মধ্যেই তাঁহাদের সমুদয় কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তাঁহারা কালসাগরে এক একটি তরঙ্গ স্বরূপ উত্থিত হইয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ মাত্র গৌরবে উন্নত থাকিয়া আবার সেই অনন্ত সাগরে মিশিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যক্ষেত্রে বাগ্‌দেবীর উপাসকগণ যেরূপ দীর্ঘকাল আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে মনস্বী লেখকগণ সেরূপ দীর্ঘকাল আত্মক্ষমতার নিদর্শন দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অল্পকালের মধ্যেই অনন্ত পদে বিলীন হইয়াছেন, কেহ কেহ বা স্বদেশের প্রাকৃতিক শক্তিতে অবসন্ন হইয়া, জীবনের মহত্তর কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন।

কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবকদিগের ক্ষমতায় বাঙ্গালা সাহিত্য অভিনব বেশে সজ্জিত ও অভিনব পথে পরিচালিত হইয়াছে। মহারাণীর রাজত্বে ইংরেজী সাহিত্য যেমন কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যও সেইরূপ কতিপয় বিষয়ে উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। সভ্যতার উন্নতি ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত লোকের শ্রমানুরাগের বৃদ্ধি হয়। জনসাধারণ অভিনব তত্ত্বসংগ্রহের জন্য বা কোন অভিনব বিষয়ে লাভবান্ হইবার নিমিত্ত একান্ত শ্রমশীল হইয়া উঠে। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ঔদাস্য অন্তর্হিত হয়। তাহারা প্রতিকূল বিষয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে জয়শ্রীলাভের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতে থাকে। সমাজের এক ভাগে কার্য্যতৎপরতার স্রোত প্রবাহিত হইলে, অন্যান্য অংশও ঐ স্রোতে অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া উঠে। এইরূপ শ্রমানুরাগের শক্তিতে সমগ্র সমাজ আন্দোলিত ও সজীব হইয়া আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।

এইরূপ সামাজিক আন্দোলনে সাহিত্যের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সংঘাতে ইংলণ্ড যখন তরঙ্গায়িত হয়, তখন ঐ তরঙ্গাবেগে ইংরেজী সাহিত্যও প্রধানতঃ প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন প্রণালীর অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে। উহাতে সাহিত্যসেবকগণ অতীত বিষয়ের পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন, এবং বর্ত্তমান বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্বসংগ্রহে অভিনিবিষ্ট হয়েন। এইরূপ অনুসন্ধিৎসা ও অভিনিবেশে ইতিহাস প্রণয়নের পথ প্রশস্ততর হয়। ইহাতে দার্শনিক মতেরও ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। মহারাণীর রাজত্বে সমাজের প্রত্যেক ভাগে অপূর্ব্ব উৎসাহ ও সজীবতার সঞ্চার হইয়াছে। ইংলণ্ডের বাণিজ্য, ইংলণ্ডের শিল্প, ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি সমগ্র পৃথিবীকে উৎসাহ ও অভিনিবেশের শিক্ষা দিতেছে। লণ্ডনের প্রান্তবাহিনী টেম্‌স নদীর তীরে উপস্থিত হও, নদীবক্ষে শত শত বাণিজ্যজাহাজ দর্শনে তোমার বোধ হইবে, নদী যেন পিণ্ডীভূত হইয়া রহিয়াছে। বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির স্থলে যাও, লোকারণ্যের অদ্ভুত দৃশ্যে তোমাকে স্তম্ভিত হইতে হইবে। মাঞ্চেষ্টার বা সেফিল্ড, বার্ম্মিংহাম বা লিবরপুলে পদার্পণ কর, নানাবিধ সুবিস্তৃত যন্ত্রশালার সুকৌশলময় কার্য্য দেখিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। এই সকল স্থানে নেত্রতৃপ্তিকর সৌন্দর্য্যের সমাবেশ নাই। প্রকৃতির মনোমোহন কমনীয় ভাব নাই। অনায়াসলভ্য মাধুর্য্যের বিকাশ নাই। সমগ্র স্থান

নিরন্তর প্রকৃতির মলিনভাবেরই পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এই মালিন্যের মধ্যে এমন উৎসাহ, এমন সজীবতা, এমন অধ্যবসায়সহকৃত প্রসন্নতা রহিয়াছে যে, তাহার অসীম শক্তিতে বারিধিবেষ্টিত একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ পৃথিবীর ললাটমণিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সমাজ-চক্রের এইরূপ আবর্ত্তনে সাহিত্যের পূর্ব্বতন অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমাজ যে ভাবে আকৃষ্ট হয়, সাহিত্য সাধারণতঃ তদনুরূপ ভাবেই সংগঠিত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে সাহিত্যও সমাজসংগঠনে সহায়তা করে। সমাজকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য প্রতিভাশালী লেখক উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে সমাজের যথোচিত উপকার হয়। কিন্তু সাধারণ সাহিত্য প্রধানতঃ সামাজিক রুচিস্রোতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড যখন বিলাসভারে অবনত ছিল, উৎকট ভোগাভিলাষে ইংরেজ যখন সুনীতির বন্ধন শিথিল করিয়া ফেলিতেছিল, তখন ইংলণ্ডে প্রধানতঃ বিষয়-বাসনার উদ্দীপক কবিতার প্রাধান্য ছিল। আবার ইংলণ্ড যখন আপনার প্রাধান্য ও স্বাধীনতার রক্ষার জন্য ভয়াবহ সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছিল, গভীর উচ্ছ্বাস ও আবেগের খরতর তরঙ্গে লোকের হৃদয় যখন আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও কবিতার প্রাধান্য ইংলণ্ডের সাহিত্য হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। উদ্দীপনাময়ী কবিতা ও উৎসাহোদ্দীপক সঙ্গীত সে সময়ে সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ ছিল। লোকের হৃদয় কর্ম্মপ্রবণ ও ধর্ম্মানুরক্ত করিবার জন্য কবি রসময়ী কবিতা লিখিতেন। সমাজ এই কবিতাস্রোতে ভাসমান হইয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিত, সেইরূপ আপনার লক্ষ্যনির্ণয়েও সমর্থ হইয়া উঠিত। এখন এই সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে এখন লোকে অপরিসীম উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। ইংলণ্ডের সাহিত্যে এখন কবিতার প্রাধান্য অন্তর্হিত ও গদ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এলিজাবেথের ইংলণ্ড যেমন আনের ইংলণ্ডের সদৃশ নহে, সেইরূপ আনের ইংলণ্ডকে বিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডের সহিত এক শ্রেণীতে নিবেশিত করাও সঙ্গত নহে। পরিবর্ত্তনের যুগে বিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডে লোকের মানসিক ভাব যে বিষয়ের দিকে গিয়াছে, গদ্যপ্রধান সাহিত্যেও সাধারণতঃ সেই বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। সাহিত্যসেবকগণ এখন কর্ম্মনিষ্ঠ সমাজের তৃপ্তিসাধন জন্য অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতেছেন। বিষয়ী লোকে ক্ষণ কালের জন্য সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে আমোদ লাভের জন্য লালায়িত হয়। সমাজ যখন এইরূপ লালসাস্রোতে ভাসমান হইতে থাকে, তখনই বিবিধ উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত সময়ে ইংলণ্ডের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডের সাহিত্যও উপন্যাসপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, সংসারক্ষেত্রে নিরন্তর আপনাদের কর্ম্মশীলতা প্রদর্শন করেন, এবং কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, যে কোন রূপে হউক, আপনাদের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থপাঠ করিতে পারেন না। বৈষয়িক ব্যাপারের আধিক্যে তাঁহাদের সময় সংক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং তাহাদের পক্ষে

সময় ও বিষয়ানুরাগ, উভয়ই বৃহৎ গ্রন্থপাঠের প্রতিকূল হইয়া উঠে। যে সকল বিষয়ের সহিত তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে যত্ন প্রকাশ করেন। অধিকন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নানা বিষয় পাঠ করিয়া তাঁহারা আপনাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করিতেও সচেষ্ট হয়েন; সমাজের এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় ভিন্ন বিষয়ের দিকে সাহিত্যের গতি হয়। সাহিত্য এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে না। এই চেষ্টার ফল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে ইংলণ্ডের সাহিত্যে এই তিনটি বিশেষ বিষয় ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডের সাহিত্য গদ্যপ্রধান হইয়াছে। এই গদ্যপ্রধান সাহিত্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি পুষ্টিলাভ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। তৃতীয়তঃ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের উন্নতি হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের এই পরিবর্ত্তন স্বতঃসংঘটিত হয় নাই। বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সামাজিক বিষয়ে ইংলণ্ড অপর দেশের নিকটে ঋণী। ইংলণ্ড তাড়িত তত্ত্ব আমেরিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন; মুদ্রাযন্ত্র হলণ্ডের নিকট লইয়াছেন; সামাজিক বিষয়েও ফ্রান্স ও জর্ম্মনীর মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। সাহিত্যেও অপর দেশ হইতে ইংলণ্ডের সাহায্য লাভ হইয়াছে। দুইটি দেশ এ বিষয়ে ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছে। এই দুই দেশ এক এক সময়ে ইংলণ্ডের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। বর্ত্তমানশতাব্দীতেও বিষয় বিশেষে ইংলণ্ডের উপর উহাদের প্রভুত্বের নিদর্শন অন্তর্হিত হয় নাই।

এই শতাব্দীতে চারি দিকে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রসারিত হওয়াতে ইউরোপের পরস্পর বিভিন্ন জনপদগুলি যেন এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নানা স্থানে কল কারখানা হওয়াতে ক্রমে শ্রমজীবিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। জনপদে জনপদে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে লোকের শিক্ষানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। প্রতি নগরে নানা বিদ্যার অনুশীলন হওয়াতে বিবিধ সভায় পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া গবেষণার পরিচয় দিতে উদ্যত হইতেছেন। নগরসমূহের বাহ্য সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হইয়াছে। নগরবাসিগণ বিদ্যালয় ও সভাতায় লোকসমাজের বরণীয় হইতেছে। নগরসমূহ যেমন শিল্প ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পূর্ব্বতন দুরবস্থা অতিক্রম করিয়া সৌভাগ্যসোপানে আরোহণ করিতেছে, জানপদবর্গও সেই রূপ আপনাদের মধ্যে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ধনেরও বৃদ্ধি হইতেছে, সাধারণের অবস্থা উন্নত হইতেছে। নানা জনপদে পরিভ্রমণ ও জানপদবর্গের সহিত আলাপ করিয়া লোকে বহুদর্শী হইতেছে। ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয় ও জর্ম্মণ, পরস্পর মনোগত ভাবের আদান প্রদান করিতেছে। সেকেন্দর শাহের দিগ্বিজয় এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রাধান্যে যেমন গ্রীস, সিরিয়, মিশর প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছিল, সেইরূপ ফরাসী, জর্ম্মণ ইংরেজ প্রভৃতিও বহুকাল বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া ইউরোপীয় সমরের সংঘাতে পরস্পরের

আচার ব্যবহার ও মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছে। এইরূপে এক জনপদের সভ্যতার সংস্রবে অন্য জনপদে সভ্যতা প্রসারিত হইয়াছে। এক জনপদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান অন্য জনপদের সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। এক জনপদের সংঘর্ষে অন্য জনপদের রাজনীতিও পরিবর্ত্তনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। লোকে যেমন দার্শনিক তত্ত্বে অধিকতর অভিনিবেশ দেখাইতেছে, সেইরূপ সমাজতত্ত্বে ও রাজনীতিতে সমদর্শী হইতেছে। এক দিকে দার্শনিক ভাবে অপর দিকে সাম্য নীতিতে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছে। এতদিন তাহারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিতি করিতেছিল, দরিদ্রভাবে অবসন্ন হইতেছিল, অজ্ঞানান্ধকারে দিক্ নির্ণয়ে অসমর্থ ছিল, এখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। তাহারা সাম্য নীতির প্রভাবে সমাজের নিম্নস্তর হইতে উন্নত স্তরে উঠিতে আগ্রহযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে জর্ম্মণী ও ফ্রান্স তাহাদের প্রধান পরিচালক হয়। জর্ম্মণীর চিন্তাশীল লোকের হৃদয় হইতে যে ভাবপ্রবাহের উৎপত্তি হয় এবং ফ্রান্সের বিপ্লবপ্রয়াসী সমাজ হইতে যে রাজনীতির আবির্ভাব হয়, তাহাতে প্রায় সমগ্র ইউরোপ বিচলিত হইয়া উঠে। মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের এই দুই প্রবাহ দুই দেশ হইতে ইংলণ্ডে উপনীত হয়। উহার অভিঘাতে ইংলণ্ডের সাহিত্য ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও নবীকৃত হইয়া উঠে। উহাতে জন্সন্ প্রভৃতির শব্দকাঠিন্য দূরীভূত হয়, ডিফো প্রভৃতির উপন্যাসরচনা প্রণালী সংস্কৃত হয় এবং ড্রাইডেন্ প্রভৃতির কবিতারচনারীতি ভিন্ন দিকে প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে উহা ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লব না ঘটাইয়া, সমস্ত বিষয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে ইংরেজী সাহিত্য নবীন ভাবে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে। কালক্রমে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব ইংরেজী সাহিত্য হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। জর্ম্মণীর সাহিত্যের শক্তিই ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইতেছে। এই দার্শনিক ভাবময় বিপুল সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যসংসারে ফরাসী সাহিত্যকে অপসারিত করিয়া উহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। জর্ম্মণ সাহিত্যের ভাব ও রচনা-প্রণালী পর্য্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোলরিজ এই বিদেশী সাহিত্যের ভাব অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে কার্লাইল এই বিষয়ে স্বকীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাণীর রাজত্বে ইংরেজী সাহিত্যে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। এই সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যও গদ্যপ্রধান হইয়াছে, ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্যেও উপন্যাসের প্রাধান্য ঘটিয়াছে এবং ইংরেজী সাহিত্যের ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যেও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের উন্নতি দেখা গিয়াছে। অধিকন্তু ইংলণ্ডীয় সাহিত্য যেমন ফরাসী ও জর্ম্মণ সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্যও সেইরূপ ইংরেজী সাহিত্যের সাহায্যে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। উৎকৃষ্ট বিষয়ের অনুকরণে অনেক সময়ে আত্মোৎকর্ষের পথ প্রশস্ততর হয়। পৃথিবীর অনেক উন্নতিশীল সাহিত্য অপর সাহিত্যের অনুকরণে পরিপুষ্ট হইয়াছে। এখন ইংরেজী সাহিত্যের

অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যও পরিপুষ্টিলাভের চেষ্টা করিতেছে। ইংরেজী সাহিত্যের সমক্ষে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষুদ্রপ্রাণ শিশুর সদৃশ। বিক্টোরিয়ার রাজত্বে এই ক্ষুদ্র প্রাণ শিশু মহা-প্রাণ হইবার জন্য পরিপুষ্টির বিষয়সংগ্রহে যেরূপ শক্তি দেখাইয়াছে, তাহা জগতের উন্নতির ইতিহাসের একটি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গদ্যপ্রধান বাঙ্গালা সাহিত্যে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবন্ধ বা গ্রন্থাদি প্রচারিত হইতেছে, এবং যে সকল উপন্যাস ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে, তৎসমুদায় বাঙ্গালীর শক্তিমত্তার অগৌরবকর নিদর্শন নহে।

সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় কবিতার প্রাধান্য থাকে। প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যে যে কবিতাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই স্রোত অনেক স্থলে প্রসন্নভাবের পরিবর্ত্তে আবিলতায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। সারল্যে ও স্বাভাবিক ভাবে আধুনিক কবিতা প্রাচীন কবিতার উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে নাই। সাধারণতঃ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, যে, আদিম অবস্থার কবিতা যেরূপ সরল, কোমল ও স্বাভাবিক ভাবোদ্দীপক হয়, আধুনিক অবস্থার কবিতা সেরূপ গুণসম্পন্ন হয় না। এই সিদ্ধান্তের মূলে কিয়দংশ সত্য আছে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদ্‌-পত্রিকায় একবার যাহা লিখিত হইয়াছিল, প্রবন্ধের বিষয় বিশদ করিবার জন্য এই স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—"সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ প্রায়ই কল্পনাপ্রিয় হইয়া থাকে। বেগবতী তরঙ্গিণী, সমুন্নত পর্ব্বত, সুচ্ছায় বৃক্ষ, অনন্ত নীল আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয় যেমন এক দিকে তাঁহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহত্তর বা নিকৃষ্টতর মানবচরিত্রও সেইরূপ তাঁহার রসময়ী কবিতার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থার কবিতা প্রায়ই উদ্দীপনা, উদ্ভাবনা প্রভৃতি গুণে উৎকর্ষ লাভ করে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে বটে, কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধিতে অনেক সময়ে কবিতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। বাল্মীকি বা হোমর যাহা দেখেন নাই, কল্পনাবলে যাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক বা গণিতজ্ঞের ক্ষমতায় তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। কিন্তু বাল্মীকি বা হোমর কাব্যজগতে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। আদিম অবস্থা মানুষকে অধিকতর সরল এবং তাহার ভাষাকে অধিকতর কবিত্বময় করে। কোমলমতি বালক যখন নীতি শিক্ষার জন্য হিতোপদেশে পথিক ও ব্যাঘ্রের কথা পাঠ করে, তখন ব্যাঘ্রের সেই ভয়ঙ্কর ভাব, সেই বলবতী জীবহিংসাপ্রবৃত্তি, তাহার স্মৃতিপটে নিরন্তর জাগরূক থাকে। ব্যাঘ্রের কথায় তাহার কল্পনা নিরন্তর উদ্দীপিত হইতে থাকে। তাহার বাসগ্রামে ব্যাঘ্র না থাকিলেও এবং সে উহার ভীষণ মূর্ত্তির সহিত পরিচিত না হইলেও, সর্ব্বদাই তাহার মনে হয়, ব্যাঘ্র যেন মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শিশু যেমন কল্পনাতরঙ্গে আন্দোলিত হয়, সভ্যতার আদিম অবস্থায় কোমল মতি মানুষও সেইরূপ কল্পনাস্রোতে ভাসমান হইয়া

থাকে। মানুষ সভ্যতার দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার চিন্তাশীলতার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক ভাবের বৃদ্ধি হয়। তখন সে সরলহৃদয় ভাবুক না হইয়া, প্রগাঢ় চিন্তাশীল দার্শনিক হইয়া উঠে।

"কিন্তু আদিম অবস্থার সকলেই প্রকৃত কবিত্বের অধিকারী হইতে পারে না। প্রতিভা সকলকে কাব্যজগতের আধিপত্য প্রদান করে না। * * * পূর্ব্বতন অবস্থায় মানুষের ভাষা কবিত্বময় হইলেও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই প্রকৃত কবি বলিয়া সম্মানিত হয়েন। কবি লোকের সমক্ষে মায়া বিস্তার করেন। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছায়াবাজীর সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন। অন্ধকারময় গৃহে ছায়াবাজী যেমন দর্শকের সমক্ষে নানা দৃশ্য বিস্তার করে, অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে কবিতাও সেইরূপ মায়া দেখাইয়া লোকের হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। আলোকের সঞ্চারে ছায়াবাজীর কৌশল যেমন ক্রমে অন্তর্হিত হয়, সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কাব্যজগতের সেই চিত্তবিমোহিনী মায়াও ক্রমে অপগত হইতে থাকে। যাহা হউক, সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থায় উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হইলেও যে, সভ্যতার পূর্ণ অবস্থায় কবিতার উৎকর্ষ সাধিত হয় না, এমন নহে। প্রতিভা সহায় হইলে মানব উন্নত অবস্থাতেও কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিচয় দিতে পারে। সভ্যযুগে এমন অনেক কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তৎসমুদয় অদ্যাপি সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে, এবং যাঁহাদের প্রতিভাগুণে সেই সকল কাব্য পাঠকের হৃদয় অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সন্তোষরসে অভিষিক্ত করিতেছে, তাঁহারা অদ্যাপি সমগ্র কবিসমাজে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মিল্টনের ন্যায় কোন কবি সহৃদয়সমাজে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু সভ্যতার আদিম অবস্থায় মিল্টনের আবির্ভাব হয় নাই। মিল্টন সভ্যযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার সুশিক্ষা লাভ হইয়াছিল। লাতিনে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি ইউরোপের নানা দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভূয়োদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনপদের পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়া, সংগৃহীত জ্ঞানের সম্প্রসারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইউরোপের প্রচলিত ভাষায় তাঁহার যথোচিত অধিকার ছিল। তিনি দার্শনিকভাবে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; দার্শনিক ভাবে তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতেন, দার্শনিক তত্ত্বের সহিত দুরবগাহ রাজনীতির পরিচয় দিয়া লোকের হৃদয় চমকিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপ সভ্যতার অবস্থায়, সভ্যযুগের অনুমোদিত এইরূপ সুশিক্ষায়, রাজনীতি ও দার্শনিক ভাবের এইরূপ জটিলতায়, মিল্টনের প্রতিভা সঙ্কুচিত হয় নাই। মিল্টন যে মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সমগ্র কাব্যজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে।"

সভ্যতার উৎকর্ষে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞানের প্রাধান্যে বাঙ্গালা কাব্য যে, উন্নতভাব বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহা নহে। প্রতিভাশালী বাঙ্গালী কবি বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য

কাব্যের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার কল্পনা ও ভাবসংগ্রহের সহায় হইয়াছে। তিনি পাশ্চাত্য ভাবের সহিত স্বদেশীয় ভাবের তুলনা বা সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে শিখিয়াছেন। এইরূপ শিক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কয়েক খানি উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তৎসমুদয় আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষায় অসমর্থ হয় নাই। ভাবের গাম্ভীর্য্যে, বর্ণনার বৈচিত্র্যে, কল্পনার উচ্ছ্বাসে মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহার, পলাশীরযুদ্ধ বা স্বপ্নপ্রয়াণ প্রভৃতি কাব্য উন্নত সাহিত্যর অযোগ্য বিষয় নহে। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনা বাঙ্গালীর প্রতিভার প্রধান নিদর্শন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হইয়া, কবি এইরূপে স্বকীয় প্রতিভা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ বিক্‌টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালার যে সকল কবি কল্পনাবিভ্রমে বা চরিত্রাঙ্কনে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যই অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রধান পথপ্রদর্শক হইয়াছে। তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রদর্শিত পথে পদার্পণ করিয়া যেখানে চিত্তসংযমের পরিচয় দিয়াছেন, সেই খানেই তাঁহাদের কবিতা জাতীয়ভাবে হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। মেঘনাদবধকার অসামান্য প্রতিভাশালী হইয়াও চিত্তসংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি সংসারে যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইয়াছেন, অমৃতময়ী বাগ্‌দেবীর আরাধনা স্থলেও সেইরূপ অসংযত-ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। কল্পনা তাঁহাকে সর্ব্বদা অনেক উচ্চতর ও অভাবনীয় বিষয়ের দিকে লইয়া যাইত। গম্ভীর ভাব সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় তাঁহার কার্য্যসাধনে নিয়োজিত হইত। বর্ণনা বৈচিত্র্য সর্ব্বদা তাঁহার আনুগত্যস্বীকারে প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও স্বকীয় মহাকাব্যে জাতীয় ভাবের সম্মানরক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ আধুনিক কবিগণ আপনাদের কাব্যে যথোচিত ক্ষমতা প্রকাশ করিলেও সরল ও স্বাভাবিক ভাবে প্রাচীন কবিকুলের নিম্নগণ্য হইয়াছেন। এ অংশে চিরদরিদ্র মুকুন্দরামকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান কালে যে সকল কবি জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের কাব্যই বাঙ্গালা সাহিত্যে আদর লাভ করিয়াছে। এই সকল কাব্যের সংখ্যা অধিক নহে। বিক্‌-টোরিয়ার রাজত্বে ইংরেজী সাহিত্য যেরূপ কাব্যপ্রধান হয় নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যও সেইরূপ কাব্যপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। কল্পনাবৈচিত্র্য থাকিলেও সারল্য, মাধুর্য্য ও স্বাভাবিক ভাবের অভাবে ইদানীন্তন বাঙ্গালা কাব্য পূর্ব্বতন কাব্যের নিকটে নিঃসন্দেহ পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

যাহা হউক, বিক্‌টোরিয়ার রাজত্বে গদ্য সাহিত্যের উন্নতিই বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই ঘটনার জন্যই বিক্‌টোরিয়ার রাজত্বকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতি-হাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিক্‌টোরিয়ার রাজত্বের পূর্ব্বে যে সকল গদ্যগ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইত, তৎসমুদয়ের রচনা উৎকৃষ্ট ছিল না। উৎকট ও অযথাভাবে সন্নিবেশিত শব্দের আড়ম্বরে উহা শ্রুতিকঠোর হইত। মহারাণীর রাজ্যভার গ্রহণের প্রায় ৩০।৩৭

বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থের প্রচার হয়। এই সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে গদ্যরচনা করিতে থাকেন। এই সময়ের গদ্য কিরূপ ছিল নিম্নোদ্ধৃত অংশ-পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে—

"দ্বাপর যুগান্তে ভারতবংশে অভিমন্যুসন্ততি মহারাজা পরিক্ষিত সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ব প্রকারেতে শিষ্ট। এক দিবস মৃগয়াতে কার্য্যক্রমে অমাত্য ও সেনাগণের সঙ্গ হইতে ভিন্ন হইয়া দৈবে দূর বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন; অত্যন্ত শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল না পাওনেতে বিব্রত জল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল এক রম্যস্থল, কিন্তু জল নিকটের মধ্যে দেখেন না; একজন মৌনব্রতে বসিয়াছে, তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে উত্তর না পাইয়া কোপান্বিত হইয়া সেই স্থানে মৃতসর্প ছিল, তাহা সেই মুনির গলায় বেষ্টন করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। সে মুনির পুত্র আসিয়া পিতার বিগতি দেখিয়া উষ্মায় উষ্মান্বিত হইয়া জল হস্তে করিয়া শাপ দিল, যেজন মৃতসর্প আমার পিতার গলায় জড়াইয়াছে, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তাহাকে তক্ষক কালসর্প দংশুক। পশ্চাৎকাল বিদিত হইল সে ব্যক্তি ছিল রাজা পরিক্ষিত।" (লিপিমালা।)

এই গদ্য রচনা উৎকৃষ্ট রীতির অনুমোদিত নহে। এই সময়ে যে সকল গদ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের মধ্যে রচনার প্রাঞ্জলতার জন্য একখানি অধিকতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একাংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় শিবনিবাসের বাটীতে মহাহর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন; সর্ব্বদা আনন্দিত, পুরবাসিরা সর্ব্বক্ষণ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত, নানা দেশীয় গুণবান্ ব্যক্তি আসিয়া রাজ-সভায় বসিয়া গুণের পরীক্ষা দিতেছেন; পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহৃত রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন; এই প্রকার প্রত্যহ হইতেছে, দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সভা, সকলেই মহারাজকে প্রশংসা করে, দিনে দিনে রাজ্যের বৃদ্ধি এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে। রাজার পাঁচ পুত্র, কোন অংশে ক্রটী নাই, যাবদীয় লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে, কিন্তু নবাব স্রাজেরদৌলা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়াছে; মহারাজ চিন্তান্বিত আছেন, দেশাধিকারী দুর্বৃত্ত, কখন কি করে? মধ্যে মধ্যে পণ্ডিতদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন, দেখ, দেশাধিকারী দুর্বৃত্ত, আপনারা সকলে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করুন যে দুষ্ট অধিকারী এদেশে না থাকে; কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবা, কদাচ প্রচার হয়। এইরূপে নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন।" (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র।)

এই রচনা সরল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের গদ্য রচনার তুলনায় এই রচনাও অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইবে। যাহা হউক, পূর্ব্বে এইরূপ রচনাই প্রশংসনীয় ছিল। সমালোচকগণ এক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রকারকে বাঙ্গালার আডিসন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। পরবর্ত্তী গদ্যলেখকগণ প্রায় এইরূপ প্রণালীতেই গদ্য লিখিতেন। লিপিমালার গদ্য রাজাবলিতে এবং বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় বা সংবাদকৌমুদীতে উৎকর্ষ লাভ করে বটে,

কিন্তু ঐ গদ্যরচনাও তাদৃশ ললিত, কোমল, মধুর বা ওজস্বিতাসম্পন্ন ছিল না। মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ও পরে যে গদ্য রচনার প্রচার হয়, তাহাতে অনুপ্রাস ও যমকেরই প্রাধান্য ছিল। প্রথম অবস্থায় লোকে প্রায়শঃ অনুপ্রাসময়ী রচনায় পক্ষপাতী হইয়া থাকে। তাহারা উচ্চতর বিষয়ের দিকে যাইতে পারে না। গভীর ভাব সাগরে নিমজ্জিত হইতেও তাহাদের সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু তাহারা এক উচ্চারণের ও এক শ্রেণীর কথাগুলি পরস্পর গ্রথিত দেখিলে আমোদিত হয়। এই জন্য রচনাকার লোক রঞ্জনার্থে অনুপ্রাসের আড়ম্বর করিয়া থাকেন। প্রভাকর-সম্পাদকের গদ্যরচনা এইরূপ ছিল। প্রভাকরে প্রায়শঃ এইরূপ গদ্য দেখা যাইত—

"এই চিত্র চিত্র কোন্ চিত্রে কি চিত্র করিয়াছে? এ চিত্র, এ চিত্র কি চিত্র! অতি বিচিত্র। যিনি ইহার কারক, তাঁহার কি আশ্চর্য্য চিত্র শক্তি! সেই শিক্ষক মহাশয়ের লিপি-নৈপুণ্য কত ব্যাখ্যা করিব? লেখনী লেখনে অশক্ত, বর্ণনে বর্ণাবলী বলবিহ্বলা, কথনে কবিত্ব অসমর্থ।" (সংবাদপ্রভাকর। ১২৬০ সাল।)

এই সময়ের আর এক শ্রেণীর গদ্যেরও কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

"চিত্তবৃত্তি অদৃষ্ট পদার্থ যাহার দ্বারা দৃষ্টাদৃষ্ট যাবৎ পদার্থ প্রকাশ পায়, তাহার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি গোমহিষ্যাদিরো আছে, কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি কেবল আহার নিদ্রাদি বিষয়ে থাকে। মনুষ্যের বুদ্ধি দৃষ্টাদৃষ্ট যাবদীয় পদার্থ বিষয়ে দীপ্তি পায়, আর চক্ষুরাদির অতীত যে পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বলোকে মনুষ্য দেহকে উত্তম কহিয়াছেন। এই বুদ্ধি ব্যক্তিবিশেষে কোন দোষবশতঃ স্থূলা, গুণবিশেষপ্রযুক্ত সূক্ষ্মা হয়েন, সেই সূক্ষ্মতা যাহার দ্বারা হয়, তাহাকে উপায় বলা যায়। এই বুদ্ধিকে মনুষ্য গোমহিষ্যাদি আধারের বিভিন্নতায় নানা কহিয়া থাকেন, ফলতঃ সর্ব্বসাধারণেরই এক, যেমত এক বায়ুকে শরীরের মধ্যে স্থান বিশেষে স্থিতিহেতু প্রাণবায়ু উদান বায়ু ইত্যাদি নানাপ্রকার বলা যায়, তাহার ন্যায় এক বুদ্ধিকে আধার ভেদে নানা কহিয়া থাকেন।" (জ্ঞানার্ণব।)

বিক্টোরিয়ার রাজ্যভার গ্রহণের পর বাঙ্গালা গদ্যের যখন এইরূপ অবস্থা ছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে দুইটি প্রতিভাশালী পুরুষ আবির্ভূত হয়েন। ইঁহাদের প্রতিভাবলে বাঙ্গালা গদ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়। যাহা নির্জ্জীব ও নিস্তেজ ছিল, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় যাহা রসহীনতার পরিচয় দিতেছিল, তাহা সজীব ও সতেজ হয়, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা কুসুমস্তবকযুক্ত ও শ্যামল পত্রাবলিপরিবৃত বালতরুর ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই দুই জন প্রতিভাসম্পন্ন সুলেখক সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতিসাধনে অগ্রসর হয়েন। ইঁহাদের রচনা সংস্কৃত শব্দবহুল হইলেও উহা মাধুর্য্যে বা লালিত্যে বিসর্জ্জন দেয় নাই। ইঁহারা এমন সুকৌশলে শব্দবিন্যাস করিয়াছেন, এমন সুনিয়মে প্রত্যেক বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন, এমন সুশৃঙ্খলার সহিত রচনার ক্রমোৎকর্ষ

দেখাইয়াছেন যে, ইঁহাদের গদ্য সর্ব্বপ্রকারে উৎকট ভাবের সম্পর্ক শূন্য হইয়াছে। এইস্থলে ইঁহাদের প্রত্যেকের সংস্কৃত শব্দবহুল রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

"ব্রাহ্মণ, আসন পরিগ্রহ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন; যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয় জলধি-জলে নিলীন হইলে, মীনরূপ ধারণ করিয়া, ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি, বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা, প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া, পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি, নৃসিংহের আকার স্বীকার করিয়া, নখকুলিশ প্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার হইয়া, দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি, জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া, তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা, মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবলচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া, অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন; যিনি, দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে, দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া, বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে, সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক, দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন; যিনি, দ্বাপর যুগের অন্তে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, দৈত্যবধদ্বারা ভূমির ভার হরিয়া, অশেষ প্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি দেবমার্গ বিপ্লাবনের নিমিত্ত, বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন; যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া, ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, করতলে করাল করবাল ধারণপূর্ব্বক, বেদবিদ্বেষী, ধর্ম্ম মার্গপরিভ্রষ্ট, নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন; সেই ত্রিলোকীনাথ, বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।" (বেতালপঞ্চবিংশতি।)

অপর লেখকের রচনা;—

"তাঁহারা কি শুভ দিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরকালে যে অত্যুন্নত অতি দুর্লভ গৌরব পদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনীজনিতা কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারতভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটী অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালের ইতিহাস এক কালেই বর্ণন করিতেছে এবং জাহ্নবীজলপবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রাসলিল সুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতি বিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে

তাহার আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্যরূপ অমূল্যরত্নের আকর স্বরূপ যে আয়ুঃপ্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমানকাল স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় অসংখ্য লোকের রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে স্বাস্থ্যগুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে এবং কোটি কোটি জনের উৎপদ্যমান শোকসন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্যবিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ বিশেষের শক্তিযোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারতক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমপ্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছে এবং সেদিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূরশেখর শিখজাতির হৃদয়চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্যভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবলপরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন, ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়। ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমনপদবীতে আম্রশাখাসমন্বিত সলিলপূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের পদাম্বুজরজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।" (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথমভাগ।)

এই রচনার অর্থপরিগ্রহে কোন কষ্ট হয় না। ইহা যেরূপ সুপরিস্ফুট, সেইরূপ হৃদয়াকর্ষক। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে যখন এইরূপ রচনার আবির্ভাব ঘটিল, তখন ঐ সাহিত্য ক্রমোন্নতিপথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাঁহাদের অসীম ক্ষমতায় এই উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল, তাঁহারা উত্তরকালে সাহিত্যের পরিচর্য্যায় উদাসীন থাকেন নাই। যে প্রতিমার দেহ নয়নের অতৃপ্তিকর মৃত্তিকাস্তূপমাত্র ছিল, তাঁহাদের কৌশলে উহা সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারা দেবপ্রতিমা সুগঠিত করিয়াছেন এবং যথাযথ বর্ণে উহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এখন সংযতচিত্ত সাধকগণ এই প্রতিমার সমক্ষে ভক্তিভরে অবনতমস্তক হইতেছেন এবং ইহার অনন্ত সৌন্দর্য্যে বিশুদ্ধ হইয়া, সৌন্দর্য্যসাধক সেই মহাপুরুষদ্বয়ের প্রভাবময়ী প্রতিভার পূজা করিতেছেন। বেতালপঞ্চবিংশতির রচনা শকুন্তলা ও সীতার বনবাসে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। উপাসক সম্প্রদায়ের রচনা সকল স্থলেই অপূর্ব্ব ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে। ফলতঃ একজনের রচনা যেরূপ কোমল, অপর জনের রচনা সেইরূপ ওজস্বী। উভয়েই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সাহিত্যক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং উভয়েই বিবিধগ্রন্থ প্রচার করিয়া, শিক্ষার পথ প্রশস্ততর করিয়াছেন। উভয়েই বিশেষ বিশেষ গুণে চিরবরণীয়। একজনের বিশেষত্ব তাহার গ্রন্থের রচনা এবং হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা—অপর জনের বিশেষত্ব তদীয় গ্রন্থে ভাবের গভীরতা এবং

তত্ত্বের বিজ্ঞান ও পুরাবৃত্তের আলোচনা। একজন শাস্ত্রীয় বিচারে আপনার বহুদর্শিতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন; অপর জন দুশ্চিকিৎস্য রোগে নিতান্ত জীর্ণ হইয়াও, পুরাতত্ত্বের বর্ণনায় যে ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে মিল্টন বা স্কটের ক্ষমতাকেও অধঃকৃত করিয়াছে।

বঙ্গের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রাধান্যকালে একটি মনস্বী পুরুষ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইনি বাঙ্গালা গদ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিয়া, ভিন্নপ্রণালীতে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ইঁহার রচনায় সংস্কৃত শব্দমালার সমাবেশ নাই। চিরপ্রচলিত সরল কথার প্রয়োগ ইঁহার গদ্যের বিশেষত্ব। কাদম্বরীর অনুবাদে যেমন সংস্কৃতানুসারিণী রচনার প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে; ইঁহার রচনাতেও সেইরূপ নিত্যব্যবহার্য্য কথার প্রাধান্য রহিয়াছে। ইঁহার গদ্য রচনা এইরূপ—

"সূর্য্য অস্ত না হইতে হইতে বোট দেওয়ানজীর ঘাটেতে গিয়া লাগিল। বাবুরাম বাবুর শরীরটী কেবল মাংসপিণ্ড—চারিজন মাজিতে কুঁতিয়া ধরাধরি করিয়া উপরে তুলিয়া দিল। বেণীবাবু কুটুম্বকে দেখিয়া "আস্তে আজ্ঞা হউক বস্তে আজ্ঞা হউক" প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টালাপ করিলেন। বাবুর বাটীর চাকর রাম তৎক্ষণাৎ তামুক সাজিয়া আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু ঘোর হুঁকারি, দুই এক টান টানিয়া বলিলেন, হুঁকাটা পিসে পিসে বল্‌ছে—খুড়া খুড়া বল্‌ছেন না কেন? বুদ্ধিমান লোকের নিকট চাকর থাকিলে সেও বুদ্ধিমান্ হয়। রাম অমনি হুঁকায় ছিচ্‌কা দিয়া—জল ফিরাইয়া—মিটেকড়া তামাক সেজে—বড় দেখে নল করে হুঁকা আনিয়া দিল। বাবুরাম বাবু হুঁকা সম্মুখে পাইয়া একেবারে যেন ইজারা করিয়া লইলেন—ভড়র ভড়র টান্‌ছেন—ধুঁয়া বৃষ্টি কর্‌ছেন—ও বিজর বিজর বক্‌ছেন।"

(আলালের ঘরের দুলাল।)

এইরূপ ভাষা সামান্য বিষয়ের বর্ণনায় বিশেষ উপযোগী। এ অংশে বাঙ্গালা গদ্য আলালের ঘরের দুলালকারের রচনায় উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু গভীর বিষয়ের বর্ণনায় এইরূপ ভাষা দ্বারা কোন উপকার লাভ হয় না, যেখানে বর্ণনার বৈচিত্র্য রক্ষা করিতে হয়, উদ্দীপন বা ওজোগুণের পরিচয় দিতে হয়, সেখানে আলালের ঘরের দুলালের ভাষার আশ্রয় লইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। ঈদৃশ স্থলে সংস্কৃতানুযায়িনী রচনা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু সবিশেষ কৌশলের সহিত সংস্কৃত শব্দের বিন্যাস না করিলে রচনা প্রায়ই প্রসাদগুণ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সীতার বনবাস, শকুন্তলা বা চারুপাঠের রচনায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের উপকার হইয়াছে। কিন্তু কাদম্বরীর অনুবাদে বাঙ্গালা গদ্য তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। আলালী ভাষাতেও গদ্যরচনার সমুদয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, যেহেতু ঐ রচনা ভাষার গাম্ভীর্য্য রক্ষার অনুকূল হইয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তী সময়ে আলালী ভাষার উন্নতি সাধন হয়। একজন প্রতিভাশালী সুলেখক সংস্কৃতের আশ্রয়ে এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার বঙ্গদর্শনে তদীয় অসামান্য প্রতিভা পরিস্ফুট হয়। বঙ্গদর্শনের

সময় হইতে এই প্রতিভায় সংস্কৃত ও আলালী ভাষার মিশ্রণে একটি প্রাঞ্জল ও মনোমত ভাষা উৎপন্ন হইয়া, সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির সহায় হইয়া উঠে। এই কার্য্য সম্পাদনে আর এক জন ক্ষমতাশালী লেখক বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহোদয়ের প্রধান সহায় হয়েন। বঙ্গদর্শনের আশ্রয়ে ইহাঁর লিপি-ক্ষমতার বিকাশ হয়, বঙ্গদর্শনসম্পাদকের প্রতিভায় ইঁহার প্রতিভা দীপ্তিশালিনী হয়, বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের রচনার সহিত ইঁহার রচনাও একশ্রেণীতে নিবেশিত হয়। এইরূপ রচনানৈপুণ্য দেখাইয়া, ইনি অভিনবপথে ভাষার পরিচালনা বিষয়ে বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়েন। ইঁহার মহীয়সী সাধনায় বঙ্গদর্শনসম্পাদকের উদ্দেশ্য সফল হয়। বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির ইতিহাসে ইঁহার নামও বঙ্গদশন-সম্পাদকের নামের সহিত গ্রথিত থাকিবে। ইঁহার মহৎ কার্য্য বঙ্গদর্শনের সহিতই শেষ হয় নাই। শেষে ইনি নবজীবন প্রচার করিয়া, হিন্দুর পূর্ব্বতন গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যত্নশীল হয়েন।

আলালীভাষার সম্প্রসারণ ও ক্রমোৎকর্ষ সাধনের সহিত আর একজন ক্ষমতাশালী লেখক ভাষার পরিপুষ্টি-বিধানে অগ্রসর হয়েন। ইনি সর্ব্বাংশে বেতালপঞ্চবিংশতি বা চারুপাঠের রচনারীতি অবলম্বন না করিয়া উভয় দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। সংস্কৃত শব্দাবলীর সহিত অসংস্কৃত শব্দমালার সামঞ্জস্য হওয়াতে ইঁহার রচনা প্রণালী দ্বারা ভাষার উদ্দীপনা বৃদ্ধি হয়, এবং ভাষা সংকীর্ণভাবে আবদ্ধ না হইয়া সম্প্রসারিত ক্ষেত্রের বিমুক্ত পথে অতিবেগে ধাবিত হইতে থাকে। বান্ধব-সম্পাদকের প্রতিভায় এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয়। বান্ধব উন্নতভাবের অবতারণা করিয়া সাহিত্যকে যেমন উন্নতিপথে পরিচালিত করিয়াছে, উদ্দীপনাময়ী ভাষা দ্বারাও সেইরূপ উহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গালা গদ্যের এইরূপে পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। লিপি-মালা প্রভৃতির ভাষা এইরূপে বিভিন্ন লেখকের প্রতিভায় সংস্কৃত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করে, উন্নত ভাষার সহিত উন্নত ভাবও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের সহায় হইয়া উঠে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বিক্টোরিয়ার অধিকারে বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির সহিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্রাদির উন্নতি হয়। সাময়িক পত্রের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অসামান্য উপকার হইয়াছে। পুরাবৃত্তে ও বিজ্ঞানে যিনি সবিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়া সহৃদয় পাঠকবর্গের বরণীয় হইয়াছেন, যাঁহার ওজস্বী রচনার পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তিনি যখন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়েন, তখন ঐ পত্রিকায় গম্ভীর ভাবে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইতে থাকে এবং উহার ভাষা বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগিনী হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পর যে সকল সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ের মধ্যে বিবিধ বিষয়ের বর্ণনায় বিবিধার্থসংগ্রহ প্রাধান্য লাভ করে। ভাষার তাদৃশ মাধুর্য্য না থাকিলেও এবং উদ্দীপনা ও ওজস্বিতায় উহা তাদৃশ অলঙ্কৃত না হইলেও ইতিহাস, ভূগোল পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা বিষয় থাকাতে বিবিধার্থসংগ্রহ আজ পর্য্যন্ত জ্ঞান

রত্নের ভাণ্ডার বলিয়া সম্মানিত হইতেছে। ইহার পর সাময়িক পত্র ভিন্ন পথে পদার্পণ করে। এ পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রের বিষয়গুলি প্রধানতঃ ইংরেজী হইতে সঙ্কলিত হইত। কিন্তু বঙ্গদর্শন এইরূপ সঙ্কলন কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উদ্ভাবনার পরিচয় দেয়। উহা অভিনব প্রণালীতে ভাষার সংগঠন বিষয়ে যেরূপ যত্নশীল হয়, ভাবের গভীরতা সাধনে ও বর্ণনীয় বিষয়ের নূতনত্ব রক্ষাতেও সেইরূপ তৎপর হইয়া উঠে।

যিনি বঙ্গদর্শনের প্রকাশ করেন, তিনি সাহিত্য সংসারে অসীম শক্তিমত্তা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভায় উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ক্ষমতায় বিভিন্ন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পাঠক সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যে বঙ্গভাষা জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীর ন্যায় প্রসন্নভাবে হাস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদর্শনের আশ্রয়ে অনেক ভাবুক ব্যক্তি রচনা কৌশলে অভ্যস্ত হয়েন। তাঁহাদের মাতৃভাষার পরিচর্য্যার ফল অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হয়েন। স্বদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নরাশির সংগ্রহেও ইঁহাদের যত্ন ও অধ্যবসায় পরিস্ফুট হয়। ইঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের সহিত স্বদেশীয় জ্ঞানের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেন, তৎসমুদয় এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্গদর্শন হইতে এক দিকে যেমন উৎকৃষ্ট উপন্যাস ও রহস্য প্রধান গ্রন্থাবলীর উদ্ভব হয়, অপরদিকে সেইরূপ সমাজ-সমালোচন ও নানা প্রবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পুস্তক প্রচারিত হইয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকে। বঙ্গদর্শন হস্তান্তরিত হইলেও উত্তর কালে উহা হইতে যে উৎকৃষ্ট সমালোচনার উৎপত্তি হয়, তদ্দারা সাহিত্য মহিমান্বিত হইয়াছে। ইউরোপে সেক্ষপীয়রের যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে,; বাঙ্গালার শকুন্তলা-তত্ত্ব সর্ব্বাংশে তৎসমুদয়ের গৌরবস্পর্দ্ধী হইতে পারে।

বঙ্গদর্শনের সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অনির্ব্বচনীয় জীবনীশক্তি লক্ষিত হয়। একদিকে বান্ধব আবির্ভূত হইয়া উদ্দীপনাময়ী ভাষায় প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে থাকে। অপরদিকে আর্য্যদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান পরিগ্রহ করিয়া নানা বিষয়ে পাঠকদিগকে আমোদিত করিতে থাকে। প্রভাতচিন্তা প্রভৃতি গৌরবান্বিত গ্রন্থ বান্ধবের চিন্তাশীলতার ফল, আর্য্যদর্শন হইতে মিল ও ম্যাটসনির জীবনীর ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের উৎপত্তি হয়। ভারতীর দার্শনিক তত্ত্ব ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতিতে সাহিত্যের যথোচিত উপকার হয়; এবং জ্ঞানাঙ্কুরে যে উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাহা গুণ গৌরবে সাহিত্য সমাজের চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। এখন অনেক উপন্যাসের উৎপত্তি হইতেছে, অনেক উপন্যাসকার সাহিত্যে আপনাদের ক্ষমতার নিদর্শন রাখিতে আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন, ইঁহাদের গ্রন্থ এপর্য্যন্ত স্বর্ণলতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এখন কেবল এক ভারতী ব্যতীত আর সকলের তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদর্শন

বান্ধব প্রভৃতি সাহিত্যে যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, তাহা মন্দীভূত হইলে একবারে নিরুদ্ধ হয় নাই। ইহার স্নিগ্ধ ধারায় অদ্যাপি সহৃদয় পাঠকবর্গের তৃপ্তিলাভ হইতেছে। সাধনার অন্তর্ধান হইয়াছে বটে, কিন্তু নব্যভারত, সাহিত্য প্রভৃতি এখনও সাহিত্যের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিতেছে।

এই স্থলে আর দুই খানি সাময়িক পত্রের উল্লেখ করা আবশ্যক। সমাজের রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই খানির আবির্ভাব হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সামাজিক রুচি যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, সাধারণ সাহিত্যে প্রধানতঃ সেই বিষয়ের প্রাধান্য থাকে। অধিকন্তু সমাজে গতি ফিরাইবার জন্যও সময়ে সময়ে উন্নত ভাবের গ্রন্থ সাহিত্যে স্থান পরিগ্রহ করে। যখন ইংলণ্ডের সমাজ ভোগাভিলাষের ঘৃণার্হ পঙ্কিল ভাবে পূর্ণ হয়, তখন নানারূপ নিন্দনীয় নাটক ও সঙ্গীত রচিত হইতে থাকে। একদল ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু যখন আপনাদের সমাজের এই পঙ্কিল ভাব দূর করিতে যত্নশীল হয়েন, তখন ইংরেজী সাহিত্যে মিল্টনের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের উৎপত্তি হয়। এই মহাকাব্য সামাজিক রুচির পঙ্কিলতা দূর করিয়া প্রসন্নতা বিধানে অগ্রসর হয়, সমাজ ঐ কাব্যের ভাবগাম্ভীর্য্যে মোহিত হইয়া আপনার অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। বঙ্গীয় সমাজ এক সময়ে বিষয়ান্তরে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গালী এতদিন উপন্যাসে তৃপ্তিলাভ করিতেছিল; পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের পরিচয়ে আমোদিত হইতেছিল, কিন্তু যে ধর্ম্মভাবের উপর আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহে মনোযোগী হয় নাই। এক খানি সংবাদপত্র এ বিষয়ে বাঙ্গালীর ঔদাস্য দূর করে। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক মহোদয় পাশ্চাত্য সমাজের সহিত স্বদেশীয় সমাজের তুলনা করিয়া যেরূপ সূক্ষ্মভাবে হিন্দুর মহত্ত্বের পরিচয় দেন, তাহাতে বাঙ্গালীর চৈতন্য হয়। পুষ্পাঞ্জলির উপর পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধ বঙ্গীয় সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে। বঙ্গীয় সমাজ যখন পাশ্চাত্য ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া জাতীয় ভাবে হতাদর হইতেছিল, তখন পুষ্পাঞ্জলিকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং জাতীয় সমাজকে জাতীয়ভাবে শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মভাবের আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েন। সামাজিক প্রবন্ধে তাঁহার গবেষণা, বিচারপটুতা ও যুক্তি-চাতুর্য্যের একশেষ প্রদর্শিত হয়। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও গভীর ভাবময় উপদেশ বাক্যে সমাজ আত্মপ্রকৃতির স্বরূপ চিন্তায় মনোনিবেশ করে। এই সময় হইতে মিশনরীদিগের ধর্ম্মান্দোলনের আঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হয়। হিন্দু ধর্ম্ম-প্রচারক বক্তারা হিন্দু সমাজে ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় মনোযোগী হয়েন, যাঁহারা এক সময়ে বঙ্গদর্শনে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তাঁহারা এইরূপ ঘাতের প্রতিঘাতে স্থির থাকিতে পারেন নাই। পুষ্পাঞ্জলিকার যে পথ প্রদর্শন করেন, সেই পথের অনুসরণে তাঁহাদের বলবতী ইচ্ছা হয়। তাঁহারা পুনর্ব্বার উৎসাহের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এই সময়ে সমাজের ধর্ম্মানুশীলন-লালসার তৃপ্তিসাধন জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে "নবজীবন" ও

"প্রচারের" আবির্ভাব হয়। প্রথমে যিনি বঙ্গদর্শনের পরিচালক ছিলেন, তিনি প্রচারের প্রধান লেখক হয়েন এবং যিনি বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের প্রধান সহকারী ছিলেন, তিনি নবজীবনের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। সুতরাং "প্রচার" ও "নবজীবন" বঙ্গদর্শনে প্রতিবিম্বিত প্রতিভারই বিকাশ স্থল। প্রচার ও নবজীবনে যে প্রতিভার বিকাশ হয়, তাহা প্রধানতঃ হিন্দুকে ধর্ম্মরাজ্যের শৃঙ্খলা দেখাইতে নিয়োজিত থাকে। এখন এই উভয় সাময়িক পত্রেরই তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু উহা হইতে যে কয়েক খানি ধর্ম্মভাব-মূলক গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা চিরদিন বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব ঘোষণা করিবে।

দেখা গেল যে, বিক্টোরিয়ার রাজত্বে বঙ্গদর্শন প্রচারের পর বিবিধ সাময়িক পত্র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয়। এই সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে থাকে। নানা বিষয়ে বিবিধ সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত হইয়া মাতৃভাষার সেবায় মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা এই সময়ে আপনাদের বিচারপটুতা, ভাবগাম্ভীর্য্য ও রচনা ক্ষমতা দেখাইয়া সহৃদয় সমাজকে চমকিত করিয়া তুলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচুর্ভাবে হিন্দুসমাজ যেমন কর্ম্মপ্রবণ হয়, বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবে সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যও সেইরূপ কার্য্যকারিণী শক্তিতে জীবন্ত ভাব ধারণ করে। এই সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের প্রধান সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত।

বর্ত্তমান যুগে সাময়িক পত্রের ন্যায় সংবাদপত্রও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সোমপ্রকাশ হইতে এই উন্নতির সূত্রপাত হয়। সোমপ্রকাশসম্পাদক বাঙ্গালা রচনায় সবিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার গ্রীস ও রোমের ইতিহাস ইংরেজীর অনুবাদ হইলেও উহা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অভাব দূর হইয়াছে। বিদ্যাকল্পদ্রুমে এক সময়ে ইতিহাস প্রভৃতি প্রকাশিত হইলেও ,ভাষাগত লালিত্যের অভাবপ্রযুক্ত উহা পাঠকবর্গের তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। যাহা হউক, উপযুক্ত বিষয়ের সংগ্রহে, রচনার প্রাঞ্জল ভাবে এবং সংবাদ-পত্রোচিত উৎকৃষ্ট রীতিতে সোমপ্রকাশ পূর্ব্বতন সংবাদপত্রসমূহের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর কালে এ বিষয়ে এডুকেশন গেজেট, ঢাকাপ্রকাশ, সাধারণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এখন ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ-পত্র সুনিয়মে আপনাদের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য সাধন করিতেছে। সংবাদপত্র সমাজের বাগ্‌যন্ত্র স্বরূপ। যেখানে প্রজাশক্তির উপর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল সর্ব্বাংশে নির্ভর করে, সেইখানে এই বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অধিকতর কার্য্যকারিণী হয়। এইজন্য ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় জনপদে সংবাদপত্রের শক্তি অধিক। ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে রাজা বিদেশীয়, প্রজাশক্তি সঙ্কুচিত। রাজকীয় যাবতীয় কার্য্য সর্ব্বাংশে রাজশক্তিতে পরিচালিত, সুতরাং স্বদেশীয় সংবাদপত্র বিদেশীয় রাজার সমক্ষে সর্ব্বাংশে আপনার শক্তি প্রকাশে সমর্থ হয় না। এরূপ অবস্থাতেও বাঙ্গালা সংবাদপত্র যে, সঙ্কীর্ণতা ও নির্জ্জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্প গৌরবের বিষয় নহে। মুদ্রণস্বাধীনতায়

ঐ শক্তির সঞ্চার হয় এবং বিক্টোরিয়ার রাজ্যভার-গ্রহণের কয়েক বৎসর পরে উহা প্রকট হইয়া উঠে।

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে, বিকৃটোরিয়ার রাজত্বে ইংরেজীতে সুশিক্ষিত প্রতিভাশালী লেখকদিগের গুণে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা উন্নত হইয়াছে। এই সময়ে যে সকল কবি অভিনব ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনাদের কাব্য শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত। যাঁহারা সাময়িক পত্রের প্রচার ও নানা গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজীতে সুপণ্ডিত। ইংরেজী শিক্ষাতে সংবাদপত্রের উন্নতি হইয়াছে এবং ইংরেজীর অনুশীলনে রহস্যপূর্ণ পত্র বা বিশেষ ভাবের গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। পঞ্চানন্দ ও কল্পতরু ইংরেজী শিক্ষিত সুলেখকের লেখনীপ্রসূত। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ইংরেজীতে অভিজ্ঞ লেখকেরই লিপিক্ষমতার নিদর্শন স্থল। কমলাকান্তের দপ্তর ইংরেজী পারদর্শী লেখকদিগেরই প্রতিভার বিকাশমাত্র। সেকাল একাল পাশ্চাত্য ভাবাদর্শী লেখকবর্গেরই অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। নাটক ও প্রহসন এবং ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবন চরিত প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সংবাদপ্রভাকর প্রকাশের পর বাঙ্গালায় নাটকের উন্নতি লক্ষিত হয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্বকার এ বিষয়ে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দেন। ইনি ইংরেজীতে পারদর্শী ছিলেন না। ইহার পর যাঁহারা নাটককার বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি ছিল। পদ্মাবতী বা কৃষ্ণকুমারী, নীলদর্পণ বা নবীন তপস্বিনী, রামাভিষেক বা হরিশ্চন্দ্র ইংরেজী শিক্ষিত লেখকদিগেরই ক্ষমতার সাক্ষ্য দিতেছে। ফলতঃ ইংরেজীর সহিত সংস্কৃতের সম্মিলন হওয়াতে বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ উন্নতি হইয়াছে। যে বিষয়ের উপর সমাজের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, ভাবুক ব্যক্তি কল্পনাবলে সেই বিষয়ের এমন সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করেন, যেন সমাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের একটী বিদুষী মহিলা স্বকীয় উপন্যাসে ভয়াবহ দাস-ব্যবসায়ের যে চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয় সমাজ চমকিত হয়। মহারাণীর রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও অনিষ্টকর সামাজিক বিষয় বা ঘটনা বিশেষের চিত্র প্রদর্শন জন্য কল্পনা-চাতুরী প্রদর্শিত হইয়াছে। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও নীলদর্পণ এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্যে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্বর্ণলতার উদ্ভব হইয়াছে।

অনুবাদে অনেক সময়ে সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয়। অনন্তরত্নের ভাণ্ডার স্বরূপ সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের পুরোভাগে রহিয়াছে। ঐ সকল রত্নের আহরণ করিলে ভাষা শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহারা এই উপায়ে ভাষার শ্রীসম্পাদনে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্যম নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহাদের চেষ্টায় ভাষার একটী অভাব দূর হইয়াছে। পদ্যে ও গদ্যে যাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্য-সংসারে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। এইরূপে অনেক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। অনেক ইংরেজী গ্রন্থেরও

অনুবাদের চেষ্টা হইতেছে। আধুনিক সময়ে উদ্ভাবনায় সাহিত্য উন্নত হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ অনুবাদেও উহার উন্নতি ঘটিয়াছে।

মহারাণীর রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্য কোন্ পথে কি ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, উপস্থিত প্রবন্ধে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। যে যে বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং যে সকল সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্রের প্রচার হইয়াছে, ক্রমানুসারে তৎসমুদায়ের বিবরণ সংগ্রহ করিলে আধুনিক সাহিত্যের ধারাবাহিক গতি অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে। যাহাহউক, যাঁহারা বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত ও অতিশ্রমে নিপীড়িত হইয়াও সাহিত্যের এইরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল সহৃদয় সমাজের বরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পুরস্কার-লোভে এই মহাব্রতে মনোনিবেশ করেন নাই। রাজদ্বারে সম্মান লাভের আশাও তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। অতীতের দিকে না ফিরিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তাঁহারা মাতৃভূমির উপকারের নিমিত্ত যেরূপ সংযত চিত্তে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সম্মান, তাঁহাদের প্রতিপত্তি, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনীর কখনও বিলয় হইবে না। উত্তর কালে যাঁহারা সাহিত্য-রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মপটুতা প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ হিতৈষিতাই তাঁহাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দিবে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

ভৌগোলিক পরিভাষা।

তিন বৎসর ধরিয়া সাহিত্য পরিষদ্ যে ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন, গত শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় তাহার একটা নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনের কার্য্য বিবরণে দেখিলাম, ভৌগোলিক পরিভাষা মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। এ সময়ে এই পরিভাষা সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে কিনা জানি না। তবে বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া দুই এক কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি, ভূগোলের পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইতেছে, ইহার বিজ্ঞাপন দেখিয়া ছিলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম, প্রস্তুত পরিভাষা সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইবে। কেননা ভাষা সম্বন্ধে সাধারণের সম্মতিই পরিষদের প্রভুত্বের মূল, বুঝিয়াছিলাম। আবার ভূগোলের পরিভাষা ছিল না, এমন নহে। ভাল হউক মন্দ হউক, ভূগোলের আবশ্যক শব্দগুলি বাঙ্গালায় চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং তৎসমুদয় পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে হইলে সকলকে তদ্বিষয় জানান আবশ্যক। যাহা হউক, দেখিতেছি ইংরেজী ভূগোলে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসমূহের বাঙ্গালা প্রতিশব্দের দুইটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। একটী তালিকার নাম ভৌগোলিক পরিভাষা-সমিতির অনুমোদিত শব্দ এবং অপরটির নাম ভৌগোলিক পরিভাষা। এই দুই নামে পরিভাষা প্রকাশিত হইবার কারণ দেখিতে পাইলাম না।

কিন্তু পরিভাষা-সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণে লিখিত আছে, সমিতি প্রথমতঃ ভৌগোলিক পরিভাষা অর্থাৎ ইংরেজী ভূগোলে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ সমূহের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নিরূপণে মনোনিবেশ করেন। তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী শব্দসমূহের একটী মুদ্রিত তালিকা প্রস্তুত হয়, এবং উহা সমিতির সভ্য ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের নিকট প্রেরিত হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, পরিভাষা-সমিতিই উল্লিখিত দুইটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কেননা, একটী তালিকার শব্দ ইংরেজী এ (A) হইতে এচ্ (H) পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে, অপরটীতে আই (I) হইতে ডবলইউ (W) পর্য্যন্ত আছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দুইটী তালিকার শব্দই সমানভাবে আলোচনা করিলাম।

কি প্রণালীতে ইংরেজী ভূগোলের পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারিলাম না। দেখিতেছি তালিকায় crosion আছে, কিন্তু denudation বা weathering

নাই ; heliocentric longitude আছে, inclination of the earth's axis to the orbit নাই ; sleet আছে, hail নাই ; lagoon আছে, atoll বা reef নাই ; aqueous meteors আছে, lightning বা thunder নাই ; extinct আছে, active বা dormant নাই ; hygrometer আছে, humidity নাই ; lava আছে, ash নাই ; isobar আছে, gradient নাই ; plutonic rock আছে, intruded rocks নাই ; নানাবিধ regions আছে, fauna বা flora নাই ; ferruginous আছে, calcareous বা argillaceous নাই ; well আছে, artesian well নাই, ইত্যাদি। অথচ এ সকল শব্দ প্রাকৃত ভূগোলে সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। সুতরাং প্রদত্ত দুইটী তালিকা অন্ততঃ প্রাকৃত ভূগোলের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

শব্দ-রচনা সম্বন্ধে দেখা যায়, কোন কোন শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এতদ্দারা শব্দের পারিভাষিকত্ব লুপ্ত হয়। তেমনই কোন শব্দের দুই তিনটী প্রতিশব্দও শিক্ষার্থীর পক্ষে মঙ্গলকর নহে। কোন কোন ইংরেজী শব্দের অর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বিস্তৃত কিম্বা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, বাঙ্গালা শব্দে পুরাতন অর্থ না রাখিয়া আধুনিক অর্থ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আশা করি সমিতি অন্ততঃ নিম্নলিখিত শব্দগুলি পুনর্ব্বার বিচার করিবেন। *

পরিভাষাসমিতির শব্দ।	আমার বক্তব্য।
Air বায়ু Winds বায়ু, বাতাস।	Air = বায়ু করিলে, Winds ও বায়ু হয় না। Winds = বাতাস, চলিত।
Altitude of a hill উৎসেধ „ of a star উন্নতাংশ Elevation উচ্চতা Height উচ্চতা, উচ্ছ্রায়।	Altitude দ্বারা perpendicular elevation এবং angle of elevation বুঝায়। প্রথম অর্থ উচ্চতা বা উচ্ছ্রায় এবং দ্বিতীয় অর্থে উন্নতাংশ রহিয়াছে। তবে আর উৎসেধ কেন ?
Average গড় Mean গড়।	Average এবং mean শব্দদ্বয়ের ব্যবহারে পার্থক্য আছে। Average temperature এবং mean temperature দ্বারা একই ভাব আসে না। এ জন্য average = গড় এবং mean = মধ্য বা মধ্যম রাখা চলে।
Atmosphere বায়ুমণ্ডল। Belt of calms নির্ব্বাতমণ্ডল Meteorology বায়ুমণ্ডলবিদ্যা।	Atmosphere অর্থে সংস্কৃতে আবহ এবং ভূবায়ু শব্দের প্রয়োগ আছে। তদনুসারে meteorology = আবহবিদ্যা করিলে দোষ দেখি না। বায়ুমণ্ডল এবং নির্ব্বাত মণ্ডলের মণ্ডল শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি ?

* এরূপ সমালোচনায় শব্দের অনুপযোগিতা দেখাইয়া নিরস্ত থাকা অযুক্ত বলিয়া স্থানে স্থানে নূতন শব্দ প্রস্তাব করিয়াছি। আশা করি, পরিভাষাসমিতি এই সকল শব্দের প্রতিও একটু মনোনিবেশ করিবেন।

Ammonia নিসাদল ক্ষার
Ozone অম্লজানসার ইত্যাদি।

রাসায়নিক শব্দের এরূপ অনুবাদ রামেন্দ্র বাবু অনুপযোগী বলিয়া দেখাইয়াছেন *। আমার মত পরিষৎপত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে।

Crust of the earth ভূপঞ্জর
Geology ভূপঞ্জর-বিদ্যা।

অভিধানে দেখা যায় পঞ্জর এবং পিঞ্জর শব্দ এক। Crust of the earth দ্বারা পঞ্জর কিম্বা পিঞ্জরের কোন ভাব আসে না। পৃথিবীর মধ্যস্থল দ্রব দ্রব্যে পরিপূর্ণ ভাবিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশকে crust বলা হইয়াছিল। সেই পুরাতন অনুমান ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহা হউক, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে কিয়দ্দূর নিম্ন পর্য্যন্তকে ভূ-ত্বক্ বলিলে বিষয়টী বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। Geology শব্দের সহজ প্রতিশব্দ 'ভূ-বিদ্যা' থাকিতে crustএর প্রতিশব্দ ভূপঞ্জর যোগ করিবার প্রয়োজন দেখি না।

Colure অয়নান্তবৃত্ত, অয়নপ্রোত, বৃহৎ বৃত্ত, অয়নান্তের অহোরাত্রবৃত্ত।

Equinoctial এবং solstitial শব্দের সঙ্গে colure ব্যবহৃত হয়। কেবল colure শব্দের প্রয়োগ দেখি না। সুতরাং প্রস্তুত তিনটী প্রতিশব্দের কোন একটী দ্বারা উভয় অর্থ ঘটিতে পারে না। অয়নান্তের অহোরাত্র-বৃত্ত অর্থে diurnal circle of the solstices দ্বারা যাহা বুঝায় colure তাহা হইতে এই অর্থ একেবারে পৃথক্। সংস্কৃত জ্যোতিষে দেখা যায়, equinoctial, ecliptic শব্দের নামে মণ্ডল, বৃত্ত ইত্যাদি থাকে এবং উহাদের secondaries এর নামে সূত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, equinoctial circle = বিষুবদ্‌বৃত্ত (বলয়, মণ্ডল), ecliptic = ক্রান্তিবৃত্ত, অপমমণ্ডল; কিন্তু circle of declination = ক্রান্তিসূত্র বা ধ্রুবসূত্র, circle of latitude = শারসূত্র। এই প্রকারে বাঙ্গালাতেও বৃত্তসূত্র শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। এরূপ প্রয়োগে অন্ততঃ সন্দেহার্থ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এতদনুসারে equinoctial colure = ক্রান্তিপাতসূত্র ও solstitial colure = অয়নান্তসূত্র করা চলে।

Density সান্দ্রতা

পত্রিকায় এই সান্দ্রতা শব্দ লইয়া অনেক বিচার হইয়া

---

* রামেন্দ্র বাবু পরিভাষাসমিতির একজন সভ্য ছিলেন। তথাপি অম্লজানসারাদি আসিল কিরূপে ?

Condensation ঘনীভবন।

গিয়াছে। সহজ ঘনতা, গাঢ়তা থাকিতে অপর শব্দের প্রয়োজন কি? ঘনতায় আপত্তি থাকে, ঘনিমা করা যাইতে পারে।

Delta 'ব' দ্বীপ।

কেবল বাঙ্গালা 'ব' ত্রিকোণাকার। নাগরী, উড়িয়া, মরাঠী প্রভৃতি দেশের অপর কোন বর্ণমালার 'ব' ত্রিকোণ নহে। বোধ হয়, অন্ততঃ হিন্দী, উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার পারিভাষিক শব্দ এক হইলেই সুবিধা। delta=নদীর ত্রিকোণভূমি বা ত্রিকোণমণ্ডল নামও আছে।

Degree of temperature তাপাংশ
Temperature তাপ-পরিমাণ।
Isothermal সমোষ্ণীয়
Heat তাপ
Sensible heat অনুভূত উষ্ণতা
Latent heat গূঢ় বা প্রচ্ছন্নতাপ
Thermometer তাপমান।

Heat তাপ হইলে, temperature তাপ-পরিমাণ কিম্বা degree of temperature তাপাংশ হয় না। পুনশ্চ sensible heatএ উষ্ণতা এবং latent heatএ তাপশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উষ্ণতা এবং তাপ কি একার্থবাচক? যে প্রতিশব্দই হউক, heat এবং temperatureএ পার্থক্য রাখিতে হইবে। Heat=তাপ এবং temperature=উষ্ণতা করিয়া অপর শব্দ রচিত হইতে পারে। যথা, heat=তাপ, quantity of heat=তাপ পরিমাণ, calorimeter=তাপমান, specific heat=আপেক্ষিক তাপ, latent heat=প্রচ্ছন্ন বা লুপ্ত তাপ, sensible heat=অপ্রচ্ছন্ন বা ব্যক্ত তাপ, temperature=উষ্ণতা, thermometer=উষ্ণতামান,, degree of temperature=উষ্ণতাংশ, isothermal=সমোষ্ণ রেখা।

Dew শিশির
Dewpoint পরিষেকাঙ্ক
Freezing point সংহনন-বিন্দু
Boiling point স্ফোটনাঙ্ক
Point বিন্দু
Saturation পূর্ণ সিক্ততা।

Dew point, freezing point ইত্যাদির point দ্বারা temperature বুঝি। সুতরাং কোথাও অঙ্ক, কোথাও বিন্দু না করিয়া সর্ব্বত্র উষ্ণতা করিলে বালকগণকে বৃথা কষ্ট পাইতে হয় না। আবার, dew=শিশির, কিন্তু dew point=পরিষেকাঙ্ক করার প্রয়োজন কি? Dew point =saturation point=পূর্ণ সিক্ততার উষ্ণতা করিলেই বা দোষ কি? তবে, saturation শব্দটি কেবল dew হইবার পূর্ণাবস্থা না বুঝাইতে না লাগিয়া অন্যান্য স্থলেও লাগে। এ জন্য air saturated with aqueous vapour=পূর্ণ আর্দ্র বায়ু এবং বায়ুর saturation point =পূর্ণ আর্দ্রতার উষ্ণতা করা যাইতে পারে। Freezing

	=solidification, শেষোক্ত শব্দকে সংহনন বলিলে অর্থ সুস্পষ্ট হয় কি ? কেননা solidকে কঠিন করা হইয়াছে।
Equinox বিষুব, ক্রান্তিপাত। Equinoctial points বিষুবদ্‌বিন্দু।	যে ক্ষণে সূর্য্য equinoctial points এ প্রবেশ করে, তাহাকেই প্রকৃত equinox বলা যায়। Equinoxএর অর্থ equinoctial point আছে বটে, কিন্তু তাহা সমর্থন করা যায় না। সুতরাং ক্রান্তিপাত করা চলে না। বিষুব শব্দেও সেই দোষ আসে, এ জন্য equinox বিষুবকাল বলা কর্ত্তব্য। Equinoctial pointsএর নাম ক্রান্তিপাত চিরপ্রসিদ্ধ আছে।
Equator, celestial বিষুবদ্‌বৃত্ত Equinoctial circle নাড়ীবলয়।	উভয় শব্দের একই অর্থ। তবে পৃথক্ নাম দিবার উদ্দেশ্য কি ? আর নাড়ী, ঘটী ইত্যাদি দ্বারা আজ কাল কাল-পরিমাণ করা হয় না। সুতরাং তাহাদিগকে বৃথা না আনিয়া কেবল বিষুবদ্‌বৃত্ত বলাই ভাল।
Epoch যুগ, কল্প।	Geological epoch অর্থে যুগ করা যাইতে পারে। কিন্তু কল্প কেন ? যাহা হউক, এই সঙ্গে geology র period শব্দের বাঙ্গালা দেওয়া আবশ্যক।
Fossil শিলাভূতাবয়ব * Fossilised rock শিলাভূত জীবজ প্রস্তর।	শিলীভূত বা petrified না হইলেও fossil হইতে পারে। জীবাবশেষ শব্দ কেমন বোধ হয় ?
Ferruginous আয়সকণীয় Siliceous বালুকা সম্বন্ধীয়।	মৃত্তিকা সম্বন্ধে এই দুইটী শব্দ প্রায় প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বালুকা সম্বন্ধীয় মৃত্তিকা ভাল শুনায় কি ? চলিত লৌহ শব্দের একটা কষ্টকর নাম রাখিবার আবশ্যকতা দেখি না। Ferruginous=লৌহময় বা লৌহযুক্ত, siliceous= বালুকাময় বা বালুকাযুক্ত অথবা সামান্যতঃ "বেলে" করিলে বুঝিবার অসুবিধা হয় না।
Fluid তরল দ্রব্য, দ্রব দ্রব্য Liquid তরল Solution দ্রব দ্রব্য।	Fluid এবং liquidএর মধ্যে যখন প্রভেদ রাখিতে হইবে, তখন fluidকে তরল এবং liquidকে দ্রব করা উচিত। তরল বলিলে 'চল্‌চলে' ভাব আসে। solution=দ্রব দ্রব্য বলিলে liquid ভ্রম হয়। এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

* শিলাভূত শব্দ হয় কি ?

Geyser উষ্ণ প্রস্রবণ
Hotspring উষ্ণ প্রস্রবণ।

Hotspring মাত্রই geyser নহে। আমাদের দেশে geyser নাই, সুতরাং একটা খাঁটি বাঙ্গালা নাম না রাখিলেও চলে। এইরূপ prairie = প্রান্তর বিশেষ, pampas = প্রান্তর বিশেষ, lallo বলিয়া কোন ফল নাই। দেখুন, ghats কে mountains, dunes কে hills ইংরেজীতে করা হয় নাই।

Horizon চক্রবাল, দিগ্বলয়, ক্ষিতিজ, কুজ।
Horizontal কুজীয়।
Horizontal plane ক্ষিতিজ ক্ষেত্র।

একটি বিষয়ের জন্য একটি নাম থাকিলে শিক্ষার্থীর বুঝিবার সুবিধা হয়। মনে করুন, চারি খানি ভূগোলে horizon বুঝাইতে কেহ চক্র, কেহ দিগ্বলয়, কেহ ক্ষিতিজ, কেহ কুজ লিখিলেন। আবার horizontal বলিবার সময় কুজীয়, কিন্তু horizontal plane বলিতে হইলে অমনই ক্ষিতিজ আবশ্যক। এরূপ প্রতিশব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী হইতে পারি না। কলেজের বালকদিগকে point of maximum density of water কত, জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত হাঁ করিয়া থাকিবে, কিন্তু temperature of maximum density of water বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে একটা না একটা উত্তর পাওয়া যায়। সেইরূপ কুজ ব্যবহার করিয়া বালকগণকে কু ক্ষিতি ভাবিয়া লইতে বলায় কোন ফল নাই। যাহা হউক, rational ও sensible ভেদে horizon দ্বিবিধ কল্পনা করা যায়। এ জন্য দুইটি নাম আবশ্যক। চক্রবাল শব্দ জ্যোতিষে horizon অর্থে প্রায় ব্যবহার হইতে দেখি নাই *। এ জন্য sensible horizon জন্য চক্রবাল কিম্বা পৃষ্ঠক্ষিতিজ এবং ralional horizon জন্য ক্ষিতিজ কিম্বা গর্ভক্ষিতিজ রাখা যাইতে পারে। Horizontal অর্থে জ্যোতিষে জলসম শব্দাদির ব্যবহার দেখা যায়। জলসম বলিলে কথাটি সহজেই বোধগম্য হয়।

---

* ভাস্করের বীজগণিতে চক্রবাল সংজ্ঞা আছে। "ত্যক্ত্বা পূর্ব্বপদক্ষেপাংশ্চক্রবালমিদং জগুঃ" কিন্তু ইহা দ্বারা একপ্রকার solution of indeterminate equations of the second degree বুঝায়। অন্যত্র জ্যোতিষে চক্রবাল শব্দ সমূহার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, খেচরচক্রবালং। কিন্তু এ সকল অর্থ এখানে সম্ভব নহে।

Hygrometer সিক্ততামান
Moist আর্দ্র
Moisture আর্দ্রতা
Saturation পূর্ণ সিক্ততা।

যদি humidity অর্থে moisture করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে hygrometer = আর্দ্রতামান করা কর্ত্তব্য। Saturationএর অর্থ অনেক স্থলে "পরিপূর্ণ" শব্দ ব্যবহার করিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়। যথা, Saturated with vapour = বাষ্প পরিপূর্ণ, saturated solution of salt = লবণ পরিপূর্ণ জল (বা দ্রাব) এ জন্য জল বা জলীয় বাষ্প দ্বারা saturated বুঝাইবার স্থলে পূর্ণ আর্দ্র ব্যবহার করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সিক্ততার বড় একটা প্রয়োজন মনে হইতেছে না।

Gas বাষ্প।
Vapour বাষ্প

যত দিন ইংরাজিতে gas ও vapour এর প্রভেদ থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালা প্রতিশব্দেও প্রভেদ রাখা আবশ্যক হইবে। প্রয়োগ ব্যতীত, gas এবং vapour এর মধ্যে একটু প্রকৃতিগত প্রভেদও আছে। এ জন্য gasকে গ্যাস বলাই ভাল। নিতান্ত আবশ্যক হইলে gas বায়ু করা যাইতে পারে। কিন্তু তখন airকে ভূবায়ু করা আবশ্যক হইবে।

Ground swell সামুদ্রবিবর্ত্ত

Swell কি বিবর্ত্ত ?

Halo মণ্ডল

পরিবেষ শব্দ অধিক প্রসিদ্ধ।

Ice বরফ
Iceberg হিমশিলা
Glacier হিমসংহতি, হিমানী
Snow হিম, তুষার
Snow-flake হিমখণ্ড
Snow-line চিরতুষাররেখা।

snow হিম হইলে iceberg হিমশিলা হয় না। আবার করকা অর্থে সচরাচর শিলা বা হিমশিলা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে হিম শব্দ ice এবং snow উভয়ই বুঝায়। আবার বাঙ্গালা হিম বলিলে শিশির বুঝায়। হিমসংহতি বলিলে mass of ice বা snow বুঝায়। সুতরাং glacierএর ভাব আসে না। হিমানী দ্বারা তাহাই বুঝায়। অধিকন্তু snow-driftও বুঝাইতে পারে। এ জন্য ice এবং snow শব্দের জন্য দুইটি প্রতিশব্দ স্থির করিয়া তাহাদের সাহায্যে অন্যান্য কয়টি শব্দ সঙ্কলন করিলে ভাল হয়। বোধ হয়, iceberg = বরফ গিরি, glacier = বরফ নদী, snow = তুষার রাখিলে সব দিক্ রক্ষা পায়।

Isobar সমভার রেখা
Pressure চাপ।

Pressure চাপ চলিত হইয়াছে। সুতরাং isobar সমচাপ রেখা করা কর্ত্তব্য।

Leap-year প্লবক বৎসর — এরূপ অনুবাদে অর্থ স্পষ্ট হয় না। দীর্ঘ বৎসর করিলে কেমন হয়?

Latitude অক্ষাংশ, পলাংশ — অক্ষাংশ শব্দের প্রকৃত অর্থ degree of latitude,

" parallel of—স্পষ্ট ভূপরিধি, সুতরাং latitude অক্ষ করিলেই চলে। স্পষ্ট ভূপরিধি অথবা অক্ষাংশীয় সমান্তরালবৃত্ত দ্বারা reduced circumference of the earth বুঝায়,

" celestial শর — অর্থাৎ উহা দ্বারা circumference × cos. lat. বুঝায়। জ্যোতিষের অক্ষরেখা = অক্ষবৃত্ত = parallel of latitude যেমন নিরক্ষবৃত্ত আছে, তেমনই অক্ষবৃত্ত আছে। celestial latitude অর্থে ঠিক শর নহে। শর, বাণ, বিক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্ট বা apparent latitude বুঝায়। এ জন্য celestial latitude অর্থে ভাস্কর অস্পষ্ট শর বলিয়াছেন। জ্যোতিষের শব্দ যখন সংস্কৃত হইতে লইতে হইবে, তখন সংস্কৃত জ্যোতিষের পরিভাষার সহিত বাঙ্গালা পরিভাষার ঐক্য রাখা কর্ত্তব্য। অস্পষ্ট শর কথাটা লম্বা হয় বটে, কিন্তু উপায় কি? *

Longitude দেশান্তর

" celestial for planets of stars ধ্রুব, ধ্রুবক। — ভোগ বা ভুক্তি শব্দ দ্বারা কোন জ্যোতিষ্কের longitude ভোগ from the initial point বুঝাইতে দেখি নাই। তদ্দ্বারা ক্রান্তিবৃত্তের অল্প বা অধিক অংশ মাত্র বুঝায়। † তারাগণের ধ্রুব বা ধ্রুবক দ্বারা longitudes of the R. A's of the stars বুঝায়। পূর্ব্বে আমি ক্রান্তিবৃত্তাংশ বা অপবৃত্তাংশ শব্দ ‡ প্রস্তাব করিয়াছিলাম। দেখিতেছি, পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী ভুজাংশ করিয়াছেন। ভুজাংশ মন্দ বোধ হইল না।

Melting দ্রবণ, বিলয়ন

Solution দ্রব পদার্থ — Melting বা fusing এবং dissolving এই দুইটী শব্দেরই প্রতিশব্দ আবশ্যক। দ্রবণ ও বিলয়ন ব্যতীত গলন শব্দও আছে। সোণা গলান কথা সবিশেষ চলিত।

---

* সংস্কৃত জ্যোতিষের কোন কোন শব্দ একটু আধটু পরিবর্ত্তিত অর্থে ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলাম। (সাঃ পঃ ১৩০২ শ্রাবণ) কিন্তু দেখিতেছি, সংস্কৃত জ্যোতিষজ্ঞ ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা করিতে গেলে এরূপ পরিবর্ত্তনে গোলযোগে পড়িতে হয়।

† সূর্য্যসিদ্ধান্তের "ইষ্টনাড়ী হতা ভুক্তিঃ, ভভোগোঽষ্টশতী লিপ্তা, প্রোচ্যন্তে লিপ্তিকা ভাভাং স্বভোগঃ" ইত্যাদি দেখুন।

‡ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০২ মাঘ।

এজন্য বোধ হয় melting by heat অর্থে গলন রাখা যাইতে পারে এবং dissolving in a solvent অর্থে দ্রবণ বা দ্রাবণ করা যাইতে পারে। এইরূপে solvent = দ্রাবক, soluble = দ্রবণশীল, solubilty = দ্রবণশীলতা, solution = দ্রাব ইত্যাদি চলিতে পারে। সামান্য কথায় 'জল' শব্দ দ্বারা solution বুঝান হইয়া থাকে। যথা নুনজল, সোণার জলে গহনা ডুবান ইত্যাদি। আমার বোধ হয় এইরূপে solution অর্থে 'জল' ব্যবহার করিলে অর্থ সুস্পষ্টও হইতে পারে। কিন্তু solvent দ্রাবক, সুতরাং acidকেও দ্রাবক বলা অযুক্ত। acidকে অম্ল বলিলে দোষ কি ?

Meridian
„ terrestrial যাম্যোত্তর বৃত্ত
„ celestial ধ্রুবপ্রোতবৃত্ত
„ prime মধ্যরেখা।

ধ্রুবপ্রোত বৃত্তত অনেক আছে। জ্যোতিষে দেখা যায়, রেখা শব্দ যোগে অনেক স্থলে পৃথিবী সম্বন্ধীয় বৃত্ত বুঝায়। এইরূপে মধ্যরেখা, যাম্যোত্তর রেখা, অক্ষরেখা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। রেখা শব্দ দ্বারা ভূগোলেরও বৃত্ত বুঝায় বটে, কিন্তু রেখা শব্দটী কেবল ভূগোলের জন্য রাখিলে বিশেষ দোষ হইবে না। meridian শব্দ ভূগোলের ও খগোলের জন্য পৃথক রাখিবার প্রয়োজন তত নাই। কোন স্থলে পৃথক করিতে হইলে পৃথিবীর যাম্যোত্তরবৃত্ত বলিতে অসুবিধা হইবে না। এইরূপে যাম্যোত্তরবৃত্ত এই একটি শব্দ দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। Prime meridian কে ভূমধ্যরেখা করিলে বিষয়টী আরও স্পষ্ট হয়। কেননা কেবল মধ্যরেখা দ্বারা meridian মাত্র বুঝায়।

Moraine উপত্যকা
Valley উপত্যকা

Moraine উপত্যকা হইল কিরূপে ? Moraine অর্থে a heap of blocks and fragments of stones বুঝি। এই অর্থেই lateral moraine, medial moraine, and ground moraine বলা হইয়া থাকে।

Observatory বেধালয়

চলিত মানমন্দির শব্দটী ত্যাগ করিবার কারণ কি ?

Organism জীবাবয়ব

Organism = জীবের অবয়ব না একেবারে জীব ? অবিকল অনুবাদ করিলে দেহী বলা কর্ত্তব্য।

Plateau মালভূমি
Table-land মালভূমি।

অধিত্যকা শব্দটীও আছে। বোধ হয় উচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগের সমস্থলীকে অধিত্যকা বলিলে ভাল হয়।

Pole পৃষ্ঠকেন্দ্র, মেরু।

কেন্দ্র অনেক আছে, আবার পৃষ্ঠদেশে কেন্দ্র আনিবার প্রয়োজন কি? Pole এর সামান্য নাম মেরু করিলেই গোল চুকিয়া যায়। এইরূপে বলা যায়, বিষুবম্মণ্ডলের মেরুর নাম ধ্রুব, মঙ্গলের মেরুদেশ ইত্যাদি।

Pot hole মণ্ডলাকার গর্ত্ত

বোধহয় দেশে 'দহ' শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Plain সমতল ভূমি, সমক্ষেত্র, সমতল ক্ষেত্র।

এই সকল প্রতিশব্দ অপেক্ষা সংস্কৃত সমস্থলী ভাল বোধ হয়।

Protoplasm জীব-বীজ।

Protoplasm = জীবের বীজ? seat of life ধরিয়া protoplasm অর্থে জীবনাধার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

Race (tidal) ওঘ সংঘর্ষ

Race শব্দের এই অর্থ ব্যতীত উহার অপর এক অর্থ প্রাকৃত ভূগোলে আবশ্যক হয় *। যাহা হউক, race শব্দটা তত আবশ্যক হয় না।

Revolution প্রদক্ষিণীকরণ।

এই অর্থে পরিভ্রমণ শব্দটা চলিত হইয়াছে।

Rock প্রস্তর
Igneous আগ্নেয়
Plutonic বারুণ

Igneous rock = আগ্নেয় প্রস্তর করিলে volcanic rock এর বাঙ্গালা কি হইবে? বারুণ প্রস্তর বলিলে aqueous or marine rock বুঝাইবার আশঙ্কা থাকে।

Metamorphic পারিণামিক

পারিণামিক শব্দ অপেক্ষা রূপান্তরিত বা বিকৃত শব্দ সহজ বোধ্য। Igneous অর্থে অগ্নিজ বা তাপজ এবং aqueous অর্থে জলজ করিলে দোষ কি?

Sun-dial সূর্য্য ঘড়ি।

দুই একটী ব্যতীত সমুদয় প্রতিশব্দ সংস্কৃতমূলক হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আর সূর্য্য ঘড়ি কেন? বাপুদেব শাস্ত্রীর ছায়াযন্ত্র চালাইলে মন্দ হয় কি?

Tides জোয়ার ভাটা
„ flood বেলোর্দ্ধ সীমা।

Flood-tide এ সীমার ভাব আসে কিরূপে?

Tornado বাতাবর্ত্ত
Cyclone বাতাবর্ত্ত

উভয় ইংরেজী শব্দের অর্থ এক কি? ঢাকায় যে tornado হইয়াছিল তাহাকে ঘূর্ণি-ঝড় বলা হইয়াছিল।

Trade-wind বাণিজ্য বায়ু।

বাণিজ্যের সহায় বলিয়া trade-winds নাম হয় নাই। ঘটনাক্রমে ঐ বাতাসে বাণিজ্যের সাহায্য হয়। এজন্য অর্থ ধরিয়া 'নিয়ত বাতাস' বলাই ভাল।

---

* এই অর্থে মাঝিরা 'টানা' বলিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গে 'রেষ' শব্দও আছে। 'রেষের' বুৎপত্তি জানি না।

Tropics ক্রান্তি, অয়নান্তবৃত্ত Tropic of cancer কর্কটক্রান্তি উত্তর পরমাপক্রমজ্যাবৃত্ত, „ of capricorn মকরক্রান্তি, দক্ষিণ পরমাপক্রমজ্যাবৃত্ত।	কর্কটক্রান্তির অনুবাদ declination of cancer হয়। অবশ্য সূর্য্যের ক্রান্তি কর্কটে হইলে অয়ন দক্ষিণ হয়। এই অর্থে কর্কটক্রান্তিবৃত্ত দ্বারা tropic of cancer বুঝাইতে পারে। সেইরূপ tropic of capricorn মকরক্রান্তিবৃত্ত হইতে পারে। সংস্কৃত জ্যোতিষে tropic এর মত কোন বৃত্ত কল্পিত হয় না। অবশ্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ইংরেজী দক্ষিণায়ণ বা উত্তরায়ণ আমাদের দক্ষিণায়ণ বা উত্তরায়ণের ঠিক সমান নহে। যাহা হউক, পরমাপক্রমজ্যাবৃত্ত বুঝিলাম না।
Valley of a mountain উপত্যকা „ of a river অণুনদী-নিম্নভূমি	Valley র উৎপত্তি বিচার করিয়া কি এই দুই প্রতিশব্দ রচিত হইয়াছে? উভয়ই উপত্যকা বলিয়া বুঝি। আবার অণুনদী ব্যতীত কি অপর নদীর Valley নাই?
Water, hard কঠিন জল „ soft কোমল জল	অর্থ দেখিয়া অনুবাদ করা কর্ত্তব্য। ইংরেজীতে যাহাই হউক, বাঙ্গালার কঠিন জল বলিলে কেমন কেমন শুনায়। আবার, বরফের সঙ্গেও ভ্রম হইতে পারে। বৈদ্যক শাস্ত্রের গুরু ও লঘু জল বলিলে কি বুঝায়?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

নরোত্তম ঠাকুর*।

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নাম না জানেন, এমন বৈষ্ণব নাই। রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে গড়ের হাট পরগণায় খেতরী গ্রাম অবস্থিত। সার্দ্ধ ত্রিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই খেতরী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই সময়েই ঠাকুর নরোত্তমের প্রাদুর্ভাব। ঠাকুর নরোত্তমের জন্মের তারিখ নির্দ্দিষ্ট নাই, তবে যখন তাহার জন্ম হয়, তখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে প্রকট আছেন, সুতরাং তাহা ১৪৫৩৫৪ শকাব্দ হইবে।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় জমীদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নারায়ণী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে নরোত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। যে নরোত্তমের আবির্ভাবে পূর্ব্ব বঙ্গ ধন্য হইয়া গিয়াছে, মাঘ মাসের পূর্ণিমার স্নিগ্ধ হাস্য-তরঙ্গের সহিত গোধূলি সময়ে তিনি ভূমিষ্ঠ হন।

বাল্যকালেই নরোত্তমের অসাধারণ গুণ ও অদ্ভুত প্রতিভা সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। "নরু"র মধুর ব্যবহারে আপামর সকলেই বাধ্য। একদিন গল্পপ্রসঙ্গে নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা ও তাঁহার বিষয়ে নানা কথা শুনিতে পাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কথা শুনিয়া বালক এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে তিনি বক্তা ব্রাহ্মণটীকে পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ও প্রতিদিন তাঁহার কাছে গৌরচরিত্র শ্রবণ করিতে যাইতেন। যে দিন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা তিনি শুনিলেন, সে দিন এত অধীর হইলেন যে, কৃষ্ণদাস নামক সেই বক্তা ব্রাহ্মণ ভয় পাইলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন, তখন রাজকুমারের মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। পরে শুনিলেন যে প্রভুর অন্তর্দ্ধানে বহুতর ভক্ত ও প্রধান প্রধান পার্ষদগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বাস করিতেছেন, তখন তাঁহার বৃন্দাবনের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিল।

এইরূপে নরোত্তম গৌরপ্রেমে মজিলেন। সর্ব্বদা গৌরকথা-প্রসঙ্গে বালক ক্রমে খেলা ধুলা ছাড়িলেন, লেখা পড়ায় পর্য্যন্ত অমনোযোগ ঘটিল। ইহাতে পিতা মাতা চিন্তিত হইলেন। কিন্তু বালক গৌরকথা শুনিতে না পাইলে যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িত, ইহাই যেন তাঁহার আত্মার আহার।

একদিন প্রাতে নরোত্তম পদ্মানদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তাহার জ্ঞানের কোন চিহ্ন ছিল না।

---

* দেহ-কড়চ-গ্রন্থকারের পরিচয় দিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত করা গেল। দেহ কড়চ গ্রন্থ পর প্রবন্ধে মুদ্রিত হইল। সাঃ পঃ সং।

এদিকে বহুক্ষণ যাবৎ পুত্রকে বাড়ী না দেখিয়া অনুসন্ধানে লোক চারিদিকে ছুটিল। এমন কি স্বয়ং রাণী নারায়ণী অস্থির হইয়া পদ্মাবতীর তীরপানে ছুটিলেন। নরোত্তম পদ্মাপারেই ছিলেন, লোকজন আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। মাতা পুত্রকে কোলে লইয়া শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে এই বিবরণের একটী পূর্ব্ব কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীমহাপ্রভু একদা রামকেলি গ্রামে আগমন করেন। পদ্মার অপরপারে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কৃষ্ণাবেশে "নরোত্তম!" নরোত্তম!" বলিয়া ডাকিয়া ছিলেন, তাহাতেই নরোত্তমের জন্ম। প্রভু নরোত্তমের জন্য প্রেমধন পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখেন। নরোত্তম যে দিন পদ্মাবতীতে স্নান করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রি একটী স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ যেন তাঁহাকে বলেন, "নরোত্তম! কল্য প্রত্যূষে তুমি পদ্মাতে স্নান করিতে যাইও, তথায় গৌরাঙ্গের গচ্ছিত প্রেম প্রাপ্ত হইবে।" নরোত্তম স্বপ্নাদেশ বিশ্বাস করিয়া স্নান করিতে যান, আর স্নানান্তে যাহা ঘটে, বলা গিয়াছে।

নরোত্তমের সেই হইতে নূতন ভাব হইল, কখন হাসেন, কখন কান্দেন, কিছুই স্থির নাই। পুত্র উন্মাদ হইয়াছে, এরূপ কখন কখন পিতা মাতার মনে হইতে লাগিল। কখন কখন নরোত্তম বৃন্দাবনে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতে মা বাপের প্রাণ শুকাইয়া গেল।

এই সময়ে জায়গীরদার নরোত্তমের গুণ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। কাজেই কৃষ্ণানন্দ নিষেধ করিতে পারিলেন না। নরোত্তমের মনের সাধ পূরিল, মনে মনে পিতা মাতার চরণে চির বিদায় লইলেন। কিছুদূর যথাপথে চলিয়াই নরোত্তম গতি ফিরাইলেন, বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। এ সংবাদ যখন খেতরীতে আসিল, তখন দুঃখের আর সীমা রহিল না। নরোত্তম কি প্রকারে চলিলেন—

"আহারের চেষ্টা নাহি সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে॥
পথের চলনে পায় হইল ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হয়ে অচেতন॥" (প্রেমবিলাস।)

নরোত্তমের বয়স তখন আন্দাজ ১৬ বর্ষের অধিক নহে। রাজার পুত্র, কোন দিন হাটেন নাই, কাজেই ধীরে ধীরে যাইতেছেন।

পুত্রের পলায়নের সংবাদ শ্রবণে কৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য চারিদিকে লোক নিযুক্ত করেন। এই লোকের একদল, তাঁহাকে যাইয়া ধরিল, কিন্তু আনিতে পারিল না, সেই ১৬ বর্ষীয় বালকের ধর্ম্মভাবের নিকট পরাস্ত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল!

এইরূপে বহুকষ্টে নরোত্তম বৃন্দাবনে যথাসময়ে পৌছিলেন। তখন রূপ সনাতন নাই, শ্রীজীব আছেন; তাঁহার নিকট গিয়া অপরূপ বালকটী ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পড়িয়া গেলেন।

ক্রমে পরিচয় হইল, দুই তিন দিন পরে রাজকুমার সাধুদর্শনে বহির্গত হইলেন। একে একে সেই দেবনিষ্ঠ ভক্তগণকে দেখিয়া নরোত্তম বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি লোকনাথ গোস্বামীকে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই নরোত্তমের মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, মনে মনে তিনি তাঁহার চরণে চিরতরে আত্মসমর্পন করিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, লোকনাথ গোস্বামীর সঙ্কল্প যে তিনি শিষ্য করিবেন না, তখন তাঁহার হৃদয়ে শত শত শেল আঘাত করিল। যদি কোন যুবতী, কোন যুবাকে আত্মসমর্পণ করিয়া জানিতে পারে যে, যুবক বিবাহ করিবে না, তখন সে যেমন কাতর হয় ও পরে সতীত্বরক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, নরোত্তমও তখন তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন। তিনি গোপনে লোকনাথ গোস্বামীর সেবা আরম্ভ করিলেন। নরোত্তমের হৃদয় কিরূপ দৈন্য ভাবাক্রান্ত ছিল, তাহার সেবার কথা ভাবিলেই তাহা বোধ হয়। প্রেমবিলাসে নরোত্তমের এই গোপনীয় সেবার কথা এইরূপে লিখিত আছে,—

"আর এক সাধন যেই করে নরোত্তম।
রাত্রিশেষে সেই সেবা করিল নিয়ম॥
যেই স্থানে গোসাঞি যায়েন বহির্দ্দেশ।
সেই স্থানে যাই করে সংস্কার বিশেষ॥"

এ মানীর কার্য্য ব্যতীত নরোত্তম আর একটি কার্য্য করিতে লাগিলেন। যথা অনুরাগবল্লী গ্রন্থে—"মৃত্তিকা শৌচের তরে সুন্দর মাটি আনে।
ছড়া ঝাটী জল আনে বিবিধ বিধানে॥" (অনুরাগবল্লী)

লোকনাথ ব্যাকুল হইলেন। কে এমন করে? উদ্দেশ্য কি? যা হোক, একদিন তিনি রাত্রি থাকিতেই বহির্দ্দেশে গেলেন ও নরোত্তমের কাণ্ড দেখিলেন।

নরোত্তমকে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, নরোত্তম পূর্ব্বাপর সকল কথা অকপটে তাঁহার কাছে কহিলেন। শুনিয়া গোস্বামী বলিলেন—

"যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন।
তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ॥
প্রয়োজন আছে কিবা গুরু করিবারে?" (প্রেমবিলাস।)

আরও এক বৎসর গেল, আরও এক বৎসর কাল নরোত্তম গুরুর সেবা করিলেন। এক বৎসর পরে লোকনাথ নরোত্তমকে আশা দিলেন। নরোত্তমের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল। শ্রাবণের পূর্ণিমাতে নরোত্তম দীক্ষিত হইলেন।

নরোত্তম শ্রীজীবের নিকট সমস্ত গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অদ্ভুত প্রতিভায়, অল্প কালেই তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া এই সময়েই "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দান করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ঠাকুর মহাশয় আর দুইজন ক্ষমতাশালী সঙ্গী লাভ করেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, অপর জন শ্যামানন্দ। এই তিন জনেই অদ্ভুত ক্ষমতাশালী অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

এই তিনজন দ্বারা বঙ্গদেশে ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করিতে শ্রীজীব ইচ্ছা করিলেন এবং ভক্তিগ্রন্থ পূর্ণ একটি সিন্দুক, দশজন পদাতিক সঙ্গে দিয়া, ইঁহাদের সহিত পাঠাইলেন। ১৫০৪ শকে তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিলেন।

গোপালপুর নামক স্থান পর্য্যন্ত তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে আসিলেন। গোপালপুরে দস্যুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি চুরি যায়। তাহাতে সকলেই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। গ্রন্থের অনুসন্ধানার্থ শ্রীনিবাস সেখানেই থাকিলেন। নরোত্তম শ্যামানন্দকে লইয়া খেতরী আগমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আগমনে খেতরী যেন জীবিত হইল, পিতামাতার দেহে যথার্থই প্রাণ আসিল।

নরোত্তম বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পর নবদ্বীপধাম দর্শন করিতে গমন করেন। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (চৈতন্যদেবের স্ত্রী) আছেন। মহাপ্রভুর পাদুকা, শয্যা, জলপাত্র, উত্তরীয় প্রভৃতি যেমন ছিল, তেমনই তখন আছে। তিনি কোথায় কোনস্থানে বসিতেন, কোথায় কি করিতেন, সকল চিহ্ন বিদ্যমান। নরোত্তম এ সকল দর্শনে কিরূপ ভাবে বিভাবিত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য। নরোত্তম নবদ্বীপ হইতে অদ্বৈতের স্থান শান্তিপুরে চলিলেন, তথা হইতে উদ্ধারণ দত্তের স্থান ত্রিবেণী ও তথা হইতে খড়দহ গমন করিলেন। তথা হইতে অভিরাম গোস্বামীর স্থান খানাকুল হইয়া নীলাচলে ধাবিত হইলেন। নীলাচলে প্রভুর লীলার চিহ্নগুলি আরও সজীব ও নূতন রহিয়াছে। এথানে প্রভুর অনেক পার্শ্বদকেই নরোত্তম পাইলেন। নরোত্তমকে পাইয়া তাঁহারাও—যদিও বিয়োগযন্ত্রণায় নিপীড়িত, তথাপি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইহার পরে তিনি নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে আগমন করেন ও নরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত হন।

নরহরি তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপা করেন। শ্রীখণ্ড হইতে তিনি কাঁটোয়ায়—যে স্থানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, যে স্থানে প্রভুর শেষ চিহ্ন কেশের সমাধি আছে, সেই স্থানে গমন করেন। কাঁটোয়ায় পদকর্ত্তা যদুনন্দনদাসের সহিত তাহার মিলন হয়। কাঁটোয়া হইতে নরোত্তম একচক্রা গ্রাম দর্শনে গমন করেন। এইরূপে যেখানে যেখানে প্রভুর লীলা কি কোন ভক্ত বিদ্যমান ছিলেন, সেই প্রত্যেক স্থানেই ঠাকুর মহাশয় গমন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর মহাশয় পুনর্ব্বার খেতরী আগমন রিলেন। খেতরীতে হরিসঙ্কীর্ত্তনের স্রোত বহিল। ঠাকুর মহাশয় নূতন সুরে ভক্তি-উদ্দীপক নূতন নূতন গীত রচনা করিতে লাগি-লেন। এইরূপে "গরাণহাটী" কীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। গড়ের হাট পরগণায় উৎপত্তি বলিয়া নূতন সুরের নাম "গরাণহাটী" হইল।

এখন ঠাকুর মহাশয় একটি অভিনব ইচ্ছা করিলেন। খেতরীতে বিগ্রহ স্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উদ্যোগের মহা আয়োজন হইতে লাগিল। মহাপ্রভুর ভক্ত যে যথায় আছেন, নিমন্ত্রিত হইলেন ও খেতরী আসিতে লাগিলেন। খেতরীধাম নূতন আকার ধারণ করিল, নূতন সাজে সজ্জিত হইল।

"স্থানে স্থানে কদলী বৃক্ষের নাহি লেখা।
নারিকেল কদলী বেষ্টিত আম্রশাখা॥" (নরোত্তমবিলাস।)

এ সবার উদ্যোগকর্ত্তা স্বয়ং রাজা কৃষ্ণানন্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে বিগ্রহ স্থাপিত হইবেন। পূর্ব্বদিন হইতে নহবত বাদ্য আরম্ভ হইল, পূর্ব্ব দিনেই প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপাদি খাটান হইল। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"কি অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপ অঙ্গন আবৃত।
কত শত কদলী বৃক্ষাদি সুশোভিত॥
কেহ কেহ পুষ্পমালা প্রস্তুত কারণে।
কেহ বহুলোক যুক্ত চন্দন ঘর্ষণে।
কেহ করে নানা বাদ্য বাদক নর্ত্তক।
বহুদেশ হইতে আইল অনেক গায়ক॥"

অপূর্ব্ব গরাণহাটী কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, ভক্তগণ এই নবীন কীর্ত্তন শ্রবণে একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কীর্ত্তন সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল—

"কেহ কহে মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে॥
গীতপ্রথা রক্ষাক্ষোভ-নিবৃত্তি নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিতে॥
সে সময়ে তাহা প্রেম-সম্পুটে রাখিল।
নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উগাড়িল॥" (ভক্তিরত্নাকর।)

এ কীর্ত্তনে কথিত আছে, স্বগণ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর রাজা কৃষ্ণানন্দ কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া প্রাসাদের সমস্ত ধন বিতরণ করিয়াছিলেন।

এই উৎসবে যে ছয় বিগ্রহ সংস্থাপিত হন, তাঁহাদের নাম নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের স্বকৃত একটী শ্লোকে লিখিত আছে। ঐ শ্লোকটি সেই উৎসব সময়েই তৎকর্ত্তৃক রচিত হয়। শ্লোকটি এই—

"গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোস্তুতে॥"

এ উৎসবকালীন, ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়া তদীয় ভক্তগণ তাঁহার একটি প্রণাম রচনা করেন, তাহা এই—

"সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্য-দন্তদ্যুতিতাদিশ্ব্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাস্নাপিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥"

শ্রীনিবাস এই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার সহিত রামচন্দ্র কবিরাজ আইসেন। রামচন্দ্রের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের এরূপ বন্ধুত্ব জন্মিল, যে একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র কাজেই খেতরী রহিয়া গেলেন। নরোত্তমের প্রস্তাবে এই সময়ে বহুলোক আকৃষ্ট হয়। অনেক ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ, কাজেই ইহাতে সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু যুক্তি তর্কে কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিল না। এইরূপে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া শেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ নিরূপায় হইয়া সকলে রাজা নরসিংহের কাছে গেলেন ও তাঁহার শরণ লইলেন। রাজা মহা আড়ম্বরে ব্রাহ্মণগণ সঙ্গে খেতরীর সন্নিকটে এক গ্রামে শিবির সংস্থাপন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় এবং তাঁহার পরিকরগণ এই সংবাদ শুনিলেন। ঠাকুর মহাশয় স্বভাবতঃ তর্ক করিতে অনিচ্ছুক, এই সংবাদে তিনি কাতর হইলেন। তখন রামচন্দ্র ও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী কুমরপুর গিয়া পণ্ডিতব্যূহকে পরাস্ত করিয়া আসিলেন। রাজা নরসিংহ রাণী রূপমালার সহিত ঠাকুর মহাশয়ের শরণ লইলেন, সেই পরাজিত পণ্ডিতগণও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইলেন। এই ঘটনায় ঠাকুর মহাশয়ের নাম দেশ বিদেশে আরও রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহার পরে যে চাঁদ রায়ের প্রতাপে গৌড়ের বাদশা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, যিনি পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও বহু পদাতি সৈন্যসহ প্রতিনিয়ত যুদ্ধে নিরত থাকিতেন, সেই চাঁদরায় সপরিবারে ঠাকুর মহাশয়ের চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় চাঁদরায়ের হিংস্র স্বভাব দূরীভূত হইয়াছিল।

ইহার কিছু দিন পরে আন্দাজ ১৫০৯ শকের পরভাগে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গমন করেন। রামচন্দ্র আর ফিরিয়া আসেন নাই। প্রিয় সঙ্গীর বিরহে ঠাকুর মহাশয় ক্রমে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন কি, সমস্ত দিবারাত্রি "প্রেমস্থলি" নামক ভজন স্থানে একাকী পড়িয়া থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে আলাপ মাত্রও করিতেন না। এইখানে বসিয়া ঠাকুর মহাশয় যে সকল প্রার্থনা গীত গাহিতেন, তাহাই তাঁহার বিরচিত প্রসিদ্ধ "প্রার্থনা গ্রন্থ।" "লক্ষ গ্রন্থের সার", "অদ্ভুত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" গ্রন্থও ঐ সময়েই বিরচিত হয়। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকার শেষে তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছেন,—

রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
নরোত্তম তবে হয় ধন্য ॥"

এই সময় তাঁহার হৃদয় বিরহে জর্জ্জরীভূত। নিম্নের পদ দুটীই তাহার পরিচয়,—

"বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল,
হিয়া মাঝে দারুণ দুঃখ দিয়া।" ইত্যাদি।

"গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর
নর হরি মুকুন্দ মুরারী।
শ্রীস্বরূপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর,
এ সব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুই না পাই দেখিতে।"

* * * * * *

"যে মোর মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।"

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঠাকুর মহাশয় একাকী ছিলেন না, তাঁহার পরাণবঁধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত কথা কহিতেন। তৎকৃত একটি পদের কিয়দংশ এই—

"নব ঘন শ্যাম ও পরাণ বন্ধুয়া,
আমি তোমায় পাশরিতে নারি।
তোমার সে মুখশশী, অমিয় মধুর হাসি,
তিল আধ না দেখিলে মরি।" ইত্যাদি।

ঠাকুর মহাশয় বুঝিলেন, বিরহব্যথায় দেহ আর ধরিতে পারিতেছি না। তাড়া তাড়ি তিনি তখন শিষ্যগণকে ডাকিয়া এক এক জনকে এক এক বিগ্রহ দান করিলেন। সমুদয় বন্দোবস্ত হইল। তখন একবার প্রিয় রামচন্দ্রের আলয়ে (বুধুরীতে) গমন করিলেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস (রামচন্দ্রের অনুজ) তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। ঠাকুর মহাশয় আদর করিয়া গোবিন্দের পদাবলী শুনিলেন। পর দিন বুধুরী হইতে যাত্রা করিয়া গাম্ভিলা গ্রামে আপন প্রিয় শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী উপস্থিত হন। কএকদিন এখানে মহা মহোৎসব হয়, যথা সময়ে এই খানেই ঠাকুর মহাশয় অত্যাশ্চর্য্য রূপে দেহত্যাগ করেন। সে এইরূপ——

একদিন—তখন ঠাকুর মহাশয় পীড়িত, গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি তাঁহাকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া গিয়াছেন, আস্তে আস্তে তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের দেহমার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু মার্জ্জন করিবেন কি। নরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে,—

"দেহে কিবা মার্জ্জন করিবে পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিলাইলা গঙ্গার জলেতে ॥
দেখিতে দেখিতে শীঘ্র হইলা অন্তর্দ্ধান।
অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহা কে বুঝিবে আন ॥
অকস্মাৎ গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল।
দেখিয়া লোকের মহা বিস্ময় হইল ॥"

তখন কার্ত্তিক মাস এবং কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। ঐ তিথিতে ঠাকুর মহাশয়ের মহোৎসব হইয়া থাকে।

চমৎকারচন্দ্রিকা, রসসার প্রভৃতি গ্রন্থের শেষে ও ভণিতায় নরোত্তমদাসের নাম দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত নহে। ঠাকুর মহাশয়ের বহুপরবর্ত্তী কোন নরোত্তমদাসের রচিত। "প্রার্থনা" এবং "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" ব্যতীত "হাটপত্তন" "চৌত্রিশা পদাবলী" প্রভৃতি কএক খানি ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত। তদ্ব্যতীত যে যে গ্রন্থের শেষে নরোত্তম নাম আছে, সে নরোত্তম ভিন্ন ব্যক্তি, ঠাকুর মহাশয় নহেন।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

দেহ-কড়চ।

(৺ নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত)

ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে অসংখ্য বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ রচিত হইলেও, বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ তেমন অধিক রচিত হয় নাই। পদ্য রচনায় যেরূপ আগ্রহ ছিল, গদ্য রচনায় সেরূপ উৎসাহ বা সেরূপ যত্ন পরিলক্ষিত হয় না। অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গদ্য সাহিত্যের প্রকাশ হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই গদ্য সাহিত্যের বিকাশ! বাঙ্গালা ভাষার প্রথমাবস্থায় পদ্যের ন্যায় গদ্যের তেমন সমধিক আলোচনা না থাকিলেও প্রাচীনা বঙ্গভাষা গদ্যসাহিত্যবর্জ্জিতা নহেন, তাহার আমরা অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। সেই গদ্যসাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনাযুক্ত একটি বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে মহাত্মার জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমাদের আলোচ্য 'দেহকড়চ' নামক গ্রন্থখানি তাঁহার রচিত। ইহা বঙ্গভাষার এক খানি প্রাচীন গদ্য গ্রন্থ। প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে তাহার কতক কতক নিদর্শন পাওয়া যায়।

দেহ-কড়চের দুই খানি পুথি * আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক খানি নরোত্তম ঠাকুরের জন্মস্থান খেতরী গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক বাবাজীর কুটীর হইতে এবং অপর খানি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী এক মোহান্তের মঠ হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পুথিখানি অতি জীর্ণ শীর্ণ, দেখিলেই দুই শতাধিক বর্ষের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। পুথির শেষে ১৬০৩ শক লেখা আছে। ঐ শকে গ্রন্থখানি নকল হয়। এই পুথি খানিকেই আমরা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিলাম।

কাঁটোয়ার পুথিখানি বড় পুরাতন বলিয়া বোধ হইল না। গ্রন্থ-সমাপ্তির পর লেখকের নাম বা সন তারিখ দেওয়া নাই। তবে এই পুথির কাগজ ও লেখা দেখিয়া কম বেশ ৭০।৮০ বর্ষের প্রাচীন বলিয়া ধরা যায়।

দুই খানি পুথিই বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। এমন পঙ্‌ক্তি নাই, যাহাতে ৫। ৭ টী বানান ভুল না আছে। তাই বলিয়া আমরা মূলে ঐ সকল বর্ণাশুদ্ধির সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ পুথিতে যেমন আছে, ঠিক তাহাই দেখাইব, টীকাতে সংশোধন, পাঠান্তর ও প্রয়োজন হইলে অর্থাদি লিখিয়া দিব।

---

* দেহকড়চের পুথি দুইখানি বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে। আজ প্রায় দুই বর্ষ অতীত হইল, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার ঐ পুথি দেখিয়া বঙ্গবাসীতে ইহার উল্লেখ করেন, তৎপরে পরিষৎ-পত্রিকায়ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী মধ্যে এবং অবশেষে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক নবপ্রকাশিত অতি উপাদেয় গ্রন্থে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সামান্য পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

দেহ-কড়চ।

———(++৪০৪++)———

১ শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্ত[২] জিব[৩]॥ থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপে[৪] হইল। তত্ত[৫] বস্ত হৈতে। তত্ত[৫] বস্ত কি ২ । পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র[৬]। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল য়েক[৭] যোগে[৮] ভাণ্ড হৈল॥ পঞ্চাত্মাকে ২॥ প্রিথিবী[৯] আপ[১০] তেজঃ বাউ[১১] আকাশ॥ একাদশীন্দ্র[১২] কে ২। কর্ম্ম-ইন্দ্র[১৩] পাঁচ॥ জ্ঞানীন্দ্র[১৪] পাঁচ॥ আবরন[১৫] এক। কর্ম্ম-ইন্দ্রের[১৬] নাম কি ২॥ হস্ত পদ লীঙ্গ[১৭] গুহ্য সির[১৮]॥ জ্ঞানীন্দ্রের[১৯] নাম কি ২॥ চক্ষুকর্ণ ঘ্রাণ রশনা[২০] বাক্। এই শকল[২১] ইন্দ্রের[২২] রাজা মণ[২৩]॥ পঞ্চ আত্মা বশ কার॥ ইন্দ্রের[২৪]॥ ইন্দ্র[২৫] বশ কার॥ রীপুর[২৬]॥ রিপুর নাম কি ২। কাম ক্রোধ, লোভ মোহ মদ মাশ্চর্য্য[২৭] দম্প শহঃ[২৮]॥ রিপুগণ করেন কি॥ ইন্দ্রগণকে[২৯] চেতন দেন॥ ইন্দ্রগণ[২৯] করেন কি॥ জিবের চেতন্ব[৩০] করে। জিবাত্মা[৩১] থাকেন কোথা॥ শীরে[৩২]॥ কিরূপে॥ শনীত[৩৩] আশ্রয়ে॥ করেন কি পিতা মাতাকে ভাবেন॥ পরমাত্মা থাকেন কোথা॥ শোণ্ডে[৩৪]॥ কিরূপে॥ স্থক্লীছলে[৩৫]॥ করেন কি॥ জিবাত্মাকে[৩১] হরেন॥ হরিলে হয় কি॥ তাহার পরমান্দ[৩৬] হয়॥ পরমান্দ[৩৬] হৈলে হয় কি॥ স্বরূপ হয়॥ স্বরূপ হৈলে হয় কি॥ রূপের সহীত[৩৭] ভেদ হয়॥ অভেদ বলি

---

১ এইখান হইতে খেতরীর পুথি আরম্ভ। ২ "তটস্থ" কাঁটোয়ার পুথির বিশুদ্ধ পাঠ। ৩ জীব। ৪ কিরূপে। ৫ তত্ত্ব। ৬ একাদশেন্দ্রিয়। ৭ 'এক' কাঁ. পু.। ৮ যোগে। ৯ পৃথিবী। ১০ অপ্। ১১ 'বায়ু'—কাঁ. পু.। ১২ একাদশেন্দ্রিয়। ১৩ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ১৪ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ১৫ 'আর মন। ১৬ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের। ১৭ লিঙ্গ। ১৮ 'হস্তপাদলিঙ্গগুহ্যশির'—কাঁ পু.। ১৯ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের। ২০ রসনা। ২১ 'সকল'-কাঁ. পু.। ২২ ইন্দ্রিয়ের। ২৩ মন। ২৪ ইন্দ্রিয়ের। ২৫ ইন্দ্রিয়। ২৬ সহকার রিপুর। ২৭ মাৎসর্য্য। ২৮ দম্ভ সহ। ২৯ ইন্দ্রিয়গণ। ৩০ জীবের চৈতন্য। ৩১ জীবাত্মা। ৩২ শিরে। ৩৩ শোণিত। ৩৪ শুক্রে। ৩৫ শুক্রচ্ছলে অর্থাৎ বীর্য্যরূপে। ৩৬ 'রূপ রূমান্ধ'—কাঁ. পু পাঠ।=পরমানন্দ। ৩৭ 'সহিত'—কাঁ.. পু।

কারে ॥ একাত্মাকে। পরমিষ্ঠী[৩৮] আত্মা থাকেন কোথা। সন্যেতে[৩৯] ॥ কিরূপে থাকেন ॥ সহশ্রদল[৪০] পদ্মে থাকেন ॥ তাহার রূপ কি ॥ শ্বরূপ প্রীকির্ত্তিতে[৪১] জোড়িত ॥ কিরূপে থাকেন ॥ শদা[৪২] আনন্দময় ॥ বাহ্যজ্ঞান-রহীত[৪৩] ॥ তেঁহ[৪৪] নিত্য চৈতন্য ॥ নিত্য চৈতন্য কাথে[৪৫] বলি ॥ শদা[৪২] চেতন ॥ তেঁহো কে[৪৬] ।। শ্রীগুরু সকলের পর[৪৭] ॥ তাথে[৫৪] জানিব কেমনে ।। তেঁহো আপনাকে আপনি জানান ।। জে[৪৮] জন চেতন সেই চৈতন্য ।। অতএব শ্বরূপ[৪৯] রূপ এক বস্তু হয় ।। বর্ত্তমান অনুমাণ[৫০] হয় দুই রূপ ।। বর্ত্তমানের অনুমাণ[৫০] ॥ অনুমানের বর্ত্তমান ॥ কি শ্বরূপ[৪৯] ॥ ইহার ভাব কি ॥ বর্ত্তমাণ[৫১] ॥ অষ্ট ভাবণা[৫২] ॥ জাথে[৫৩] দেখি নাঞি তাথে[৫৪] কীরূপে ভা[illegible]বে। জাহাকে[৫৩] দেখিতে পাই তাহাকে ভাবি জেরূপ[৫৫] নেত্রে দেখি ॥ সেইরূপ হ্রিদয়ে[৫৬] থাকে ॥ বর্ত্তমান[৫৭] জানিব কিশে[৫৮] ।। জাহাতে[৫৩] শ্রবণ দর্শণ[৫৯] ॥ শে লোভ কাথে[৬০] ।। জে মণে হরে[৬১] ।। মনে হরে কে ।। শ্রীগুরু ॥ শিক্ষাগুরু কে ।। শহজ[৬৩] যানায় জে[৬২] ।। প্রাপ্তি কি। সহজ বস্তু। শহজ[৬৩] বস্তু বর্ত্তে কিশে[৫৮] ।। সহজ মানস ছিষ্টি জাতে[৬৪] ।। শহজ[৬৩] মানশ[৬৫] বর্ত্তমাণ[৫১] ॥ গুরুরূপ বর্ত্তমান ॥ গুরুর স্থিতি কোথা ॥ বর্ত্তমানে ॥ বর্ত্তমাণ[৫১] কি ॥ সহজ মানশ[৬৫] ।। মানশ[৬৫] কয় ।। তিন ॥ কি ২ ।। অজনিসম্ভবা[৬৬] । জনিশম্ভা[৬৭] ।। সতসিদ্ধি[৬৮] ॥ এহি তিন ।। জনিসম্ভবা[৬৭] বর্ত্তমাণ[৫১] ।। অজনিসম্ভবা[৬৬] গোকুল[৬৭] বৃন্দাবন ।। সতসিদ্ধি[৬৮] গোলোক বৃন্দাবন ।। জনিশম্ভার[৬৭] উৎপতি[৬৯] কোথা ।। ছিষ্টিকর্ত্তা[৭০] হৈতে ।। সে কে ।।

---

৩৮ 'পরমেষ্ঠী',—কাঁ. পু. । ৩৯ শূন্যেতে। ৪০ সহস্র। ৪১ স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। ৪২ সদা। ৪৩ 'রহিত'—কাঁ. পু.। ৪৪ 'তিঁহ'—কাঁ. পু.। ৪৫ কাহাকে। ৪৬ তাহা কি বা তিনি কে ? ৪৭ পর অর্থাৎ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ। ৪৮ যে। ৪৯ স্বরূপ। ৫০ অনুমান। ৫১ বর্ত্তমান। ৫২ ভাবনা। ৫৩ যাহা। ৫৪ তাহাকে। ৫৫ যেরূপ। ৫৬ হৃদয়ে। ৫৭ 'বর্ত্তমান কাল' কাঁ. পু.। ৫৮ কিসে। ৫৯ 'দর্শন'-কাঁ. পু.। ৬০ অর্থাৎ সে কাহাকে লোভ করে। ৬১ 'জে মন হরে'—কাঁ. পু.। ৬২ সহজ জানায় যে। ৬৩ 'সহজ'—কাঁ. পু.। ৬৪ 'সহজ মানসা সৃষ্টি জাতে'—কাঁ. পু.। ৬৫ মানস। ৬৬ অযোনিসম্ভবা। ৬৭ যোনিসম্ভবা। ৬৮ স্বতঃসিদ্ধ। ৬৯ উৎপত্তি। ৭০ সৃষ্টি।

ব্রহ্মা। স্থিতি কোথা ॥ খিরদশাই[৭১] ॥ সংসারের কর্ত্তা কে ॥ মহেশ্বর ॥ তার স্থিতি কোথা। কৈলাস ॥ এই তিন লোকে গুণাবতার। খিরদশাই[৭১] কোন্ পুরুষ ॥ তৃতিয়[৭২] পুরুষ[৭৩] ॥ তার স্বরূপ কি ॥ শহস্র[৪০] মস্তক ॥ শহস্র[৪০] পদ ॥ ইত্যাদি ॥ স্থিতি কোথা ॥ চৌদ্যভুবনের অধ[৭৪] ॥ তাহার ণাম[৭৫] কি ॥ শপ্ত[৭৬] শর্গ[৭৭] সপ্ত পাতাল ॥ কি ২ ॥ ভূলোক ভবলোক স্বরলোক মহোলোক[৭৮] জনলোক তপলোক শান্তলোক। এহি সপ্ত শ্বর্গ[৭৭]। সপ্ত পাতাল কি ২ ॥ অতল বিতল স্বতল তল তলাতল মহাতল রশাতল[৮০] ॥ ইহার উধ বৈকণ্ঠ[৮১] ॥ আদিস্থান। তাথে গর্ভ দশা ইব স্থিতি ॥ তার অধ পচীশ[৮২] ক্রোশ জোজন[৮৩] ॥ একুনে পঞ্চাশ ক্রোশ জোজন[৮৩] ব্রহ্মাণ্ড ॥ ব্রহ্মাণ্ড থাকেন কোথা ॥ বিরজাতে ॥ তেহোঁ কে ॥ তেহঁ প্রথম পুরুষ ॥ তার নাসাগ্রে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিনাশ ॥ তার প্রমাণ কি ॥

[৮৪] 'জযে সেকোনিশ্বাসেত কাল মথাবলম্বনং।
জিবতি লোম বিনো জাহ্নগদগুণাথা।
য়িষ্ণ মহানুমহই সধ সধ কলা বিশেষ।
গোবিন্দ মাদি পুরুশং ত্বমহংভজামি' ॥ [৮৪]

তার উৎপত্তি কোথা ॥ চত্তর্ব্বহ[৮৫] শঙ্কর্শন[৮৬] হৈতে ॥ চতুর্ব্বহ[৮৫] ৪ ।৩। বাসুদেব শঙ্কর্শন[৮৬] পদ্মমন[৮৭] অনিরূদ্র[৮৮]। এই চারিজন। স্থিতি কোথা ॥

গোলোকনাথ হৈতে ॥ গোলোকনাথ কে ॥ তেহোঁ কোন নাএক[৮৯] ॥ তেহোঁ অশ্বর্য্যা[৯০] নাএক[৮৯] ॥ তার গুণ কি ॥ তার তিনগুণ ॥ তার অংশ

---

৭১ ক্ষীরোদশায়ী। ৭২ তৃতীয়। ৭৩ পুরুষ। ৭৪ চৌদ্দভুবনের অধঃ। ৭৫ নাম। ৭৬ সপ্ত। ৭৭ স্বর্গ। ৭৮ মহর্লোক। ৮০ রসাতল। ৮১ উর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ। ৮২ পঁচিশ। ৮৩ যোজন।

৮৪ "যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" (ব্রহ্মসংহিতা ৫ অঃ)

৮৫ চতুর্ব্যূহ। ৮৭ সঙ্কর্ষণ। ৮৭ প্রদ্যুম্ন। ৮৮ অনিরুদ্ধ। ৮৯ নায়ক। ৯০ ঐশ্বর্য্য।

চতুর্ব্বহ[৮৫]। তার প্রকাশ গোলোক ॥ প্রকাশে বস্তু ভেদ নাঞি । তার প্রমাণ কি ।

'বাসুদেব প্রধানশ্চতম্মন শ্রীদিধামত ॥

গোলকে মাথুরে জস্যদ্বারকাদৌ প্রবর্ত্ততে' ॥ [৯১]

'গোলোকে উক্ত জৎ কিঞ্চিৎ গোকুলে তৎ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

প্রকাশ স্বরূপোয়ং দ্বিতিয় দেহরূপকং' ॥ [৯২]

জগন্নাথ নতু মাধুর্য্য নায়েক[৮৯] গোকুলনাথের প্রকাশ মথুরা ॥ বৈভব দ্বারকা বিলাশা ॥ ভোমি[৯৩] বৃন্দাবনং ভোমি ॥ ০ ॥ গোকুলনাথের প্রকাষ[৯৪] বৈকুণ্ঠাদি বিলাশ[৯৫]। নিত্যবৃন্দাবন । নিত্যবৃন্দাবননাথকে ভাবেন । ইহো অজনিসম্ভবা[৬৬]। নিত্যবৃন্দাবননাথ কে । সতসিদ্ধি[৯৬] ॥ নিত্য বৃন্দাবননাথ থাকেন কোথা ॥ সর্ব্বপরি[৯৭] ॥ প্রমাণ কি ॥ 'নিত্য দ্বারপরি বৈকুণ্ঠক্ত পরিস্থিতি[৯৮]' ॥ শেখানে[৯৯] হয় কি ॥ নিত্যরাষ[১০০] হয় ॥ নিত্য মহোৎসব হয় ॥ প্রমাণ কি ॥ তথাহি ॥

'সত্যস্থান মঙ্গলনস্যা বিষ্ণবে কান্তবহ্লবং ।

নিত্য বৃন্দাবনং নাম নিত্য রাশ মহোৎসবঃ ॥' [১০১]

শেখানে[৯৯] চন্দ্র সুর্য্যের[১০১] গতি নাহি ॥ রত্নমন্দিরের ছটায় দিপ্তমান[১০৩]। প্রমাণ কি । আদিবরাহতন্ত্রে 'জোতির্ম্ময়ী জত্র তত্র বৃন্দারন্য মহৎ পদং ॥

বৃন্দাবনে শদ্য বাশং নিত্য সিদ্ধি শদ্য গতিঃ ॥'[১০৪]

---

৯১ "বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ পদ্মনাভোঽনিরুদ্ধকঃ। গোলোকে মথুরা যস্য দ্বারকাদ্যৌ চ বর্ত্ততে ॥"

৯২ "গোলোকোক্তঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ গোকুলে তৎপ্রতিষ্ঠিতম্। স্বপ্রকাশস্বরূপোঽয়ং দ্বিতীয়ো দেহরূপকঃ ॥"

৯৩ 'নৌমি বৃন্দাবনং' – কাঁ. পু.। এই পংক্তির পাঠ সমীচীন নহে। ৯৪ প্রকাশ। ৯৫ বিলাস। ৯৬ স্বতঃসিদ্ধ।

৯৭ সর্ব্বোপরি। ৯৮ উভয় পুথির পাঠই বোঝা গেল না। ৯৯ সেখানে। ১০০ রাস।

১০১ "সত্যস্থং মঙ্গলাস্তস্য বিষ্ণোঃ কান্তাতিবল্লভং। নিত্যবৃন্দাবনং নাম নিত্যরাসমহোৎসবং ॥"

১০২ সূর্য্যের। ১০৩ দীপ্তমান।

১০৪ "জ্যোতির্ম্ময়ী যত্র পুরী বৃন্দারণ্যং মহৎপদং। বৃন্দাবনে সদাভাসো নাস্তি চন্দ্ররবের্গতিঃ ॥"

শেখানে[৯৯] বাএ[১০৫] স্থির নিত্য সুখ ॥ শোক বিচ্ছেদ নাঞী। জরা মিত্ত্ব[১০৬] নাহি ॥ ক্রোধ অহঙ্কার নাহি ॥ প্রমাণ কি ॥

'অতুঃখং সোক বিচ্ছেদ জরামিত্ত্বনাং বর্জ্জিতং।

অক্রোধ মাশ্চর্য্য নাস্তি অভীর্থন বহঙ্করং ॥'[১০৭]

করেন কি। 'ছিষ্টির রশ আশ্বাদন। শিখি পিঙ্করিভূষণং।'[১০৮] 'অঙ্গি এত নৈরাকার মাত্রে যে ভূসনাশ্রয়ং।'[১০৯] তার স্থিতি কোথা। চারি বেদের পরি ॥ রত্ন সিংহাসনে ॥ কিশোরি[১১০] বিরাজমাণ[১১১]। শে[১১২] নাইকার[১১৩] কাঙ্ক্ষ রতি। নায়েকের[১১৪] প্রেম রতি ॥ তেঁহো সত সিদ্ধি[১১৫]। তখন নির্গুণ প্রীকির্ত্তি[১১৬] পুরুশে[১১৭] জড়িত ॥ তাখে পাব কিশে[৫৮] ॥ তাহার স্বরূপ[৪১] হৈলে ॥ স্বরূপ[৫৫] হৈব কিশে[৫৮] ॥ গুরু উপদেশে। গুরু উপদেশ কি। কামগায়ত্রী কামবিজ[১১৮] ॥ কামগাত্রী[১২০] কে ॥ নায়েক[৮৯] ॥ কামবিজ[১১৮] কে ॥ নাইকা[১১৯] ॥ কাম-গাত্রি[১২০] সাড়ে চব্বিশ অক্ষর। সাড়ে চব্বিশ ছন্দ ॥ কামবিজ[১১৮] তেমতি। এই সকল ছন্দ অঙ্গে ধারণ করিবেন ॥ তাহাতে শদা দিপ্তমাণ[১০৩] গুরুনায়েক[৮৯] শিষ্য নাইকা[১১৯]। নাইকার[১১৩] শ্বরূপ[৪৯] হয় কিশে[৫৮] ॥ নাইকার[১১৩] গুণ অঙ্গে ধারণ করিবেক। গুণ কি ২। নেত্রে শ্রী গুণমুঞ্জরি[১২১] ॥ জিহ্বাতে রসমুঞ্জরি[১২১] ॥ নাশায়ে[১২২] কস্তুরি-মুঞ্জরি[১২১] ॥ কর্ণেগুণমুঞ্জরি[১২১] ॥ বাক্যে মধুমুঞ্জরি[১২১] ॥ কণ্ঠে ভৃঙ্গমুঞ্জরি[১২১] ॥ বক্ষস্থলে প্রেমমঞ্জুরি[১২১] ॥ হস্তে বিণমুঞ্জরি[১২৩] ॥ অন্তরে কাম-মুঞ্জরি[১২১] ॥ মোনে[১২৪] রতিমুঞ্জরি[১২১] ॥ চিত্তে প্রীতমুঞ্জুরি[১২১] ॥ চরণে পদ্মমুঞ্জরি[১২১] গুণ এই সকল গুণ অঙ্গে ধারণ করিবেন ॥ ০ ॥ ০ ॥ তবে শ্বরূপ[৪৯] হইবেন ॥

---

১০৫ অস্পষ্ট। কাঁটোয়ার পুথিতে 'বাউ' পাঠ আছে। ১০৬ মৃত্যু।
১০৭ "অদুঃখং শোকবিচ্ছেদজরামৃত্যুবিবর্জ্জিতম্। অক্রোধো নাস্তি মাৎসর্য্যং নাভ্যর্থনমহঙ্কৃতিঃ ॥"
১০৮ "সৃষ্টিরস আস্বাদনঃ শিখিপুচ্ছ বিভূষণং"—সব বোঝা গেল না।
১০৯ অস্পষ্ট। সব বোঝা গেল না। ১১০ কিশোরী। ১১১ বিরাজমান। ১১২ সে। ১১৩ নায়িকার।
১১৪ নায়কের। ১১৫ স্বতঃসিদ্ধি। ১১৬ প্রকৃতি। ১১৭ পুরুষে। ১১৮ বীজ। ১১৯ নায়িকা।
১২০ 'গায়ত্রী'—কাঁ. পু.। ১২১ মুঞ্জরী। ১২২ নাসিকায়। ১২৩ বীণামঞ্জরী। ১২৪ মনে।

স্বরূপ[৪৯] পাইবেন ॥ স্বরূপের ধংশ[১২৫] নাহি ॥ ধংশ[১২৫] নাই কার ॥ নিত্যের বর্ণগুণ জে[৪৮] ধারণ করিবেন ॥ শে[১২১] শরূপ[৪৯] হইবেক ॥ শ্বরূপ[৪৯] হৈলে শ্বরূপ[৪৯] সহিত ভেদ হয় ॥

পয়ার ॥ শে[১১২] পৃকৃতির[১১৬] দরশনে আনন্দিত মন ॥
মন হরিণ এাসে[১২৬] করিল গমন ॥
ধনুরূপ হৈয়া থাকে নাহি জানে আন ॥
শেহিরূপ[১২৭] নিবরধি করয়ে ধেয়ান।
শেহিরূপ[১২৭] আসি তার দ্রিদয়ে[৫৬] পসিল[১২৮] ॥
দ্রিদয়ের[৫৬] মেদ্ধে[১২৯] শেই[১২৬] পৃকৃতি[১১৬] হইল ॥
পৃকৃতি[১১৬] হইয়া করে প্রকৃতির শঙ্গ[১৩১] ॥
পৃকৃতির[১৩০] শঙ্গে[১৩১] তার উপজয়ে রঙ্গ ॥
রশের[১৩২] তরঙ্গে পড়ি নাহি জানে আন।
রশেতে মগণ (সদা) রশ[১৩৩] করে পান।
রস পান করিবে জে শেই সে পাইবে।
রশের মরম জানি প্রভুরে[১৩৪] ভুঞ্জাবে ॥
প্রভুর সুখে সুখি[১৩৫] হইয়া শেবে[১৩৬] জেই জন।
অবশ্য পাইবে সেই নিত্য বৃন্দাবন ॥
গোকুল গোলোক এক নিত্য বস্তু স্থান।
নিত্য পরিবার গোলোক স্বয়ং প্রধান ॥
মাধুর্য্য নিত্য প্রকট। অতয়েব[১৩৭] মাধুর্য্য প্রধান প্রকট ॥ রূপে নিত্য

---

১২৫ ধ্বংস। ১২৬ আশায়। ১২৭ সেহি=সেই। ১২৮ পশিল=প্রবেশ করিল। ১২৯ 'মধ্যে'—কাঁ. পু.। ১৩০ 'প্রকৃতি'—কাঁ. পু.। ১৩১ সঙ্গী। ১৩২ রসের। ১৩৩ রস। ১৩৪ প্রভুরে। ১৩৫ সুখী। ১৩৬ সেবে। ১৩৭ অতএব।

ও বিহার। অতয়েব[১৩৭] মাধুর্য্য নাএক[৮৯] শিক্ষাগুরূ[১৩৮]॥ নরত্তম দাষে[১৩৯] কহে ভাবি সেই গুরু॥ ❋॥ ❋॥ ❋॥ ইতি শ্রীমন নরোত্তম ঠাকুর মহাষয় বিরচীত দেহকড়চ শুভমস্ত[১৪০]॥ শকাব্দা ১৬০৩॥

---

১৩৮ গুরু। ১৩৯ নরোত্তম দাসে। ১৪০ ইতি শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিরচিত দেহকড়চ। শুভমস্তু।

বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব।

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে, রামায়ণ ও মনুসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন আর কোন গ্রন্থে উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না *। মনুসংহিতায় কেবল পুণ্ড্র † নাম এবং রামায়ণে বঙ্গ ও পুণ্ড্র উভয় নামই দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ-পাঠে বোধ হয়, বঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশ, উভয়ই অনার্য্যনিবাস ও বনভূমি-সমাচ্ছন্ন। তথায় পুণ্ড্র সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্রগণ, পিতার অসন্তোষ উৎপাদন করায়, পিতৃশাপে অনার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পুণ্ড্রভূমিতে যাইয়া বাস করে।[১] এদিকে ত এই; ওদিকে কিন্তু আবার ঐ রামায়ণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমূর্ত্তরজা নামে এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজা, পুণ্ড্রদেশ অতিক্রম করিয়া কামরূপ অঞ্চলে ধর্ম্মারণ্য নামক স্থানের সমীপে প্রাগ্জ্যোতিষ নামে এক আর্য্যরাজ্য স্থাপন করেন।[২] এ বড় আশ্চর্য্য কথা; আর্য্যস্রোত ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ, একের পর আর, এইরূপ ভাবেই অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে, তাহার বিপরীত, মধ্যে প্রবল একটা পুণ্ড্রদেশ অতিক্রম করিয়া ও তাহার এদিক্ ওদিক্ না তাকাইয়া, একেবারেই কামরূপে গিয়া আর্য্যরাজ্য স্থাপিত হইল, ইহা কখনই হইতে পারে না; অবশ্যই ক্রমে ক্রমে ভূভাগ আবিষ্কৃত হইতে হইতে কামরূপমুখে আর্য্যস্রোত অগ্রসর হইয়া থাকিবে। সুতরাং ওদিকে মগধ, আর এদিকে কামরূপ, উভয় আর্য্যরাজ্যের মধ্যে এই দূর ব্যবধান স্থানে, কিছু না কিছু আর্য্য-নিবাস ছিল, ইহা না হইয়াই পারে না। তবে এই হইতে পারে যে, দেশের সাধারণ অধিবাসী যাহারা, তাহারা সকলেই অনার্য্য এবং আর্য্যনিবাস যাহা কিছু ছিল, তাহা তাহাদের তুলনায় মুষ্টিমেয়। অতএব ইহাই আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে বঙ্গ নামধেয় যে ভূমি, অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ অধুনাতন বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ, তখন অসভ্যনিবাস হইলেও, প্রকৃত পুণ্ড্রভূমি যাহা, অর্থাৎ অধুনাতন উত্তরবঙ্গ আর্য্যনিবাস শূন্য ছিল না।

---

* [অথর্ব্ববেদে অঙ্গের উল্লেখ আছে—"গন্ধারিভ্যো মুজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যোমগধেভ্যঃ।" অথর্ব্বসংহিতা ৫।২২।৪। অথর্ব্বপরিশিষ্টে 'বঙ্গ' নাম পাওয়া যায়। এখনকার বাঙ্গালার অন্তর্গত ভাগলপুর অঞ্চলই পূর্ব্বকালে 'অঙ্গ' নামে খ্যাত ছিল। ঐতরেয় আরণ্যকেও (২।১।১) 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' প্রভৃতি স্থলে পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী—'বঙ্গাঃ বঙ্গদেশীয়াঃ বগধাঃ মগধাঃ' এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ত্রয়ীটীকা ১৬৩পৃঃ)]—পত্রিকা-সম্পাদক।

† [ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রদিগের বর্ণনা আছে।—'অন্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি ত এতেঽন্ধ্রা পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি। বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৭।১৮।]—পঃ সম্পাদক।

১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

২। "তথামূর্ত্তরজাবীরশ্চক্রে প্রাগ্জ্যোতিষং পুরং। ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থং।" রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

বর্ত্তমান যে গ্রন্থ মনুসংহিতা নামে প্রচলিত, তাহা প্রকৃতঃ পক্ষে মনুর মত সংগ্রহ মাত্র এবং রামায়ণ হইতে উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক *। এই সংগ্রহদৃষ্টে অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে অতি প্রাচীন মনুকৃত কোন স্মৃতি ছিল এবং তাহারই অবলম্বনে বর্ত্তমান সংহিতার উদয় হইয়াছে। অতি প্রাচীন মনুস্মৃতিতে কি ছিল তাহা জানি না, সুতরাং যাহা আছে, তাহা লইয়াই বিচার। বর্ত্তমান সংহিতার প্রমাণেও জানা যায় যে, পুণ্ড্রভূমি খাঁটি অনার্য্যনিবাস নহে; তথায় শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণও বসতি করিত।[১] এই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, মনু পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন.ও কিরাতদিগকেই ধরিয়াছেন।

রামায়ণ ও মনুসংহিতার পর, মহাভারতেও কেবল পুণ্ড্রভূমি ও বঙ্গের নাম নহে, অধিকন্তু তাম্রলিপ্তের নামও দেখিতে পাওয়া যায়।[২] এখানে ইহা বলাই বাহুল্য যে, রামায়ণ, মনুসংহিতা এবং মহাভারতে, ক্রমান্বয়ে যে পৌণ্ড্রভূমি, বঙ্গ এবং তাম্রলিপ্তের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা বঙ্গ ও পৌণ্ড্র মাত্র, তদতিরিক্ত অন্য কোন স্থান নহে। সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে, ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, ভীম বঙ্গভূমিতে আসিয়া বাসুদেব নামা নৃপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তখন যে বঙ্গভূমিতে আর্য্যগণ আসিয়া বাস করিয়াছিল এবং আর্য্যজাতীয় রাজা যে উহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাহা রাজার এই বাসুদেব নামেই পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। কেবল বঙ্গ বলিয়া কেন, তৎকালে বঙ্গের দক্ষিণস্থিত উৎকল সহ কলিঙ্গ রাজ্য পর্য্যন্ত, আর্য্যগণের দ্বারা কেবল অধিবেশিত নহে, প্রত্যুত পুণ্যভূমির মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছিল।[৩] বঙ্গের মধ্যেও তখন

---

* [প্রচলিত ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা রামায়ণ অপেক্ষা অপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, বরং নানা কারণে মনুসংহিতার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়। এখন যে মনুসংহিতা প্রচলিত আছে, তাহারই কএকটি বচন রামায়ণে অবিকল উদ্ধৃত দেখি। যথা।

'শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
গৃহীতৌ ধর্ম্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিত্রং ময়া॥ ৩০
রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥ ৩১ } = মনু ৮।৩১৮।
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৩২ } = মনু ৮।৩১৬।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৮ অধ্যায়।]—পঃ সম্পাদক।

১। "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাদরদাঃ খশাঃ॥"

(মনু ১০ অধ্যায়।)

২। "অঙ্গঃ বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ" ইত্যাদি। মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪। ভীষ্মপর্ব্ব ৯।৫৬ এবং "অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।" ইত্যাদি। হরিবংশ ২২৮ অঃ।

৩। "এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাঽযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতং।

সাগরসঙ্গম মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে ১; সুতরাং বঙ্গ তখন কেবল আর্য্যনিবাস নহে; বহু দূর দূরান্তরবাসী আর্য্যগণ পর্য্যন্ত, পুণ্যতীর্থ সাগরসঙ্গমে স্নান হেতু যাওয়া আসা করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও যে ভ্রাতৃগণসহ এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া স্নান করিয়াছিলেন, মহাভারত বনপর্ব্বে ১১৩ অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতের পর, পুরাণাদিতে পৌণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এবং এমন কি সমতট প্রদেশের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণে পৌণ্ড্রদেশের বিষয় কথনে, পৌণ্ড্র-খণ্ড নামে একটি পৃথক্ খণ্ডই বিভাগ করা হইয়াছে এবং সেই পৌণ্ড্রখণ্ড মধ্যে, এমন কি গৌড় নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণ সকলের প্রাচীনত্বে * অনেকেরই সন্দেহ আছে এবং আমারও সে সন্দেহ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং পুরাণোক্ত কোন স্থল এখানে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিলাম না। তবে হরিবংশ যদিও মহাভারত অপেক্ষা বহুলাংশে আধুনিক; তথাপি উহাকে আর আর সমস্ত পুরাণ অপেক্ষা বহু প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যদিও এই হরিবংশের মধ্যে পৌণ্ড্র, বঙ্গ, ও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সমতট, কর্ণসুবর্ণ, ইত্যাদি নামধেয় প্রাচীন বাঙ্গালার অপরাপর প্রদেশগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনির্ণীত-কাল পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রমাণিত কাল যে সকল গ্রন্থ তাহা সন্ধান করিলে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ শক নরপতির ষষ্ঠ শতাব্দীর কিঞ্চিদূন মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতায় যুগপৎ এই নামগুলির উল্লেখ দেখা যায়,—গৌড়, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, বর্দ্ধমান, বঙ্গ, উপবঙ্গ, সমতট। ২ তদ্ভিন্ন, ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পরে প্রাদুর্ভূত উত্তরভারতের সম্রাট্ ও কান্যকুব্জেশ্বর শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক কবি বাণভট্টের হর্ষচরিতে ও চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাণভট্টের লিখন অনুসারে জানা যায় যে কর্ণসুবর্ণ † এবং গৌড় একই রাজ্য ছিল।

উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতং ॥
সমানং দেবযানেন পথাস্বর্গমুপেয়ুষঃ ॥
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরিজিরে ॥" ইত্যাদি। মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৮ অঃ।

১। "স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদী শতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্ ॥"
এই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ভ্রাতৃগণ সহ যুধিষ্ঠির স্নান করিয়াছিলেন।
মহাভারত—বনপর্ব্ব ১১৪ এবং ৮৫ অধ্যায়।

* [পুরাণে দুই একটি প্রক্ষিপ্ত বচন থাকিলেও মূল পুরাণগুলি নিতান্ত আধুনিক নয়। এমন কি আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে ভবিষ্যৎ পু·াণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে]—পঃ সম্পাদক।

২। বৃহৎসংহিতা ১৪।৬—৮।

† [বাণভট্টের গ্রন্থে গৌড় নাম আছে, কিন্তু কর্ণসুবর্ণ পাইলাম না।]—পঃ সঃ।

যাহা হউক, বরাহমিহিরের লিখনানুসারে দেখা যায় যে, গৌড় হইতে পৌণ্ড্র পৃথক্ ও বঙ্গ হইতে বর্দ্ধমান পৃথক্ এবং বরাহমিহির উপবঙ্গ নামে আরও যে একটি স্বতন্ত্র স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই উপবঙ্গ, বোধ হয়, তদানীন্তন গাঙ্গেয় বদ্বীপ হইতে পারে। যাহা হউক, গৌড় ও পৌণ্ড্র, বঙ্গ ও বর্দ্ধমান, ইত্যাদির পৃথক্ উল্লেখের কারণ বিচার করার পূর্ব্বে, একবার দেখা উচিত যে, বিদেশীয়দিগের গ্রন্থ হইতে বঙ্গভূমির প্রাচীন সংবাদ কতদূর সংগৃহীত হইতে পারে।

গ্রীকভূবেত্তা প্তলেমির প্রণীত ভূবৃত্তান্ত-পুস্তকের মাক্রিণ্ডেল কৃত ইংরেজী অনুবাদ পাঠে জানা যায় যে,[১] ইউরোপ আদি পাশ্চাত্যভূমে, পূর্ব্বভারতের মধ্যে তাম্রলিপ্তি অর্থাৎ বর্ত্তমান তমলুকনগর, খৃষ্টের ৬০০ বর্ষেরও পূর্ব্ব হইতে গণনীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যবন্দর বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। তবেই দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্ট জন্মিবার ৬০০ বৎসরেরও অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে তাম্রলিপ্তি প্রদেশ ছিল; তথায় যে অব্যবহিত প্রদেশ হইতে আর্য্যস্রোত আসিয়াছিল, সেই বঙ্গভূমিও বিশেষ সভ্যতা এবং সম্পদের আকর না হইলে তাম্রলিপ্তির সামুদ্রিক বাণিজ্য-বন্দরের তাদৃশ খ্যাতি হইতে পারিত না। যে কালে লোকচলাচলের নিতান্ত বিরলতা এবং দেশ দেশান্তরে গমনাগমনের দারুণ দুর্গমতা হেতু যে কোন খ্যাতি-বিস্তার বহুকাল সাপেক্ষ ছিল,—সেই পূর্ব্বতন কালেই সুদূর ইউরোপ ভূমিতে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। অতএব উক্ত বিশিষ্ট প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বঙ্গভূমিকে অনেকে যেরূপ অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেশ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা নহে। তাম্রলিপ্তির প্রোক্ত খ্যাতি বিস্তার হওয়া যে কালসাপেক্ষ, তাহার একটা পরিমাণ কল্পনা করিলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, খৃষ্টের সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তাম্রলিপ্তপ্রমুখ সেই প্রাচীন বঙ্গে সুখ, সৌভাগ্য ও সভ্যতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এই বঙ্গভূমের লোক অধ্যবসায়শালী হইয়া দেশ দেশান্তরে সমুদ্রযানে বাণিজ্যাদি করিয়া ফিরিত। এ বিষয়ের আরও বিশেষ প্রমাণ অন্যত্র হইতেও পাওয়া যাইতেছে।

সিংহলদ্বীপের মহাবংশ নামক গ্রন্থে[২] লিখিত আছে যে বৎসর বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়েন, সেই বৎসর বঙ্গীয় রাজকুমার বিজয় সিংহল জয় করেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু অনুসন্ধানের দ্বারা খৃষ্টীয় শকের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়া থাকেন।[৩] সুতরাং এখানেও প্রমাণ স্থলে যে সময়ের ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে,

---

১। " * * is proved historically by the mention of Tamralipta, 600 of years before our era, as one of the most frequented ports of Eastern India"——Mc Crindels Ptolemy, 73.

২। Mahavanso, chaps 6, 7, 8, 58.

৩। একমাত্র মক্ষমূলর বুদ্ধনির্ব্বাণের কাল খৃঃ পূঃ ৪৭৭ বৎসর নিরূপণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে যখন আমাদের বিচার করিবার সময় ও স্থান ইহা নহে, তখন অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের যে মত, তাহাই মূলে গ্রহণ করিলাম।

তাহাও প্রায় খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬০০ বৎসরের কথা। মহাবংশে লিখিত আছে, যে বঙ্গভূমের মধ্যে লাল [১] নামক প্রদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। সিংহবাহুর বিজয় নামে এক পুত্র ছিল। বিজয় স্বীয় কর্ম্মদোষে পিতার বিরাগভাজন হওয়ায়, পিতৃ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত হওয়ায় স্বদেশ হইতে সঙ্গীগণসহ সেই রাজপুত্র বিজয় সমুদ্রযানে (সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্তি হইতে) যাত্রা করিয়া সিংহলে উপস্থিত হইয়া, সেই রাজ্য জয়পূর্ব্বক তথাকার সিংহাসন অধিকার করেন। কিছুকাল রাজত্বের পর তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকপ্রাপ্ত হইলে, মন্ত্রিগণ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেবকে বঙ্গ হইতে আনাইয়া সিংহলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই হইতে এই বংশ সিংহলদ্বীপে বাইশ শত বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিল। বিজয় সিংহবাহুর পুত্র হেতু এই বংশীয় রাজাদিগকে সিংহবংশীয় বলিত এবং ইহাদেরই নামে এই দ্বীপের নাম সিংহল * হইয়াছিল। এতদ্দ্বারাও আমরা বাঙ্গালার তাৎকালিক সভ্যতা, যুদ্ধকুশলতা এবং সমুদ্রযানাদি পরিচালনের কৌশলাদি বিশিষ্ট রূপে অবগত হইতে পারি। সে কতই পুরাতন কালের কথা! আমরা একজন সিংহলীয় ইতিহাসবিদের প্রসাদে এই সকল কথা এখন অবগত হইতে পারিতেছি; নতুবা এই মহৎ সংবাদ সম্বন্ধে হয়ত আমাদিগকে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ থাকিতে হইত। অতএব উক্ত ইতিহাসবিদ্‌কে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়।

মহাভারতের সময়েও বঙ্গভূমি বাসুদেব নামা রাজার অধীনে একটী প্রতাপান্বিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল † এবং তখন হইতেই যে বঙ্গের সভ্যতা ও সম্পদের সূত্রপাত, তাহা উপরোক্ত প্রমাণ দুইটির দ্বারাও অংশতঃ সমর্থিত হইতেছে। কারণ, উক্ত প্রমাণ দুইটিতে খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে বঙ্গের সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে।

খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত মগধেশ্বর মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভাস্থিত গ্রীকরাজ সিলুক্যুস্ নিকাতোরের রাজদূত মিগাস্থিনিস্ এবং তাহার পরবর্ত্তী গ্রীকভূবেত্তা প্তলেমি, সমুদ্র সহ গঙ্গাসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগকে, "গঙ্গারিদে" [২] অর্থাৎ গঙ্গারাদ্ধ নামে

১। এই "লাল" শব্দ পালীভাষায় রাঢ় শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া জানা যায়।

* [মহাবংশের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত ও সভাপর্ব্বে সিংহলদেশের উল্লেখ আছে।
"সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মণিমুক্তাস্তথৈব চ। শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলা সমুপাহরন্" ॥ সভাপর্ব্ব।
সুতরাং বিজয়সিংহ হইতে সিংহল নাম হওয়া সম্ভাবিত নহে।]—পঃ সঃ।

† মহাভারত। সভাপর্ব্ব। রাজসূয়কালে ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, বঙ্গের রাজা বাসুদেবকে পরাজয় করেন।

২। গঙ্গারিদে (Gangaride) শব্দে কেহ "গঙ্গার্দ্ধি," কেহবা গঙ্গারিক্থ, কেহবা কিছুই বিবেচনা করেন না। ফলতঃ উহা যে 'গঙ্গারাদ্ধ" শব্দ তাহাতে সন্দেহ অতি অল্পই। রাদ্ধ শব্দ এরূপে নিষ্পন্ন, রাধ+ক্ত= রাদ্ধ, ইহার অর্থ নিষ্পন্ন হওয়া, এতৎ যোগে গাঙ্গরাদ্ধ বা গঙ্গারাদ্ধ শব্দ হইতেপারে; উভয়েরই অর্থ গঙ্গাজলের ক্রিয়া অর্থাৎ তদ্দ্বারা আনিত মৃত্তিকায় যে দেশ গঠিত হইয়াছে; অথবা গঙ্গাজলের দ্বারা যে দেশ পালিত হয়।

উল্লেখ করিয়াছেন [১]। এই স্থানের বিবরণ উক্ত দুইজন গ্রীক কর্ত্তৃক যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তদানীন্তন বঙ্গই সূচিত হয় এবং তমলুক বা তাম্রলিপ্তিকেও তাহার অন্তর্গত বলিয়া বুঝায়। বোধ হয়, তৎকালে সেই সমস্ত ভূভাগই, প্রদেশ নির্ব্বিশেষে, গাঙ্গরাঢ় নামে অভিহিত হইত; পরবর্ত্তীকালে তৎসমস্ত ভূভাগ আবার স্থান বিশেষে রাঢ় শব্দে কথিত হইয়াছিল। ইহাও নিঃসন্দেহে অনুমিত হইতেছে যে, পরবর্ত্তীকালে এই 'রাঢ়' শব্দই অপভ্রংশে রাঢ় * শব্দে পরিগণিত হইয়াছে। গঙ্গারিদের বিষয় বলিতে গিয়া মিগাস্থিনিস্ প্রথমেই বলিতেছেন যে, গঙ্গারিদের মধ্যে গঙ্গার ন্যূনকল্প প্রশস্ততা ৪ ক্রোশ এবং উর্দ্ধকল্প ১০ ক্রোশ। তখনকার কালের ভাগীরথী যাহা দিয়া গঙ্গার মূল-স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহার তদ্রূপ প্রশস্ততাই সম্ভব এবং নদী যতই সাগরমুখে গিয়া থাকে, ততই তাহার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ৪ ক্রোশ হইতে ১০ ক্রোশ প্রশস্ততা কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহারা ১২।১৪ ক্রোশ পরিসর পদ্মা বা মেঘনার মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; অথবা যাঁহারা বর্ত্তমান ভাগীরথীরই ডায়মণ্ডহারবার আদির নিকট প্রশস্ততা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার যথার্থতা অবগত হইতে পারিবেন।

তাহার পর মিগাস্থিনিস গঙ্গারিদেকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—প্রথম গঙ্গারিদে খাস, ইহাই নিঃসন্দেহ তদানীন্তন বঙ্গ; দ্বিতীয় বিভাগ গঙ্গার দ্বীপ, ইহা তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে গাঙ্গেয় বদ্বীপের যে কিছু ভূভাগ তখন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে, বোধ হয়, এই শেষোক্ত ভূমির দ্বীপত্ব হেতু সমস্ত-প্রদেশটাই তৎকালে গ্রীক ভৌগোলিকদের নিকট দ্বীপ শব্দে, আখ্যাত হইয়া থাকিবে। মিগাস্থিনিস্ বলিতেছেন যে, এই দ্বীপাখ্যাত গঙ্গারিদে অতিশয় প্রতাপশালী রাজ্য এবং ইহার অধিবাসীর সংখ্যা অতিশয় বিপুল; বসবাস সর্ব্বত্রই অতিশয় ঘন সন্নিবিষ্ট। তৃতীয় বিভাগ গঙ্গারিদে কলিঙ্গ; বলা বাহুল্য যে এই কলিঙ্গই মহাভারতে পুণ্যস্থলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক মহাভারতের নির্ণয় যে ঠিক, তাহা এই গঙ্গারিদে কলিঙ্গের অবস্থান দ্বারা জানা যায়। মিগাস্থিনিস, প্টলেমি ও প্লীনি ইহারা সকলেই এই কলিঙ্গের অবস্থান, গঙ্গার দক্ষিণেই সমুদ্রতীরে নির্ণয় করিয়াছেন। [২]

এক্ষণে এই প্রদেশে কিরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ্য ছিল, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত, মিগাস্থিনিস প্রত্যেকের সৈন্য সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। গঙ্গারিদে খাস বা বঙ্গের সৈন্য সংখ্যা,—এক হাজার অশ্ব, সপ্তশত হস্তী ও যাইট হাজার পদাতি। গাঙ্গেয় দ্বীপাখ্যাত গঙ্গারিদে বা তাম্রলিপ্তি রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা,—চারি সহস্র অশ্ব ও পঞ্চাশ হাজার পদাতি। গঙ্গারিদে কলিঙ্গের সৈন্য সংখ্যা—এক হাজার অশ্ব, সপ্তশত হস্তী ও

১। Mc Crindel's Ptolemy, pp. 172.

* [রাঢ় শব্দ সংস্কৃত লাট শব্দের অপভ্রংশ।]—পঃ, সঃ।

২। Pliny, Book VI, Chap LXV and Mc Crindel's Ptolemy, pp. 231

ষাইট হাজার পদাতি। তৎকালে মিগাস্থিনিস যত রাজ্যের বিবরণ দিয়াছেন, দেখা যায় যে, সে সমস্ত রাজ্য অপেক্ষা একমাত্র পাটলিপুত্রাধিপ মগধেশ্বরের সৈন্য সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মগধের সৈন্য সংখ্যা—ত্রিশ হাজার অশ্ব, নয় হাজার হস্তী এবং ছয় লক্ষ পদাতি। ইহাও এ স্থানে বক্তব্য যে চন্দ্রগুপ্তের এই সৈন্য, তিনিই তৎকালে ভারত-সম্রাট্ নামে বিখ্যাত ছিলেন।[১]

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত, কিন্তু অপরিজ্ঞাতনাম, একজন গ্রীকবণিক, "পেরিপ্লুস্ অব দি ইরিথ্রিয়ান" অর্থাৎ আরব্য সমুদ্রবাহী বাণিজ্য-বিবরণ নামে একখানি বাণিজ্য বিবরণের পুস্তক লিখিয়াছিলেন; ঐ পুস্তকে সেই কালে আরব্য সমুদ্র দিয়া ও মিসর এবং ইউরোপ ভূমির মধ্যে পরস্পরে কি প্রকারে ও কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাণিজ্য চলিত, তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পেরিপ্লুস্ গ্রন্থ এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত গ্রীকভূবেত্তা প্তলেমির ভূবৃত্তান্ত পুস্তকে, অধুনাতন বঙ্গভূমির মধ্যে কিরাদিয়া নামক প্রদেশ এবং গঙ্গিনামক সামুদ্রিক বাণিজ্যবন্দরের উল্লেখ দেখা যায়।

কিরাদিয়া।—এই প্রদেশ মাক্রিণ্ডেল প্রভৃতি[২] অনেকেই রঙ্গপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহা খুব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে কিরাদিয়া নাম, করতোয়ারই গ্রীকরূপান্তর মাত্র। করতোয়ানদীপ্রবাহিত দেশ বলিয়া, এই ভূভাগকে সম্ভবতঃ করতোয়া প্রদেশ বলিত এবং সেই করতোয়াই গ্রীকের হাতে কিরাদিয়া * নাম ধারণ করিয়াছে। স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, করতোয়া নদীর জলে পৌণ্ড্রক্ষেত্র প্লাবিত হইত। ফলতঃ মালদহের উত্তর ভাগ হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এই ভূভাগই সে কালের পৌণ্ড্ররাজ্য। দ্বিতীয়তঃ পেরিপ্লুসে এইস্থান যে তেজপত্রের ব্যবসায় জন্য বিখ্যাত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই তেজপত্র এখন এখানে অতি সুলভ, বন জঙ্গলে পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তেজপত্রের ব্যবসায়, একদিকে গঙ্গা বাহিয়া, তাম্রলিপ্তি হইয়া, সমুদ্রযানে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলস্থিত নীলকুণ্ডা বন্দরে গিয়া, তথা হইতে সমুদ্র পথে সুয়েজ দিয়া ইউরোপ ভূমে নীত হইত।[৩] অন্যদিকে এই প্রদেশের সীমান্তভাগে, প্রতিবৎসরে একটা করিয়া মেলা হইত এবং সেই মেলায় চীনদেশীয় লোক আসিয়া স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে তেজপত্র লইয়া যাইত। চীনদিগের সহ ব্যবসায় সম্বন্ধে পেরিপ্লুসে এরূপ বিবরণ দেওয়া আছে—[৪] "ইহারা

১। উপরে মিগাস্থিনিসের নাম যাহা কিছু ক্রমান্বয়ে উক্ত হইল, তৎসম্বন্ধে Megasthenes Frag. LVI & LVI B দ্রষ্টব্য।

২। Mc Crindel's Ptolemy, pp. 219 & Periplus pp. 145.

* [কিরাদিয়া সম্ভবতঃ কিরাতদেশ শব্দেরই অপভ্রংশ। সকল পুরাণেই ভারতের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী 'কিরাত' জনপদ ও সেই জনপদবাসী 'কিরাত' জাতির উল্লেখ আছে।]— পঃ সম্পাদক।

৩। Mc Crindel's Periplus, pp. 142—47.

৪। Mc Crindel's Periplus, pp. 148—49.

দেখিতে খর্ব্ব বর্ত্তুলাকার, মুখ চ্যাপটা এবং আকার প্রকারে বন জন্তু সদৃশ; কিন্তু তাহা হইলেও, স্বভাবতঃ ইহারা শান্ত প্রকৃতি। ইহারা সস্ত্রীক ও সপুত্রক এই মেলা স্থানে আসিত এবং ব্যবসায়ার্থে পাটিতে জড়াইয়া দ্রব্যের বোঝা সকল সঙ্গে করিয়া আনিত। পাটিগুলি দেখিতে নবীন দ্রাক্ষালতার পত্রের ন্যায়। যেখানে তাহাদের দেশের সীমায় করতোয়া প্রদেশ সংমিলিত হইয়াছে, তথায় মেলাস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখানে তাহারা পাটি বিছাইয়া, তাহারই উপর দ্রব্যাদি সাজাইয়া বসিত এবং মেলার কয়েকদিন উৎসবের সহিত কাটাইয়া, মেলা অন্তে তাহাদের সুদূর গৃহে প্রস্থান করিত।" চীনবাসীরা তেজপত্রের পরিবর্ত্তে রেশমী কাপড় ও রেশম বিক্রয় করিয়া যাইত। এই চীনবাসীর মধ্যে সম্ভবতঃ ভুটিয়া, আসামী, চীন প্রভৃতি নানা জাতিই থাকিত; যদিও পেরিপ্লুসে তাহারা এক সাধারণ চীন নামে বর্ণিত হইয়াছে বটে।

গাঙ্গি।—এই গাঙ্গি কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের গবেষণায়, নানা স্থলই নির্ণীত হইয়া থাকে।[১] কিন্তু এটা কাহারও বিবেচনায় আইসে না যে, তৎকালে বাঙ্গালা দেশে একমাত্র সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্দর তাম্রলিপ্তি ভিন্ন দ্বিতীয় ছিল না; অথচ গাঙ্গির নাম ও বর্ণনা দৃষ্টে স্পষ্টতঃই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা গঙ্গার সহ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট একটী সামুদ্রিক বন্দর। এই গাঙ্গি ফলতঃ অন্য কিছুই নহে, উহা "গাঙ্গেয়" বন্দর শব্দের গ্রীকরূপান্তর মাত্র এবং এই গাঙ্গেয় বন্দর গঙ্গার সর্ব্বদক্ষিণস্থিত ও গঙ্গা মুখে প্রবেশের পথে অবস্থিত বলিয়া, নিঃসন্দেহ তাম্রলিপ্তিই তদ্রূপ নামেও কথিত হইত। অথবা প্রদেশের নাম তাম্রলিপ্তি এবং নগরের নাম "গাঙ্গেয়" বা "গাঙ্গী" এইরূপ যাহা হয় একটা ছিল। ফলতঃ এই গাঙ্গী যে তাম্রলিপ্তি বন্দর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গঙ্গা দিয়া ও এই গাঙ্গি নামক বন্দর হইয়া তৎকালে সমুদ্রপথে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী হইত, তৎসম্বন্ধে পেরিপ্লুস হইতে এইরূপ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১। চীনাংশুক।—বাক্‌ট্রিয়া হইয়া বরোচ বন্দরে আসিয়া, তথা হইতে সমুদ্রপথে নীত হইয়া গঙ্গা দিয়া বঙ্গভূমে প্রবেশ করিত।

২। মুক্তা।—তাম্রপর্ণী অর্থাৎ সিংহল হইতে গাঙ্গি বন্দরে আসিত।

৩। শঙ্খ।—উত্তর বঙ্গ হইতে আসিয়া গাঙ্গি দিয়া ও জাহাজ যোগে অন্যান্য দেশে নীত হইত।

১। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের গাঙ্গি সম্বন্ধে গবেষণার দৌড়টা একবার দেখিবার বিষয় বটে। হিরীনের মতে গাঙ্গি কলিকাতার ২০ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত ধুলিয়াপুর। উইলফোর্ডের মতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে হস্তিমল্লগ্রাম, যথায় হাতি ধরা হইয়া থাকে। মরের মতে চট্টগ্রাম। টেলরের মতে ঢাকা জেলায় সুবর্ণগ্রামের নিকট। কনিংহামের মতে যশোর। সেণ্টমার্টিনের মতে বর্ত্তমান বর্দ্ধমান। অন্য এক জন অপরিজ্ঞাত নামার মতে কলিকাতা এবং স্বয়ং প্তলেমির অনুবাদক মাক্রিণ্ডেলের মতে দক্ষিণ বেহারের অন্তর্গত গঙ্গ্রী নামক বেদিয়া জাতির গঙ্গ্রীস নামক গ্রাম।

৪। তেজপত্র।—উত্তর বঙ্গ হইতে গঙ্গা বাহিয়া গাঙ্গি বন্দরে আসিয়া, তথা হইতে জাহাজে ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ মুসিরি ও নীলকুণ্ডায় যাইয়া, সেখান হইতে ইউরোপ ভূমে নীত হইত। অন্যদিকে স্থলপথে চীনদেশে যাইত।

৫। থস্‌থস্।—উহাও গঙ্গা বাহিয়া গাঙ্গি নগরে গিয়া সমুদ্রযোগে বিদেশে নীত হইত।

৬। অত্যুৎকৃষ্ট মস্‌লিন কাপড়।—ইহা বাঙ্গালার অভ্যন্তর হইতে গঙ্গা বাহিয়া, পরে জাহাজ যোগে আরব দেশে যাইত এবং তথা হইতে অন্যান্য দেশে নীত হইত।

৭। কলিত।—কলিত নামক স্বর্ণমুদ্রা,[১] যাহা তৎকালে বঙ্গভূমে চলিতছিল, তাহাও গাঙ্গি দিয়া সমুদ্রযোগে বিদেশে নীত হইত।

পেরিপ্লুসে ভারতীয় বাণিজ্যের আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ক আরও বহুতর দ্রব্যের তালিকা দেওয়া আছে। কিন্তু যে যে দ্রব্য স্পষ্টতঃ বঙ্গভূমি ও গাঙ্গিবন্দরের সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই মাত্র এখানে গ্রহণ করিলাম। ইহা ভিন্ন পেরিপ্লুসে উক্ত অপরাপর দ্রব্যও যে বঙ্গভূমের সঙ্গে আমদানী রপ্তানী না ছিল, এমন নহে। কিন্তু যখন তাহার মধ্যে কোনটারই নাম বঙ্গভূমির সংস্রবে উল্লিখিত হয় নাই, তখন আমিও তাহার কোনটার নাম এখানে গ্রহণ করা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিলাম না। সে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখও এত অধিক যে, এখানে তাহাদের তালিকা দেওয়ার স্থানও সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। যাহার কৌতূহল হইবে, তিনি তাহা পেরিপ্লুসে স্বয়ং দেখিয়া লইবেন।[২] গঙ্গা হইতে সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোত সম্বন্ধে পেরিপ্লুসে নানারূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এক প্রকার এই, এক এক কাঠের অতি বৃহৎ নৌকা, এরূপ দুই বৃহৎ নৌকা পাশাপাশি ভাবে যুড়িয়া বাঁধা হইত; যাহাকে চলিত কথায় নৌকার সাংড়া কহে, পেরিপ্লুসেও এই যোড়া-নৌকার নাম সাঙ্গারা (Sangara.) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার অতি বৃহৎ জলযান, বর্ত্তমান জাহাজের ন্যায়। তদ্ভিন্ন পেরিপ্লুসের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ভারতের পূর্ব্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই, দেশীয় জাহাজ সকল উপকূল ভাগে বাণিজ্য করিয়া ফিরিত।[৩]

ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে ইহার অতিরিক্ত আর কোন সংবাদ প্রাচীন বঙ্গ সম্বন্ধে পাওয়া যায় না। ইহার পরে ফাহিয়ান্‌ ও হিউএন্‌ সিয়াং নামক দুইজন চীন-

১। 'কলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্।"—গীতগোবিন্দ। বোধ হয় এই কলিতও, পেরিপ্লুসোক্ত সেই কলিত নামক স্বর্ণমুদ্রা।

২। Mc erindel's Periplus of the Ereethrean, II. 39, তাহা ছাড়া পুস্তকের মধ্যে আরও নানা স্থানে দ্রব্যাদির তালিকা দেওয়া আছে।

৩। "In these marts are found those native vessels for coasting voyages which trade as for as Limurike, and another kind called Sangara, made by fastenning together large vessels formed each of a single timber, and also others called Kolandiophonta, which are of great bulk and employed for voyages to Khruse and the Ganges." Mc. Crindel's Periplus, pp. 142.

পরিব্রাজকের নিকট হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ফাহিয়ান্ খৃষ্টীয় ৩৯৯ শকে চীনদেশ হইতে ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়া, ভ্রমণ-সমাধানান্তে ৪১৪ খৃঃ অব্দে চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তিনি বাঙ্গালা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তিনি ভাগলপুরের অন্তর্গত চম্পানগর হইতে বরাবর গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্ত নগরে আইসেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতটে, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম অপ্রচলিত ছিল না এবং তথায় তিনি বৌদ্ধদিগের ২৪টি সঙ্ঘারাম দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া, সিংহল যাত্রা করেন। চৌদ্দ দিনের দিন সিংহলে উপস্থিত হন। তিনি সিংহলে দুই বৎসর থাকিয়া যবদ্বীপে গমন করেন এবং যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ধর্ম্মেরই প্রাবল্য দেখিতে পান। বৌদ্ধধর্ম্ম তথায় একরূপ অপরিজ্ঞাতই ছিল বলিতে হইবে। তাহার পর, যবদ্বীপ বা যাবা হইতে জাহাজে উঠিয়া চীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে সকল জাহাজ তৎকালে চলাচল করিত, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, যেহেতু ফাহিয়ান্ যে জাহাজে গিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটায় দুইশতাধিক লোক থাকিত এবং যে ব্রাহ্মণের এখন সমুদ্রগমনে জাতি যায়, সেই ব্রাহ্মণ আরোহীও তাহাতে অনেক ছিল।

হিউএন্‌সিয়াং চীনরাজ্যে হোনান্ প্রদেশে চিব্‌লিউ সহরে খৃষ্টীয় ৬০৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ক্রম সময়ে বৌদ্ধযতি সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়া, বিংশ বর্ষ বয়ক্রম সময়ে ভিক্ষু পদবীতে উন্নীত হয়েন। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে সকল তত্ত্ব চীনরাজ্যে অমীমাংসিত বা সন্দেহ সংযুক্ত ছিল, তাহারই মীমাংসা ও সন্দেহ নিরাকরণার্থে এবং বহুতর বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ ও বৌদ্ধতীর্থ সকল দর্শনের নিমিত্তও বটে, হিউএন্‌সিয়াং খৃষ্টীয় ৬২৯ অব্দে চীন হইতে যাত্রা করিয়া, ভারত ভ্রমণান্তর খৃষ্টীয় ৬৪৫ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

হিউএন্‌সিয়াং বাঙ্গালাদেশে আসিয়া তথায় এই কয়টি রাজ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ। কিন্তু কোন রাজ্যের রাজধানীর নাম উল্লেখ করেন নাই।

হিউএন্‌সিয়াং কর্ত্তৃক উক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও প্রাচীন পুণ্ড্রভূমি একই দেশ। অনেকে অনুমান করেন যে মালদহের তিন ক্রোশ ও প্রাচীন গৌড়নগরের নয় ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বস্থিত প্রাচীন পাণ্ডুয়ানামক স্থানে পৌণ্ড্রের রাজধানী ছিল। আমারও তাহাই বোধ হয়। এখানে প্রাচীনভগ্নাবশেষ এখন পর্য্যন্ত অনেক আছে। কিন্তু প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী ইংরেজ কনিংহামের নির্ণয়ে, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত করতোয়াতটে মহাস্থানগড় নামক স্থানে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান ছিল। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অতি ঘন বসতিযুক্ত দেশ। ইহার রাজধানীর চতুঃসীমা প্রায় ২৷৷০ ক্রোশ হইবে এবং এখানে পুষ্করিণী, রাজকীয় অট্টালিকা ও পুষ্পবাটিকা সকল পর পর পর্য্যায়ক্রমে শ্রেণীবদ্ধরূপে শোভা পাইত। হিউএন্‌সিয়াং এখানে কাঁঠাল দেখিয়া ও খাইয়া বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন এবং অতি আহ্লাদের সহিত কাঁঠালের বর্ণনাও লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রদেশে বাঙ্গালার অন্যান্য

বিভাগ অপেক্ষা, কাঁঠাল এখনও অত্যধিক বা অপরিমিত জন্মিয়া থাকে। এক এক গাছে এত কাঁঠালের ফল আমি কোন স্থানে দেখি নাই। হিউএন্‌সিয়াং এখানে ২০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে তিন সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়াছিলেন, কিন্তু দেবমন্দির ও হিন্দুর সংখ্যাই অনেক এবং নগ্ন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীর দলও কম ছিল না। তিনি লোকপ্রকৃতি বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, অধিবাসীরা বিদ্যানুরাগী। [১]

সমতট।—ইহার অবস্থান ও আয়তন পরে বলা হইয়াছে।[২] ইহার তাৎকালিক রাজধানী কোথায় ছিল বলা যায় না, তবে হিউএন্‌সিয়াং এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, এ রাজধানীও চতুঃসীমায় ২॥০ ক্রোশ আয়তন হইবে। তিনি এখানে ৩০টি সঙ্ঘারামে দুই সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাই অনেক ও তাহার মধ্যে নগ্ন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীর দল অতিশয় বেশী। এখানকার লোক সকলও বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য বিশেষ যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়া থাকে।

তাম্রলিপ্তি।—ভূমধ্যে যে সমুদ্রবাহু প্রবেশ করিয়া আছে, অর্থাৎ তদনীন্তন গাঙ্গেয় বদ্বীপের অভ্যন্তরস্থিত যে সমুদ্রশাখা, তাহারই উপকূলভাগ হইতে তাম্রলিপ্তি রাজ্যের অবস্থিতি। এখানকার অধিবাসীরা সাহসী, কষ্টসহ এবং ধনসম্পদ্‌সম্পন্ন। নগরে মণি-মুক্তা ও অত্যাশ্চর্য্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইত। হিউএন্‌সিয়াং এখানে ১০টি সঙ্ঘারামে এক সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত এবং হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীও বহু-সংখ্যক দেখিতে পাইয়াছিলেন।

কর্ণসুবর্ণ।—ইহারও রাজধানীর চতুঃসীমা প্রায় ২॥০ ক্রোশ হইবে। এই প্রদেশে অতিশয় ঘন বসতি। ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। লোক সকল অতিশয় বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যা উপার্জ্জনে অতিশয় যত্ন করিয়া থাকে। তাহারা অতি সৎ ও মধুর প্রকৃতি। হিউএন্‌সিয়াং এখানেও দশটি সঙ্ঘারামে দুই সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। রাজধানীর অল্প দূরে আরও তিনটি বৃহৎ ও সুনির্ম্মিত সঙ্ঘারাম ছিল, তথায় প্রধান প্রধান বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ বাস করিত।

কর্ণসুবর্ণের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নামক পুর কোথায় ছিল, তৎ সম্বন্ধে হিউএন্‌সিয়াংয়ের ইংরেজী অনুবাদক বীল নির্দ্দেশ করেন যে উহা ভাগলপুরের নিকটস্থিত কর্ণগড় নামক স্থান। বলা বাহুল্য যে এ নির্ণয় কোন মতেই প্রামাণিক ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কর্ণসুবর্ণ প্রদেশ ভাগীরথীর পশ্চিম তটস্থিত বঙ্গেরই যে অংশ বিশেষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রীকভূবেত্তা প্তলেমি লিখিয়াছেন যে, গঙ্গারাঢ় প্রদেশে গঙ্গার উপরে কর্ত্তাসিনা (Kartasina) নামে নগর। প্তলেমির ইংরেজী অনুবাদক মাক্রিণ্ডেল [৩] লিখিতেছেন

১। Beal's Buddhist's Records of the Western World, Vol I, Fo kwo ki.

২। অধুনাতন পূর্ব্ববঙ্গের দক্ষিণাংশ, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা। 'পরে বলা হইয়াছে", অর্থাৎ অন্য আর একটি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

৩। Mc Crindel's Ptolemy, pp. 172

যে, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের নিকট করসোণাগড় নামক স্থানই এই প্তলেমির কার্ত্তাসিনা। আমিও এই করসোণাগড়কেই কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম, যদি করসোণাগড় কোথায় তাহা জানিতে পারিতাম। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলা, ভ্রমণকালেও করসোণাগড়ের কথা কোথাও শুনি নাই, অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার পোষ্ট আফিসের ভিলেজ ডিরেক্টরীতেও করসোণাগড়ের নাম কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।[১] তবে ঐ জেলার সাগরদীঘী নামক স্থানের নিকটে অনেক প্রস্তরময় বৌদ্ধকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায় এবং হিউএন্‌সিয়াং কর্ণসুবর্ণের রাজধানীর অনতিদূরস্থিত যে তিনটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের সুনির্ম্মিত ও বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ করেন, সম্ভবতঃ এ গুলি তাহারই ভগ্নাবশেষ হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ রাজধানী যেখানেই হউক, কর্ণসুবর্ণ প্রদেশ ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থিত উত্তরদিক্‌স্থ ভূভাগ। ইহা সম্ভবতঃ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল এবং সেই জন্যই বাণভট্ট কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়কে একদিকে যেমন এক বলিয়াছেন, অন্যদিকে হিউএন্‌সিয়াং তেমনি গৌড়রাজ্যের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই। তাহা হইলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান উপরে যেরূপ নির্ণয় করিলাম, তাহাই যে সম্পূর্ণ ঠিক, তাহা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে। পুণ্ড্রভূমির রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা মালদহের নিকট প্রাচীন পাণ্ডুয়া। সুতরাং পুণ্ড্ররাজ্য ও কর্ণসুবর্ণ সংলগ্ন থাকায়, সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণরাজ স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত রাখিবার জন্যই সীমান্তভাগে গৌড় নামে নগর স্থাপন করেন এবং এই নগরই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইতে থাকায়, তৎকালেই কর্ণসুবর্ণ কখনও কখনও গৌড় নামেও আখ্যাত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

আবার বাণভট্টের কিছু পূর্ব্বেই প্রাদুর্ভূত বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় দেখা যায় যে, তিনি পৌণ্ড্র, গৌড়, বঙ্গ ও বর্দ্ধমান এ সকলের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ পৌণ্ড্র হইতে যে গৌড় পৃথক্, তাহা উপরে যথেষ্ট পরিমাণেই প্রদর্শন করা গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গ যে সেইরূপ গৌড় ও বর্দ্ধমানাদির অতিরিক্ত একটা পৃথক্ রাজ্য ছিল, তাহা বোধ হয় না। বরং ইহাই বোধ হয় যে বঙ্গ, গৌড় ও বর্দ্ধমান, এ উভয়ের সমষ্টিবোধক সাধারণ নাম ছিল। কারণ গৌড় ও বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া তৎকালে বঙ্গ বলিতে যে সংকীর্ণ ভূভাগ বুঝাইত, সেই বঙ্গের যে কখনও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল, তাহা কোন প্রমাণে কোথাও জানিতে পারা যায় না। তবে বর্দ্ধমান ও গৌড় সম্ভবতঃ তখন দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়া থাকিবে। কর্ণসুবর্ণ নামে গৌড় যে তখন পৃথক্ রাজ্য ছিল, তাহা নিশ্চয়। এখন কথা হইতেছে যে বর্দ্ধমানও তদ্রূপ পৃথক্ রাজ্য ছিল কিনা। সম্ভবতঃ ছিল, কারণ

১। ঘটকগ্রন্থে দেখা যায় যে, বারেন্দ্র কায়স্থদের মধ্যে "দে" কায়স্থেরা কাণসোণা গ্রামে বাস করেন। কাণসোণা দে কায়স্থদের এক সমাজ। এই কাণসোণা কোথায়, তাহাও পোষ্টাফিসের Village Directory তে খুঁজিয়া পাইলাম না। বোধ হয় ইহার অবস্থান নিরূপিত হইলে কর্ণসুবর্ণ নামক প্রাচীন নগরের অবস্থান সম্বন্ধে কতকটা কিনারা হইতে পারিত। কাণসোণা যেন কর্ণসুবর্ণেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

তিরুমলয় গিরি হইতে আবিষ্কৃত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর একখানি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, তখন বাঙ্গালায় উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় নামে দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল এবং তখন উত্তররাঢ়ের রাজা ছিলেন মহীপাল ও দক্ষিণরাঢ়ের রাজা ছিলেন রণশূর।[১] বলা বাহুল্য যে কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়ই তৎকালের উত্তররাঢ় ও বর্দ্ধমানাদি দক্ষিণরাঢ়। উক্ত শিলালিপিতে বাঙ্গালার মধ্যে পুণ্ড্রভুক্তি ও বঙ্গালদেশ নামে আরও দুইটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রভুক্তি প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং যে "বঙ্গাল" রাজ্যের নাম উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন বঙ্গ নহে, উহা প্রাচীন সমতট বা এক্ষণে যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বা বাঙ্গাল দেশ বলা।

যাহা হউক, গৌড়নগর ও গৌড়রাজ্যের নাম, আমরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ওদিকে আর কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাই না।[২] উহার প্রাচীনতম উল্লেখ যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে বাণভট্ট ও বরাহমিহির সর্ব্বপ্রাচীন। গ্রীকভূবেত্তা প্তলেমির সময় এই নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিলে, তৎকর্ত্তৃক উল্লিখিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। হইতে পারে এই নগর অনেক পূর্ব্ব হইতেই সংস্থাপিত, কিন্তু বাণভট্ট ও বরাহমিহিরের কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। এই গৌড় এ পর্য্যন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পৃথক্ রাজ্য ও পৃথক্‌রাজ্যের রাজধানীরূপে গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকালে, মহারাজ আদিশূরকে সিংহাসনে আরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়। আদিশূরের সময় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, কিন্তু সে বিচারের স্থান এখানে নহে, প্রবন্ধান্তরে তাহা বিবেচ্য। এখানে যাহা আমার বিশ্বাস, তদনুরূপ "বেদবাণাঙ্গশাকে" অর্থাৎ ৭৩২ খৃঃ অব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ-আনয়নের কাল ধরিয়া, আদিশূরের সময়কে মোটামুটি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্য বলিয়া ধরিলাম। যাহা হউক, এই আদিশূরের সময়েই দেখা যায় যে, গৌড় অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং পূর্ব্বতন কর্ণসুবর্ণ, বর্দ্ধমান, সমতট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আদি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক রাজ্যে পরিণত হইয়া, সমস্ত রাজ্য বাঙ্গালা বা গৌড়রাজ্য আখ্যায় আখ্যায়িত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলতঃ সমস্ত বাঙ্গালার একছত্র নৃপবর্গের মধ্যে মহারাজ আদিশূরকেই আদি ও প্রথম বলিতে হয় এবং তাঁহা হইতেই গৌড়ের সমৃদ্ধি ও সমস্ত বাঙ্গালার গৌড়রাজ্য নাম হয়। মহারাজ আদিশূরের পরেও বাঙ্গালা দেশকে অনেক সময় অনেক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও, সমস্ত বাঙ্গালার যে গৌড় আখ্যা, আদিশূরের

১। বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ টিপ্‌পনীতে। ৬০৯ পৃঃ।

২। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় নোটে লিখিত আছে যে, খৃষ্ট জন্মের ৬০০।৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজগৌড় নামক রাজাকর্ত্তৃক গৌড়নগর স্থাপিত হয়। কথাটা শুনিতে অতি কর্ণসুখকর তাহাতে সন্দেহ নাই, যেহেতু স্বদেশের প্রাচীনত্বে কাহার না আনন্দ উপস্থিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কথাটা অপ্রামাণিক। ইতিহাসে বহুতর গৌড়নামক স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা, প্রাচীন শ্রাবস্তির নিকটস্থ গৌড়, কৌশাম্বীর নিকটস্থ গৌড়, বেরার রাজ্যের নিকটস্থ গৌড় ইত্যাদি। কিন্তু এ সকলের মধ্যে বাঙ্গালার গৌড়ই ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করে, এবং গৌড় ও গৌড়রাজ্য বলিলে, সাধারণতঃ বাঙ্গালারই রাজধানী ও বাঙ্গালারাজ্য বুঝাইয়া থাকে।

সময় হইয়াছিল, তাহা তাহার পর হইতে যতদিন পর্য্যন্ত গৌড় নগরের অস্তিত্ব ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আর কখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথি আছে। ময়ূরভট্ট ধর্ম্মায়ণের আদি কবি। তিনিও আবার হাকন্দপুরাণ অনুসারে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ময়ূরভট্টের পর খেলারামেরও ধর্ম্মমঙ্গলের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। খেলারামের পর রূপরাম ও ঘনরাম। ইহারা ভিন্ন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ধর্ম্মমঙ্গলের পুস্তক লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতেও আবার বৈষ্ণব গ্রন্থ ও রামায়ণ মহাভারতাদির জন্য বঙ্গীয় পাঠককুলের যত আগ্রহ ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথির জন্য তত নহে; কারণ বঙ্গবাসীর ধর্ম্মমঙ্গল প্রচার করিবার পূর্ব্বে শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্মঠাকুরের নামও জানা ছিল না। এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই পাঁচ ছয় খানি ধর্ম্মায়ণ পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এরূপ অনুসন্ধান চলিতে থাকিলে আরও অনেক পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এক এক খানি ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথি অতিশয় বিস্তারিত। উহার গান বার দিনে শেষ হয়। ধর্ম্মঠাকুরের গান গাহিয়া আজিও অনেকে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে এবং ধর্ম্মঠাকুরের গান শুনিয়া নিম্ন শ্রেণীর বহু লক্ষ লোক কৃতার্থ হইতেছে। অনেক কবি এই গান লিখিবার জন্য মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়াছেন। মাণিকগাঙ্গুলি বাঙ্গাল-মেলের লোক, বাঙ্গাল-মেল রাঢ়ীশ্রেণীর ছত্রিশ মেলের একটি, সুতরাং তিনি সুব্রাহ্মণ, ঘনরামের মত চণ্ডালের ব্রাহ্মণ নহেন। মাণিকের বাড়ী বেলডিহা, রাঢ়ে। তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে তুঙ্গাড়ী যাইতেছেন, পথে ব্রাহ্মণবেশে ধর্ম্মঠাকুর দেখা দিলেন। ধর্ম্মঠাকুর দেখিলেন এমন সুব্রাহ্মণকে দিয়া যদি গান লিখাইয়া লইতে পারি, তা'হ'লে ভদ্রলোক মহলেও আমার একটু পসার হয়। তিনি নাছোড়বন্দা হইয়া মাণিককে ধরিলেন;—

"নিজ বীজ মন্ত্র লিখিয়া দিলেন নকল। ইহা দেখি কবিতা রচিবে অবিকল॥
গায়েন হবেক তোর চতুর্থ সোদর। জগত ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর॥"

শুনিয়া মাণিকতো অবাক্! ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ছেলে, একজন গান রচিবে, আর একজন গাহিবে? কি সর্ব্বনাশ!!! তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনের ভাব তাঁহার নিজের কথাতেই ব্যক্ত করিব ;—

"এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ। জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবে দেশে দেশে। সুপক্ষের সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাঁসে॥"

ধর্ম্মঠাকুর তবু ছাড়িলেন না, লোভ দেখাইয়া আত্মীয়তা করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন ;—

"জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি। তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন। ময়ূরভট্টের কথা মন দিয়া শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া। অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া॥"

মাণিকচন্দ্র এ টোপটি ছাড়িতে পারিলেন না। স্বীকার পাইলেন। জানা গেল, ধর্ম্ম-ঠাকুরের গান লিখিয়া ময়ূরভট্টতো বৈকুণ্ঠে আছেনই ; মাণিকচন্দ্রও তথায় যাইবেন ; হয়তো রামচন্দ্র কবিও যাইবেন, ঘনরাম খেলারাম রূপরামের তো কথাই নাই।

এ ধর্ম্মঠাকুরটি কে? দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার উপাধি রায়। বোড়াল হইতে যিনি আমরক্তের ঔষধ দেন তাঁহার নাম ক্ষুদি রায়, মেমারির পশ্চিমে যিনি পিত্তদোষের ঔষধ দেন তাঁহার নাম অচল রায়, মাণিক গাঙ্গুলি মহাশয়ের যিনি মুরুব্বি হইয়াছিলেন তাঁহার নাম বাঁকুড়া রায়। রায়শব্দটি সংস্কৃত রাজশব্দ ভাঙ্গা। ধর্ম্মঠাকুর অনেক জায়গায় রাজ উপাধিতে বিশোভিত। ঘেঁটুগাছিতে তিনি ধর্ম্মরাজ, নদীয়ার নিকট জামালপুরে তিনি বুড়ো রাজ। সময়ে সময়ে তিনি সিংহও হইয়া থাকেন। মাণিকের পুঁথি হইতে স্থানভেদে তাঁহার নামভেদ দেখাইতেছি—

"প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর। স্থানে স্থানে মূর্ত্তিভেদ মহিমা বিস্তর॥
বেলডিহার বাঁকুড়ারায়ে বন্দি একমনে। অসংখ্য প্রণতি শীতলসিংহের চরণে॥
ফুল্লরের ফতেসিং বৈতলের বাঁকুড়ারায়। শুদ্ধভাবে বন্দি দোহে নত হয়ে কায়॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্ম্মে বন্দিয়া সাদরে। শ্যামবাজারের দলুরায়ে দিয়ে জয় জয় কারে॥
দেপুরে জগৎরায়ে যোড় করি কর। গোপালপুরের কাঁকড়াবিছায় বন্দি তার পর॥
সিয়াসের কালাচাঁদে ঞিদাসের বাঁকুড়ারায়। বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায়॥
গাপুরের স্বরূপনারাণ স্বর্ণসিংহাসনে। বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপনারাণে॥
পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাঁহায়। বড়ুজা গ্রামের বন্দিব মোহনরায়॥
গুছুড়া গ্রামের বন্দি শীতলনারাণে। আলগুড়চিন্নার খুদিরায়ে বন্দি সাবধানে॥
আকুটিকুল্লার মাল্লার ধর্ম্মের করিয়া স্তবন। বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ॥
জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিল্যা সহিত। জাজপুরে দেহারে বন্দি দার্ঢ্য করি চিত॥"

এত গেল দক্ষিণরাঢ়ের। উত্তররাঢ়েও এইরূপ গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মঠাকুর আছেন।

তাঁহার নামভেদও অসংখ্য। নিজ কলিকাতায় কিছু কম দশ বারটী ধর্ম্মঠাকুর আছেন, তন্মধ্যে যাঁহার নামে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, তাঁহার জাঁক কিছু বেশী। বলরামদের ষ্ট্রীটে একটি সরু গলি মধ্যে খাসা মন্দির আছে, মন্দিরের মাথায় একটী খোদিত লিপিও আছে, মন্দিরটি একজন কায়স্থের দেওয়া।

ধর্ম্মঠাকুরকে কোন কোন স্থলে বিষ্ণুরূপে পূজা করে, তুলসী দেয়, বলিদান করে না। কোথাও শিবরূপে পূজা করে, বিল্বপত্র দেয়। কোথাও বা ছাগবলি, মেষবলিও দেয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুরগী শূকর বলিই হয়। ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিত—কোথাও কৈবর্ত্ত, কোথাও দুলে, কোথ'ও বাগ্দী, কোথাও আগুরি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ডোম বা পোদ। শেষোক্ত দুই জাতি এখনও ব্রাহ্মণ লয় নাই, এখনও তাহারা আপনাদের জাতীয় পণ্ডিত দিয়া সব কাজ করায়। ধর্ম্মঠাকুর ইহাদের নিজস্ব দেবতা।

এই ধর্ম্মঠাকুর কে ? যে কোন ধর্ম্মায়ণ পাঠ কর, দেখিবে, তিনি ইচ্ছায় সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁহার সৃষ্টির অংশ মাত্র। কোন পুস্তকে তাঁহার নাম আদ্য, কোন পুস্তকে তাঁহার নাম অনাদ্য। ঘনরামের পুস্তকে দেখিতে পাই, তাঁহার বার্ম্মতি গাওয়া হইতেছে। কেহ কেহ বার্ম্মতি ভাঙ্গিয়া বারমতি করিয়াছেন। অর্থ করিয়াছেন, বার দিনে গান হয় বলিয়া উহার নাম বার্ম্মতি। কিন্তু বাস্তবিক কথাটি বার্ম্মতি, ঘনরাম দুই এক জায়গায় ব্রহ্মতি পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন।

"এতক্ষণে ধর্ম্মের বার্ম্মতি হইল সায়।" ইহার অর্থ যদি এরূপ করা যায় তাহা হইলে সঙ্গত হয়, এতক্ষণে ধর্ম্মকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা সফল হইল অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মায়ণ লিখিয়া কবি প্রমাণ করিলেন যে ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উপর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মস্বরূপ। ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথি পড়িতে গেলেই একজন লোকের নাম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম রমাই পণ্ডিত। ঘনরামের মতে ইনি জাতিতে বাইতি ময়নাগড়ের কিছু দূরে ইনি ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিতেন। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী ইঁহারই আশ্রমে শালে ভর দিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মপূজার আদি গুরু। ইঁহার লিখিত কোন গ্রন্থাদি পাইতে পারিলে ধর্ম্মতত্ত্ব ভালরূপে বুঝা যাইতে পারিবে, এই আশয়ে ময়নাগড়ে সোসাইটীর ভ্রমণকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী অতি হৃদয়গ্রাহী বলিয়া পরিশিষ্টরূপে এই প্রবন্ধে সংযোজিত করিলাম।

ময়নাগড়ে রমাই পণ্ডিতের কোন পুস্তক পাইলাম না ; কিন্তু যাহা পাইলাম তাহাতে আশা ও আগ্রহ আরও বৃদ্ধি হইল। জানিতে পারিলাম, যে রমাই পণ্ডিতের পদ্ধতি লইয়া অনেক স্থলে ধর্ম্মের পূজা হয়। পদ্ধতি ময়নাগড়ে পাওয়া গেল না, কিন্তু কয়েকটি বাঙ্গালা মন্ত্র পাওয়া গেল। সে গুলির ভাষা অনেক স্থলে অতি প্রাচীন, অনেক স্থলে বোধ হয় যেন পরবর্ত্তী লোকে কিছু কিছু বদলাইয়াছে, দুই এক স্থলে অর্থবোধই হইল না। কাব্যতীর্থ মহাশয় যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি লিখিয়া আনিয়াছেন আমরাও তেমনি উদ্ধৃত করিলাম।

ধ্যানের মন্ত্র।

"বর্ণ যুগপতি সর্ব্ব গুণধাম। শুন শুন সর্ব্বজন যুগের বিধান॥
যে দিনেতে ভৃঙ্গীভার আছিল মণ্ডলে। অন্ত বাসুকী নাগের জন্ম সেই কালে॥
ষোড় করিয়া নাগে জিজ্ঞাসে বারতা। এক মুণ্ডে ছিল তার সহস্রেক মাথা॥
নির্ম্মাইলেন প্রেম হংসের বাতাসে। আসন করিয়া প্রভু মনের হরিষে॥
জলেতে ডুবিল হংস আহার কারণে। কিছু না পাইয়া উঠে প্রভু সন্নিধানে॥
গরল মুখের বিন্দু থাকে মস্তকের দেশে।
নাগের নিশ্বাস কৈল ভাঁটায় জোয়ার। রাত্রদিন সঞ্চিলেন অনার দয়িতার॥
তাহার উপরে রুধির প্রকাশ। দ্বিজ মূরতি কৈল আড়ম্ব কৈলাস॥
যোগেতে মঙ্গল স্বজিলেন ভঙ্গীভার। অনন্ত কোটীদিগের কে করে বিচার॥
কে করিতে পারে প্রভু আদ্যের জ্ঞেয়ান। ঘটে আসি পূজা লও স্বরূপনারাণ॥
হীন নম্র জন্ম মোর জাতির নাহি স্থিতি। লহ লহ জল পুষ্প যুগের যুগপতি॥
গাছের বাকল নহি পত্রে নহি ছায়া। আগে আগে নিরঞ্জন নির্ম্মাইলেন কায়া॥
তাঁহার ভকতে প্রভু করিলেন তার। বিষ্ণুর কারণে ভ্রমেণ নৈরাকার॥
আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার। তিনরূপ হইলেন ভ্রমিলেন সংসার॥
তবেতো ভ্রমণ কৈল পশ্চিম মূরতি। দক্ষিণে ভ্রমণ কৈল পূর্ব্বে আইলেন স্থিতি॥
অঙ্গে হাত বুলাইতে স্বজিলেন পার্ব্বতী। দেখিতে সুন্দররূপ মনোহর জ্যোতি॥
টলিল ধর্ম্মের বিন্দু দেবী নিল করে। ধর্ম্ম সমরিয়া মাতা পূরিল উদরে॥
তিল প্রমাণ হৈয়া গড়িল বসুমতী। দিনে দিনে পার্ব্বতীর বাড়িল উদর॥
চলিতে শকতি নাহি যুড়ে দুই কর। কে জন্মিল বলিয়া বলেন যজ্ঞেশ্বর॥
ব্রহ্মতালু দিয়া হৈল ব্রহ্মের জনম। ব্রহ্মজালে বিষ্ণুর দহিছে তখন॥
ক্ষীণকটি কুপিল কুমণ্ডল লৈয়া। হাতে বিষ্ণুর জন্ম হৈল কর্ণমূল দিয়া॥
মনেতে বিচারি ত্রিদশেশ্বর। জীবত্রি শীতল কৈল ভূমিষ্ঠ মহেশ্বর॥
তিনবার জনমিল এইতো উদরে। অপার মহিমা লীলা কে বুঝিতে পারে॥
ধর্ম্মের মঙ্গল গীত পণ্ডিত রমাই গান। একল রমাই দ্বিজ শয়ে লব ধান॥"

ইহার দুই এক জায়গায় হেঁয়ালির মত বোধ হয়। প্রাচীনভাষা অতি দুর্ব্বোধ, এই নিমিত্তই বোধ হয় ঐরূপ।

ঠাকুরের স্নানের মন্ত্রটী এই——

স্নানের মন্ত্র—

"ওঁ আরতি ভারতি গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরয্বাং গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা কৌশিকী॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সদা স্বয় মনোভৃত্বা ভৃঙ্গারৈ॥

জল লইয়া স্নান করেন ধর্ম্ম আগম জলে। অখণ্ড তুলসীপত্র দিয়া পদতলে॥
অভিগঙ্গা চূড়ামণি করেন ভকতি। তুরিতে যে স্নান লেন গোঁসাঞি যুবতী॥
ঢোলে সমুদ্র এল গোসাঞি ক্ষীরনদী। গঙ্গা যমুনা এল বসন্ন বদরী॥
শোভাধাত্রীগণ এল হোয়ে এক স্থানে। স্নান করেন প্রভু ভগবানে॥
স্নান আচলিত গীত পণ্ডিত রামএ গান। একল রামএ দ্বিজ শয়ে লব ধান॥"

রমাই'র খাঁটি লেখা কিছু পাওয়া গেল—সুতরাং রমাই'র একখানি ধর্ম্মপূজার যে পদ্ধতি আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। রমাই'র পুস্তক অন্বেষণ করিবার জন্য সোসাইটীর অন্যতম ভ্রমণকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থকে ঘাঁটাল অঞ্চলে পাঠাইলাম। তিনি যে সকল তত্ত্ব আনিলেন, তাহারও মধ্যে মধ্যে রমাই পণ্ডিতের নাম পাওয়া গেল, তিনিও মুখে মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন—

"ওঁ ষোল সহস্র গতি লয়ে শ্রীরমাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করিবারে যান। সেই পথ দিয়া ঋষি মুনি মার্কণ্ড যান ধূপে ধুনায় ধর্ম্মঘর দেখিবারে পান॥ কহেন মার্কণ্ড মুনি, শুন হে কপিল মুনি, কিসের শুনি জয় জয় কার। বলে মিথ্যাই আলম চাঁদা, মিথ্যাই বাজনা বাজে মিথ্যাই ধর্ম্ম উজন। ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে মুনি মার্কণ্ড যান জ্বর বলি বোধ হল ঋষি মুনির গায়। অষ্টকুট চেলি শূল ব্যাধি মুনি মার্কণ্ড স্থান। আদ্যের ধবল দিল মুনির মুখেতে জাঁতিয়ে রমাই পণ্ডিত বলে মধুর পুষ্কর্ণি দিবে পৃষ্ঠের জাঙ্গাল। মধু মাংসে এ ঘর করিবে এককার॥ গতি ভকতের উচ্ছিষ্ট মুনি কুড়ায়ে খাবে। তবে তো মার্কণ্ড মুনি অমর পদ পাবে॥

ঘাঁটাল হইতেও সংবাদ আসিল, রমাই পণ্ডিতই ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি করিয়াছেন। সে অঞ্চলের ধর্ম্মপূজার ধ্যানের মন্ত্র এই ;—

"স্বর্গ মর্ত্ত্য না ছিল না ছিল যে পাতাল। উৎপত্তি না ছিল যম কাল॥ দেবা দেবী গুরু শিষ্য কেহ না ছিল। নীল অনিল ধর্ম্ম জন্ম যে লভিল॥ ধর্ম্মকে বাপে না দিলেন জন্ম। মায়ে না দিলেন উদরে ঠাঁই। শূন্যভরে জন্মিলেন অনাদ্য গোসাঞি॥ নিরঞ্জন নৈরাকার বুঝিতে না পারি। আপনি করিলেন প্রভু আপনার কায়া। হস্তপদ স্কন্ধ চক্ষু নিরঞ্জনের হইল। নয়ন মিলাইয়া তিনি দৃষ্টি মিলাইল॥ দেখিলেন নবখণ্ড ব্রহ্মা অগ্নিময়। তস্মাৎ দেব নিরঞ্জনায় নম॥"

ইহা পদ্য না গদ্য! ছেলা বেলা ঠানদিদির মুখে এইরূপ না পদ্য না গদ্য না মিল না অমিল ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিতাম, একি সেই জাতীয় রচনা?

পরিশেষে কুরাণ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের যত্নে ও পরিশ্রমে রমাই পণ্ডিত কৃত পদ্ধতির একখানি পুঁথি পাইয়াছি, অশিক্ষিত ডোম বা পোদ পণ্ডিতের নিকট হইতে নকল করিবার জন্য ও পুস্তক লইতে অনেক সাধ্য সাধনা ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মায়ণ পুস্তকে যেমন নানা দেবদেবীর বন্দনা আছে, রমাই'র পুস্তকে তাহার কিছুই নাই, তাহাতে বন্দনাই নাই। অন্য ধর্ম্মায়ণ পুঁথিগুলি হয় ব্রাহ্মণের

লেখা, না হয় ইদানীন্তন লোকের লেখা, সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতাও আছেন, কিন্তু রমাই পণ্ডিত খাঁটি ধর্ম্মপণ্ডিত ধর্ম্ম ছাড়া, তিনি আর কিছু জানেন না, তাই তাঁহার ধর্ম্মায়ণে অন্য দেব দেবীর বন্দনা নাই। তাঁহার পদ্ধতির এক অংশ পুরাণের ন্যায় সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্ণ, তাহার আরম্ভ এই—

"শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নম।

শূন্যপুরাণ লিখ্যতে—

নাই রেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিহ্ন। রবি শশী নাই ছিল নাই রাত্রি দিন॥
নাই ছিল জল স্থল নাই ছিল আকাশ। মেরু মন্দার না ছিল না কৈলাস॥
দেবতা দেহারা নাই পুজিবার দেহ। মহাশূন্য মধ্যে প্রভুর আর আছে কেহ॥
ঋষি যে তপস্বী নাই নাহিক ব্রাহ্মণ। পর্ব্বত পাহাড় নাই নাহিক স্থাবর জঙ্গম॥
পুণ্য স্থল নাই ছিল নাই গঙ্গা জল। সাগর সঙ্গম নাই দেবতা সকল॥
নাই সৃষ্টি ছিল আর নাই সুর নর। ব্রহ্মা বিষ্ণু না ছিল না ছিল আধার॥
বার ব্রত না ছিল ঋষি যে তপসী। তীর্থস্থল নাহি ছিল গয়া বারাণসী॥
প্রয়াগ মাধব নাই কি করি বিচার। স্বর্গ মর্ত্ত্য নাই ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দশদিক্‌পাল নাই মেঘ তারাগণ। আয়ু মৃত্যু নাই ছিল যমের তাড়ন॥
চারি বেদ নাই ছিল শাস্ত্রের বিচার। গুপ্ত বেদ করিলেন প্রভু কর্‌তার॥
শ্রীধর্ম্মচরণারবিন্দ করিয়া প্রণতি। শ্রীযুত রমাই কয় শুনরে ভারতী॥"

তবেই তো দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মঠাকুর যজ্ঞ নিন্দা করেন। এই কথা বলিয়াছিল বলিয়া মার্কণ্ডেয় মুনির কুষ্ঠ হইল। ধর্ম্মঠাকুরের নাম আদ্য, তিনি শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন। শূন্য হইতে সৃষ্টি তো আর কোন ঠাকুর করেন নাই। শূন্যও তো হিন্দুদিগের মত নয়। মনু বলিয়াছেন;—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।"

"নাসীৎ" এমন কথা তো বলেন নাই। তবে এই ঘোর শূন্যবাদী যজ্ঞনিন্দাকারী 'ললিত অবতার' কে? ইহাঁর (ভকৎ) ভক্তগণ সবইতো অনাচরণীয় জাতি। হিন্দুরা—ব্রাহ্মণেরা যাহাদের জল খান, এমন জাতি নিতান্ত গরজে—মানেতে না পড়িলে ধর্ম্মঠাকুরের কাছে যান না। ধর্ম্মায়ণের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মঠাকুরের ভকতে হিন্দুদিগের যথেষ্ট দ্বেষও করে, হিন্দু নাম ধরিয়া গালি দেয়। বোধ হয়, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে ইহারাই ডাকিয়া আনিয়াছিল। রমাই পণ্ডিতের পুঁথিতে শ্রীনিরঞ্জনের রুস্মা নামে একটি অধ্যায় আছে সেটি ছোট সকল স্থলে অর্থবোধ হয় না, কিন্তু যাহা হয়, তাহাতেই ভকতগণের হিন্দুদ্বেষ ও যবনমৈত্রী প্রকাশ পায়। সে অধ্যায়টি কোন রূপ সংশোধন না করিয়া অবিকল উঠাইয়া দিলাম।

শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা।

"জাজপুর পুর বাদি, সোলসর ঘর বেদি, বেদি লয় কর্ণয় যুন।
দক্ষিণ্যা মাগিতে যায়, যার ঘরে নাঞি পায়, সাঁপ দিয়া পড়ায় ভুবন॥
মালদহে নাগে কর দিনয় কর্ণযুন॥

দক্ষিণা মাগিতে যায়, যার ঘরে নাঞি পায়, সাঁপ দিয়া পড়ায় ভুবন।
মালদহে নাগে কর, না চিনে আপন পর, জালের নাঞিক দিশপাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হয়্যা জোড়, সধর্ম্মিরে করএ বিনাশ॥
বেদে করে উচ্চারণ, বেরযায় অগ্নি ঘনে ঘন, দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম, সভে বলে রাখ ধর্ম্ম, তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে বিষ্টি সংহারণ, এ বড় হৈইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম্ম, মায়াতে হইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হৈল্যা যবনরূপি, মাথায়েতে কাল টুপি, হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম।
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্যা ভেস্ত অবতার, মুখেতে বলেন দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ, সবে হয়্যা একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল্যা মহাঁমদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর, আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি।
গণেশ হইয়া গাজি, কার্ত্তিক হৈইল্য কাজি, ফকির হইল্য যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হৈইল্যা শেক, পুরন্দর হইল মোলনা।
চন্দ্র সূর্য্য-আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে, সবে মেলি বাজায় বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি, তিহঁ হৈল্যা হায়া বিবি, পদ্মাবতি হল্য বিবিনুর।
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে এক মন, প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে, পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়, রামাঞি পণ্ডিত গায়, ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥"

ধর্ম্মরাজ যবন হইয়া আইলেন ব্রাহ্মণের উপদ্রব নিবারণের জন্য। এ সকল কথার অর্থ কি? এই যে জাজপুরের নাম হইতেছে, এ কোন জাজপুর? উড়িষ্যার রাজধানী জাজপুর নহে, কারণ উড়িষ্যায় ধর্ম্মঠাকুরের বড় একটা প্রাদুর্ভাব নাই। ইহা মাণিকগাঙ্গুলির জাজপুর, এখানে ধর্ম্মের নাম দেহার, ইহা বঙ্গে,—রাঢ়ে। জাজপুর অঞ্চলে যখন মুসলমান আসে, তখন ধর্ম্মঠাকুরের ভকতেরা তাহাদের সঙ্গে মিশেন ও মিশিয়া ব্রাহ্মণদের জব্দ করেন।

ধর্ম্মঠাকুরের সিংহলে বড় সম্মান ছিল, এ কথা আমরা রমাই পণ্ডিতের পুস্তকে দেখিতে পাই। যথা—

"আদ্য ভূপতি নিমাব দেহারা ধর্ম্ম যথা আদি স্থান। নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী।
শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান॥"

ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান অনেক জায়গায় সংস্কৃতে পাইয়াছি, তাহার মধ্যে একটি এই—

"ওঁ যস্যান্তং নাদি মধ্যং ন চ করপদং ভয়ং নাস্তি কায়া নির্নাদং।
নাকারং নাধিরূপং সকলদলগতং ন চ ভয়মরণং
যস্য যোগিনং সংকল্পহীনং স্বর্ণমূর্ত্তিনিরঞ্জনায় নমঃ॥"

এ মন্ত্রটি আমরা খাঁটালের নিকট বীরসিংহা গ্রামের ধর্ম্মঠাকুরের জনৈক পণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি। আর একটী যথা—

"যস্যান্তো নাদি মধ্যো নচ করচরণং নাস্তি কায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম ঝ যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনগতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্
তত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ॥"

এ মন্ত্রটী আমরা সুঞ্রাগাছির ধর্ম্মপণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় জাতিতে ময়রা, উচ্চারণ বড় অপরিষ্কার। এ ধর্ম্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। ইনি উচ্চ সিংহাসনের উপরে বসিয়া আছেন। ইঁহার গায়ে পিতলের টোপ। কিন্তু সে টোপ নিতান্ত কাছে না গেলে দেখা যায় না। আর একটী মন্ত্র যথা—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচকরচরণৌ নাস্তি কায়ো নো নাদঃ
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্ব্বলোকৈকনাথং
ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং॥"

এ ধ্যানটি পূর্ব্বোক্ত দুইটির একটি ভাল সংস্করণ মাত্র। ইহা ভাটপাড়ার ন্যায়শাস্ত্রধ্যায়ী একটি পড়ুয়ার নিকট পাইয়াছি। তাঁহার নিবাস রাজঘাটের সন্নিকট। নিজের মানত থাকিলে পূজা করিতে হয় বলিয়া তিনি এইটি মুখস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশে ধর্ম্মঠাকুরের দুই রকম পুরোহিত থাকে, ছোট লোক পুরোহিতেরাই প্রায় পূজা করে। ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে এবং সজ্জাতির মানতের জন্য পূজা করিয়া থাকেন। বোধ হয় সে কালের বাঙ্গালায় অথবা কোনরূপ প্রাকৃত ভাষায় এ ধ্যানটি আগে রচিত হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু যতই চেষ্টা করিতে চান, ব্যাকরণাশুদ্ধির দায় কিছুতেই এড়ান যায় না। এ ঠাকুরটি শূন্যমূর্ত্তি। শূন্যমূর্ত্তি হয় কি করিয়া। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, "অস্তি নাস্তি তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যরূপং" একি সেই শূন্যরূপ না কি ?

ময়নাগড় হইতে সংবাদ পাইলাম যে বহু পূর্ব্বে তথায় একটি পুষ্করিণীর মধ্য হইতে ধর্ম্ম, শঙ্খ ও একখানি পাথর উঠিয়াছিল। পাথর ও শঙ্খ কেহ কখন দেখে নাই, ধর্ম্ম সবাই দেখিতেছে। একি ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব না কি ? কালক্রমে বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন, সঙ্ঘ শঙ্খ হইয়াছেন ও পরে লোপ পাইয়াছেন।

ধর্ম্মঠাকুর বঙ্গদেশের এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি যেখানে বর্ত্তমান, সেইখানে অনাচরণীয় জাতির সংখ্যা অধিক এবং মুসলমান কম। রাঢ়ে এই ভাব, দক্ষিণেও এই ভাব; কিন্তু পূর্ব্ব ও মধ্য বাঙ্গালায় ভাব স্বতন্ত্র, সেখানে মুসলমান অধিক অনাচরণীয় জাতি কম। সেখানে ধর্ম্মই যবনরূপী হইয়া আছেন না কি?

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল আগাগোড়াই পড় ব্রাহ্মণসজ্জনের নাম পাইবে না, কোথাও বারুই রাজা, কোথাও বা অন্য ছোটলোক রাজা। গৌড়ের রাজার কোন জাতি তাহা কেহ বলে না। তাঁহার শ্যালীপো লাউসেনেরও কোন জাতি, তাহাও কেহ বলে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থের কোন প্রাধান্যই এ পুস্তকে নাই।

ধর্ম্মঠাকুরের আরও অনেক কথা আছে। আমরা ক্রমে বলিব এবং এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে, সকল পুস্তকও সংগৃহীত হয় নাই। যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ। বৌদ্ধরা তো আপনাদিগকে কখন বৌদ্ধ বলিত না, তাহারা আপন ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিত। সেই ধর্ম্ম নামটাই বজায় রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের উপাস্য বস্তু তিনটী বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। সঙ্ঘ অর্থে সন্ন্যাসীর দল। কালে বুদ্ধদেব লোপ পাইয়াছেন। ধর্ম্ম বজায় আছেন। পাকা বারমেসে সন্ন্যাসীর দল লোপ পাইয়াছে, গাজনী সন্ন্যাসীরদল হইয়াছে। ইহারা দশ পোনের দিনের জন্য সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী হইলে বারমেসে সন্ন্যাসীর যেরূপ মান্য ছিল, ইহাদেরও সেইরূপ মান্য হয়। ইহারা হবিষ্য করে ও নিজ হস্তে পূজা পাঠ করে। এ সকল ব্যাপারই লুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের কথা মনে করিয়া দেয়। তার পর ধর্ম্মঠাকুরের সিংহলে খাতির বড় অধিক, তিনি যজ্ঞ নিন্দা করেন; এ দুইটি কথাতেও তাঁহাকে বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্নের অন্যতম রত্ন বলিয়া মনে হয়। রমাই পণ্ডিত এক জায়গায় তাঁহাকে ললিত অবতার বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবনচরিত ললিতবিস্তর নামক গ্রন্থে ললিত শব্দটি কেন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ললিতবিস্তরের ললিত আর ললিত অবতারের ললিত একই অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর আর এক কথা আছে, বৌদ্ধদিগের সর্ব্বোচ্চ দর্শনের নাম শূন্যবাদ। প্রজ্ঞাপারমিতাদিগ্রন্থগুলি শূন্যতা ও মহাশূন্যতার বিচারেই প্রবৃত্ত। নির্ব্বাণ-লাভ শব্দের অর্থ শূন্য হইয়া যাওয়া। হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রধান মত ভেদ এই যে হিন্দুরা বলেন "সদেব ইদমগ্র আসীৎ"; বৌদ্ধেরা বলেন, 'অসতঃ সৎ জায়তে।' আমাদের ধর্ম্মঠাকুর নিজে শূন্যমূর্ত্তি ও শূন্য হইতেই সৃষ্টি করেন; সুতরাং আমাদের ধর্ম্মপূজার ব্যাপার যেরূপেই পরীক্ষা করিয়া দেখি, ঘুরিয়া ফিরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখনও কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিবার সময় হয় নাই।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পরিশিষ্ট।

—০—

ময়নাগড়।

যে লাউসেন হইতে ধর্ম্মঠাকুরের প্রচার সমস্ত ধর্ম্মায়ণ একবাক্যে স্বীকার করেন, সেই লাউসেনের রাজধানী ধর্ম্মের প্রথমোৎপত্তি স্থল ময়নাগড় তমলুক হইতে ১৩। ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিম দিকে অবস্থিত। স্থানটী একটি জঙ্গলময় ক্ষুদ্রতম গ্রাম, ভদ্রলোকের বসবাসতো নাইই, ইতরলোকের সংখ্যাও খুব কম। তমলুক হইতে যাইবার পথও নাই, কোন রকমে মাঠ ঘাট দিয়া যাইতে হয়। ময়নাগড়ে অন্য আর কিছুই নাই, থাকিবার মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত প্রাচীন গড় আছে। কিংবদন্তী এই গড়ই রাজা লাউসেন কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত। গড়টি এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল, তাহার চারিপাশে পরিখা আছে, তাহারও এখন দুরবস্থা, মধ্যে মধ্যে চর হইয়াছে, কোথাও বা সমভূম হইয়াছে। আসল কথা এখন আর কিছুই নাই, কেবল অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি আছে। তাই আজও লোকে ইহাকে ময়নাগড় বলে ও অতীতের সুখ সমৃদ্ধি মনে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। সেই পরিখায় পরিবেষ্টিত একটি সুপ্রশস্ত প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী আছে (লোকে উহাকেই গড় বলে।) বাড়ীটির অবস্থাও অতি শোচনীয়। ময়নাগড়ে রাজবাড়ী ভিন্ন অথবা রাজগড় ভিন্ন আর বাড়ী নাই। এখন এ বাড়ীর অধিকারী রাজাদের নাম শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ বাহুবলেন্দ্র, সচ্চিদানন্দ বাহুবলেন্দ্র ও পূর্ণানন্দ বাহুবলেন্দ্র, ইঁহারা তিন সহোদর। ইঁহারা লাউসেনের বংশীয় নহেন। ইঁহাদের আদি-পুরুষের নাম গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলেন্দ্র, আদি নিবাস বালিসিতা, পরে শিলদা (দুইটীই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত।) গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলেন্দ্র ময়নায় আসিয়া কি এক অপরিস্ফুট সূত্রে রাজত্ব করেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরাই এখানকার রাজা। ইঁহাদের বিস্তৃত ইতিহাস ইঁহাদের কাছে আছে। এবং কতক Modern History of Rajas & Zemindars, by Loknath Ghosh Part II গ্রন্থের ৩২৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই বাড়ীতে লাউসেনের একটি আসন আছে, কিংবদন্তী এই আসনে বসিয়া রাজা লাউসেন ইষ্টদেবীর পূজাদি করিতেন। আসনটি ইষ্টকনির্ম্মিত চতুষ্কোণ একটী বেদী মাত্র, এখন উহা ভগ্ন ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কিন্তু পরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিশেষরূপে সম্মানিত। রাজবাড়ীতে লাউসেন-প্রতিষ্ঠিত এক কালীমূর্ত্তি আছেন। দেবী প্রস্তরময়ী, মাপে তিন পোয়া মাত্র, তাঁহার চারিটী হস্ত। তিনি যে মন্দিরে থাকেন, সে স্থানে একই মন্দিরে একটি মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি এখন ভগ্নপ্রায়, মন্দিরের আকার অনেকটা চাল দেওয়া একচুড়া থেবড়া বড় রথের মত। মন্দিরটী বড়, দেয়ালে ইটের উপর নানাবিধ খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতি কারুকার্য্য।—দেবীর নাম রঙ্কিণী। মহাদেবের নাম লোকেশ্বর (সম্ভবতঃ লোকেশ্বর।) দেবদেবীর নিত্য পূজা হইয়া থাকে। পূজা কিন্তু সাত্ত্বিক,

কোনকালে বলিদান হয় না। গড়ের একদিকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে, তথায় ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্ম্মঠাকুর কিন্তু সেখানে থাকিতে পান না, তিনি গড় হইতে প্রায় দুইক্রোশ উত্তরে বৃন্দাবন-চক নামক স্থানে থাকেন। কেবল বৎসরে একদিন ভাদ্র সংক্রান্তিতে সন্ধ্যার সময় তথা হইতে আনীত হইয়া গড়ের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পূজিত হয়েন ও সেই দিবসই পূজার পর তাঁহাকে স্বস্থানে লইয়া যাইতে হয়, কেন যে থাকিতে পান না বা থাকেন না, তাহার কোন কারণ কেহ জানেন না। বৃন্দাবন-চক একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, তবে তত জঙ্গলময় নয়, দশ ঘর শ্রমজীবী গৃহস্থের বাস আছে। চারিদিকে বড় বড় মাঠ ও মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীও আছে। এই বৃন্দাবন-চকে যেখানে এখন ধর্ম্মঠাকুর থাকেন, তাঁহার মন্দিরের সম্মুখে ও সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুকুর আছে, পুকুরটি দেখিলে একেবারেই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। তবুও কিংবদন্তী যে সেই পুকুর হইতেই নাকি এই ধর্ম্মঠাকুর, একখানি পাথর ও একটী শঙ্খ এবং একখানি ধর্ম্মেরই পূজার পদ্ধতি আবির্ভূত হইয়াছিল। তখন নাকি লাউসেনের আধিপত্য, আবার সেই লাউসেনই নাকি ইহার বহুল প্রচার করিয়া যান। এখন কিন্তু আর সে শঙ্খ নাই, পাথর খানিও নাই, আছেন কেবল স্বয়ং ধর্ম্মঠাকুর ও তাঁহার পূজার পদ্ধতি। ঠাকুরের আকার কচ্ছপের মত, দস্তর মত শুঁড় প্রভৃতি কচ্ছপের যাহা যাহা থাকে, সবই আছে, অধিকন্তু তলপেটে একটি সচক্র ছোট সর্প খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের পূজকেরা বলেন, উহা অনন্ত, অনন্তের উপর ভগবান্ অবস্থিত ইত্যাদি ইত্যাদি। পুকুর হইতে উত্তোলিত হইয়া ঠাকুর সেই বৃন্দাবন-চকেই রহিলেন। যে স্থানে ঠাকুর থাকেন, উহা প্রসিদ্ধ মন্দিরের মত নহে, উহা একখানি ঘর। ঘর খানির চারিদিকে পাকা দেয়াল, উপরে খড়ের চাল, ঠাকুর ঘরের মধ্যস্থলে একটি বেদীর উপর কাঠের দোলচৌকিতে থাকেন। ঠাকুরের কিছু জমি জারাৎ আছে, তাহাতে আয় প্রায় বার্ষিক তিনশত টাকা হইবে। উহার উপস্বত্ব হইতে উহার পূজা হয়। এই উপস্বত্ব উহার পূজকেরাই আদায় ও খরচাদি করিয়া থাকে। উহার পূজকেরা জাতিতে কৈবর্ত্ত। ব্রাহ্মণে ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মের পূজা করিতে পারেন এইমাত্র, কিন্তু কৈবর্ত্তেরাই পূজার প্রকৃত মালিক। পূজকদিগকে পণ্ডিত বলে। ইহারা কৈবর্ত্ত হইলেও ধর্ম্মের পূজক বলিয়া ১৫ দিন অশৌচ ভোগ করে। ইহারা আপনাদের অন্যান্য কুটুম্বদের বাড়ীতে আহার করে না, এমন কি শ্বশুর বাড়ীতেও খায় না, তবে নূতন হাঁড়িতে রাঁধিয়া দিলে খায়। ইহারা মাছ খায় না, ইহাদের চিহ্ন তর্জ্জনীতে একটি অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরীয় থাকে। ইহারা স্বজাতিমহলে বিশেষ সম্মানিত। ইহারা চাষা হইলেও নিজে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করে না, কিন্তু লাঙ্গলধরা চাষাদের সহিত কুটুম্বিতা করে। ধর্ম্মের পূজা নিত্য হয়। প্রাতঃকালে স্নানাদির পর অনাহারেই পূজা বিহিত; স্নান না করিয়া হয় না। ধর্ম্মের ঘট স্থাপনা নাই। পূজা করিবার নিয়ম এই—নিত্য তিথি অনুসারে সংকল্প করিতে হয়। নিত্যই ঠাকুরকে স্নান করাইতে

হয়। (স্নানের মন্ত্র মূল প্রবন্ধে দেখ।) তারপর শালগ্রামশিলার মত উপর নীচে সচন্দন তুলসী দিয়া ধ্যান করিতে হয়।—(ধ্যানের মন্ত্র মূলে দেখ।) পরে যথাক্রমে পুষ্পাদি দিয়া পূজা করিতে হয়। ধাং ধীং ধং ধর্ম্মায় নমঃ ইহাই ইঁহার বীজ, তুলস্যাদি এই মন্ত্রেই দিতে হয়। পূজা পঞ্চোপচারে, ষোড়শোপচারে যখন যেমন ঘটিয়া উঠে করিলেও চলে। কোন বাঁধা বাঁধি নাই। ধর্ম্মের স্তুতি—"শ্বেতবস্ত্রং শ্বেতমাল্যং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকং। শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জন নমোস্তুতে॥"—ধর্ম্মের প্রণাম "আকাশাৎ পতিতো তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং। সর্ব্বদেবনমস্কারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥" এই গেল পূজার বিধি।

ধর্ম্মের নিত্য পূজায় ⁄৫ সের করিয়া আতপ চাউলের নৈবেদ্য চাই, কমে হইবে না, বেশী যে যত দিতে পারে। অন্যান্য উপকরণ কলা, বাতাসা, নারিকেল, শশা, মুগ, কাঁচা দুধ (জল দেওয়া চলিবে না) ইত্যাদি। প্রত্যহ সায়াহ্নে পঞ্চ প্রদীপ দিয়া আরতি করিতে হয়। এখানে ধর্ম্মের বলি হয় না, তুলসীপত্র দিয়া পূজা করিতে হয়। বিল্বপত্র একেবারে চলে না।

ধর্ম্মকে সকলে বিশেষ মান্য করে। পীড়াদি কোনরূপ দৈব দুর্বিপাকে ধর্ম্মের মানত করে। শনি বা মঙ্গলবারে মানসিক পূজা দিবার নিয়ম। তবে পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যদিনেও দিতে পারা যায়। ধর্ম্মের মানত করিয়া লোকে মাথায় চুল রাখে, দাড়ি কি নখ রাখে না। গৃহস্থেরা বালক বালিকার চুল ধর্ম্মের কাছেই দেয়, দ্বিতীয় পঞ্চানন নাই। ভাদ্র ও বৈশাখে সংক্রান্তিতে ধর্ম্মের গাজন হয়, তাহাতে নানাস্থান হইতে অনেক যাত্রী সমবেত হয়, যাত্রীরা সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিনে হবিষ্য অথবা ফলমূলাদি আহার করিয়া থাকে। পরে গাজনের দিন পূজা দিয়া ধর্ম্মের প্রসাদ পায় ও সারা দিন রাত ধর্ম্মেরই গান গায়। এ পূজাও প্রাতঃকালেই হয়। গাজনের যাত্রীরা রাত্রিতে ধর্ম্মের ঘরে পূজা দেয়। যাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই আসে। তবে ব্রাহ্মণের পূজা ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণে করিতে পারে। ধর্ম্মের মানস করিলে কোন বার করিবার নিয়ম নাই। ধর্ম্মকে লোকে বাড়ী আনিয়াও পূজা দেয়, খুব ধূমধাম করে, ঢাক ঢোল বাজায়। আমি একটি মানসকারীর বাড়ীতে পূজা দেখিয়াছি। মানসকারী একটি ঘরের মধ্যস্থলে ধর্ম্মঠাকুরকে আনিয়াছে, ধর্ম্মপূজক পণ্ডিত পূজা করিতেছে। হাজার পঁচিশ তুলসী দিতেছে। (গৃহস্থের ত মানসই সেই রূপ।) তাহার পার্শ্বে দুই ধারে দুই তিনজন ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলা পূজা করিতেছেন ও তুলসী দিতেছেন। পণ্ডিতদের সম্মান ব্রাহ্মণের মতই। পণ্ডিত শালগ্রাম শিলা পূজা করিতে পারে না। ধর্ম্মের পক্ক অন্ন ভোগ হয় না, নৈবেদ্যাদি আমান্নই দিতে হয়। বলিতো হয়ই না। শুনিতে পাওয়া যায়, ময়নাগড় পরগণাতেই নাকি বলি নাই। এখানকার লোকে ধর্ম্মকে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু বলে। ধর্ম্ম পূজা করিতে গেলে আসন শুদ্ধ্যাদি দস্তুর মত সবই করিতে হয়। মোট কথা এখানকার ধর্ম্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানেও ইহাকে মানে। গাজনের যাত্রীরা যাহা যাহা পূজা দেয়, পণ্ডিত সে সমস্তই নাম ও গোত্র নির্দ্দেশ করিয়া উৎসর্গ করিয়া দেয়। পরে দক্ষিণা পায়।

গাজনের যাত্রীরা ধর্ম্মের ঘরে কাদার একটা চাপের উপর একটি কাটী পুতিয়া তাহাতে তূলা জড়াইয়া ঘৃত দিয়া দীপাকার করিয়া জালিয়া দেয়। তাহাও উৎসৃষ্ট হয়। এ দীপ যাত্রীদের দিতেই হইবে। যাহাদের শিত্রী হয়, তাহারা চুণ মানস করে অর্থাৎ সারিয়া গেলে চুণ দিয়া ধর্ম্মের পূজা দেয়, সেই চুণ ঠাকুরের ঘরে দেওয়া হয়।

শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

পরিষদের কার্য্য-বিবরণ।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৭শে বৈশাখ (১৮৯৭। ৯ই মে) রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৹ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় ১০৬৷১ নং গ্রে ষ্ট্রীট পরিষৎকার্য্যালয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ (সহ-সভাপতি), মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ ডি-এল, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি-এল, বাবু কুঞ্জলাল রায়, বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম-এ বি এল, বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্-এ, বাবু প্রতুলচন্দ্র বসু, বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, বাবু মন্মথচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাবু প্রমথনাথ মিত্র, বাবু ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল, বাবু কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, বাবু বাণীনাথ নন্দী, বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ, বাবু অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এম-এ বি-এল, বাবু যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ বি-এল, বাবু মনোমোহন বসু, বাবু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গোবিন্দলাল দত্ত, বাবু রামেশ্বর মণ্ডল, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বারিষ্টার), বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ বি-এল (সম্পাদক), বাবু কুঞ্জবিহারী বসু বি-এ (সহ-সম্পাদক)।

অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১ গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩ ভারতেশ্বরীর হীরক জুবিলি উপলক্ষে অভিনন্দন পত্র। ৪ নিয়মাবলী সংশোধনসমিতির মন্তব্য। ৫ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আবেদন-পত্র। ৬ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "ছাতনার ইষ্টক-লিপি" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ। ৭ নূতন ধনরক্ষক নিয়োগ। ৮ বিবিধ বিষয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

বিগত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত হইলে গৃহীত হইল।

অতঃপর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

	প্রস্তাবক।	অনুমোদক।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু	ডাক্তার চুনীলাল বসু।
২।	,, চারুচন্দ্র ঘোষ	,, প্রতুলচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দত্ত।
৩।	,, চারুচন্দ্র ঘোষ	,, প্রতুলচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু।
৪।	,, চারুচন্দ্র ঘোষ	,, প্রতুলচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত শ্যামলাল বসু।
৫।	,, চারুচন্দ্র ঘোষ	,, প্রতুলচন্দ্র বসু	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এটর্নি।
৬।	,, কুঞ্জলাল রায়	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যানিধি।
৭।	,, কুঞ্জলাল রায়	,, মনোমোহন বসু	শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী।
৮।	,, কুঞ্জলাল রায়	,, মনোমোহন বসু	ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ।
৯।	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, কুঞ্জলাল রায়	শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঘোষ।
১০।	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, কুঞ্জলাল রায়	কুমার যতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
১১।	,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সম্পাদক হীরক-জুবিলীসমিতি কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত অভিনন্দন-পত্রের পাণ্ডুলিপি সভায় পাঠ করিলেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পাণ্ডুলিপিতে "সংস্কৃত চর্চ্চার ও ভাবী উন্নতির" স্থলে "সংস্কৃত চর্চ্চার পুনরুন্নতি" ব্যবহার করা হউক। উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে অভিনন্দন পত্রের সর্ব্বত্র "আপনি" স্থলে 'মহারাজ্ঞী' শব্দ প্রযুক্ত হউক। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পাণ্ডুলিপিতে 'প্রতীচ্য' শব্দ স্থলে 'পাশ্চাত্য' শব্দ প্রযুক্ত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পাণ্ডুলিপিতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি স্থলে "বিজ্ঞান ও" শব্দগুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পরিবর্ত্তিত আকারে অভিনন্দন পত্র সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সম্পাদক নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির মন্তব্য সভায় উপস্থিত করিলেন। উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে মন্তব্য মুদ্রিত হইয়া আগামী মাসিক অধিবেশনের পূর্ব্বে সকল সভ্যের নিকট প্রেরিত হউক এবং বিচারের জন্য আগামী মাসিক সভায় উপস্থিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপে প্রেরণের জন্য আবেদন-পত্র সভার বিচারার্থ উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিলেন যে আবেদন-পত্রোক্ত প্রস্তাবগুলির সহিত তাঁহার বিশেষ মতভেদ আছে। সাহিত্য-পরিষদ্ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার যোগ্যপাত্র নহেন। শিশু পরিষদ্ এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অনধিকারী। এরূপ করায় বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়া হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের Board of Study প্রভৃতি থাকিতে আমাদের এ অনধিকার চর্চ্চা কেন? ইহাতে পরিষদ্ হাস্যাস্পদ হইবে মাত্র। আমরা যেন University-Reform-Association হইয়াছি। বক্তা একে একে প্রস্তাবগুলির সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যে শিক্ষার্থীদিগের কোনরূপ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না। বক্তা শেষে প্রস্তাব করিলেন যে আবেদন পত্রখানি পাঠান না হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, যখন শিক্ষাসমিতি গঠিত হইয়াছে এবং সমিতির সভ্যেরা উক্ত আবেদনপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তখন উহা পাঠানই উচিত। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের এক বিগত অধিবেশনে যে শিক্ষাসমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি অধিবেশনে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তিনি আবেদনপত্রে সেই প্রস্তাবসমূহ গ্রথিত করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য পরিষদ্ কোন অধিবেশনে যদি কোন অনিষ্টকর প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া থাকেন, তবে যে তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে না, তিনি এরূপ বলেন না। পূর্ব্বে ভাবিয়া চিন্তিয়া শাখা সমিতি গঠিত করিলে, শাখা-সমিতির পরিশ্রমের লাঘব হইতে পারিত। প্রস্তাবকর্ত্তা সাধারণের কাছে পরিষদের হাস্যাস্পদ হওয়ার আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু আমরা যেন নিজেদের কাছে হাস্যাস্পদ না হই।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, যে শিক্ষাসমিতির নিয়োগ-বিষয়ক মন্তব্য যতদিন না প্রত্যাহৃত হয়, ততদিন আবেদনপত্র প্রেরণ বন্ধ করিতে কোন সভ্যেরই অধিকার নাই। যিনি উক্ত মন্তব্য প্রত্যাহৃত করিতে চান, তাঁহার রীতিমত বিজ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব আনা উচিত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে পূর্ব্ব মন্তব্য পুনর্ব্বিচার হইতে পারে, ইহা তিনি অস্বীকার করেন না। পূর্ব্বে যখন এ বিষয়ের বিচার হইয়া নির্দ্ধারণ হইয়াছিল, তখন তিনি সভাপতিরূপে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মত নির্দ্ধারণের পক্ষেই ছিল। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে পরিষদ্ হইতে আবেদন পাঠান তাঁহার মতে অপ্রাসঙ্গিক নহে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এখন নির্ভর ইংরাজির উপর। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠ্য ও পরীক্ষাপ্রণালীর

সংস্কার হওয়া আবশ্যক। অতএব এ বিষয়ে পরিষদের আবেদন পাঠান অনধিকার চর্চ্চা নহে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে পূর্ব্ব অধিবেশনে যখন এ বিষয় উপস্থিত হয়, তখন পরিষদ্ এরূপ আবেদন পাঠাইতে অধিকারী কি অনধিকারী তাহার কোন বিচার বা মীমাংসা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে আবার বলিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস এই যে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর দোষে আমাদের ইংরাজি শিক্ষা সম্যক্ হইতেছে না। বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। অতএব শিক্ষাপ্রণালীর যাহাতে সংস্কার হয়, সে বিষয়ে আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্পাদক বলিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক সভ্য স্বমতানুযায়ী প্রস্তাব বিচারার্থ পাঠাইতে পারেন। দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণের সমষ্টি স্বরূপ পরিষদ্ ঐরূপ করিলে বামনের চাঁদে হাত দেওয়া হইবে কেন? প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীতে দেশের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে, তাহার নিবারণের চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় যতীন্দ্র বাবুর বাক্যের পোষকতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিয়া ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করা উচিত ছিল।

প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিলেন যে যে আবেদন পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা দ্বারা যে শিক্ষার্থীদিগের কোন উপকার সাধিত হইবে, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না।

অবশেষে উপস্থিত সভ্যের অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপে এরূপ আবেদন পত্র পাঠাইবার অধিকার পরিষদের আছে। আবেদন-পত্রের বিচার স্থগিত রহিল।

সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার পদ গ্রহণ না করাতে তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের ধনরক্ষক নিযুক্ত হউন।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সম্পাদক।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সভাপতি।

১৩০৪ সালের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৭ সাল ২৩ শে মে) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট স্থিত রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুরের ভবনে পরিষৎকার্য্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ডি এল্, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী, বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, বাবু হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথনাথ মিত্র, শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বি এল, বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু, বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ, বাবু অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বাবু অমৃতলাল বসু, বাবু মতিলাল ঘোষ, কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু বাণীনাথ নন্দী, বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, বাবু গোবিন্দলাল দত্ত, বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), কুঞ্জবিহারী বসু বি এ (সহসম্পাদক)।

অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১ বিগত অধিবেশনে গৃহীত হীরক জুবিলির অভিনন্দন পত্রের পুনর্ব্বিচার। ২ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমীপে প্রেরণের জন্য আবেদন পত্রের আলোচনা। ৩ বিবিধ বিষয়।

যে পত্রের অনুসারে সভা আহূত হইয়াছিল, সম্পাদক সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সেই পত্র পাঠ করিলেন। পত্র খানি এইরূপ ;—

১০ই মে ১৮৯৭, ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

শ্রীযুক্ত সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন

আমাদের বিবেচনায় বিগত অধিবেশনে অনুমোদিত ভারতেশ্বরীর সমীপে অভিনন্দন পত্রের পুনর্ব্বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে পরীক্ষা ও পাঠ্য সম্বন্ধে যে আবেদন-পত্র পাঠান স্থির হইয়াছে, তাহাও শীঘ্র প্রেরণ করা আবশ্যক। এই জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আগামী ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় আপনি নিয়মাবলীর তৃতীয় ধারা মতে একটী বিশেষ সাধারণ সভা আহূত করুন ইতি।

ভবদীয়—শ্রীমনোমোহন বসু।
শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র।
শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।
শ্রীবিজয়কেশব মিত্র।
শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু।
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।
শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

সম্পাদক পুনর্ব্বিচারের জন্য সংশোধিত অভিনন্দন পত্র সভায় উপস্থিত করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে উহা পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "ভক্তি" স্থলে "রাজভক্তি" শব্দ প্রযুক্ত হউক।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর প্রস্তাবকারী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে বদান্যতার স্থলে ঐকান্তিক যত্ন শব্দ প্রযুক্ত হউক। শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে "আপনার অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি যে" এই শব্দ গুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে শিক্ষা প্রণালীর "প্রভাবে" স্থলে "গুণে" শব্দ এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে অভিনন্দন পত্রের শেষে "হউক" স্থলে "করিতে থাকুক" শব্দদ্বয় গৃহীত হইল।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পরিবর্ত্তিত আকারে আবেদন পত্র অনুমোদিত হউক।

শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদক মহাশয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমীপে প্রেরণের জন্য আবেদন পত্র সভার বিচারার্থ উপস্থিত করিলেন।

মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে আবেদন পত্র বিশ্ব-বিদ্যা-

লয়ের সমীপে প্রেরিত হউক। মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলিলেন যে এরূপ আবেদনপত্র প্রেরণ করাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি কোন রূপ অসম্মান প্রদর্শিত হইতেছে না। কারণ আমাদের এইমাত্র অনুরোধ যে, আবেদনপত্রলিখিত প্রস্তাবগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয় বিবেচনা করুন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইলে প্রকৃত শিক্ষার অবনতি হইবে। প্রকৃত শিক্ষা কি? শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দুইটী—(১) প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ। (২) শিক্ষার্থীর বুদ্ধির বিকাশ ও উন্নতি। আমরা দেখিতে পাই বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথম উদ্দেশ্যটীর প্রতি লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু দ্বিতীয়টীর প্রতি দৃষ্টি তেমন রাখেন না। বিশ্ব-বিদ্যালয় পরীক্ষার্থীদিগকে যতগুলি বিষয় শিখিতে বলেন, তাহার সকল গুলি তাহারা সম্যক্ বুঝিতে পারে না। পরীক্ষায় অর্দ্ধেকের অধিক পরীক্ষার্থী "ফেল" হয় কেন? প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে (যাহারা খুব ভালও নহে, খুব মন্দও নহে), ভাল মনে হয় না। আমাদের প্রস্তাব গুলি গৃহীত হইলে, সাধারণ শিক্ষার্থীর উপকার হইবার সম্ভাবনা। প্রবেশিকা ও এফ এ পরীক্ষা কঠিন করিলে পাঠার্থীর শিক্ষার অর্দ্ধ পথে গতি রোধ করা হয়।

বক্তা মহাশয় একে একে প্রস্তাবগুলির উপযোগিতা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে আবেদন পত্রের মূল উদ্দেশ্যের সহিত তাহার সহানুভূতি আছে। কিন্তু আবেদনোক্ত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হইলে যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সে আশা তিনি করেন না। কয়েক খানি গ্রন্থ বাদ দিলেই অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি যে সুচারুরূপে পঠিত হইবে, তাহার প্রমাণ কি?

বক্তা একে একে প্রস্তাব গুলির সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে তিনি কোন প্রস্তাব করিতেছেন না। আবেদন-পত্র দ্বারা যে কোন উপকার সাধিত হইবে না, তাহাই দেখান তাঁহার উদ্দেশ্য। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য পীড়নের যাহাতে কতকটা লাঘব হয়, আবেদন পত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। শিক্ষাপ্রণালীর একবারে ঐকান্তিক সংস্কার হইবে এরূপ আশা করা যায় না। যদি বিশেষ কমিটী করিয়া অন্ততঃ এক বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়, তবে যদি শিক্ষা-সংস্কারের কোন বিশেষ (Positive) উপায় বাহির হইতে পারে। যদি শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় বুদ্ধির পরিমার্জ্জন, তবে কিছু কিছু বিজ্ঞানশিক্ষা মন্দ নহে, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসাদিরও শিক্ষা হওয়া উচিত। মনুষ্যত্বকে কেন্দ্র স্থলে রাখিয়া বিজ্ঞানাদি সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রাকৃতিক ভূগোল উঠাইয়া দেওয়া না হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রাকৃতিক ভূগোল শিক্ষার উপযোগিতা দেখাইয়া উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে প্রাকৃতিক ভূগোলে কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। পড়িতে আমোদও আছে। অতএব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উক্ত বিষয় না উঠাইলেই ভাল হয়। বিশেষতঃ যখন ভূগোলের পরিমাণ কম করা হইল। তখন তাহার স্থানে প্রাকৃতিক ভূগোল থাকিলে মন্দ হয় না।

সম্পাদক প্রাকৃতিক ভূগোল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর উপযোগী নহে, এই হেতু দেখাইয়া উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন।

মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরে বলিলেন যে যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে পাঠ্যের আধিক্য প্রযুক্ত শিক্ষা সম্যক্ হইতে পারে না, তবে আমরা যাহা করিয়াছি তাহাই ঠিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র ক্ষমতা যে তাঁহারা পাঠ্যের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন। সেই জন্য আমরা কমাইতে বলিয়া ঠিক করিয়াছি। আমরা রোগের কোন ঔষধ প্রয়োগ করিতেছি না বটে, কিন্তু কুপথ্য বারণ করিতেছি, ইহা ব্যর্থ হইবে না। ভূগোল খগোল পড়িয়া অনেক সময়ে এরূপ গোল বাধিয়া যায় যে, পাঠার্থী স্বর্গে কি মর্ত্তে স্থির করিতে পারে না। যদি পাঠ্য পাঠার্থীর উপযোগী না হয়, যদি সে তাহা বুঝিতে না পারে, তবে সেরূপ পাঠ না একরূপ প্রবঞ্চনা মাত্র। মুখস্থ বিজ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞান ভাল। প্রাকৃতিক ভূগোলের সকল অংশ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর উপযোগী নহে। কিন্তু যখন অনেকের মত হইতেছে, প্রাকৃতিক ভূগোল রাখা উচিত, তখন বোধ হয় আবেদন পত্রের তৃতীয় দফার (b) অংশ এইরূপ পরিবর্ত্তিত করিলে সকল পক্ষের অনুমোদিত হইতে পারে।

Physical Geography as a complete subject be omitted from the course as too difficult but that some text-book explaining some of the ordinary elementary notions on the subject be prescribed.

প্রস্তাবকারী বাণীনাথ নন্দী উক্ত পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিলেন।

মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও প্রস্তাব করিলেন যে উক্ত তৃতীয় দফার (a) অংশ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হউক—

The fourth book of Euclid be omitted from the course as being comparatively of little use to the general student. উক্ত পরিবর্ত্তন সকলের অনুমোদিত হইল। পরিবর্ত্তিত আকারে আবেদন পত্র সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে অভিনন্দন পত্র ও আবেদন পত্র সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সম্পাদক।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
সভাপতি।

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ সাল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৪।

[বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৵ আনা।]

(২৮এ শ্রাবণ প্রকাশিত হইল।)

৪র্থ ভাগ।] [২য় সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

দুর্গামঙ্গল

ও

কবি রূপনারায়ণ।

জগতে যাহারা ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে অমরকীর্ত্তির আশা করেন, কবির নির্ম্মল-প্রতিভা তাহাদিগকে "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী" এই উদাস কবিতা শুনাইয়া দেয়। বস্তুতঃ "ইষ্টক উপরে ইষ্টক স্থাপন করিয়া" কাহারও অমরতার আশা পূর্ণ হয় নাই। অযোধ্যা, মথুরা, উজ্জয়িনী বা হস্তিনাপুরী—ইষ্টকগ্রথিত কীর্ত্তিমাত্রেরই পরিণাম একই। কিন্তু যাঁহারা প্রতিভার দিব্যজ্যোতিতে বিশ্বপ্রহেলিকা ভেদ করিয়া মানবমণ্ডলীকে কোন নূতন লক্ষ্য দেখাইতে পারিয়াছেন, অথবা জগতে কোন নূতন সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিতে পারিয়াছেন, সেই বাগ্‌দেবীর উপাসকগণের রসভাবময়ী লেখনীই জগতে অমরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। সর্ব্ববিনাশক কাল সে কীর্ত্তির কণামাত্রও ধ্বংস করিতে পারে নাই। উজ্জয়িনীর অভ্রভেদী রত্নগঠিত রাজপ্রাসাদ বালুকাকণায় পরিণত হইয়াছে, কিন্তু শকুন্তলা ও মেঘদূতের মধুময়ী কবিতাকৌমুদী আজিও তেমনি জ্যোতিষ্মতী রহিয়া কালিদাসের অমরত্ব প্রকাশ করিতেছে। শতদ্বীপপরিসঙ্কুলা সে অযোধ্যানগরী এখন আর নাই, কিন্তু তমসার শীতল প্রবাহের ছায় মহর্ষির শান্ত হৃদয়কন্দর হইতে রামায়ণী গঙ্গার যে করুণস্রোতঃ নিঃসৃত হইয়াছিল, বাল্মীকির অমরতার চিহ্নস্বরূপ তাহা আজিও বিমলরূপে তেমনি

প্রবাহিত আছে। জগতে কবিই অমর। আমরা অদ্য এইরূপ অমর এক মহাত্মার কীর্ত্তির কথা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

বঙ্গভাষার শৈশব অবস্থার যে সকল প্রতিভাশালী বঙ্গসন্তান স্বীয় লেখনী দ্বারা মাতৃ-ভাষার সেবা করিয়াছিলেন, কবি রূপনারায়ণ ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে একজন। রূপনারায়ণ বঙ্গের বেদস্থানীয় মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বনে বিবিধ ছন্দে বিবিধ রসালঙ্কারের লীলা দেখা-ইয়া 'দুর্গামঙ্গল' নামক গীতকাব্য বা পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। রূপনারায়ণের গ্রন্থ চণ্ডীর অনুবাদ। কিন্তু সে অনুবাদ, সংস্কৃত শ্লোকের অনুস্বার-বিসর্গহীন আবৃত্তিমাত্র নহে। যাহাতে সাধারণে চণ্ডীর তত্ত্বকথা সহজে বুঝিয়া আগ্রহের সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তন করে, রূপ-নারায়ণ সেই উদ্দেশ্যে বিচিত্র ব্যাখ্যার সহিত বিবিধ রাগরাগিণী ও ছন্দের রসে রসময় করিয়া ললিত শব্দে চণ্ডীর তত্ত্ব গ্রন্থন করিয়াছেন। তাঁহার রাগরাগিণী ও পদমাধুর্য্যে অনেক বৈষ্ণব কবির গরিমা ম্লান হইয়াছে; তাঁহার সরল মধুর ব্যাখ্যায় চণ্ডীর অনেক জটিলতত্ত্ব সহজবোধ্য হইয়াছে। রূপনারায়ণের কৃতিত্ব অসাধারণ। রূপনারায়ণ ভিন্ন সে কালে কেন, একালেও বোধ হয় কোন কবি সংস্কৃতের পদ্যানুবাদে এমন মধুরতার সঞ্চার করিতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা কাঁটালিয়ার অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের চণ্ডীর অনুবাদের কথা সাহিত্য-পরিষদে প্রকাশ করিয়াছি। ভাষার শৈশব সময়ে ভবানী-প্রসাদ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বড়ই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। তাহাতে আবার তিনি অন্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে উহা যে কত আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্গভূমি চিরদিন অন্ধের এক কীর্ত্তিরত্ন সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া অন্য দেশের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, রূপনারায়ণের অনুবাদের সহিত ভবানীপ্রসাদের অনুবাদের কি ভাষার মধুরতা, কি মূলের সহিত সমতা-রক্ষা, কি অলঙ্কার, কি ছন্দ, কোনও বিষয়েই তুলনা হয় না। নারায়ণ কবিত্ব প্রকাশ করিবার জন্যই চণ্ডীর অনুবাদ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার রচনায় প্রতিপত্রে ছন্দ, অলঙ্কার ও রসের লীলাভিনয় হইয়াছে। ভবানীপ্রসাদের কাব্যসম্পদ্ ছিল না। তিনি অন্ধতাহেতু বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া চণ্ডীর অনুবাদচ্ছলে, বড়ই সরল প্রাণে সরল ভাষায় জগন্মাতার নিকট হৃদয়ের বেদনা জানাইয়াছেন। সুতরাং দুই জনের গ্রন্থ দুই রূপ হইয়াছে। একের রসালঙ্কার-লীলাময়ী রচনা বিবিধ ভূষণভূষিতা যুবতীর ন্যায় আনন্দোৎ-ফুল্লা ও চঞ্চলা। অপরের রচনা পারিপাট্যবিহীনা শোককাতরা বিধবার ন্যায় অশ্রুসিক্তা ও প্রার্থনাময়ী। এই কারণে এবং ভবানীপ্রসাদের অঙ্গহীনতার কথা স্মরণ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধে উভয়ের রচনা তুলনা করিতে বিরত হইব।

দুর্গামঙ্গলে রূপনারায়ণ আপনার কোন পরিচয় বা গ্রন্থরচনার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। আমরা যে গ্রন্থ খানি পাইয়াছি, উহার লিপিকারকের নাম প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ। গ্রন্থের শেষ ভাগে নিম্নলিখিত কএকটী কথা লিখিত আছে;—

"স্বাক্ষর শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ দীন, ভজন সাধনহীন, ভরসা কেবলমাত্র কালীর চরণ। আদাজান। সন ১২৩৫ সনের ১১ই বৈশাখ বেলা দুই প্রহরের সময় পুস্তক লেখা সমাপ্ত।"

এক্ষণে এই প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমান আছেন। ইঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছে। ইঁহার নিকটেই আমরা দুর্গামঙ্গল পাইয়াছি। প্রসন্নবাবু ও তদ্বংশীয়েরা রূপনারায়ণকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেন, সেই জন্য পুরুষানুক্রমে 'দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থ যত্নের সহিত স্বীয় গৃহে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালাকে আজিও অনেক প্রাচীন লোকে প্রাকৃত বা পরাকৃত বলেন। এইজন্য ঘোষ মহাশয়-দিগের গৃহে রক্ষিত এই গ্রন্থ 'পরাকৃত চণ্ডী' বলিয়া কথিত হয়। গ্রন্থ-শেষে যে আদাজান গ্রামের উল্লেখ আছে, উহা ময়মনসিংহ জেলার আটীয়া পরগণায় অবস্থিত। আদাজানের ঘোষ স্বদেশে 'কুলীন' বলিয়া পরিগণিত। আদাজানের ঘোষ মহাশয়দিগের বংশপত্রিকা অনুসারে রূপনারায়ণ ঘোষ প্রসন্নবাবু হইতে ৮ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। পূর্ব্বকালে বালিকা-বিবাহের রীতি ছিল বটে, কিন্তু পুরুষেরা ৩০।৪০ বৎসর বয়সে * বিবাহ করিতেন। এই-জন্য গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ৩৫ বৎসর ধরিলে রূপনারায়ণ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২৮০ বৎসর (৮ পুরুষ) পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বঙ্গজ কায়স্থদিগের যে কএকটী সমাজ আছে, বাজুর সমাজ তন্মধ্যে একটী। ময়মন-সিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা ও ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহাকুমার অন্তর্গত স্থান 'বাজু' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাজুতে বসতি করিলে কৌলীন্য নষ্ট হইবে—চন্দ্রদ্বীপের রাজা তৎকালীন কায়স্থ-সমাজপতি পরমানন্দ রায় এইরূপ নিয়ম করেন। এইজন্য কোন কুলীন সহজে এদেশে আসিতে চাহিতেন না। আদিশূর যে পাঁচজন কায়স্থ এদেশে আনয়ন করেন, মকরন্দ ঘোষ তাহার অন্যতম। এই মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষের নাম কার্স্য ঘোষ। এই কার্স্য ঘোষবংশীয় কামদেব ঘোষকে যশোহরাধিপতি বিক্রমাদিত্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে লইয়া যান। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য, মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে কামদেব ঘোষের প্রপৌত্র বাণীনাথ ও জগন্নাথ নামক ভ্রাতৃদ্বয় রাজবিপ্লবে ভীত হইয়া যশোহর হইতে পলাইয়া মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত আমডালা গ্রামে উপস্থিত হন। বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় আমডালার অধিপতি করবংশীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাণীনাথ নিহত হন। জগন্নাথ আমডালা হইতে পলায়ন করিয়া টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাফলা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। তথাকার ভূম্যধিকারী যাদবেন্দ্র রায় (কাগমারী পরগণার প্রসিদ্ধ জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ) তাঁহার পরিচয় পাইয়া ইন্দুমতী নাম্নী স্বীয় কন্যাকে জগন্নাথের সহিত বিবাহ দিয়া আপন জমিদারীর অন্তর্গত বাফলাদিগর ২৭ খানি-গ্রাম যৌতুক প্রদান করেন। কিন্তু জগন্নাথ ঘোষ এইরূপ প্রচুর যৌতুক পাইয়াও বাফলার

* কুলীন সন্তানেরা অল্পবয়সে বিবাহিত হইতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।—প° স°

রহিলেন না। বাফলা হইতে পলাইয়া আদাজান গ্রামের হরা বৈরাগীর আখড়ায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাদবেন্দ্র রায় যত্ন করিয়াও জগন্নাথকে বাফলা আনিতে না পারিয়া আদাজান গ্রামের কিয়দংশ ভূমি তাঁহাকে দান করিলেন। তদবধি জগন্নাথ ও তদীয় বংশধরগণ আদাজানে বসতি করিয়া দেশে 'আদাজানের ঘোষ' বলিয়া বিখ্যাত হন। যাদবেন্দ্রের মৃত্যুর পর জগন্নাথ ঘোষ বাফলার জমিদার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি যে শ্লোক রচনা করেন, সে শ্লোকের অর্দ্ধ "যাদবেন্দ্র-বিহীনেয়ং বাফলা নিস্ফলা গতা" এখনও লোক মুখে শুনা যায়। জগন্নাথের উল্লিখিত বিবরণ কুলজী গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"যশোর নগরে বাস ভাই দুইজন।
পিতামাতা হীন হৈয়া উৎকণ্ঠিত মন॥
রাজবিপ্লবনে ছিন্ন ভিন্ন হৈল দেশ।
বাণীনাথ জগন্নাথ চিন্তিয়া অশেষ॥
যশোর ত্যজিয়া দোহে চলে বাজুদেশ।
আমডালা নগরেতে করিল প্রবেশ॥
তথাকার অধিকারী ছিল করবংশ।
ধর্ম্মলেশ নাহি তার নিতান্ত নৃশংস॥
পরিচয় দোহাকার পেয়ে সেই কর।
যতনে রাখিল নিয়া আপনার ঘর॥
মনে মনে বিচারিয়া বলে সেই কর।
ভ্রাতৃদ্বয়ের অগ্রভাগে যুড়ি দুই কর॥
মোর ঘরে দুই কন্যা আছে সুলক্ষণা।
তাহা দোহে পরিণয় কর দুই জনা॥
হৈল দোহে অস্বীকার, ক্রোধে জলে দুরাচার,
বলে কর শুন মোর বাণী।
যদি বিয়া না করিবা, তার প্রতিফল পাবা,
পদ্মানদী মধ্যে যাবে প্রাণী॥
দুই ভাই হৈয়া ব্যস্ত, পলায়ন করে ত্রস্ত,
ধৃত হৈল বাণীনাথ ঘোষ।
কহে কর ধীবরেরে, ছালাতে ভরিয়া এরে,
পদ্মাতে ডুবালে নাহি দোষ॥
নাবিকেরা অতঃপরে, বাণীনাথে ধরি করে,
ত্বরা ভরি ছালার ভিতর।

ত্বরিতে তাহারে নিয়া, চলে পদ্মানদী বাইয়া,
মধ্যে নিল হইয়া সত্বর॥
বলে শুন মহাশয়, বিয়া কল্লে প্রাণ রয়,
নহেত পদ্মায় ডুবাইব।
ভাবে বাণী মনে মন, করিয়াছি এই পণ,
মরি তবু বিয়া না করিব॥
'মেরি ভাই জগন্নাথ, না মিল্‌গেই কার্‌কি সাথ,
বেটা বেটিকো না দিবেগা বিয়া।
যব্‌ তক রহে ওস্‌কি বংশ, না করে ইয়া কৌল ধ্বংস,
বাণীনাথ পদ্মায় রহে গিয়া।" (কায়স্থবংশাবলী ধৃত।)

এই জগন্নাথ ঘোষের পুত্রই রূপনারায়ণ ঘোষ। মানসিংহ ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তৎপরবর্ত্তী ১০ বৎসর মধ্যে জগন্নাথের যশোহর হইতে আদাজানে বাস ও রূপনারায়ণের জন্ম ধরিলে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে রূপনারায়ণের জন্মকাল নির্ণীত হয়। এ হিসাবে রূপনারায়ণ ৩০০ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আমাদের পূর্ব্বের হিসাবে (প্রত্যেক পুরুষে ৩৫ বৎসর ধরিয়া) ২৮০ বৎসর পাওয়া যায়। সুতরাং এই উভয় মতে ২০ বৎসরের তফাৎ দেখা যায়। কিন্তু আমরা যে পূর্ব্বে প্রত্যেক পুরুষে ৩৫ বৎসর ধরিয়াছি, তাহা খুব ঠিক হয় নাই। সে কালে এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকেই প্রায় ৪০ বৎসরে বিবাহ করিতেন। এইজন্য এই ২০ বৎসর কম পাওয়া যাইতেছে। যাহাহউক রূপনারায়ণের আবির্ভাবকাল আমরা ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ বা বাঙ্গালা ১০০০ সন নির্দ্দিষ্ট করিতেছি।

ভাষাবিচার দ্বারাও রূপনারায়ণ যে ২৫০।৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক, তাহা বুঝিতে পারা যায়। রূপনারায়ণের গ্রন্থে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালা-ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণ তদ্দর্শনে রূপনারায়ণের প্রাচীনত্ব অনুমান করিতে পারিবেন।

রূপনারায়ণের গ্রন্থে		বর্ত্তমান প্রচলিত	
১। কহন্তি	...	কহেন বা কহে।	"মহামুনি মেধস কহন্তি মোক্ষপথ।"
২। করন্তি	...	করেন বা করে।	"মহা মহা দৈত্যকুল করন্তি চর্ব্বণ।"
৩। করুকা	...	করুন।	"আমা সমার দুর্গতি, হরুকা সে ভগবতী, কৃপাকরি করুকা কল্যাণ।"
৪। হরুকা	...	হরুন।	
৫। সমার	...	সবার।	
৬। আলাপন্তি	...	আলাপ করে।	"যতেক বিদ্যাধরী, কিন্নর কিন্নরী, রাগ আলাপন্তি রসাল।"

৭।	মুনিতে	..	মুনিকর্ত্তৃক।	"মুনিস্তে পূজিত হৈয়া সুরথ নৃপতি।"
৮।	তোমাত	...	তোমাকে।	"দেবীর চরিত্র কিছু কহিব তোমাত।"
৯।	তোমাক	...	তোমাকে।	"অতএব বলোঁ তোমাক কি করিব স্তুতি।"
১০।	বলোঁ	...	বল।	
১১।	ভকতিয়ে	...	ভকতিতে।	"ভকতিয়ে নম্রমূর্ত্তি মুদিত লোচন।"
১২।	তাহান	...	তাঁহার।	"কি কর্ম্ম করেন কিবা স্বভাব তাহান।"
১৩।	তাথে	...	তাহাতে।	"উৎপন্ন করিয়া তাথে করিয়া ঘোষণ।"
১৪।	ইবা	...	এই।	"ইবা শিশু, ইহার করিবে কোন কর্ম্ম।"
১৫।	ই	...	এ।	"তাহার ইরূপ হৌক তাহা নাহি লিখি।"
১৬।	এমত	...	এমন।	"কি হেতু এমত হয় মুনির সত্তম।"
১৭।	মাউর	...	মায়ূর।	"ধানশী মাউর"
১৮।	মাঙ্গিলা	...	মাগিলা।	"যে বর মাঙ্গিলা ব্রহ্মা সেহি বর পাইলা।"
১৯।	সেহি	...	সেই।	"সেহি দেবী বহুরূপা, সমাকে করুকা কৃপা"
২০।	বিনু	...	বিনা।	"যা বিনু শকতিহীন, ঈশ আদি লোক তিন"
২১।	জিন	...	যিনি।	"পূর্ব্বাপর প্রতিদিন, সুরেন্দ্র সেবিত জিন"
২২।	সহসাৎ	...	সহসা।	"উঠিয়া সহসাৎ, দেখিলা সাক্ষাৎ"
২৩।	কমুন	...	কেমন।	"না জানি কমুন পুণ্যে আসিয়াছি হেথা।"
২৪।	এতেক	...	এত, বা এই।	"এতেক স্তবন যদি কৈলা প্রজাপতি।"
২৫।	দেখিল	...	দেখিলাম। (১)	"বড়ই সাহস এই দেখিল তোমার।"

রূপনারায়ণ শক্তির উপাসক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দুর্গামঙ্গলে তিনি স্বয়ং যে সকল সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। গ্রন্থ মধ্যে সংস্কৃত তূণকাদি ছন্দ প্রয়োগ, সুললিত বহুল সংস্কৃত শব্দ, ক্রিয়াপদ ও অলঙ্কারযুক্ত রচনা এবং প্রসিদ্ধ কবিগণের ভাব অবিকল গ্রহণ তাহার সংস্কৃতজ্ঞতার অন্ততম প্রমাণ। গ্রন্থারম্ভে কবি যে দুইটী শ্লোক লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"প্রণম্য পরমানন্দং শ্রীগুরুং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
বক্ষ্যামি কিঞ্চিচ্ছ্লোকায় দেবী মাহাত্ম্যমুত্তমং।
খর্ব্বং ক্ষেমকরং মহীধরসুতাসূতং ব্রহ্মেন্দ্রাধিপং।
নানাসাধ্যসুসাধ্য কর্ম্মসুখদং সিদ্ধিপ্রদং সুন্দরং।
বন্দেঽহং সততং গজেন্দ্রবদনং সিন্দূরশৈলপ্রভং
সিদ্ধিং দেহি গণেশাধীশ! পরবং দুর্গামহামঙ্গলে॥"

(১) এইরূপ প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ত্তা উত্তম পুরুষ, ক্রিয়া নাম পুরুষ, গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়।

গ্রন্থারম্ভে বিনয়-প্রকাশার্থ রূপনারায়ণ, মহাকবি কালিদাসের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন ;—

"দেবীর মাহাত্ম্য শুনি চপল হৃদয়। পারিবা না পারি কিছু বলিব নিশ্চয়॥ (১)
গুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে। দুস্তর সাগর চাহি উড়ুপে তরিতে॥ (২)
প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ। হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন॥ (৩)
পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে। বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে॥ (৪)
এহি সব দৃষ্ট কথা হৃদয়ে ভাবিয়া। চণ্ডীর বৃত্তান্ত কহি শুন মন দিয়া॥"

সংস্কৃত ব্যতীত ব্রজভাষা ও হিন্দীপ্রভৃতিতেও রূপনারায়ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে বহুপরিমাণে ব্রজভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। রূপবর্ণনা-স্থলে রূপনারায়ণ বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় বিবিধ সুললিত ছন্দে ব্রজভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল স্থলের রচনা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের রচনা হইতে কোনও অংশে হীন নহে। বরং অনেক স্থলে বর্ণনার নূতনত্ব ও ভাবের চাতুর্য্য আছে। আমরা দুই একটী স্থল পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য উদ্ধার করিতেছি ;—

১। বদন মদন স্যন্দন জানি। কুণ্ডল চারুচক্র মানি॥
যো রথ আরোহি মদন বীর। জিনিল পিনাকপাণি ধীর॥
২। সবিতা সিন্দুরবিন্দু, চন্দনতিলক ইন্দু, উজ্জ্বল কজ্জল মেঘ, ভালে ভাল শোভিনী।
৩। ললিত ত্রিবলি জানি, মনে এহি অনুমানি, ভঞ্জনের ভীতিহেতু, কটি তটে আটনী।
৪। উচ্চ কুচ অতি চারু, জিতিল সুমেরু মেরু, হাররূপে ছোঁই গঙ্গু, রঙ্গে বাসকারিণী।

রূপনারায়ণ মার্কণ্ডেয়-পুরাণ অবলম্বন করিয়া 'দুর্গামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। "পুরাণ প্রমাণে কহে রূপনারায়ণ" একথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে নিম্নলিখিত কএকটী শ্লোকে গ্রন্থরচনার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—

"পক্ষি সবে কহে কথা জৈমিনি শুনয়। সে কথা গাঁথিলা শ্লোকে ব্যাস মহাশয়॥
মহামুনি বেদব্যাস তাঁহার বচন। সংস্কৃত কারণে না বুঝে সর্ব্বজন॥
সতত চণ্ডীর কথা শুনিতে অভিলাষ। ই হেতু পাঁচালী করি করিল প্রকাশ॥
সেহি পুণ্যময় কথা শুনিতে সন্তোষ। পয়ারে কহিল রূপনারায়ণ ঘোষ॥"

'সর্ব্বজন' বুঝাইবার জন্য রূপনারায়ণ 'চণ্ডীর কথা' পাঁচালী বা গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক হয় নাই। বিচিত্র রাগরাগিণী ও বিবিধ ছন্দে সুললিত শব্দবিন্যাস দ্বারা সর্ব্বজনের হৃদ্য, সুখশ্রব্য ও সহজবোধ্য করিয়া তাঁহাকে এই গীত রচনা করিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় ও মূলের সহিত আক্ষরিক সাম্য-রক্ষা

---

* (১) "তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ।"
(২) "তিতীর্ষুঃ দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।"
(৩) "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"
(৪) "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ। "(রঘুবংশ।)

করিতে তিনি অল্প চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার চেষ্টা অনেক স্থলেই বিস্ময়কর সফলতা-লাভ করিয়াছে। যে সকল স্থলে মূলের সহিত আক্ষরিক সমতা রক্ষা করিতে গেলে গ্রন্থের মর্ম্ম সুব্যক্ত হয় না, রূপনারায়ণ সে স্থলে সমতা-রক্ষার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বিচিত্র ব্যাখ্যা দ্বারা চণ্ডীর মর্ম্ম বুঝাইয়াছেন। এই সকল স্থলে তাঁহার অমর লেখনী অনুবাদের বন্ধন-মুক্ত হইয়া কি বর্ণনা কি ভাব সকল বিষয়েই অমৃত উদ্গার করিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের সহিত দুর্গামঙ্গলের প্রথমভাগে ঘটনাগত দুই একটী বৈষম্য দেখা যায়—মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী পক্ষিগণ বক্তা, জৈমিনি শ্রোতা। দুর্গামঙ্গলের বক্তা ও শ্রোতা তাহারাই। কিন্তু জৈমিনির বিন্ধ্যপর্ব্বত-গমন ও প্রশ্নজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত ঘটনা, দুই গ্রন্থে একরূপ নহে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, একদিন ব্যাসশিষ্য জৈমিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

১। কস্মাৎ মানুষতাং প্রাপ্তো নির্গুণোঽপি জনার্দ্দনঃ।
বাসুদেবো জগৎসৃতিস্থিতিসংযমকারণং।

২। কস্মাচ্চ পাণ্ডুপুত্রাণামেকা সা দ্রুপদাত্মজা।
পঞ্চানাং মহিষী কৃষ্ণা হ্যত্র নঃ সংশয়ো মহান্।

৩। ভেষজং ব্রহ্মহত্যায়া বলদেবো মহাবলঃ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন কস্মাচ্চক্রে হলায়ুধঃ।

৪। কথঞ্চ দ্রৌপদেয়াস্তেঽকৃতদারা মহারথাঃ।
পাণ্ডুনাথা মহাত্মানো বধমাপুরনাথবৎ॥

প্রশ্ন শুনিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি কহিলেন, আমার এখন ক্রিয়াকাল উপস্থিত, আমি বলিতে পারিব না। তুমি বিন্ধ্য পর্ব্বতে যাও; সেখানে পিঙ্গাক্ষ, বিবোধ, সুপত্র ও সুমুখ নামে বেদশাস্ত্রজ্ঞ চারিটী পক্ষী আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সবিস্তর জানিতে পারিবে। জৈমিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পক্ষীরা কে? মার্কণ্ডেয় পক্ষিগণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন উপলক্ষে কহিলেন, ইহারা সুকৃষ নামক মুনির পুত্র; অতিথিকে আত্মমাংস প্রদান করিতে অস্বীকার করায় পিতৃশাপে পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। জৈমিনি অতঃপর বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিয়া পক্ষীদিগকে প্রশ্নচতুষ্টয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর দেন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের এই ঘটনা দুর্গামঙ্গলে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"ব্যাসশিষ্য মহাতেজা জৈমিনি তপোধন। গুরুকে জিজ্ঞাসে মুনি অপূর্ব্ব কথন॥
কহ গুরুদেব মোকে পরম তত্ত্বকথা। চণ্ডীর বৃত্তান্ত কহ না কর অন্যথা॥
অষ্টম মন্বন্তরেত সন্দেহ বহুতর। তার প্রতি ভ্রম মোর ঘুচাও সত্বর॥
এতেক কহিলা যদি করিয়া ভকতি। কহিলেন ব্যাসদেব তবে তার প্রতি॥
পরম আমোদে তবে তাহাকে কহিলা। সাধু সাধু বলি মুনি অতি প্রশংসিলা॥

তাজ প্রশ্ন করিহ জৈমিনি তপোধন । সকল না জানি আমি সেহি বিবরণ ॥
মার্কণ্ডেয় মহামুনি তপ করে যথা । সত্বর গমনে তুমি চলি যাও তথা ॥
এতেক কহিলা যদি ব্যাস মহামুনি । গুরুর আজ্ঞায় তথা চলিলা জৈমিনি ॥
মার্কণ্ডেয় স্থানে উত্তরিলা তপোধন । জৈমিনি করিলা তার চরণ বন্দন ॥
মার্কণ্ডেয় দিলা তাকে বসিতে আসন । অতিথি ব্যবহারে মুনি করিলা অর্চ্চন ॥
শ্রম দূর হৈলে তবে জিজ্ঞাসে বচন । কহ মুনিবর এথা গমন কারণ ॥
তবে মুনি জৈমিনি করিলা নিবেদন । অষ্টম মন্বন্তরের কথা অপূর্ব্ব বিবরণ ॥
সেহি পুণ্যময় কথা বিশেষ শুনিতে । ই হেতু আইল মুনি তোমা সম্ভাষিতে ॥
তবে মার্কণ্ডেয় মুনি বিনয় করিয়া । উপদেশ কহিলা জৈমিনি সম্বোধিয়া ॥
নিয়ম করিছি আমি তপস্যা কারণ । কহিতে বিলম্ব হয় না পারি এখন ॥
বিন্ধ্য পর্ব্বতে আছে পক্ষী দুইজন । সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তারা বড়ই নিপুণ ॥
গৌতমের পুত্র তারা গৌতম সমান । গৌতমের শাপে পক্ষিযোনি উপাদান ॥
তা সমার ঠাঁঞি তুমি যাও মুনিবর । সকল বৃত্তান্ত তারা কহিবে সুন্দর ॥
মার্কণ্ডেয় স্থানে শুনি এতেক বচন । বিন্ধ্যপর্ব্বতে তবে গেলা তপোধন ॥
দেখিলা তথাতে গিয়া পক্ষী দুইজন । পক্ষী সম্ভাষিলা বলি বিনয় বচন ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হেন জানিলা নিশ্চয় । কিন্তু পক্ষীরূপ দেখি মনেতে বিস্ময় ॥
ইরূপ হইল কোন কর্ম্মের বিপাকে । কহিবা সে সব কথা যদি কৃপা থাকে ॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্মপক্ষী কহে কথা । জিজ্ঞাসিলা মুনিবর কেন আইলা এথা ॥
পক্ষিরূপ হৈল আমি শাপের কারণ । শুন মুনিবর আগে সেহি বিবরণ ॥
গৌতম নামে শুনিয়াছ মহাতপোধন । তাহার আশ্রমে আইলা অতিথি একজন ॥
অতিথি কহিল কথা মুনি সম্বোধিয়া । আতিথ্য করিবা আজি নরমাংস দিয়া ॥
শুনিয়া এতেক কথা গৌতম তপোধন । পুত্র সব আনি মুনি জিজ্ঞাসে তখন ॥
মাংসাকাঙ্ক্ষী অতিথি হইল উপস্থিত । আপনার মাংস তাকে দিবার উচিত ॥
আমরা সম্মত নহি বলিল তখন । পুত্রকে মারিতে চাহে বাপ নিদারুণ ॥
এতেক শুনিয়া মুনি কুপিল অন্তরে । দুঃসহ দারুণ শাপ শাপিলা সত্বরে ॥
না জান অতিথিপূজা অজ্ঞান কারণ । পক্ষিযোনি হও গিয়া তোরা দুইজন ॥
তবেত গৌতম মুনি মহা তপোধন । অতিথের পূজা হেতু ভাবিলা তখন ॥
কাটিতে আপন তনু উদ্যম করিলা । হেন কালে সেহি দেশ আসিয়া ধরিলা ॥
মুনি সম্বোধিয়া তিনি বলিলা তখন । তোমার মাংসেতে আমার নহে প্রয়োজন ॥
ব্রাহ্মণের মাংস আমি না করি ভোজন । প্রকারে বুঝিল তোমার অতিথি কেমন ॥
এতেক কহিলা যদি প্রভু নারায়ণ । আমা সমা প্রতি মুনি ভাবিলা তখন ॥
কপট না বুঝি শাপ দিল অকারণ । প্রতিকার বলি শুন পুত্র দুই জন ॥

আমার মুখের কথা না হবে অন্যথা। পক্ষী হইয়া পাইবে পরম জ্ঞানকথা॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইবা মহা জ্ঞানবন্ত। সর্ব্বতত্ত্ব জানিবা বেদের যত অন্ত॥
এতেক কহিলা মুনি শাপ প্রতিকার। তদবধি পক্ষী হইয়া আছি বহুকাল॥
ধর্ম্মপক্ষী হইয়া আছি শুন তপোধন। তোমার গমন হেথা কহ কি কারণ॥
তবে মুনি জৈমিনি করিলা নিবেদন। শুন পক্ষিরাজ কহি গমন কারণ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীর পূর্ব্বকথা। তোমা হৈতে শুনিবারে আসিয়াছি হেথা॥
পরম কৌতুক কথা মহা পুণ্যময়। শুনিতে করিল ইচ্ছা কহ মহাশয়॥
তবে সেহি ধর্ম্মপক্ষী লাগিলা কহিতে। মার্কণ্ডেয় যে কহিল ভাগুরি সহিতে॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, জৈমিনি মহাভারতীয় প্রশ্নচতুষ্টয় লইয়া মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট উপস্থিত হন। প্রথমে ব্যাসের নিকট জিজ্ঞাসা রূপনারায়ণের কল্পনা-সম্ভূত। প্রথমে স্বীয় গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের নিকট যাওয়া বোধ হয় রূপ-নারায়ণের মনে ভাল লাগে নাই। সেই জন্যই মূলে ব্যাসের নিকট জিজ্ঞাসা না থাকিলেও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতীয় প্রশ্নচতুষ্টয়ের স্থলে "চণ্ডীর বৃত্তান্ত কহ না কর অন্যথা" এই প্রশ্ন কল্পনা করা বোধ হয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততা ও চণ্ডীর গৌরব সূচনার জন্য। চারি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া চণ্ডীর বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত পঁহুছিতে অনেক বর্ণনা করিতে হইত এবং তাহাতে চণ্ডীর বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িত, কিন্তু চণ্ডীর বৃত্তান্ত প্রধান ভাবে বর্ণনাই রূপনারায়ণের উদ্দেশ্য ছিল, এই জন্যই প্রশ্নের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পক্ষিগণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত, জৈমিনির স্বয়ং পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা, পক্ষিগণের পিতার নাম সুকৃষ না বলিয়া গৌতম বলা, চারি পক্ষী স্থলে দুই পক্ষী বলা, এবং অতিথিরূপে ইন্দ্রকে উপস্থিত না করিয়া নারায়ণকে উপস্থিত করার কারণ নির্ণয় করা যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে পক্ষিগণের শাপ-মোচনের স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"যস্মাচ্চ যুষ্মাভিরহং প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।
তস্মাৎ তির্য্যক্ত্বমাপন্নাঃ পরং জ্ঞানমবাপ্স্যথ।
জৈমিনেঃ প্রশ্নসন্দেহান্ যদা বক্ষ্যথ পুত্রকাঃ
তদা মোক্ষ্যথ মচ্ছাপাদেষ বোঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥"

রূপনারায়ণ পক্ষিগণের শাপ-মোচনের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু জৈমিনির প্রশ্নের উত্তর দিলেই যে তাহাদের শাপ-মোচন হইবে সে কথা বলেন নাই। প্রস্তাব এইরূপ অসম্পূর্ণ রাখিবার কারণ কি, নির্ণয় করা যায় না। যাহা হউক, ইহা ব্যতীত মার্কণ্ডেয়-পুরাণের বর্ণনার সহিত দুর্গামঙ্গলের ঘটনাগত আর কোন অনৈক্য দেখা যায় না। "সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো" হইতে "সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ" পর্য্যন্ত ঘটনাগুলি একই প্রকার। তবে অনুবাদের সরলতা বা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য অথবা ভক্তি বা

কবিত্ব-প্রদর্শনার্থ স্থানে স্থানে মূল অপেক্ষা কোন কোন বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে যে স্থলে দেবীর রূপ-বর্ণনা এক কথায় সমাপ্ত হইয়াছে, রূপনারায়ণ সেই রূপ বর্ণনা হয়ত দুই পৃষ্ঠায় পূর্ণ করিয়াছেন। উপমা, অতিশয়োক্তি, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা প্রাচীন বঙ্গকবিরা অতি প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিতেন। রূপনারায়ণও দুর্গামঙ্গলে অনেক স্থলে সে কর্ত্তব্য বিবিধ ছন্দ ও অলঙ্কারে পালন করিয়াছেন। এইকালে আমাদের নিকট এই সকল রূপবর্ণনার ঘনঘটা তাদৃশ প্রীতিকর না হইলেও সে কালের শ্রোতাগণ উহাতে মুগ্ধ হইতেন। বরং সে কালে অন্য বর্ণনা অপেক্ষা এই সকল বর্ণনারই অধিক আদর ছিল। উপমার জন্য কবিগণ অর্দ্ধচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র, প্রবাল, মুক্তা, বিম্ব, বান্ধুলি, কদম্ব, কদলী, সিংহ, হস্তী, কোকিল, খঞ্জন প্রভৃতি খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক এক মহাসত্য আবিষ্কার করিতেন। রূপনারায়ণ রূপবর্ণনাদি স্থলে এই সকল চিরন্তন উপমা-লহরীর লীলা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। এই সকল স্থলেই তাহাকে মূল হইতে দূরে যাইতে হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রূপনারায়ণ চণ্ডী অবলম্বনে দুর্গামঙ্গল নামক গীতকাব্য বা পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ চণ্ডীমাহাত্ম্য রসালঙ্কার রাগ রাগিণীবিশিষ্ট গীতে পরিবর্ত্তিত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। আধুনিক আক্ষরিক অনুবাদের মত নীরস অনুবাদ অনুস্বার বিসর্গহীন সঙ্গীত প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সাধারণে যাহাতে চণ্ডীমাহাত্ম্য অনুরাগের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন করে, তাহার জন্য তিনি বিবিধ রাগ রাগিণী, বিবিধ ছন্দ অলঙ্কার, ও বিচিত্র ব্যাখ্যা দ্বারা চণ্ডীর নীরস কথাগুলিকে সরস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি যে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, দুর্গামঙ্গল পাঠ করিলে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

রূপনারায়ণের গ্রন্থে ত্রিপদী, চতুষ্পদী, তূণক, একাবলি, পয়ার প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কবি এই সকল ছন্দের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে কেবল দুইটী ছন্দের নাম দেখা যায়—পয়ার ও গীতছন্দ। আমরা যাহাকে পয়ার বলি, রূপনারায়ণও তাহাকেই পয়ার বলিয়াছেন। কিন্তু গীতছন্দ বলিয়া কোন বিশেষ ছন্দকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কোন স্থলে পয়ার কোন স্থলে ত্রিপদী গীতছন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতছন্দের অর্থ 'গাহিবার পদ' করা যাইতে পারে, কিন্তু সে অর্থ এ গ্রন্থে খাটে না। কেন না দুর্গামঙ্গলের সমস্তই গান। যেখানে নূতন ছন্দ বা নূতন কোন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থলেই রাগিণী ও ধুয়া লিখিত আছে। ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের নাম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রাগিণী ও তাল অনুসারে পদ রচনা করা হইত। রূপনারায়ণের গ্রন্থে মালতী, পঠমঞ্জরী, কামোদ, ভৈরবী প্রভৃতি বিবিধ রাগিণী ব্যবহৃত হইয়াছে। রূপনারায়ণের রচনার আদর্শ ও রাগ রাগিণী প্রয়োগের প্রথা দেখাইবার জন্য আমরা কএকটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

মালসী—ভৈরবী।

জয়তি জগতি সুন্দরী দেবী।
শৌরি গৌরীনাথ সেবি॥ ধুয়া।

পাবক তপন কিরণ দেহ।
চিকুর নিকর সজল মেহ॥
শ্রীমুখ সদন বদন ইন্দু।
তরল কমল শম্ভু সিন্ধু॥
অলক তিলক ভালে শোহে।
সুন্দর সিন্দুর বিন্দু তাহে॥
কবরী কেশর কুসুম শালী।
শিরসি প্রকট মুকুট ভালি॥
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন তিন।
ঈশ আশক নিমিখ হীন॥
অলখি অসীম ভাওর ভঙ্গ।
উপেখি কাম ধনুক রঙ্গ॥
বদন মদন স্যন্দন জানি।
কুণ্ডল চারু চক্র মানি॥
যো রথ আরোহি মদন বীর।
জিনিল পিনাকপাণি ধীর॥
নাশা উপর নাগ সোতি।
কনক চন্দ্র কাঁতি সাঁথি॥
ভুবনবিজয়ী বৈজয়ন্তী।
উপেখি কাম ধাম চিন্তি॥

বিম্ব নিন্দিত অধর রঙ্গ।
তহি তুলি ভ্রমতি ভৃঙ্গ॥
চারু দশন অশনি কাঁতি।
নিন্দে দাড়িম্ব বীজ পাঁতি॥
অমিঞা বরিখে মধুর ভাখি।
মধুর মন্দ মন্দ হাসি॥
কম্বু কণ্ঠ মোহে সর্ব্ব।
হরল কমল নাগ গর্ব্ব॥
পাণি মানি পদ্মনাল।
শোহে কনক কঙ্কট জাল॥
পীন সঘন সুকুচ ভার।
ভাতি বিবিধ রতন হার॥
ক্ষীণ মধ্য ত্রিবলি বস্তু।
সাধন শম্ভু সিদ্ধি পন্থ॥
হেরি গভীর নাভি কূপ।
বাস আশ ভুজগ উপ॥
নূপুরে শ্রীপুরে নাদয়ন্তি।
শবদ অবোধ বোধয়ন্তি॥
সেহি পাদপদ্ম সঙ্গ।
রহল রূপ নারায়ণ ভৃঙ্গ॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

নমো নমো মহাদেবী, তোকে সতত সেবি, তুমি নারায়ণী বহুরূপা।
কি করিব তোমা স্তুতি, আমার অল্পমতি, আপন প্রভাবে কর কৃপা।
অখিল জগৎ জনে, আর পঞ্চভূত প্রাণে, যিনি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা।
নমো নমো তার পদে, সতত পরমামোদে, বিত্তরূপা তুমি জগন্মাতা।
চৈতন্যরূপিণী যিনি, ব্যাপিয়া জগৎ ত্রিণি, আছেন পরম কুতূহলে।
তিনি দেবী কৃপাময়ী, সুরেক কল্পকা জয়ী, নমো নমো তার পদতলে।

আমা সবার দুর্গতি, হরুকা সে ভগবতী, কৃপা করি করুকা কল্যাণ ।
যেহি দেবী পূর্ব্বকালে, অমর স্তবন কৈলে, মারিলা মহিষ বলবান ।
পূর্ব্বাপর প্রতিদিন, সুরেন্দ্রসেবিত যিন, ইষ্ট লাভ করেন সদায় ।
তিনি যে পরমেশ্বরী, অসুর-সংক্ষয়-কারী, নমো নমো নমো তার পায় ।
যাহাকে স্মরণ মাত্র, হরে দুঃখ অচিরাত, সর্ব্বাপদ বিনাশে তখন ।
ব্রহ্মা আদি করি দেবে, যাহার চরণ সেবে, সে পদ কমলে রহু মন ।
মহাদৈত্য তাপ পাইয়া, ভক্তি নম্র মূর্ত্তি হৈয়া, সম্প্রতি স্মরণ করি তাক ।
করুকা অসুর নাশ, পূর্ণ হউক অভিলাষ, শুনিয়া সুরের স্তুতিবাক্ ।
ভগবতী ভাবিনী, ভবভয়-হারিণী, দুর্গা দুর্গভয়ে কর পার ।
তোমার পদারবিন্দে, সতত পরমানন্দে, নমো নমো নমো বারে বার ।
এই অভিলাষ করি, স্তুতি কৈলা কর যুড়ি, অরি ভয় পাইয়া দেবগণ ।
কহে রূপনারায়ণ, সংযত করিয়া মন, ভাবে যেন সদা সে চরণ ।

ভৈরবী ।

দেখ দেবী ভদ্রকালী,
দিক্ চণ্ড তুণ্ড শালী,
দিক্ পাদ দিক্‌পাণি পালিনী । ধুয়া ।

দিক্ তিন গুণ আঁখি,
বিরিঞ্চি + রাখি,
বিবিধ আয়ুধ আধ
ওষধীশ ধারিণী ।

কৌমোদকী চারু চক্র,
শোহে বৈরী নাশে দক্ষ,
অসংখ্য বিপক্ষে কক্ষ,
সর্ব্বভক্ষ্য ঈক্ষণী ।

তামসী শ্রেয়সী দেবী,
পাদপদ্ম নিত্য সেবি,
অঞ্জন গঞ্জন দেহ,
ভীম সীম রূপিণী ।

ইন্দ্র চন্দ্র দেববৃন্দ,
পূজহি পদারবিন্দ,
বাহন মৃগেন্দ্র ইন্দ্র,
ব্রহ্মবন্দ্যবন্দিনী ।

খড়্গপাণি লোহ দণ্ড,
নিশ্চিত + মুণ্ড,
ভূষণ্ড কোদণ্ড দণ্ড,
শঙ্খ শূল ধারিণী ।

এহি রূপে দেখি মাতা,
আনন্দে বন্দিলা ধাতা,
প্রসন্ন প্রসন্ন + ,
বৈর ভীতি বাদিনী ।

ই ভব তরিতে সেতু,
শক্তি ভক্তি মুক্তি হেতু,
আনন্দে মহারবিন্দে,
ভাব তাই ভাবিনী।

সেহি দেবী বহুরূপা,
সমাকে করুকা কৃপা,
রূপনারায়ণ ঘোষ,
ভাষ পরকাশিনী।

সাধারণে যাহাতে আগ্রহে শ্রবণ কীর্ত্তন করে এবং নিতান্ত অজ্ঞ লোকেও যাহাতে চণ্ডীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, রূপনারায়ণ তাহার জন্য বিবিধ রাগ-রাগিণী যোগে চণ্ডীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই জন্য মার্কণ্ডেয়-পুরাণে যে কথা দুই শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, রূপনারায়ণ দুই পত্রে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য চণ্ডীর এক অংশ ও দুর্গামঙ্গলে তাহার যে অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ।
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু র্বৈশ্যপার্থিবৌ॥

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টু মিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।
মমত্বং মমরাজস্য রাজ্যাঙ্গেষখিলেষপি।
জানতোঽপি যথাঽজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম।
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈ র্দারৈ র্ভৃত্যৈ স্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি।
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।
তৎকেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা।

ঋষিরুবাচ।

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্।
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ।

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলং।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যৎ তেষাং মৃগপক্ষিণাং।
মনুষ্যাণাঞ্চ যৎ তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ।
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা।
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি।
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ।
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥"

এতেক কহিয়া তবে সুরথ নৃপতি। বৈশ্য সঙ্গে করি তথা গেলা শীঘ্র গতি ॥
মহা ঋষি মেধস তাহার ঠাঞি গেলা। প্রণাম করিয়া দুই কহিতে লাগিলা ॥
প্রণাম করিয়া কহে সুরথ রাজন। এক নিবেদন করি শুন ভগবান ॥
আমার হৃদয়ে এক জন্মিল বিস্ময়। খণ্ডাও সংশয় ঋষি তুমি মহাশয় ॥
যে রাজ্য ছাড়িছি তার প্রজাগণ প্রতি। হস্তী ঘোড়া ধন রত্ন আর যত ইতি ॥
এতেক রাজ্যাঙ্গ প্রতি দয়া কেন হয়। বিজ্ঞ হৈয়া অবিজ্ঞ হই বড়ই বিস্ময় ॥
জানিতেছি যদ্যপি দারুণ ভৃত্যগণ। তথাচ অজ্ঞান প্রায় হই কি কারণ ॥
আর এক বৈশ্য প্রভু দেখ পরতেক। পুত্রদারা সুহৃদে সর্ব্বস্ব হরিলেক ॥
নিরস্ত করিল অতিশয় কুবচনে। মহাদুঃখী হৈয়া বৈশ্য আসিয়াছে বনে ॥
যদ্যপি কলত্র পুত্র অতি নিদারুণ। তথাচ করয়ে স্নেহ কহ কি কারণ ॥
মহা দুঃখে দুঃখিত আমরা দুইজন। দৃষ্ট দোষ বিষয় মমতা করে মন ॥
দয়ায়ে আকুল চিত্ত ইবা কি বিষম। কি হেতু এমত হয় মুনির সত্তম ॥
অবিবেক তিমিরান্ধ হয় মূঢ় জন। অজ্ঞানে আবৃত সেহি থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
তাহার ইরূপ হৌক তাহা নাহি লিখি। জ্ঞানবন্ত হৈয়া কেন দেখিয়া না দেখি ॥

সর্ব্বতত্ত্ব জানি ছুই সকল সর্ব্বার্থ। জানিয়া সে জ্ঞান কেন সব হয় ব্যর্থ ॥
এতেক অপূর্ব্ব কথা রাজা নিবেদিলা। তবে সে মেধস ঋষি কহিতে লাগিলা ॥
মহামুনি মেধস কহন্তি মোক্ষপথ। সাবধান হৈয়া শুনে সমাধি সুরথ ॥
শুনহ ভকত ভাই হৈয়া একমন। দুর্গামঙ্গল কহে রূপনারায়ণ ॥

ভৈরবী।

ভগবতী ভাবিনী ভবমোহিনী। দয়ার নিধান তিন লোকের জননী ॥ ধ্রু
তবে ঋষি কহে শুন সুরথ নৃপতি। কহিব পরম তত্ত্ব কর অবগতি ॥
আহার মৈথুন নিদ্রা ভয় আদি করি। বিষয় গোচর জ্ঞান ইহাকে সে বলি ॥
এহিত বিষয় জ্ঞান সর্ব্বপ্রাণী ধরে। বিষয় স্বভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাব করে ॥
ই বস্তু তোমার কহে ই বস্তু আমার। সুখ দুঃখ অভিলাষ যত ইতি আর ॥
এ সকল জ্ঞান প্রাণী মাত্রের সমান। প্রকৃতি আকার ভিন্ন কিন্তু মতিমান্ ॥
এহি দেখ পরতেক আপন সাক্ষাত্। বিশেষিয়া কহি কিছু শুন নরনাথ ॥
ভিন্ন প্রকৃতি দেখ ভিন্ন আকৃতি। দিবসে না দেখে পেচকাদি পক্ষীজাতি ॥
কোন প্রাণী রাত্রি-অন্ধকাক আদি করি। রাত্রি দিনে অন্ধ কোন প্রাণী করি বলি ॥
মার্জ্জারাদি করি জন্তু দেখে রাত্রি দিনে। বিষয়েত জ্ঞান আছে সকলের মনে ॥
ইরূপ জ্ঞানেক যদি বল তুমি জ্ঞান। অনেক মনুষ্য তবে আছে জ্ঞানবান্ ॥
কেবল মনুষ্য নহে যেহি ধরে প্রাণ। পশু পক্ষী মৎস্য আদি সবের সমান ॥
বিষয় গোচর জ্ঞানে জ্ঞানী সর্ব্বজন। মৃগ পক্ষী যেমত তেমতি নরগণ ॥
ই জ্ঞানেক জ্ঞান না বলি নরনাথ। এহি পক্ষী দেখ রাজা আপন সাক্ষাত ॥
যদ্যপি আপনে পক্ষী পীড়িত ক্ষুধাতে। আহার দিতেছে দেখ শিশুর মুখেতে ॥
ইবা শিশু ইহার করিবে কোন কর্ম্ম। দেখহ মনুজরাজ এহি জ্ঞানধর্ম্ম ॥
উপকার পাবে করি সাভিলাষ হৈয়া। শিশুকে আহার দেয় আপনে দুঃখ পাইয়া ॥
ইহা কিনা দেখ রাজা আপন সাক্ষাত। সকলেরি মোহ আছে শুন নরনাথ ॥
অতি মহাজ্ঞানী যিনি তার মোহ আছে। মায়ায় মোহিত মোহগর্ত্তে পড়িয়াছে ॥
তোমরা সংসারী রাজা সংসারে উৎসুক। মোহ হয় করি মনে ভাব কেন দুঃখ ॥
এহি যে তোমার মোহ না কর বিস্ময়। মহামায়ার প্রভাবে সকলের মোহ হয় ॥

মায়ূর।

জয় জয় দেবী কে জানে তব সীমা। হরিহর ব্রহ্মা যার না জানে মহিমা ॥ ধ্রু।
জগৎ পতির মায়া সেহি মহামায়া। জগৎ মোহেন তিনি মহামোহ দিয়া ॥
মোহিত করেন মহাজ্ঞানী সেহি দেবী। ব্রহ্মা আদি করিয়া যাহার পদ সেবি ॥
যোগনিদ্রা বিষ্ণুর সেহি ভগবতী। পরম আনন্দময়ী সর্ব্বত্র তার স্থিতি ॥
সকল জ্ঞানীর চিত্ত বলে আকর্ষিয়া। মোহ দিতেছেন তিনি মহামায়া দিয়া ॥

পরম জ্ঞানীর রাজা এতাদৃশ হয়। তোমার হইব মোহ ই কোন বিস্ময়॥
সেহি মহামায়া দেবী স্থজনকারিণী। প্রসন্না হইলে তিনি মুকুতিদায়িনী॥
মহাবিদ্যারূপা ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী। পরম মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী॥
মোক্ষসাধনরূপা সদা বিদ্যমানা। সংসার বন্ধের হেতু তিনি সে নিপুণা॥
অবিদ্যা স্বরূপ মহাবিদ্যা স্বরূপিণী। সর্ব্বসুরেশ্বরী তিনি পরম কল্যাণী॥
যত ইতি চরাচর ব্রহ্মা আদি করি। সর্ব্ব সম্পূর্ণা তিনি সকলের ঈশ্বরী॥"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সাধারণে যাহাতে আগ্রহের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন করে, সেই উদ্দেশ্যে রূপনারায়ণ 'রায়মঙ্গল' 'মনসামঙ্গল' 'ভারতমঙ্গল' প্রভৃতি পাঁচালীর ন্যায় দুর্গামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভূমিতে দুর্গামঙ্গল কীর্ত্তিত হইত। এই সকল কীর্ত্তন গ্রন্থে দুই শ্রেণীর গান দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর গান সকলে মিলিয়া বিশুদ্ধ রাগিণী ও তালযোগে গাইয়া থাকে। আর কতকগুলি গান প্রধান গায়ক স্থর করিয়া আবৃত্তি করিয়া যায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর গানের প্রথম পদ বা ধূয়া দলের অন্যান্য লোকে প্রধান গায়কের এক এক চরণ আবৃত্তির মধ্যে মধ্যে গাইয়া থাকে। এই গান গুলি ঘটনার বর্ণনা মাত্র। এ গুলি প্রায়ই পয়ার ছন্দে রচিত, কদাচিৎ ত্রিপদীও দেখিতে পাওয়া যায়। রূপবর্ণনা, স্তব প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর গান। এ শ্রেণীর কোন কোন গানেও ধূয়া আছে। দুর্গামঙ্গলে এই উভয় শ্রেণীর গানই দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং গ্রন্থ মধ্যে বহু সংখ্যক ধূয়া আছে। আমরা দুই একটী ধূয়া উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

(১) ভৈরবী।

জয় জয় চণ্ডে, জিত চণ্ডমুণ্ডে,
প্রচণ্ডরূপিণী চণ্ড অসুর সুদণ্ডে॥

(২) ভৈরবী রাগ—গীতছন্দঃ।

কপালী করালী কালী, দোলে মুণ্ডমালা ভালি,
রক্তবীজ দৈত্যরাজ, হীন বীর্য্য কীর্য্যহি।

(৩) ভৈরবী।

জননী গো জনম লৈয়া অভিলাষা।
অভিমত এহি দেখি, করুণাময়ী তুঁহি, তুয়া নিজ কিঙ্করে আশা।

যে স্থলে কোন রসের অবতারণা করিবার অবসর ঘটিয়াছে, রূপনারায়ণ সেই স্থলে স্বীয় লেখনীকে অনুবাদের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রস্তাব বা ছন্দের অবসান স্থলে কবি স্বীয় নামের ভণিতা দিয়াছেন। ভণিতাতে রূপনারায়ণ কবিত্বের সহিত ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবলোকনার্থ আমরা তিনটী উদ্ধৃত করিলাম;—

১। সেহি পাদপদ্ম সঙ্গ।
রহল রূপনারায়ণ ভৃঙ্গ॥

২। শুন দেবী বলি আমি, অসীম মহিমা তুমি,
তথাচ কহিতে করি সাধ।
কহে রূপনারায়ণ, শিশুর বচন যেন,
মায় শুনে করিয়া আহ্লাদ।

৩। যা বিনু শকতি হীন,
ঈশ আদি লোক তিন,
রূপনারায়ণ ঘোষ-ভাষপরকাশিনী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রূপনারায়ণ সংস্কৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতি জানিতেন। দুর্গামঙ্গলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতির রচনা এবং বাঙ্গালার সহিত উহাদের মিশ্রিত রচনা উভয়বিধ রচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে পারশী, উর্দ্দু প্রভৃতির বহুল প্রচার ছিল; কিন্তু রূপনারায়ণের রচনায় পারশী বা উর্দ্দুর মিশ্রণ নাই। ইহার দুই কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, হয়ত—কবি পারশী বা উর্দ্দু জানিতেন না। নয়ত—ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তিনি যাবনিক শব্দ প্রয়োগ ইচ্ছা করেন নাই।

রূপনারায়ণের সময়ে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, দুর্গামঙ্গলে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। তৎকালে দেশে বাঙ্গালা কাব্যে বৈষ্ণবকবিদিগের প্রভাব বড় বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের ব্রজভাষায় বা ব্রজভাষা মিশ্রিত বাঙ্গালায় রচিত প্রেমবিরহবিষয়ক গীতিকবিতাগুলি বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সাধারণ ভাষাতেও ব্রজভাষার মিশ্রণ কম ছিল না। দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক', সপ্তমীর 'তে' স্থলে 'ত' ব্যবহৃত হইত। কারক বিশেষে এখন যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন তেমন হয় নাই। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়ার 'কে' এর পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে সপ্তমীর 'ত' দেখা যায়। তৃতীয়ার 'কর্ত্তৃক' বিভক্তির ব্যবহার ছিলনা, 'কর্ত্তৃক' স্থলে 'তে' ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান কালের 'ইতেছে' প্রভৃতি ক্রিয়া বিভক্তির প্রয়োগ কম। তৎপরিবর্ত্তে সংস্কৃতের অনুরূপ 'করন্তি' 'গায়ন্তি' প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। সম্ভ্রম বুঝাইতে কোন কোন ক্রিয়াপদে 'আ' যোগ করা হইত। যেমন—করুকা (করুন), হরুকা (হরুন), 'আশ্রয় করিয়া' স্থলে 'আশ্রাইয়া', আক্রমণ করিল স্থলে 'আক্রাইল'। এইরূপ কৃধাতুর প্রয়োগ ব্যতীত শব্দ বা ধাতু হইতে মুখ্য ক্রিয়ার রচনা দেখা যায়। তৎকালে বাঙ্গালায় বিবিধ ছন্দের ব্যবহার হইয়াছিল। কিন্তু এক পয়ার ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের নাম রূপনারায়ণ উল্লেখ করেন নাই। রূপনারায়ণের সময়ে ব্যবহৃত অনেক শব্দ বর্ত্তমানে একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দুর্গামঙ্গলের ভাষার প্রাচীনত্ব

প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল শব্দ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতেই উহা দৃষ্ট হইবে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে আর লিখিত হইল না।

রূপনারায়ণের সময়ে বাঙ্গালা 'অপভাষা' বলিয়া পণ্ডিত সমাজে গণ্য ছিল। এই জন্য গ্রন্থারম্ভে রূপনারায়ণকে বিনয়ের সহিত বলিতে হইয়াছে ;—

"তাহার চরিত্র কিছু কহিতে করি আশা।
শ্লেষ না করিয় ভাই বলি অপভাষা।
চণ্ডাল ভাণ্ডেতে যদি থাকে গঙ্গাজল।
তথাপি পবিত্র বড় জানিয় নিশ্চল॥"

রূপনারায়ণের সময়ের বঙ্গদেশে মঙ্গলাখ্য গীতগুলির খুব প্রচার হইয়াছিল। শিক্ষিত লোকের মধ্যে যাহাদের কবিত্ব ও গানশক্তি ছিল, তাহারা দল বাঁধিয়া এই মঙ্গলগীত গাহিতেন। এইকালে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বেষাদ্বেষি খুব ছিল (১), কিন্তু বৈষ্ণব কবিদিগের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের অধিকার শক্তিগণের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। রূপনারায়ণ শাক্ত ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবকবিগণের কবিত্বপ্রভাব তিনি এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার শাক্তকাব্যে বৈষ্ণবের ভক্তি, বিনয় ও মধুরতা প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

---

(১) এই দ্বেষাদ্বেষি নিবন্ধনই 'দুর্গামঙ্গলে' বৈষ্ণবাবতার চৈতন্যদেবের বন্দনাদি করা হয় নাই।

ছাতনার ইষ্টক-লিপি।

(জ্যৈষ্ঠমাসের অধিবেশনে পঠিত)

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইষ্টকে খোদিত লিপির সংখ্যা অতি কম। তদ্দ্বারা প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য বাহির করা অতিশয় কঠিন; কিন্তু সুখের বিষয়, আজ যে খোদিত ইষ্টকখানি এই সভাস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে, এই ইষ্টকখানি হইতে কতকটা ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

প্রবাদমালা অনেক সময়ে অলীক ঘটনামূলক হইলেও সময়ে সময়ে তাহা হইতেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য জানিতে পারা যায়। বহুদিন হইতে ছাতনায় যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই ক্ষুদ্র ইষ্টকলিপি হইতে তাহার ঐতিহাসিকতা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে। এই কারণে এই খোদিত ইষ্টকখানি আমাদের আলোচ্য। যে স্থান হইতে ও যেরূপে ইষ্টকখানি পাওয়া গিয়াছে, অগ্রে তাহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বাঁকুড়া হইতে প্রায় চারিক্রোশ দূরে হাজারীবাঘ হইতে সহরঘাটী পর্য্যন্ত যে পুরাতন বড় রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার ধারে ছাতনা গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে একটী বিখ্যাত সামন্তরাজ্য ছিল।

কোন্ সময়ে এই রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রবাদ আছে যে, প্রথমে এখানে ব্রাহ্মণ-রাজগণই রাজত্ব করিতেন। পরে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবী ব্রাহ্মণ রাজাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং সামন্তগণ রাজা হইবে বলিয়া রাজাকে স্বপ্ন দেন। স্বপ্ন দেখিয়া রাজা অতিশয় চিন্তিত হইলেন; তিনি পাত্রমিত্র ডাকিয়া সামন্তগণকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে প্রায় সকল সামন্তই নির্ম্মূল হইল। এই সামন্তগণ কোন্ জাতীয় ও কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। সমাজে ইহারা জলাচরণীয় ও নবশাখদিগের ন্যায় সম্মানিত। একই পুরোহিত উভয় জাতির যাজকতা করে। কোন কোন সামন্ত উপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, সামন্ত সম্ভবতঃ সামতাল নামেরই রূপান্তর মাত্র। সামতাল অর্থাৎ সাঁওতালগণই ব্রাহ্মণ রাজাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার এবং ক্ষমতাবলে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমে লোকে তাহাদের উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এই অনুমান কতদূর সত্য, তাহা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদিগের বিবেচ্য বিষয়। ছাতনার বর্ত্তমান সামন্তরাজগণ আপনাদিগকে ছত্রি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন।

কথিত আছে, ব্রাহ্মণরাজ সামন্তদিগের উচ্ছেদ সাধন করিলে ১২ জন সামন্ত জনৈক কুম্ভকারের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া অনেক কষ্টে জীবন রক্ষা করে। তাহারা কুম্ভকারদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করায় রাজার লোকেরা ধরিতে পারে নাই। যাহা

হউক, তাহারা অরণ্যে আশ্রয় লইল এবং প্রতিশোধ লইবার চিন্তা করিতে লাগিল। জঙ্গলেই তাহারা দলপুষ্ট করিতে লাগিল এবং একদিন অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া বলিল, 'আজি আমাদের সঙ্গে যে যে ভোজন করিবে, সেই আমাদের জাতিভুক্ত হইবে।' বলা বাহুল্য, এই সুযোগে অনেক নীচজাতি সামন্তদিগের সহিত মিশিয়া যায়। কেবল একজন সামন্ত সেই ছত্রিশ জাতির সহিত আহার করিতে আপত্তি করিয়া দূরে এক পাথরে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। এইজন্ত সকলেই তাহাকে সমাজচ্যুত করিল। সে 'পাথর কাটা' সামন্ত নামে খ্যাত হইল। আজও তাহার বংশীয়েরা 'পাথরকাটা সামন্ত' বলিয়া পরিচিত। সামন্ত-সমাজে ইহারা মর্য্যাদায় হীন। যাহা হউক, এক দিন সামন্তগণ অতিশয় ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত হইয়া জঙ্গলে বেড়াইতেছিল; এমন সময়ে বাশুলীদেবী বৃদ্ধা অরতীবেশে কেঁদ লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা কেঁদ চাহিলে তিনি সকলকে দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধার ঝুড়ি হইতে কেঁদ কাড়িয়া লইল। তখন বাশুলী পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই ১২টী টাঙ্গি (পরশু) ও খাঁড়া গ্রহণ কর, অমুক দিনে তোমরা ছদ্মবেশে রাজবাটী প্রবেশ করিবে। ঐ দিবস উৎসবে রাজা বাহিরে আসিবে। যখন ঢাকের বাজনায় নির্দ্দিষ্ট বোল বাজিতে থাকিবে, তখন তোমরা প্রকাশ্যে রাজাকে আক্রমণ করিবে। যুদ্ধে তোমাদের জয় হইবে, কিন্তু তোমরা আমার কেঁদ কাড়িয়া লইয়াছ, সুতরাং প্রথম রণে একজন কাটা পড়িবে।' তদনুসারে ১২ জন সামন্ত অনুচর সমভিব্যাহারে উৎসব দেখিবার ছলে গুপ্তভাবে রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। রাজা দেবদর্শনে বাহিরে আসিলেন। এ দিকে ঢাকে সহসা সঙ্কেত বোল বাজিয়া উঠিল,

"ডে ডেং ডে ডেং কাশমলা। লার্‌বি পার্‌বি এই বেলা॥"

১২ জন সামন্ত তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাশুলীপ্রদত্ত তীক্ষ্ণধার টাঙ্গি ও খড়্গ বাহির করিয়া হুহুঙ্কার রবে রাজাকে আক্রমণ করিল। বাশুলীর কথামত একজন সামন্ত হত হইলে অবশিষ্ট ১১ জন রাজাকে কাটিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিল। এইরূপে সামন্তগণ কুলক্ষয়ের প্রতিশোধ লইয়া রাজ্যাধিকার করিল। প্রবাদ, এখন যেখানে রাজবাড়ী তাহার ঈশানকোণে ছাতনার পশ্চিমে ব্রাহ্মণ-রাজাদিগের রাজপ্রাসাদ ছিল। দুই একখানি ইষ্টক ও ভাস্করকার্য্য সমন্বিত প্রস্তর আজও তথায় পাওয়া যায়। লোকে বলে, তথায় রাজারা যে সকল লোককে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা এখনও তথায় কবন্ধ হইয়া আছে, মধ্যে মধ্যে ভয় দেখাইবার জন্ত মানবের সমক্ষে উপস্থিত হয়। অশোকবনে ঐ স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণীর অগ্রভাগে তামার এক প্রকাণ্ড কটাহে পাকতৈল সঞ্চিত ছিল। ঐ কটাহের উপর তামার ঢাকনিতে ব্রাহ্মণ-রাজাদিগের বিবরণ লিখিত ছিল। কিন্তু ঐ কটাহ বা উহার ঢাকনি কে রাখিয়াছে, জানিবার উপায় নাই।

১১ জনেই রাজ্যাধিকার করিয়াছে, সুতরাং কে রাজা হইবে, তাহা লইয়া গোলযোগ

হইল। প্রতিদিন এক একজন রাজা হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল, পরে সকলেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিন পরামর্শ করিল যে, কল্য প্রাতে উঠিয়া অগ্রে যাহাকে দেখিব, তাহাকেই রাজা করিব। এ দিকে বিধাতার নির্বন্ধক্রমে ঠিক ঐ দিন দুইটি রাজপুত্রবালক জগন্নাথদর্শনে যাইতে যাইতে সম্বলহীন হইয়া ছাতনায় উপস্থিত হইল এবং রাজাদিগের দানশীলতার পরিচয় পাইয়া অতি প্রত্যুষেই ভিক্ষা করিবার জন্য রাজ-ভবনে প্রবেশ করিল। সেই সময় সামন্তগণ কাহাকে রাজা করিবে? এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। এমন সময় তাহাদের সম্মুখে দুইটী সর্ব্বসুলক্ষণ কুসুম-সুকুমার বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকদ্বয় আসিয়াই তাহাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মহারাজ আমরা জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি, পথে নিঃস্ব হইয়া আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" সামন্তগণ বলিলেন, "আমাদের ভিক্ষা দিবার কিছুই নাই,—রাজ্য, ধন, জন, যান, বাহনাদি যাহা কিছু সকলই আপনাদের হইয়াছে, আমরা আপনাদের আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। এক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে ও প্রজামণ্ডলীকে পালন করেন।" এই বলিয়া তাহারা সেই বালক দুইটীকে রাজোচিত অভিবাদন করিল। উভয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠই সিংহা-সনে অভিষিক্ত হইলেন। বালকদ্বয় এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যলাভে তথায় রাজা হইয়া পরাক্রান্ত সামন্তগণের সাহায্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই দুই জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হামীর রায় ও কনিষ্ঠের নাম উত্তর রায়। বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরা এই হামীর ও উত্তরের বংশধর। উত্তররায় বাশুলী দেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, উহার ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। ভগ্ন মন্দিরের প্রাচীর ও প্রধান দেবালয় ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল। ঐ সকল ইষ্টকের অধিকাংশই লিপিযুক্ত। আমরা ঐ দেবালয়ে দুই প্রকার (এক প্রকার উচ্চ অক্ষরে ও একপ্রকার গভীর অক্ষরে) খোদিত ইষ্টক-লিপি দেখিয়াছি। উচ্চ অক্ষরে খোদিত ইষ্টকে লেখা আছে—"শ্রীং ছাতনানগরেস শ্রীং উত্তররায় সক ১৪৭৫"। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সর্ আলেক্জান্দার কনিংহাম্ পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি এই স্থান সম্বন্ধে তাঁহার আর্কিওলজিকাল সর্ভে রিপোর্টে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"About fourteen miles from Bankura on the old grand Trunk Road through Hazaribagh to Shaharghati at the village of Chatna are some ruins; the principal consists of some temples and ruins within a brick enclosure, the enclosure and brick temples that existed having long become mere mounds, while the laterite temples still stand; the bricks used are mostly inscribed, and the inscription gives a name which I read as Konaha Utara Raja, while the pandits read it as Hamira Utara Raja; the date at the end is the same in all, *viz* sake 1476" (Arch. Sur. Rept. VIII. p. 199.)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ বাঁকুড়া হইতে ছাতনার দূরত্ব ১৪ মাইল লিখিয়াছেন, উহা প্রকৃত পক্ষে ৮ মাইল হইবে। তিনি ও তাঁহার পণ্ডিত ইষ্টকলিপি হইতে 'কোনহ উত্তর রাজা' বা 'হবীর উত্তর রাজা' পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রবাদ অনুসারে উত্তররায় মন্দির করিয়াছিলেন এবং ঐ মন্দিরের ইষ্টক সমূহে "শ্রী২ ছাতনানগরেস শ্রী২ উতররায় সকে ১৪৭৫" লিখিত হইয়াছে। আমরা সেই প্রাচীন ভগ্নমন্দির হইতে যে ইষ্টকখানি * সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই অদ্যকার সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে।
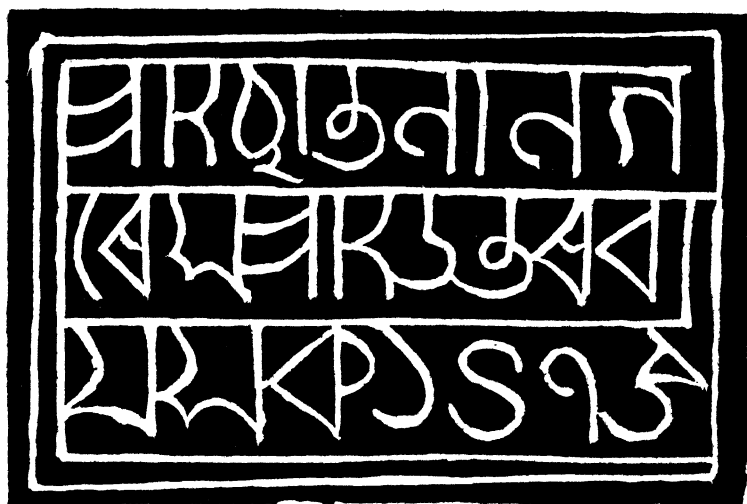
ইহাতে দেখিতে পাইবেন, "শ্রী২ ছাতনানগরেস † শ্রী২ উতররায় সক ‡ ১৪৭৫" খোদিত আছে।

পূর্ব্ববর্ণিত প্রবাদবাক্য সমস্ত প্রকৃত হউক বা না হউক, কিন্তু উত্তররায় নামে যে একজন রাজা ছাতনায় রাজত্ব করিতেন, তাহা এই সামান্য ইষ্টক লিপিই কতকটা সমর্থন করিতেছে এবং পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সকল সময়ে প্রকৃত পাঠ প্রকাশ করেন না, এ বিষয়েও আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছে।

যেখান হইতে এই ইষ্টকখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার আরও একটু পরিচয় দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

গভীরাক্ষরে লিখিত ইষ্টক আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ ইষ্টকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে। আমরা ইহার একখানিও ইট গোটা পাই নাই। সুতরাং ইহার লেখা পড়া অসম্ভব। সেই প্রাচীন মন্দিরের সদর দরজা ও পশ্চিমের একটা প্রস্তর-

---

* ইষ্টক-লিপির প্রতিকৃতি উপরে দেওয়া গেল।　　† নগরেশ।　　‡ শক।

মণ্ডপ আজও দণ্ডায়মান আছে। এই মন্দির বর্ত্তমান রাজপথের ঠিক উত্তরে অবস্থিত। এখন বাশুলী দেবী ঐ মন্দিরে নাই। প্রবাদ আছে, ইংরাজেরা এদেশ জয় করিলে মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া গোরা পল্টন যাতায়াত করিতে লাগিল। বাশুলীদেবী তাহাতে রাজাকে স্বপ্ন দিলেন, "ফিরিঙ্গীর পায়ের ধূলা উড়িয়া আমার গায়ে লাগে, আমাকে তুমি অন্য স্থানে লইয়া যাও।" তদনুসারে বিবেকানন্দ নৃপতি ১৬৫৫ শকে রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রস্তর নির্ম্মিত এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা ঐ মন্দিরের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে ;—

"ব্রহ্মাশেষসুরেশবন্দ্যচরণশ্রীবাশুলীপ্রীতয়ে
শর্ব্বাস্যস্মরশায়কর্ত্তুশশভৃৎসংখ্যে শকাব্দে শুভে।
সামন্তান্বয়সাগরেন্দুরভবদ্দন্তীশজিৎ কেশরী
ভূভৃদ্‌গ্রবরো বিবেক নৃপতিঃ সৌধং দদৌ দার্শদং॥"

ব্রহ্মা, অনন্ত ও ইন্দ্রের চরণবন্দনাপূর্ব্বক শ্রীবাশুলী দেবীর প্রীতির জন্য শুভ মহাদেবের মুখ (৫), মদনের বাণ (৫), ঋতু (৬) ও চন্দ্র (১)-সংখ্যক শকাব্দে (অর্থাৎ ১৬৫৫ শকে) সামন্তবংশার্ণবসম্ভূত চন্দ্রস্বরূপ রাজহস্তী-জয়কারী সিংহস্বরূপ ভূপতিগণের প্রধান বিবেক নামক নৃপতি (এই) প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির দান করিয়াছিলেন।

ঐ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে। স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে এবং দুই একখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িতেছে। মন্দিরের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

প্রবাদ এইরূপ, বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস ঐ বাশুলীর উপাসক ছিলেন এবং প্রাচীন মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। তাহার পর ১২৭৯ সালে বর্ত্তমান বাশুলী মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহাতেই এখন বাশুলী দেবী আছেন।

উক্ত মন্দিরাদি ভিন্ন ছাতনায় আরও কএকটী অতি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে। ছাতনার মধ্যস্থানে কামারপাড়ার পূর্ব্বে রাস্তার উত্তরে অনতিদূরে তিনটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী মূর্ত্তি প্রায় ৪ ফিট উচ্চ, উহার এক হস্তে ধনু ও অপর হস্তে দণ্ড বিদ্যমান। আর একখানি পাথরে একটী ধনুষ্পাণি ও নিকটে একটী শিশু মূর্ত্তি আছে।

এই সামন্তরাজ্যের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক পুরাতত্ত্ব বাহির হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

কবি উদ্ধবানন্দের "রাধিকামঙ্গল" ও তাহার সমালোচক।

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-জগতে বিশেষ পরিচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অবৈতনিক ও বৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে থাকিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তিনি বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে যে ১৬খানি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণে আবদ্ধ থাকিব। তাঁহার সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে কবি উদ্ধবানন্দের "রাধিকামঙ্গল" একখানি। গত কার্ত্তিকমাসের পরিষদে এই সম্বন্ধে একটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পুঁথিখানির পত্র-সংখ্যা ছয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি অবলম্বন করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় যে বিস্তৃত সমালোচনাটী লিখিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার গভীর যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার সকল কথা আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। সেইগুলি একে একে বলিতেছি।

বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় প্রথমে এই কয়েকটী বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—১ উদ্ধবানন্দ কোন্ সময়ের লোক? ২ তাঁহার বাড়ী কোথায়? ৩ তিনি কোন্ জাতি? এখানে বলা আবশ্যক যে, উদ্ধবানন্দের "রাধিকামঙ্গলে" এ সম্বন্ধে পরিষ্কার কিছু নাই।

১। যে নকল পুঁথিখানি সমালোচক মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে, তাহা ১২৩৪ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা চারি দণ্ডের সময় সমাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রতিলিপি খানির বয়ঃক্রম এখন ৭০ বৎসর। ইহা হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে, উদ্ধবানন্দ এই সময়ের "বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী"। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না যে, কবি উক্ত সময়ের বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী কি করিয়া হইলেন। ইহা কি সম্ভবপর নহে যে কবি ২৫।৩০ বৎসর বয়সে "রাধিকামঙ্গল" প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং পুঁথি প্রণয়নের পরই সমালোচক মহাশয়ের প্রাপ্ত প্রতিলিপি খানি নকল করা হইয়াছিল?

কিন্তু সমালোচক মহাশয় এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেখাইতেছেন। নানা কারণে তাঁহার বোধ হইয়াছে, কবি ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বতন লোক। এই "নানা কারণের" মধ্যে একটী মাত্র কারণ তিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন। সে কারণটী এই;—"কবির রচনায় ইংরেজ আমলের কোন তত্ত্ব, কোন পদার্থ, কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের নিদর্শন মাত্রও নাই।" আমরা সমালোচক মহাশয়ের এ কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কাহারও গ্রন্থে যদি কোন সময়ের কোন তত্ত্ব, কি পদার্থ, কি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত না থাকে, তবে সেই লেখক যে, সে সময়ের লোক হইতে পারেন না, এ যুক্তি আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তাহার পর, শ্রীমতী রাধিকার জন্মবৃত্তান্তের মধ্যে ইংরেজ-আমলের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতি লেখায় প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

তৎপরে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন যে, "কোন্ অব্দে তাঁহার আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব, আর কখনই বা তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোন মীমাংসায় সমুপনীত হওয়া অসম্ভব। সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতারই একটা না একটা প্রতীকার আছে। অতএব এতৎ সম্পর্কেও হতাশ হওয়া সমীচীন নয়। দেখা যাউক কিসে কি হয়। আশ্বস্ত হইবার একটু স্থল আছে।" আমরা কিন্তু আশ্বস্ত হইবার স্থল কিছুই তাঁহার সমালোচনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। বোধ হয়, বিদ্যানিধি মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

২। কবির বাসস্থান।—এ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় অতি অদ্ভুত যুক্তির দ্বারা অদ্ভুত মীমাংসায় সমুপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ পুঁথি হইতে একটী চরণ তুলিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কবি কর্ত্তৃকারকে "প্রথম পুরুষ", কিন্তু উহার ক্রিয়াপদে "উত্তম পুরুষ" ব্যবহার করিয়াছেন। এখন উৎকল দেশে কর্ত্তা ও ক্রিয়া প্রয়োগের ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং সমালোচক মহাশয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উদ্ধবানন্দ উৎকলবাসী ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, এই অনুমান অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। কারণ, "বাঙ্গালার প্রাচীন গদ্যলেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উড়িয়া ছিলেন, আর তিনি ব্রাহ্মণ।" তিনি আরও একটী অকাট্য প্রমাণ বা নিদর্শন পাইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার বৈতল-উত্তরবাড় গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ মিত্রজ মহাশয় তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, মিত্রজ মহাশয়দিগের প্রদেশে "সারল বিরাট" বা "বৃহৎ বিরাট" নামে এক বাঙ্গালা পদ্য-পুস্তক আছে। তাহার প্রণেতা আপনাকে "উৎকল ব্রাহ্মণ" বলিয়া স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা দুই জনে যখন উৎকলবাসী, তখন সমালোচক মহাশয়ের মতে উদ্ধবানন্দ উড়িষ্যার লোক না হইবেন কেন? সমালোচক মহাশয় যে যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরাও সেই যুক্তির দ্বারা কি বলিতে পারি না যে উদ্ধবানন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন? বিদ্যানিধি মহাশয়ের বোধ হয় উদ্ধবানন্দের জাতি নির্দ্দেশ করিবার সময় ঐ কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিস্মৃত হইয়াছেন।

এখানে সমালোচক মহাশয়ের নিকট আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তিনি কি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে, এক উৎকল দেশ ভিন্ন আর কোথাও এরূপ কর্ত্তা ও ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই? আমরা কিন্তু অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির পদে কর্ত্তা ও ক্রিয়ার এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাই। সমালোচক মহাশয় কি তাঁহাদের সকলকেই উৎকলবাসী বলেন?

৩। জাতি-নিরূপণ।—সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন যে, অজ্ঞাত কবির ন্যায় উদ্ধবানন্দ স্বীয় গ্রন্থে আপনাকে "দ্বিজ" বা "দাস" বলিয়া বিশেষিত করেন নাই। সুতরাং

কবি "ব্রাহ্মণ" কি "ব্রাহ্মণেতর বর্ণ" তাহা সাব্যস্ত করা সমালোচক মহাশয়ের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়া পড়িল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কবিতার ভণিতায় আপনাদিগকে "দাস" বলিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস, জ্ঞানদাস, পরমানন্দদাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাহার পর বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেছেন যে, উপাধি দেখিতে পাইলেও কবির জাতি নিরূপণ করা যাইত। তিনি কি কৌশলবলে ইহা নিরূপণ করিতেন, তাহার একটী উদাহরণও দিয়াছেন। যেমন, এই পুঁথি-পাঠকের নাম "শ্রীমধুসূদন আশ।" এই "আশ" উপাধি দেখিয়া সমালোচক মহাশয় পুঁথি-পাঠকের জাতি নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্তুবায়, সুতরাং বস্ত্র-বয়ন তাহার জাতি-বৃত্তি! কিন্তু তন্তুবায় ভিন্ন অন্য জাতিরও "আশ" উপাধি আছে, তাহা বোধ হয় সমালোচক জ্ঞাত নহেন। এই প্রসঙ্গে, তিনি পুঁথি-পাঠকের বাসস্থান কোন্ জেলায় তাহাও সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পুঁথিতে লেখা আছে যে পুঁথি-পাঠকের বাসস্থান "শ্যামপুর গ্রাম"। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্যামপুর বাঁকুড়া জেলায়। এই "কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান"টী যে কি, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তবে তাঁহার অবলম্বিত পুঁথিখানিও বাঁকুড়া জেলা হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং তাঁহার মতে, শ্যামপুর যে বাঁকুড়া জেলান্তর্গত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। কি সুন্দর যুক্তি!

এইত গেল কবির কথা। তাহার পর সমালোচক মহাশয় কাব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুঁথির সমালোচনা এই কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(ক) পুঁথির নামকরণ; (খ) ঐতিহাসিক তত্ত্ব; (গ) ভাষা; (ঘ) ছন্দ; (ঙ) কাব্যের মিলন; (চ) ব্যাকরণ দোষ; (ছ) কবির কল্পনাশক্তি।

(ক) পুঁথির নামকরণ।—উদ্ধবানন্দ তাঁহার পুঁথির নাম কেন "রাধিকামঙ্গল" রাখিলেন, তৎসম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "পূর্ব্বাচার্য্য চৈতন্য-মঙ্গলকার লোচনদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ, উদ্ধবানন্দের পক্ষে শ্রেয়স্কর ও মনঃপূত কার্য্য বিবেচিত হইয়াছিল। তাই তিনি "রাধিকামঙ্গল" নাম দিয়া অভীষ্ট দেবতার মহিমা-কীর্ত্তন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।" এ বেশ কথা। কিন্তু এখানে একটী রহস্যের কথা বলিব। বিদ্যানিধি মহাশয় পরিষদের সভায় যখন এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন, তখন সেখানে অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্ত কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, "বিদ্যানিধি মহাশয় যে লোচনদাসের প্রণীত চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে তাহা ঠিক নয়। চৈতন্যমঙ্গল বৃন্দাবন দাসের প্রণীত, কিন্তু লোচনদাসের প্রণীত নহে।" গোস্বামী মহাশয়ের উল্লিখিত কথাগুলির মধ্যে একটু রহস্য আছে। ইনি প্রভু নিত্যানন্দের সন্তান। প্রভু নিত্যানন্দের সহিত ঠাকুর নরহরির বরাবরই একটু খট্‌মটি চলিত। এমন কি, প্রভু নিত্যানন্দের

শিষ্য বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে পারতপক্ষে ঠাকুর নরহরির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। নরহরি ঠাকুর মহাপ্রভুকে চামর ব্যজন করিতেন। বৃন্দাবনদাস সেই ঘটনা বর্ণনাস্থলে নরহরির নাম উল্লেখ না করিয়া, লিখিলেন, "কোন কোন ভাগ্যবান চামর ঢুলায়।" বৃন্দাবনদাস প্রভু নিত্যানন্দের আদেশক্রমে এই লীলাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ইহার নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখেন। এই গ্রন্থের কথা শুনিয়া ঠাকুর নরহরি উহা দেখিবার জন্য বৃন্দাবনদাসের বাড়ীতে গমন করেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, গ্রন্থখানি তাঁহার দেখা ঘটে নাই। তিনি ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন, এবং তাঁহার প্রিয় ও প্রধান শিষ্য ত্রিলোচনদাসকে মহাপ্রভুর মধুর লীলাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিতে অনুমতি দেন। ত্রিলোচন বা লোচনদাসও তাঁহার গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখেন। তিনি বোধ হয় তখন জানিতে পারিয়াছিলেন না যে, বৃন্দাবনদাসও তাঁহার গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিয়াছেন। যাহাহউক, দুই গ্রন্থের এক নাম হইতে পারে না। শেষে বৃন্দাবনদাসের মাতা শ্রীমতী নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্যস্থা হইয়া এই নাম-করণের বিবাদ মিটাইয়া দেন। তিনি লোচনদাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং উহারই নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিতে অনুমতি দেন। আর, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম "চৈতন্য ভাগবত" রাখিতে বলেন। এখন, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় প্রভু নিত্যানন্দের সন্তান। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি লোচনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" বলিয়া যে একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। যখন এ কথা উত্থাপন করিলাম, তখন এ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াই উহার প্রতিলিপি বৃন্দাবনের গোস্বামীপাদ-দিগের অনুমোদনার্থে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ইহা পাঠ করিবার পর তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রণয়ন করেন। তখন ইহার নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" ছিল, এবং তখন লোচনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" লিখিত হইলেও বৃন্দাবনে প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং কবিরাজ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) ঐতিহাসিক তত্ত্ব।—"রাধিকা-মঙ্গল" হইতে সমালোচক মহাশয় যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিষ্কাশিত করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। যথা, "ঘুঙ্গুর", "সোণার ঝাঁপা", "ঝুরি", "সরল-শঙ্খ", "নূপুর" ও "সোণার চুড়ি"। তিনি যে এই সমুদায় অতি আবশ্যকীয় "ঐতিহাসিক তত্ত্ব" নিষ্কাশিত করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে প্রকৃতই "বিস্মিত ও পুলকিত" হইবারই কথা। তবে এইখানে আমরা একটী কথা বলিতে চাহি। যখন রাধিকামঙ্গলের মধ্যে ইংরেজ আমলের "ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও পদার্থ"—সোণার চুড়ি আছে, তখন তিনি "ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বতন লোক" কি করিয়া হইলেন ?

(গ) ভাষা।—বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেছেন, "সরল ভাষায় কবি যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরী।" যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে ক্রমে সংস্কৃত-বাঙ্গালা বা অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষা করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহা "যথেষ্ট বাহাদুরী," সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাঁহার বৈষ্ণব-কবিদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করা অভ্যাস থাকিত, তাহা হইলে উদ্ধবানন্দের সরলভাষা দেখিয়া তিনি এত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না।

(ঘ) ছন্দ।—সমালোচক মহাশয় এই পুঁথি হইতে একটী নূতন ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। ছন্দটীর নামকরণ এখনও হয় নাই। এই ছন্দের মিলন তিন চরণে। যথা—

"শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ ভজ এক মনে।
শ্রীরাধিকার জন্মকথা শুন সাবধানে।
সূর্য্য আরাধন করে অপত্য কারণে॥"

আমাদের কিন্তু বোধ হয় লিপিকার নকল করিবার সময় তৃতীয় চরণটী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে, "সূর্য্য আরাধন করে" ইহার কর্ত্তা কে? বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার নূতন ছন্দের আরও দুইটী উদাহরণ দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, লিপিকরের ভুলে উহাদেরও এক একটী চরণ পড়িয়া গিয়াছে।

তাহার পর সমালোচক মহাশয় ছন্দের দোষ ধরিয়াছেন, কারণ পুঁথির সকল পদে তিনি অক্ষরের সমতা পান নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা—

"বৈদ্য বলে বায়ুদোষ ছাঁকিয়াছে তাঁরে।
ভাগ্যবলে আজি আমি আইলাম তোমার ঘরে॥"

বিদ্যানিধি মহাশয় এই কবিতার প্রথম চরণটী গণিয়া সচরাচর প্রচলিত নিয়মানুযায়ী চৌদ্দ অক্ষর পাইয়াছেন। কিন্তু শেষ চরণে দেখেন সতেরটী অক্ষর। এখন এই ভ্রম-প্রমাদ কবির নিজের ত্রুটিতে, কি লিপিকরের অনবধানতায় ঘটিয়াছে, সমালোচক মহাশয় তাহারই বিচার করিতে বসিলেন। বিচারে গরীব লিপিকরই দোষী সাব্যস্ত হইলেন। তাহার পর বিচারক মহাশয় শেষ চরণটী সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রথমতঃ "আমি" শব্দ বিলুপ্ত করিয়া দেখেন ছন্দঃপাত ঘটে না। অধিকন্তু উহাতে না ব্যাকরণ দোষ, আর না অর্থ হানি, কিছুই হয় না। কিন্তু তাহাতেও দেখেন, এক বর্ণের আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করেন নাই। "তোমার ঘরে" পরিবর্ত্তে "তোমা ঘরে" ধরিয়া লইয়া দেখেন, সকল দিক্ বজায় থাকে। অর্থাৎ একমাত্র "র" বর্জ্জিত হইলে, তাঁহার আপদের শান্তি হয়। এখন সমালোচক মহাশয়ের সংশোধিত চরণ দুটী কিরূপ হইল দেখা যাউক:—

"বৈদ্য বলে বায়ুদোষ ছেঁকিয়াছে তাঁরে।
ভাগ্যবলে আজি আইলাম তোমা ঘরে॥"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কবি উদ্ধবানন্দ ইংরেজ আমলের সুশিক্ষিত পণ্ডিত নহেন, তাই তিনি হালের কবিদিগের ন্যায় প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দদোষ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু বলিতে কি, এই সংশোধিত চরণ অপেক্ষা কবির নিজ চরণটী আমাদের নিকট অধিক মিষ্ট বোধ হইতেছে।

কিন্তু একটী মাত্র ত্রুটী ধর্ত্তব্য নয়। বারংবার এরূপ ত্রুটী অমার্জ্জনীয়। কবি আবার এই দোষে দূষিত হইয়াছেন। যথা—

"যাহারে ভাবিছ তুমি, গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি,
একবার দরশন দাও।"

"গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি" এই অংশে এগারটী অক্ষর আছে। সমালোচক মহাশয় ইহাও কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে "আইলাম" স্থলে "এলাম" করিলেন, কিন্তু দেখেন, তথাপি দুই বর্ণের আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া "গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি" স্থলে "গোলোকের হরি আমি" বসাইতে বাসনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে অর্থের একটু গোলমাল হয় দেখিয়া, একরূপ হতাশ হইয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে, "এমন স্থলে কাহারও করস্পর্শ ঘটিলে মূলবস্তু সংস্কৃত বা মার্জ্জিত হয় না, কিন্তু দূষিত ও বিষাক্ত হয়।" আমরাও বলি কবির লেখার উপর হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।

(ঙ) কাব্যের মিলন।—সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "গ্রন্থে হীন-মিলনের অভাব নাই।" প্রাচীন বাঙ্গালা-কবিদিগের পদে এইরূপ হীন মিলনের ছড়াছড়ি। কিন্তু তাহাতে কবিতার মিষ্টতা কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব হয় নাই। ফল কথা, প্রাচীন কবিগণ অক্ষর মিল করিয়া কবিতা লিখিতেন না। তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, সুতরাং কবিতা লেখা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল না, উহা আপনাপনি তাঁহাদের ভাবপূর্ণ হৃদয় হইতে বাহির হইত।

(চ) ব্যাকরণ-দোষ।—বিদ্যানিধি মহাশয় পুঁথিতে অনেক ব্যাকরণের দোষ দেখাইয়াছেন। যেমন, বিশেষ্য শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত, স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্ত্তে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ, প্রথম পুরুষের স্থানে উত্তম পুরুষ প্রযুক্ত ইত্যাদি।

কিন্তু এ দোষ উদ্ধবানন্দের নহে, তিনি যাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সে কালের কবিগণের দোষ।

কোন ভক্ত যখন মন প্রাণ খুলিয়া শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার সুর, তাল, মানের দিকে দৃষ্টি থাকেনা ও থাকিতে পারেনা। সেইরূপ কবি যখন হৃদয়ের আবেগের সহিত কবিতা লেখেন, তখন তাঁহার কাব্যের অক্ষর মিল কি ব্যাকরণ দোষের দিকে বড় দৃষ্টি থাকেনা। তাই প্রাচীন কবিদিগের পদে এই সকল দোষের এত প্রাদুর্ভাব। কিন্তু তাহাতে কবিতার মিষ্টতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

(ছ) কবির কল্পনা-শক্তি।—সমালোচক মহাশয় উদ্ধবানন্দের কল্পনা-শক্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি চিরকাল শুষ্ক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং উদ্ধবানন্দের কল্পনা শক্তি তাঁহার নিকট চিত্ত-চমৎকারিণী হইবারই কথা। যে সমস্ত বৈষ্ণব কবি-দিগের কবিতায় সামান্য আভাস লইয়া উদ্ধবানন্দ তাঁহার "রাধিকা-মঙ্গল" লিখিয়াছেন, আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়কে সেগুলি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, "রাধিকার দশ নখ দশ ইন্দু" প্রভৃতি তাঁহাদের লেখার মধ্যে ছড়াছড়ি। এ বর্ণনা উদ্ধবানন্দের নূতন নহে, এবং ইহাতে তাঁহার "বিশেষ প্রশংসা যোগ্য"ও কিছু নাই।

যাহা হউক পুঁথিখানি সংশোধন করিতে সমালোচক মহাশয় অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছেন। বিশেষতঃ লিপিকরের প্রমাদে তাঁহার বিলক্ষণ দায়ে ঠেকিতে হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, তিনি উহা কিরূপে সংশোধন করিয়াছেন।

সমালোচক মহাশয় পুঁথির একস্থানে পাইয়াছেন, "গণিত কাঞ্চন জিনি, রাত্রবরণ খানি।" তিনি এই অংশ সংশোধন করিয়া করিলেন, "কষিত কাঞ্চন জিনি, গাত্রাবরণ খানি।" এইটী পড়িয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করা অভ্যাস নাই এবং সেই জন্যই তিনি সম্ভবতঃ অবগত নহেন যে, প্রাচীন লেখকগণ "ল" ও "ণ" একই প্রকার লিখিতেন। সুতরাং এখানে "গণিত" শব্দটী "কষিত" না হইয়া "গলিত" হইবে। আর, "রাত্রবরণ" স্থানে "গাত্রাবরণ" না লিখিয়া "গাত্রের বরণ" কি "গাত্র-বরণ" হইলেই ভাল হয়।

এখন, তিনি "রাধিকামঙ্গল" পুঁথিখানি কিরূপ সংশোধন করিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী উদাহরণ দিয়া আমরা প্রবন্ধটী শেষ করিব। যথা,—

"এই মত ক্রমে দশ মাস পরবেশে।
আনন্দ বাড়িল বড় রাজার আবেশে॥
শুক্ল অষ্টমী তিথি ভাদ্র-পদ মাসে।
অবতার কৈল রাই রাজার আবেশে॥"

দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের "আবেশে" কথায় অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয় "আবাসে" হইবে॥

"নিষ্কলঙ্ক সোণার চাঁদ উদয় হইল।
এতদিনে গগনে চান্দের গৌরব টুটিল॥"

"গগনে চান্দের" স্থলে "গগন-চান্দের" হইলেই বোধ হয় ভাল হয়।

"নাম মোর বসুমতী ভাগ্য করি মানি।
রাই-পদ লাগে যেন কাঁচা ননি॥"

শেষ চরণে "কাঁচা ননি"র পূর্ব্বে বোধ হয় একটী কথা পড়িয়া গিয়াছে।

"লাখবান হেন বাণী রাখে বক্ষঃস্থলে।"

"হেন বাণী" অর্থ কি? বোধ হয় "লাখবান হেম রাণী" হইবে।

"বাহির উজানে রাজা রহে হেট মাথে।"

এখানে "উজানে" অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। "উঠানে" হইলে কিন্তু মানে হয়।

"রাজারে বিরস দেখি কহে নারদ মুনি;
আজিও কেন দেখিতে তোমার হরষিত বাণী॥"

শেষ চরণ হইতে বোধ হয় একটী "না" পড়িয়া গিয়াছে।

"নারদ আসিয়া ডাকে শির মস্ত্র হইয়া থাকে—
চিত্রপটে আকার না নড়ে।"

আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন অর্থ করিতে পারিলাম না। চরণদ্বয় এইরূপ হইলে কি অর্থ হয় না?

"নারদ আসিয়া তাঁকে, শির নম্র হৈয়া থাকে,
চিত্রপট আকার না নড়ে।"

"অমৃত পাইয়া মুনি, বিচার করিল শুনি,
এই শিশু কৃষ্ণপ্রিয়া হব।"

এখানে "অমৃত" স্থানে "সম্বিত" এবং "শুনি" স্থানে "পুনি" অর্থাৎ পুনঃ হইলে ভাল হয় না কি?

"ধূপ দীপ মাল্য গন্ধ পুষ্প মাল্য চন্দন।"

বোধ হয় এখানে একটী "মাল্য" অতিরিক্ত হইয়াছে।

"বৃকভানুপুরের লোক ডেকে ডেকে বলে।
গগন ছেড়্যা চান্দ কিবা ভূমি চলি ভুলে॥"

"ভুলে" স্থানে বোধ হয় "বুলে" হইবে।

ক্রমে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং এখানেই সমাপ্ত করিলাম। ফল, "রাধিকামঙ্গল" পুঁথি, যাহা কার্ত্তিকের সাহিত্য-পরিষদে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এত ভুলে পরিপূর্ণ যে অনেক স্থলে অর্থ করা কঠিন। যাঁহাদের হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করা অভ্যাস আছে, পত্রিকার প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কাহাকে দেখাইয়া লইলেই ভাল হইত।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

বঙ্গীয় সংবাদপত্র।

ইতিপূর্ব্বে আমরা সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রের তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। অদ্য সংবাদপত্রের তালিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের এই সমস্ত তালিকা যে ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য নহে, তাহা আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি। কিন্তু ক্রমে এরূপ তালিকা সঙ্কলিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহের পথ পরিষ্কৃত হইবে বলিয়াই আমরা এই বহ্বায়াসসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকগণ আমাদিগের উদ্দেশ্যের সাধুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ত্রুটিজনিত অপবাদ হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন এবং সাময়িক ও সংবাদপত্রসমূহের তালিকা সংগ্রহে যে সমস্ত ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক সংশোধনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

শ্রীরাজবিহারী দাস।

পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।
অনুবাদিকা	...	অপ্রকাশিত
অবলাবান্ধব	...	দ্বারকানাথ গঙ্গো (১)
অবকাশরঞ্জিকা	...	(ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
অপূর্ব্ব পঞ্চায়ৎ	...	অপ্রকাশিত
অবোধবোধিনী	...	„
অবোধবন্ধু	...	অপ্রকাশিত
অমৃতবাজারপত্রিকা	...	শিশিরকুমার ঘোষ(২)
অরুণোদয়	...	রেভারেণ্ড লাল-বিহারী দে
অরুণোদয়	...	পঞ্চানন বন্দ্যো
আক্কেল গুড়ুম	...	ব্রজনাথ (৩)

(১) নারীজাতির কল্যাণ-কামনায় বঙ্গদেশে যে সমস্ত পত্র প্রচারিত হইয়াছে, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। পূর্ব্বতন ঢাকা ও ইদানীন্তন ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী লোনসিংহ গ্রাম হইতে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধবের প্রচার আরম্ভ হয়। একবৎসর পাক্ষিকরূপে তথা হইতে প্রকাশিত হইয়া পরে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচবৎসর কাল যথানিয়মে প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে বন্ধ হয়। কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরে ইহা মাসিক আকার ধারণ করে। এই পত্রের লেখকগণ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

(২) ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে জেলা যশোরের অন্তঃপাতী অমৃতবাজার নামক গ্রাম হইতে এই বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাদুর্ভূত হয়। প্রথমতঃ ইহা কেবল বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। পরে কলিকাতা বাগবাজার হইতে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটনের ভীষণ মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে অমৃতবাজার বাঙ্গালা কলেবর পরিত্যাগ করে। এক্ষণে ইহা প্রাত্যহিক হইয়াছে। অমৃতবাজারের তীব্র লেখনী দেশবিখ্যাত।

(৩) ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রকাশিত হয়। বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' লিখিয়াছেন, "ইহার লিখন ভঙ্গী দেখিয়া লোকের আক্কেল যথার্থই গুড়ুম হইত।"

পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।
আনন্দবাজার পত্রিকা		হেমন্তকুমার ঘোষ (৪)	কাব্যপ্রকাশ	...	(ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
আলোক	...	অপ্রকাশিত (৫)	কাব্য রত্নাকর	...	উমাকান্ত বন্দ্যো
আর্য্যদর্পণ	...	„	কালভৈরব	...	অপ্রকাশিত
আর্য্যসুহৃদ্	...	„	কালীবার্ত্তাপ্রকাশিকা		কালীদাস মিত্র
আর্য্যোদয়	...	„	কাশীপুরনিবাসী	...	(বরিশাল হইতে প্রকাশিত)
উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি	...	অপ্রকাশিত	কুমারী পত্রিকা	...	অপ্রকাশিত
উদ্বোধন	...	„	কুশদহ	...	„
উলুবেড়িয়া দর্পণ	...	„	কৌমুদী	...	„
এডুকেশন গেজেট	...	সি স্মিথ, প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (৬)	কৌস্তুভ	...	মহেশচন্দ্র ঘোষ
কান্দিপত্রিকা	...	অপ্রকাশিত	গবর্ণমেণ্ট গেজেট	...	জন ক্লার্ক মার্শম্যান, জে রবিন্সন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু (৭)
কবি	...	„			

(৪) লর্ড লিটনের ভীষণ মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষেধবিধি প্রচলিত হইলে অমৃতবাজার ইংরেজীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং এই পত্র তাহার স্থল অধিকার করে; কিন্তু অমৃতবাজারের ন্যায় ইহা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হয় নাই।

(৫) নগদ ৵২॥ মূল্যে এই পত্র সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, এতদপেক্ষা সুলভ মূল্যের পত্রিকা আর হয় নাই। ইহার পর "সুধাপান", পরে কিছুদিন সুলভ-দৈনিক ৵২॥ মূল্যে চলিয়াছিল।

(৬) ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে হজ্‌সন প্রাট্ সাহেবের চেষ্টায় সত্যার্ণব যন্ত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই পত্র প্রথম প্রচারিত হয়। ওব্রায়ন স্মিথ নামক এক পাদরী সাহেব তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কবি বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী হইয়া পত্রিকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। স্মিথ সাহেব স্বদেশে গমন করিলে গবর্ণমেণ্ট বাবু প্যারীচরণ সরকারকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ৭ই মে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলগাড়ীতে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ উক্ত পত্রে প্রকটিত হওয়ায় প্যারী বাবুর সহিত গবর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য হয় এবং তিনি সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। অনন্তর ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের অনুরোধে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৬৭ সালের ডিসেম্বর হইতে এডুকেশন গেজেটের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তদবধি রাজনৈতিক বিষয়ে এই পত্রের কোন স্বাধীনতা নাই।

(৭) ১৮৪০ সালের ১লা জুলাই হইতে এই রাজকীয় বার্ত্তাবহ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক প্রসিদ্ধ পাদরী পুঙ্গব মার্শম্যান সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

পত্রিকার নাম	সম্পাদকের নাম।
গরিব	... কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য
গুণাকর	... অপ্রকাশিত
গোয়ালপাড়া হিতসাধিনী	●
গ্রামদূত	... (বাখরগঞ্জ হইতে প্রকাশিত)
গ্রামবাসী	... (রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত)
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা	হরিনাথ মজুমদার
চারুবার্ত্তা	... অদ্বৈতচরণ বসু, দীনেশচরণ বসু
চারুমিহির	... (ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত)
চিত্তরঞ্জিকা	... (ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ	... (চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত)
জগদ্দীপ	... অপ্রকাশিত
জগৎবাসী	... ●

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
জ্ঞানবিকাশিনী	... (পাবনা চাটমোহর হইতে প্রকাশিত)
জ্ঞানদীপিকা	... ভগবতীচরণ
জ্ঞানার্জ্জন	... চৈতন্যচরণ অধিকারী
জ্ঞানরত্নাকর	... তারণীচরণ রায়
জ্ঞানচন্দ্রোদয়	... রাধানাথ বসু
জ্ঞানপ্রদায়িনী	... বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানদর্পণ	... উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্ঞানান্বেষণ	... রসিককৃষ্ণ মল্লিক (৮)
জ্ঞানোদয়	... চন্দ্রশেখর
জ্ঞানোদয়	... ● অপ্রকাশিত
ঢাকাগেজেট	... শশীভূষণ সেন
ঢাকাপ্রকাশ	... কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দপ্রসাদ রায় গুরুগঙ্গা আইচ্ চৌধুরী (৯)

পরে ক্রমান্বয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক জে রবিন্সন সাহেব, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু চন্দ্রনাথ বসু ইহার সম্পাদকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। এই পত্রে গবর্ণমেণ্ট কৃত নানাবিধ বিজ্ঞাপন, রাজকীয় বিধি ব্যবস্থা ও রাজকর্ম্মচারিগণের নিয়োগাদির অনুজ্ঞা পত্রসমূহ অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

(৮) ১৮৩৪ কি ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রচারিত হইয়া ত্রয়োদশবর্ষ কাল জীবিত ছিল। তদানীন্তন হিন্দু-কলেজের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহাতে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

(৯) বঙ্গীয় ১২৬৭ (১৭৮২ শক) সালের ৫ই চৈত্র তারিখে ঢাকা নগর হইতে এই সুবিখ্যাত পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ"-লেখক মৃত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর পিতৃব্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও বাবু চন্দ্রকান্ত বসু প্রভৃতির প্রযত্নাতিশয়ে পূর্ব্ববঙ্গের এই প্রাচীন ও প্রধান সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। সদ্ভাবশতক প্রণেতা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম ইহার সম্পাদক পদে বরিত হয়েন। তৎকালে ঢাকাপ্রকাশ এরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইত যে, উহা সোমপ্রকাশের

পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।
ঢাকাদর্পণ	...	অপ্রকাশিত
ঢাকাদর্শক	...	তারিণীচরণ বসু
তিমিরনাশক	...	অপ্রকাশিত
ত্রিপুরা-বার্ত্তাবহ	...	"
ত্রিপুরা-প্রকাশ	...	"
দর্শক	...	পূর্ণচন্দ্র পাঠক (চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত)
দিগ্বিজয়	...	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
দ্বিজরাজ	...	গোঁসাইদাস গুপ্ত
দিনমণি	...	গোপালচন্দ্র দে
দিবাকর	...	অপ্রকাশিত
দূত	...	অপ্রকাশিত
দৈনিক	...	ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত (১০)
দৈনিকবার্ত্তা	...	অপ্রকাশিত
ধূমকেতু	...	কালীকিশোর কাহালী
ধূমকেতু	...	(চন্দননগর হইতে প্রকাশিত)
ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ	...	(কালীঘাট হইতে প্রকাশিত)
নববিভাকর	...	গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় (১১)

সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইত। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার "বিজ্ঞাপনী" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া ঢাকা-প্রকাশের সংস্রব পরিত্যাগ করিলে ব্যাকরণসারপ্রণেতা বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায় উহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ঢাকাপ্রকাশ ক্রমে নিস্তেজ ভাব ধারণ করে। বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হইলে ঢাকাপ্রকাশ হস্তান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান সম্পাদক বাবু গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ইনি ঢাকার ধনী বাবু রূপলাল দাস কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

(১০) এইপত্র প্রতিদিন "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন "সমাচারচন্দ্রিকা" ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

(১১) খৃষ্টীয় ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটন বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করিলে ভার্ণাক্যুলার প্রেস আক্ট অনুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রথমে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট মুচলকা চাহেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় মুচলকা দিয়া পত্রিকা রাখিতে অপমান বোধ করেন এবং সোমপ্রকাশ উঠাইয়া দেন। সোমপ্রকাশ তখন বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র ছিল। উহার আকস্মিক বিয়োগে সর্ব্বসাধারণ সাতিশয় দুঃখিত ও পরিতপ্ত হইলেন। সোমপ্রকাশের অভাব পরিপূরণ করিবার জন্ত বাঙ্গালা ১২৮৫ সালের বৈশাখ মাসে "নববিভাকরের" অভ্যুদয় হইল। বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী মৃত বাবু গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে এই পত্রের সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হয়েন। রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় নববিভাকর বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইল এবং সর্ব্বাংশেই উহা সোমপ্রকাশের অভাব পূরণ করিল। কিন্তু গুরুতর পরিশ্রমে গঙ্গাধর বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় এক বৎসর পরে তিনি উহা বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "সাধারণী"র সহিত সম্মিলিত করিয়া দিলেন এবং কিয়ৎকাল নববিভাকর ও সাধারণী সম্মিলিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া পরে বিলুপ্ত হইয়া গেল। নববিভাকরের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার পূরণ হয় নাই।

পত্রিকার নাম ।		সম্পাদকের নাম ।
নবযুগ	...	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।
নব মেদিনী	...	(মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত)
নদীয়াবাসী	...	অপ্রকাশিত
নগেন্দ্র বিনোদিনী	...	ঌ
নিশাকর	...	নীলকমল দাস
পতাকা	...	জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়
পথ্যপ্রদান	...	অপ্রকাশিত
পরিদর্শক	...	জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
পরিদর্শক	...	(শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত)
পাষণ্ড পীড়ন	...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী	...	(চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত)
প্রজাবন্ধু	...	(চন্দননগর হইতে প্রকাশিত)
প্রতিধ্বনি	...	অপ্রকাশিত
প্রতিকার	...	(বহরমপুর হইতে প্রকাশিত)

পত্রিকার নাম ।		সম্পাদকের নাম ।
প্রকৃতি	...	অনুকূলচন্দ্র মুখো
প্রতিবাসী	...	অপ্রকাশিত
প্রভাতী	...	রাজমোহন মুখো
প্রভাত-সমীর	...	দুর্গাচরণ বন্দ্যো
প্রয়াগ-দূত	...	অপ্রকাশিত
ফরিদপুর-হিতৈষিণী	...	ঌ
বঙ্গবাসী	...	যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১২)
বঙ্গদূত	...	নীলরত্ন হালদার
বঙ্গবিজ্ঞাপনী	...	মিত্র কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বঙ্গবন্ধু	...	(ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
বঙ্গরবি	...	অপ্রকাশিত
বঙ্গনিবাসী	...	মহেশচন্দ্র পাল, উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩)

প্রচারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের এরূপ বিস্তৃতি কি প্রসার ছিল না। যদিও "সুলভ সমাচার" প্রভৃতি স্বল্পমূল্যের দুই একখানা পত্র ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সমস্ত পত্র সাধারণ্যে তাদৃশ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। স্বল্পমূল্যে উচ্চ অঙ্গের পত্রিকা মধ্যে "বঙ্গবাসী"ই প্রথম ও প্রধান। বঙ্গবাসীর অনুকরণে এক্ষণে এদেশে অনেক পত্রের প্রচার হইয়াছে, কিন্তু গুণ গরিমায় বা গ্রাহক সংখ্যার প্রাচুর্য্যে কেহই অদ্যাপি "বঙ্গবাসীকে" অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয় যে, বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী বাঙ্গালা কোন সংবাদ পত্রেরই বঙ্গবাসীর তুল্য গ্রাহক সংখ্যা নাই। বঙ্গবাসীর গ্রাহক সংখ্যা বিংশতি সহস্রেরও অধিক হইবে।

(১৩) ১৮৯০ খৃঃ অব্দে (১২৯৭ বঙ্গাব্দে) এই পত্র বঙ্গবাসীর অনুকরণে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।
বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা	...	অপ্রকাশিত (১৪)	বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ গেজেট		চন্দ্রকিশোর রায়
বরিশাল বার্ত্তাবহ	...	„	বাদরায়ী	...	দ্বারকানাথ মুখো
বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী	...	„	বিশ্বদর্শন	...	শিবচন্দ্র চট্টো
বামাবোধিনী	...	„	বিক্রমপুর	...	অপ্রকাশিত (১৬)
বালারঞ্জিকা	...	(বরিশাল হইতে প্রকাশিত)	বিজ্ঞাপনী	...	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
			বিজলী	...	অপ্রকাশিত
বালকবন্ধু	...	অপ্রকাশিত	বেঙ্গল গেজেট	...	গঙ্গাধর ভট্ট (১৭)
বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	...	„	বেঙ্গল স্পেক্টেটর	...	রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র(১৮)
বর্দ্ধমান সংবাদ	...	„			
বসুমতী	...	(১৫)	বরাহনগর সমাচার	...	শশীপদ বন্দ্যো
বাঁকুড়া দর্পণ	...	„			
বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী		„	ভারতমিহির	...	অনাথবন্ধু গুহ(১৯)
বন্ধু	...	চারুচন্দ্র দত্ত	ভারতবাসী	...	হরিদাস গড়গড়ি

এক সময়ে ইহা বিশেষ যোগ্যতা সহকারে সম্পাদিত হইত। কিন্তু বাবু মহেশচন্দ্র পাল, মহিলা-ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনীর দুর্নাম রটনা করায় কারাগারে আবদ্ধ হয়েন। পরে শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, তৎপরে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ইহার সম্পাদক হন। মহেশবাবু বঙ্গনিবাসীর স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি উহার পরিচালন ভার অর্পণ করেন। পরে সচিত্র ভারতসংবাদ বঙ্গনিবাসীর সহিত সংযোজিত হয়।

(১৪) ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রথম প্রচারিত হয়।

(১৫) ১৩০৩ সালের ৩রা শ্রাবণ হইতে প্রকাশিত। প্রথমে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, পরে গত পৌষ হইতে শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক হইয়াছেন।

(১৬) বাঙ্গালা ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে উত্তর বিক্রমপুরান্তর্গত লৌহজঙ্গ গ্রাম হইতে তত্রত্য বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী বাবু রাধাবিনোদ পাল চৌধুরী কর্ত্তৃক বিক্রমপুর পরগণার মুখপত্র স্বরূপ এই পত্র প্রকাশিত হয়। তিন বৎসর কাল ইহা লৌহজঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইয়া পরে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে। তদবধি রাজধানী হইতেই প্রকাশিত হইতেছে।

(১৭) খৃষ্টীয় ১৮১৬ অব্দ এই পত্রের প্রকাশারম্ভের কাল নির্দ্দেশ করিয়া কেহ কেহ ইহাকেই বাঙ্গালার প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

(১৮) খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র ইংরাজী ১৮৪২ সালে এই পত্র প্রচার করেন। ইহাতে নানাপ্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইত, কিন্তু পত্রিকাখানি ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় মুদ্রিত হওয়ায় ব্যয়ের অত্যন্ত আধিক্য হইল এবং দুই বৎসর পরে এই কারণে উঠিয়া গেল।

(১৯) বাঙ্গালা ১২৮২ সালের শ্রাবণ মাসে ময়মনসিংহ নগরে এই উৎকৃষ্ট পত্রের আবির্ভাব হয়। লেখার তেজস্বিতায় ও মতের উদারতায় ইহা একখানি গণনীয় পত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।
ভারত-সংস্কারক	...	কালীনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত
ভারত-হিতৈষী	...	অপ্রকাশিত
ভারতদর্পণ	...	„
ভারত-বণিক	...	„
ভারত-বন্ধু	...	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত-রঞ্জন	...	(মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত)
ভারতসংবাদ (সচিত্র)	...	অপ্রকাশিত (২০)
ভারতীয় মন্ত্রমন্দির	...	রাজঋষি সিদ্ধেশ্বর
ভৃঙ্গদূত	...	নীলকমল দাস
মহাজনদর্পণ	...	জয়কালী বসু(২১)
মদ না গরল	...	অপ্রকাশিত
মনোরঞ্জন	...	গোপালচন্দ্র দে
মার্ত্তণ্ড	...	অপ্রকাশিত
মিহির	...	„
মুক্তাবলী	...	কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য
মুর্শিদাবাদ-পত্রিকা	...	অপ্রকাশিত (২২)
মুর্শিদাবাদ-প্রতিনিধি	...	„
মুসলমান বন্ধু	...	„
মেদিনী	...	(মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত)
মেদিনীপুর অধ্যক্ষ	...	অপ্রকাশিত
মৃত্যুঞ্জয়	...	„
মুর্শিদাবাদ হিতৈষী	...	„
রসরাজ	...	রাজনারায়ণ সেন ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য(২৩)
রসমুদ্গর	...	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রসরত্নাকর	...	যদুনাথ পাল
রত্নবর্ষণ	...	মাধবচন্দ্র ঘোষ
রত্নাবলী	...	অপ্রকাশিত

(২০) বঙ্গনিবাসী ও সাহিত্যকল্পদ্রুম সম্পাদক শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা অতি অল্পদিন ছিল। পরে ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহা বঙ্গনিবাসীর সহিত মিশাইয়া দেন।

(২১) ২৮৪৯ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা বাঙ্গালায় বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রথম পত্র।

(২২) ১৮৪০ খৃঃ অব্দে রাজা কৃষ্ণনাথ তদীয় প্রজাবর্গের উন্নতিবিধানার্থ এই পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন।

(২৩) এই জঘন্য পত্র ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে বঙ্গ রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়। মৃত ভোলানাথ সেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহা ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। রসরাজে প্রথম সম্পাদক রাজনারায়ণ সেন কাশিমবাজার-নিবাসী রাজা কৃষ্ণনাথ ও তদীয় সহধর্ম্মিণী রাণী স্বর্ণময়ীর অপবাদ রটনা করায় উক্ত রাজা কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ হয়েন। দ্বিতীয় সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যও রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া পরগ্লানির নিমিত্ত কারাগারে গমন করেন। রসরাজ দীর্ঘকাল সংবাদপ্রভাকরের সহিত অশ্লীল কবিতা-যুদ্ধ করে। বাবু রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "প্রভাকর ও রসরাজে যখন ঝগড়া হইত, তখন রাস্তার দুইজন ময়লা পরিষ্কারক জাতীয় লোক ঝগড়া করিয়া পরস্পরের হস্তিকাস্থিত ময়লা লইয়া পরস্পরে গাত্রে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ দৃশ্য হয়, সেরূপ জঘন্য দৃশ্য হইত।"

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
রত্নাকর ...	অপ্রকাশিত
রঙ্গপুর-দিক্প্রকাশ ...	(কাকিনিয়া হইতে প্রকাশিত)
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ ...	অপ্রকাশিত
রাজরাণী ...	গঙ্গানারায়ণ বসু
রাজসাহী সমাচার ...	অপ্রকাশিত
শক্তি ...	(ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
শান্তি ...	অপ্রকাশিত
শিল্প ও কৃষিপত্রিকা ...	(তাহেরপুর হইতে প্রকাশিত)
শুভসাধিনী	কালীপ্রসন্ন ঘোষ (২৪)
শ্রীহট্টপ্রকাশ ...	অপ্রকাশিত (২৫)
সমাচারদর্পণ ...	জন ক্লার্ক মার্শম্যান-সাহেব (২৬)
সময়	জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (২৭)

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
সমাচার চন্দ্রিকা ...	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত
সহচর ...	বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়
সম্মিলনী ...	উমেশচন্দ্র গুপ্ত
সত্যবাদী ...	অপ্রকাশিত
সঞ্জয় ...	(ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত)
সহযোগী ...	অপ্রকাশিত
সমাচার সুধাবর্ষণ ...	„
সভারাজেন্দ্র ...	„
সত্যপ্রদীপ ...	এম্ টাউন্-সেণ্ড সাহেব (২৯)

(২৪) সুলভ সমাচারের অনুকরণে ইহাই ঢাকা নগরের সর্ব্বপ্রথম এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র।

(২৫) ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট হইতে এই পত্র প্রকাশিত হয়।

(২৬) ১৮১৮ খৃঃ অব্দের ২৩শে মে (কাহারও মতে ৩১শে মে) শ্রীরামপুর হইতে বঙ্গের এই আদি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রতি সংখ্যা চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইত এবং নিয়মিত ডাক মাসুলের এক চতুর্থাংশ মূল্যে ইহা দেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। ইহা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত হইত। সুবিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্মযাজক জন ক্লার্ক মার্শম্যান সাহেব এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। মার্শম্যান সাহেব বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্রের জনক। তিনিই "দিগ্দর্শন" নামক নানা ঐতিহাসিক প্রবন্ধসংবলিত সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার জন্ম অথবা মৃত্যু দিন উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র সম্পাদকগণের মহোৎসব করা কর্ত্তব্য।

(২৭) ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গবাসীর অনুকরণে এই পত্রের প্রকাশ হয়। পরে ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা আমূল-সংস্কার-প্রিয়তার (Radicalism) পরিপোষক।

(২৮) ১৮২০ (কাহারও মতে ১৮২১) খৃঃ অব্দে পণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংবাদ কৌমুদীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে এই পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে সতীদাহের স্বপক্ষতা করা হইত। সমাচারচন্দ্রিকা এক্ষণে দৈনিকের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

(২৯) ১৮৫০ খৃঃ অব্দে এম্ টাউন-সেণ্ড সাহেব এই সচিত্র পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকটিত হইত।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
সর্ব্বশুভকরী	... মতিলাল চট্টোপাধ্যায়
সর্ব্বরসরঙ্গিণী	... অপ্রকাশিত
সমালোচক	... দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সমাজদর্পণ	... যশোদানন্দন সরকার
সংবাদকৌমুদী	... রামমোহন রায় (৩০)
সংবাদপ্রভাকর	... ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামচন্দ্র গুপ্ত, গোপালচন্দ্র মুখো (৩১)
সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়	.. হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র আঢ্য, অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য, গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য (৩২)
সংবাদভাস্কর	... শ্রীনাথ রায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য (৩৩)

(৩০) এই পত্র ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহাতে সহমরণের বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইত।

(৩১) ১৮৩০ খৃঃ অব্দের (১২৩৭ বঙ্গাব্দের) ১৬ই মাঘ শুক্রবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই প্রসিদ্ধ পত্রের প্রচার করেন। গুপ্ত কবির "প্রভাকর" এক সময়ে দেশ মধ্যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রভাকরে গদ্য পদ্য উভয়ই প্রকটিত হইত; কিন্তু উহার গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই লোকের মন অধিক আকর্ষণ করিত। গুপ্ত কবির ব্যঙ্গ কবিতাসমূহ লোকের নিকট এত সমাদৃত হইত যে, অনেক সময় প্রভাকরের দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বারা লোকের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিতে হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অসামান্য কবিত্ব শক্তি-সম্পন্ন হইয়াও বিশুদ্ধ রুচির অভাবে 'ভাস্কর' ও 'রসরাজে'র সহিত অশ্লীল কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রভাকর অদ্যাপি জীবিত আছে এবং সর্ব্বত্র গুপ্ত কবির মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

(৩২) ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতাস্থ 'আঢ্য' পরিবার কর্ত্তৃক এই পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ ইহা প্রতি-পক্ষে একবার করিয়া বাহির হইত। তৎকালে বাবু হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি ঢাকা কালেজের অধ্যাপক হইয়া গমন করিলে বাবু উদয়চরণ আঢ্য ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। বাবু উদয়চরণ আঢ্য বাঙ্গালার আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলে বাবু অদ্বৈতচরণ আঢ্য ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বাবু অদ্বৈতচরণ আঢ্যের মৃত্যু হয়। তৎপরে বাবু গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ইহার সম্পাদক হয়েন। ১২৪৮ সালে ইহা সপ্তাহে তিনবার করিয়া প্রকাশিত হইত; পরে ১২৫২ সালে (১৮৪৫ খৃঃ অব্দে) প্রাত্যহিক হইয়া এখনও তদবস্থায় জীবিত আছে।

(৩৩) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীনাথ রায় এই পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ ঘোষণা করায় শ্রীনাথরায় উক্ত রাজার ২০।২৫ জন হিন্দুস্থানী দ্বারবান কর্ত্তৃক ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ১৩ই জানুয়ারি ৮ ঘটিকার সময় ধৃত, আক্রান্ত, প্রহৃত ও অর্দ্ধ উলঙ্গভাবে আন্দুলে নীত হয়েন। তথায় উত্তপ্ত লৌহে তাঁহার হস্ত ও শরীরের নানাস্থান দগ্ধ করা হয়। ঐ অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক তাঁহার এক সহস্র মুদ্রা মাত্র জরিমানা হইয়াছিল। যাহা হউক, তৎকালে ভাস্করের গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুদূরবর্ত্তী পঞ্জাব ও ইংলণ্ডে ভাস্করের গ্রাহক ছিল। অতঃপর পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ভাস্করের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। তিনি গদ্য রচনায় সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পদ্যে প্রভাকরের যেরূপ প্রতিপত্তি হয়, গদ্যে ভাস্করও সেইরূপ সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় বহুদিন হইল "ভাস্কর" অস্তমিত হইয়াছে।

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
সংবাদ-সাধুরঞ্জন ...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	সারসংগ্রহ ...	অপ্রকাশিত
সংশোধিনী ...	(চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত)	স্বাস্থ্যতত্ত্ব ...	"
		সুধীরঞ্জন ...	"
সঞ্জীবনী ...	কৃষ্ণকুমার মিত্র (৩৪)	সুনীতিসংবাদ ...	"
		সুধাপান ...	"
সাপ্তাহিক সমাচার ..	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়	সুলভসমাচার ...	কেশবচন্দ্র সেন (৩৭)
সাধারণী ...	অক্ষয়চন্দ্র সরকার (৩৫)	সুরভি ...	যোগেন্দ্রনাথ বসু (৩৮)
সারস্বতপত্র ...	রাজবিহারী দাস, উমেশচন্দ্র বসু (৩৬)	সুলভ দৈনিক ...	কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
সাহস ...	চন্দ্রশেখর সেন		

(৩৪) ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইহা কলিকাতার উন্নতিশীল ব্রাহ্ম-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পত্রে শিক্ষা ও রাজনীতিসংক্রান্ত নানা সারগর্ভ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া থাকে, কিন্তু সমাজনীতির আলোচনায় সঞ্জীবনী সময়ে সময়ে হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়া থাকেন।

(৩৫) বাঙ্গালা ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক চুঁচুড়ানগরে এই তেজস্বিনী পত্রিকার সমুদ্ভব হয়। প্রথম প্রথম "সাধারণী" রাজনীতি অপেক্ষা সাহিত্য-চর্চ্চায় অধিকতর মনোনিবেশ করিত, পরে উহা চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং নববিভাকরের সহিত সম্মিলিত হইয়া বৃহদায়তন পরিগ্রহ করে। ঐ সময়ে উহা বঙ্গের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট রাজনৈতিক পত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

(৩৬) ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক কর্ত্তৃক ঢাকা সারস্বত বা পণ্ডিত সমাজের মুখপত্রস্বরূপ এই পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা প্রাচীন হিন্দুরীতিনীতির পরিপোষক। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের শিক্ষা-সৌকর্য্যবিধানার্থ ইহাতে রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক সারস্বত সমাজের সংস্রব পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকার্য্যে গমন করিলে নানা সম্পাদক পরিবর্ত্তিত হওয়ার পর বাবু উমেশ চন্দ্র বসু উহার সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সারস্বত পত্রের কলেবর এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে।

(৩৭) সুবিখ্যাত বাগ্মী বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া য়ুরোপীয় সংবাদপত্রের অনুকরণে এতদ্দেশে একখানা স্বল্পমূল্যের সংবাদ-পত্র প্রকাশে যত্নবান্ হয়েন। তাঁহারই উদ্যোগে এক পয়সা মূল্যে কলিকাতা হইতে এই ক্ষুদ্র পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে এরূপ অল্প মূল্যের উৎকৃষ্ট পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

(৩৮) ১৮৮১ খৃঃ অব্দে বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু এই পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। এই পত্রে রাজনীতি অপেক্ষা সাহিত্যেরই অধিকতর আলোচনা হইত। ইহার সহিত পরে বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "পতাকা" নামক পত্র সম্মিলিত হয়। এক্ষণে উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া "হিতবাদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।	পত্রিকার নাম।		সম্পাদকের নাম।
সুধাকর	...	আবদুর রহিম	সুলভসংবাদ	...	অপ্রকাশিত
সুজনবন্ধু	...	নবীনচন্দ্র দে	সোমপ্রকাশ	...	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ,
সুজনরঞ্জন	...	গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত			কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (৩৯)
সুধাসিন্ধু	...	অপ্রকাশিত	সৌদামিনী	...	অপ্রকাশিত

(৩৯) খৃষ্টীয় ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর মাসে (১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ) পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার এই সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। রচনার বিশুদ্ধতায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের রীতিসঙ্গত সমালোচনায় সোমপ্রকাশ পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশীয় ও য়ুরোপীয় সকল সমাজেই সোমপ্রকাশ পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। সোমপ্রকাশ হইতে অনেকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার পদ্ধতি অবগত হইয়াছেন। প্রাচীন সোমপ্রকাশের বিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শিতা ও যুক্তি-প্রয়োগ-কুশলতা বাঙ্গালা সংবাদপত্র মাত্রেরই অনুকরণীয়। সোমপ্রকাশের প্রথম প্রচার বিবরণ কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ। সংস্কৃত কালেজে সারদাপ্রসাদ নামে একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি ঈষৎ বধির ছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার বধিরতা বৃদ্ধি হইল। তিনি কৃতবিদ্য হইলেও একমাত্র বধিরতাদোষে তাঁহার কোন কাজকর্ম্ম পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। সারদাপ্রসাদের জীবনোপায় করিবার নিমিত্ত দয়ার সাগর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশের সৃষ্টি কল্পনা করেন। সারদাপ্রসাদ সোমপ্রকাশের সম্পাদক হইবেন আর বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রভৃতি উহাতে লিখিবেন প্রথমে এই স্থির হয়। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করাতে সারদাপ্রসাদের সেই স্থলে কর্ম্ম হইল, তিনি কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় ভাল সংবাদ-পত্র ছিল না; একখানি ভাল বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে এই অভিলাষ ছিল। এক দিবস তাঁহার সেই পুর্ব্বানুষ্ঠান স্মরণ হওয়াতে তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজনকে ডাকিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহার মতের অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে যে সংবাদ-পত্রের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, তাহাই করা হইবে স্থির হইল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই লিখিবেন, এই অবধারণ করিয়া সম্পাদকতার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। কিছুদিন তাঁহারা সকলেই লিখিয়াছিলেন, ক্রমে দুই একজন করিয়া প্রত্যেকেই অবসর গ্রহণ করিলেন। সমুদয় ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্কন্ধে পতিত হইল। যখন সোমপ্রকাশের প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ছাপাখানা কলিকাতা চাঁপাতলায় ছিল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে মাতলা রেলওয়ে খোলা হইলে ঐ মুদ্রাযন্ত্র চাঙ্গড়িপোতায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিজ বসতবাটীতে নীত হয়। পরে তথা হইতে উহা ভবানীপুরে আনীত হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার জীবনকাল (১৮৮৬ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত এই পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে উহার সে তেজ, সে প্রতিভা বা সে রচনার মাধুর্য্য কিছুই নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একজন অনুগ্রহভাজন ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎসাহে বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে এই প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সোমপ্রকাশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও ভগবতীচরণ দে প্রভৃতি ঐ আলোচনায় যোগ দান করেন। স্বয়ং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঐ সময় নানা জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবে প্রাগুক্ত বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ লর্ড লিটনের ভীষণ মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থা প্রচারিত হইলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট মুচলকা চাহেন। তিনি মুচলকা দিয়া

পত্রিকার নাম।	সম্পাদকের নাম।
হালিসহর পত্রিকা ...	অপ্রকাশিত
হালিসহর প্রকাশিকা	"
হাবড়া হিতকরী ...	"
হিন্দুরঞ্জিকা ...	(বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত)
হিন্দুহিতৈষিণী ...	হরিশ্চন্দ্র মিত্র, আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত, (৪০)
হিতবাদী ...	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (৪১)
হিতসাধিনী ...	(বরিশাল হইতে প্রকাশিত)
হিতকরী ...	হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়
হিতৈষী ...	কালীচরণ মিত্র
হরিভক্তিপ্রদায়িনী ..	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী

পত্রিকা রাখিতে অপমান বোধ করিয়া সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ করেন। সদাশয় লর্ড রিপণের অনুগ্রহে মুদ্রাযন্ত্র আইন তিরোহিত হইলে সোমপ্রকাশ পুনর্জীবিত হয় এবং তদবধি অদ্যাপি ইহা জীবিত থাকিয়া নানারূপে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছে।

(৪০) বাঙ্গালা ১২৭১ সনের ফাল্গুন মাসে ঢাকা জেলার কতিপয় প্রধান হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির যত্নে হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্রস্বরূপ হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুকবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রথমে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ১৩ বৎসর এই পত্র দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের পরলোক গমনের পর বাবু আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। এক্ষণে ঢাকার হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা ও হিন্দুহিতৈষিণী উভয়েরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৪১) সুপণ্ডিত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রথমে ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হয়েন। মৃত-সুরভি ও পতাকার অনেক লেখক তখন তাঁহার সহায়তা করিতেন। পরে ইহা হস্তান্তরিত হইয়া প্রথমে বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ মিত্র, পরে এখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হিতবাদী বাঙ্গালার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সংবাদ-পত্র।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখন পর্য্যন্ত অনেকের ধারণা যে, বাঙ্গালা পদ্যরামায়ণ-প্রণেতা কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত, দুই তিন শত বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন লোক নহেন এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস কৌলীন্যের শীর্ষস্থানাধিকারী হইলেও, অনেকে তাঁহাকে আদৌ ব্রাহ্মণ,—অন্ততঃ সৎব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত নহে। যাহাহউক, বাঙ্গালার আদি লেখক এবং কবিখ্যাতির পৌর্ব্বাপর্য্য বিবেচনা স্থলে, কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালার আদি কবি; কেহ বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা গুণ-রাজ খাঁকেই সেই পদে অধিষ্ঠিত করিয়া থাকেন এবং কেহ বা এমনও নির্লজ্জ বিদ্বান্ আছেন, যাঁহার মতে, এমন কি, চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীও কৃত্তিবাসের অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে।

কেবল কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এ কথা বলি কেন, আমাদের বাঙ্গালা দেশের ঐতিহাসিক অনেক বিষয় সম্বন্ধেই, ঐরূপ অপূর্ব্ব মত সকল এ পর্য্যন্ত অতি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া খ্যাপিত ও বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি, শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও, অতি ধীর ও গম্ভীরভাবে ঘোষিত করিয়া আসিতেছেন যে,——

১। পাল বংশের আগে, শূরবংশ বলিয়া বাঙ্গালায় কোন রাজবংশ ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন যে রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পালবংশ। ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে আবার আদিশূর-আনীত শাণ্ডিল্য-গোত্রোদ্ভব ভট্টনারায়ণ-বংশীয় দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র, গুরবমিশ্র প্রভৃতিকে পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে পাল রাজা-দিগের মন্ত্রিত্ব করিতে দেখা যায় কি রূপে?[১] অথবা ব্রাহ্মণদিগের আদি কৌলিন্য-স্থাপক আদিশূর-বংশীয় রাজা ধরাশূরই বা কোথায় যান?

---

(১) বাঙ্গালায় পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় অপর কোন ব্রাহ্মণ বংশ বাঙ্গালায় বর্ত্তমান ছিল না, অথবা স্বতন্ত্র আনীতও হয় নাই। পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গা-লার যে কয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদের গোত্র নাম এই—শুনক, শনক, কাশ্যপ, গৌতম, পরাশর, বশিষ্ঠ, হারিত, যাস্ক এই আট গোত্র। কিন্তু আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ১২ অধ্যায়ে যে গোত্রমালা দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে "শুনক" গোত্রের নাম পাইলাম না। যাহা হউক, একখানি বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থেও দেখা যাইতেছে যে, ভট্টনারায়ণ-বংশীয় আদিগাঁই ওঝা, গৌড়ে পালবংশের স্থাপক দেবপাল রাজার পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন,—

"রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখসুরধুনীতীরদেশে বিধাতুং,
নাম্নাদিগাঁই বিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।" ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ ধৃত শ্লোক।)

এ বারেন্দ্র কৌলীন্য গ্রন্থখানি আমার কাছে নাই। সম্ভবতঃ তখনও গৌড়ে শূরবংশই প্রবল এবং পাল-

২। সেন বংশের আদি বীরসেনই, আদিশূর নাম লইয়া, বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাল! এদিকে কিন্তু বল্লালের বাপ বিজয়সেনের নিজ খোদিত লিপি দ্বারা জানা যায় যে, বীরসেন হইতে অধঃস্তন তিন পুরুষ, বাঙ্গালার মুখও কখনও দেখেন নাই; তাঁহারা আজীবন স্বচ্ছন্দচিত্তে দাক্ষিণাত্য কর্ণাটভূমিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বীরসেনই যদি আদিশূর নাম লইয়া বাঙ্গালায় পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ আনাইয়া থাকেন, তবে বীরসেন হইতে পঞ্চম পুরুষ বল্লালের[২] সময়, ব্রাহ্মণ-বংশের ১৩।১৪ পুরুষ[৩] পৌঁছিয়াছিল কি করিয়া? বংশ-গণনায়, অতি ন্যূন সংখ্যায়ও, ২৫ বৎসরের কমে পুরুষ গণিত হইতে পারে না। এ হিসাবে ব্রাহ্মণদের ১৪ পুরুষ পর্য্যন্ত হইতে অন্ততঃ পক্ষে ৩৫০ বৎসর লাগিয়াছে। আর ওদিকে বীরসেন হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত পুরুষ-গণনায় বৎসর যদি দুনা করিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও পাঁচ পুরুষে মোট ২৫০ বৎসর হয়। সুতরাং এই পঞ্চব্রাহ্মণ যে বীরসেন ব্যতীত, অন্য কোন প্রাচীন আদিশূরের দ্বারা বল্লালের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।[৪]

৩। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন যে, মুসলমান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালায় আসিয়া, লছমনিয়া নামক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, গৌড় অধিকার করেন। এখন এই লছমনিয়া কে? আমাদের ঐতিহাসিকদের সাধারণতঃ লক্ষ্মণসেনের প্রতি যেন অসীম কৃপা! লক্ষ্মণসেন বয়সকালে মিথিলা প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন বলিয়া হউক, আর যে কারণে হউক, এই লক্ষ্মণসেনের উপর তাঁহারা বাঙ্গালায় যবনাধিকারের কলঙ্কটা চাপাইতে একেবারেই নারাজ। লক্ষ্মণের পর তাঁহার দুই পুত্র মাধবসেন ও কেশবসেনের নাম পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহারাও লছমনিয়া হইতে পারে না; অথচ একটা লছমনিয়া খাড়া না করিতে পারিলেও চলে না। এখন পুস্তক বিশেষে লক্ষ্মণের নাম কিছু অস্পষ্ট, সুতরাং সেইই তবে মুসলমান

বংশ তখন বাঙ্গালায় কোন প্রাদেশিক ভূঁইয়া বা সামন্তরাজ স্বরূপ গণ্য ছিলেন। তখনও প্রবল হইয়া গৌড় অধিকার করিবার সময় তাঁহাদের আসে নাই।

(২) দাক্ষিণাত্য-কর্ণাটরাজ বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন, সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন, হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন, বিজয়ের পুত্র বল্লালসেন। সেনরাজগণের অনেক তাম্রশাসন দৃষ্টেই এই সহজ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৩) পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বংশে উৎপন্ন উৎসাহ মুখটি বল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন, ইনি শ্রীহর্ষ হইতে ১৪ পুরুষ অন্তর। অন্য চারি গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা এই সময়ে কেহ ১১, ১২, বা ১৩ পুরুষে গণিত হইয়া থাকেন।

(৪) আদিশূরের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার লিখিয়াছেন, যথা, কায়স্থ কৌস্তুভ অনুসারে ৮১৪ শক, দত্তবংশমালা অনুসারে ৮০৪ শক, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্ণয় অনুসারে ৮৮৬ এবং ক্ষিতীশ-বংশা-

ঐতিহাসিকের লছমনিয়া না হইয়া যায় না। কিন্তু ইংরাজের মধ্যে যেমন বাপ, বেটা ও নাতির একই নাম হইতে পারে, ভারতে ত তেমনটা প্রথা নাই, সুতরাং লছমনিয়ার নাতি লছমনিয়া হইবে কি করিয়া, অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, এ লছমনিয়া অর্থে লক্ষ্মণ নহে, লাক্ষ্মণের এবং এই লাক্ষ্মণেরই বখ্‌তিয়ার খিলিজীর হাতে বাঙ্গালা হারাইয়া চিরকলঙ্কের পসরা মাথায় করিয়া পলাতক হইয়াছিলেন। এইরূপ অপূর্ব্ব যুক্তি-পরম্পরায়, আমাদের ঐতিহাসিকগণ অপূর্ব্ব সত্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাই বাঙ্গালার ভাবী পুরুষগণকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন।

বলীর মতে ৯৯৯। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলাচার্য্যগণ সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে, "বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" অর্থাৎ ৯৫৪ শক। কিন্তু ইহার কোনটাই যে ঠিক নহে, তাহার এক অতি বিশিষ্ট কারণ এই যে, তাহার কোনটাই বল্লালসেনের ৩৫০ বা ৪০০ বৎসর পূর্ব্বগত সময় দেখাইতে পারে নাই; অথচ বল্লালের নিকট কৌলীন্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ কয়টির উর্দ্ধতনবংশাবলী গণনায় নিশ্চয় জানা যাইতেছে,—

বল্লালের অন্ততঃ সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে না হইলে, ব্রাহ্মণ বংশাবলীর আদি কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকাল ঠিক বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। অতএব আরও প্রমাণ দেখা যাউক, পঞ্চব্রাহ্মণ কবে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের ভট্টগ্রন্থ মতে ৬৫৪ শক নির্ণীত হইয়াছে; পুনশ্চ বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার মতে,

"বিপ্রান্ বেদবিধানবঞ্চিতহৃদো বিজ্ঞায় বিজ্ঞো বিভুঃ,
গৌড়স্থান্ সকলান্ কলিপ্রকলিতান্ বিঘ্নোপশান্তক্ষমান্।
স্বাচারী সুবিচারচারচতুরশ্চারুক্রিয়াচারকঃ;
শাকে বেদকলঙ্কষট্‌কবিমিতে রাজাদিশূরঃ স চ॥"

শাকে "বেদ কলঙ্ক ষট্‌ক বিমিতে" অর্থাৎ ৬৫৪ শকে। কেহ কেহ বলেন যে, বাচস্পতিমিশ্র কৃত কুলরাম গ্রন্থে দেখা যায়, "বেদবাণাঙ্গ শাক", অর্থাৎ ৬৫৪ শক; কিন্তু আমার কাছে যে কুলরাম গ্রন্থ আছে, তাহাতে শকের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাইলাম না। তবে অনেক কুলগ্রন্থেই "বেদবাণাঙ্ক" শক উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা "বেদবাণাঙ্ক" না হইয়া, উহা যে গোড়ায় "বেদবাণাঙ্গ" ছিল এবং কালে পুঁথি হইতে পুঁথ্যন্তর লিপিকালে লেখকের দোষে "বেদবাণাঙ্কে" পরিণত হইয়াছে ও পরবর্ত্তী অজ্ঞ কুলাচার্য্যগণ তাহাই যে অঙ্কের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। "বেদবাণাঙ্গ" যে ঠিক, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, উহা বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার "বেদকলঙ্কষট্‌কের" সহিত এক হইতেছে এবং দ্বিতীয়তঃ বল্লালের যত আগে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সঙ্গত হয়, এই শক তাহার পূর্ণ মাত্রার পোষকতা করিতেছে। অতএব "বেদবাণাঙ্গই" ঠিক এবং "বেদবাণাঙ্ক" কালবশে ও নকলকারকের দোষে ভ্রান্ত রূপান্তর মাত্র।

ফলতঃ "বেদবাণাঙ্গ" স্বরূপ এই ৬৫৪ শকই আদিশূরের যথার্থ কাল বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে। ৬৫৪ শকে ইংরেজী ৭৩২ খৃষ্টাব্দ হয়। দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম যে, বিশ্বকোষে আদিশূরের কাল ৭৭৬ খৃষ্টাব্দ ধরা হইয়াছে। অবশ্য, উহা ৭৩২ খৃঃ সহ এক মিল না হইলেও আর আর সকল অপূর্ব্ব কাল-নির্ণয় অপেক্ষা, সত্যের সঙ্গে উহার যে অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ বিশ্বকোষ যেরূপ উপাদেয়, অমূল্য এবং বিশাল অথচ সূক্ষ্ম অনুসন্ধানপূর্ণ গ্রন্থ, তাহাতে উহার পক্ষে ঐ কাল-নির্ণয় উপযুক্তই হইয়াছে বলিতে হইবে।

এইরূপ আরও বহুতর বিষয় আছে; কিন্তু পাঠক, সে সকলের আর অধিক উল্লেখ করিয়া জায়গা জোড়া করিতে ইচ্ছা করি না।

ঘটনাগুলির উপরোক্ত ভ্রান্ত বিবরণ সকল বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং অন্যদেশের সাহিত্যেও যে তদ্রূপ ভ্রান্ত বিবরণ না চলে, এমন নহে। তবে কি না কালে তাহা সংশোধিত হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে, আমাদের পক্ষে জ্ঞাতব্য এমন গুরুতর বিষয়টা, এতগুলি বড় বড় বিদ্বান্ সত্ত্বেও যে, বিনা সংশোধনে এতদিন ধরিয়া একভাবেই চলিয়া আসিতেছে, এইটাই বড় দুঃখের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও ইংরেজে যাহা বলে, তাহাই শিরোধার্য্য; এখনও তাহারই মধ্যে

এখন দেখা যাউক এই ৭৩২ খৃঃ অব্দ বল্লালসেন হইতে কতটা অন্তর। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষে ও ১১২৭ শকে, অর্থাৎ ১২০৫ খৃষ্টাব্দে, সূক্তিকর্ণামৃত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য যে শ্রীধরদাস একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, তিনি যে নিজ গ্রন্থের সন তারিখ এবং তাঁহার বাপ যে রাজার মহাসামন্ত সেই রাজার নাম ও তাহার রাজত্বকাল যে নির্ভুল রূপে জানিতেন, তাহাতে সন্দেহ করা নিতান্ত পাগলের কার্য্য। কিন্তু মাঝে পড়িয়া একটা কথার আলোচনা একটু প্রয়োজন;—১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজী যদি লক্ষ্মণসেনকে তাড়াইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিল, তবে আবার সেই লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খৃঃ অব্দে রাজা থাকিলেন কিরূপে? ইহার অতি সহজ ও অভ্রান্ত উত্তর এই যে, লক্ষ্মণসেন কেবল নদীয়া ও গৌড় হইতেই বিতাড়িত হইয়াছিলেন; নতুবা, বিতাড়িত হওয়ার পরেও, তিনি ও তাঁহার বংশাবলী বহুদিন ধরিয়া, এমন কি বাদশাহ বল্‌বনের সময়ের পর পর্য্যন্তও, পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পৈনাম নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ১২০৩ খৃঃ অব্দের পরেও, এই কয় পুরুষ বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন,—লক্ষ্মণসেন ও তৎপুত্র মাধবসেন, মাধবের পর মাধবের কনিষ্ঠ কেশবসেন, কেশবের পুত্র সদাসেন বা শূরসেন এবং শূরসেনের পুত্র দনৌজামাধব। কালে এই দনৌজা-মাধবের নাম খ্যাত হইয়াছে অশেষ প্রকারে, যথা—দনুজারি, দনুজমর্দ্দন, দনুজমাধব, বেদানুজ, নৌজে, ধিনুজ, ইত্যাদি। যাহাহউক, দনৌজামাধব ১৩০০ খৃঃ প্রারম্ভে বিক্রমপুর হইতে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে, অধুনাতন মাধবপাশা নামক স্থানে, রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গৌড় যবন করতলগত হইলেও, সেনবংশীয়েরা গৌড়কে যেন যবন কর্ত্তৃক ক্ষণিক হস্তান্তরিত ভাবিয়া, আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিতে ত্রুটী করিতেন না; যেমন ফ্রান্সের সামান্য অধিকার হস্তান্তরিত হইয়া গেলেও, বহুদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজগণ ফরাসীরাজ বলিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক মনের সখ মিটাইতে ত্রুটী করিতেন না।

ভাল! এখন খৃষ্টীয় ১২০৫ শকে যদি লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বৎসর রাজত্বকাল হইল, তাহা হইলে লক্ষ্মণের রাজ্যারম্ভ এবং অভিষেককাল হইতেছে ১১৬৮ খৃঃ। ইহার পূর্ব্বে লক্ষ্মণের পিতা বল্লালের রাজত্বকাল ৫০ বৎসর; এই পঞ্চাশ ১১৬৮ খৃঃ অব্দ হইতে বাদ দিলে, বল্লালের অভিষেক কাল পাওয়া যাইতেছে ১১১৮ খৃঃ অব্দ। এই ১১১৮ খৃঃ হইতে ৭৩২ খৃঃ, ৩৮৬ বৎসর অন্তর; সুতরাং সে সময়ে অর্থাৎ ১১১৮ খৃঃ শকে বা তৎসন্নি-হিত সময়ে, কৌলীন্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মণবংশের মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে ১৩।১৪ পুরুষ হওয়া সম্পূর্ণই সঙ্গত হইতেছে। কথা আছে, বল্লালসেন জীবনের শেষ বয়সে দানসাগর-রচনা করেন এবং ঐ রচনার পর ১ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এখন ঐ দানসাগর রচনার কাল বল্লাল নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, "পূর্ণে শশিনবদশমিতে" শকে, অর্থাৎ ১০৯১ শকে বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দে। ১১৬৯ খৃঃ হইতে বল্লালের অভিষেক কাল ১১৬৮ বাদ দিলে, ৫১ বা দিন

আঙ্গুল কাটিয়া অঙ্গুলিবৎ যে কিছু নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া থাকি মাত্র। নতুবা যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহাতে এখনও বলিতে হয় যে, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিষয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান কার্য্য, এখনও তাহার শৈশব সীমা অতিক্রম করে নাই। এখনও অনেকে, ইংরেজপ্রণীত পুস্তক সকলের টীকা টীপ্পনী হইতে বহুগ্রন্থের নামাদি নকল করিয়া, স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশপূর্ব্বক স্বীয় অসীম বিদ্যাবত্তা ও বহুব্যাপী অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন[৫]। দেশে একজন সর্ব্বগ্রন্থ ও সর্ব্বশাস্ত্র-দর্শী পণ্ডিত থাকিলেই রক্ষা থাকে না; কিন্তু আমাদের সটীপ্পনী বাঙ্গালা পুস্তক সকল পড়িলে, অবশ্যই বলিতে হয় যে, তেমন পণ্ডিত আমাদের দেশে অসংখ্য! অসংখ্য বটে, তথাপি কিন্তু আমাদের যে সাহিত্য ইতিহাসাদি বিষয়ক অভাব ও দুর্দ্দশা ঘুচে না, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই।

উহারই মধ্যে যাহারা বা কিছু স্বাধীন ভাবে বিষয়ানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহাও প্রায় ছাপার পুঁথি দৃষ্টে। আমাদের প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি নকল প্রায়ই স্পর্শাতীত

মা সাদির ভাঙ্গাভর্ত্তি পূরণে মোট ৫০ বৎসরই পাওয়া যায়। অতএব আইন-ই-অকবরী ও অপরাপর গ্রন্থে, বল্লালের রাজত্বকাল ৫০ বর্ষ বলিয়া যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যে সত্য, সে কথা উপরোক্ত হিসাবের দ্বারাও অতি উত্তমরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

আর একটা কথা, লক্ষ্মণসেন প্রবর্ত্তিত লসং সন, যাহা এখনও মিথিলায় প্রচলিত, তাহা বর্ত্তমান ১৮৯৭ খৃঃ ৭৮৯ বর্ষ পরিমিত, সুতরাং ১১০৮ খৃষ্টাব্দে উহার আরম্ভ। এই ১১০৮ খৃঃ হইতে লক্ষ্মণের ৩৭ বৎসর রাজত্ব শেষ ১২০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত, ৯৭ বর্ষ পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা এই দুইটী বিষয় সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে; প্রথমতঃ লসং সন লক্ষ্মণসেনের জন্ম বৎসর ধরিয়া আরম্ভ; দ্বিতীয়তঃ বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বাঙ্গালা আক্রমণ কালে লক্ষ্মণসেন যথার্থই অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। এরূপ বৃদ্ধ রাজা ছাড়িয়া বিনাযুদ্ধে পলাইলে, দোষ তাঁহাকে দেওয়া যায় না; দোষ লক্ষ্মণের পাত্র মিত্রাদির এবং দোষ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির। তাই বলি, সে পলায়ন লক্ষ্মণসেনের নহে; সে পলায়ন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির, লক্ষ্মণসেন কেবল তাহাতে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি প্রতিনিধি পলাতক, এই মাত্র তাঁহার দোষ।

লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক একটা কথা লিখিয়াছেন যে, তিনি আজন্ম রাজা এবং তাঁহার মাতা সুসময় প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্মণকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেন নাই। এ অদ্ভুত উপন্যাসের প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। যাহাহউক, যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে না দিলে, সন্তান এবং প্রসূতি উভয়েই বাঁচে কি? শারীর-তত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন। তবে আমরা সোজা দৃষ্টিতে যতটা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় যেন বাঁচে না।

যাহাহউক, এখন বোধ হয় অনেকেরই ভ্রম ঘুচিবে যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজী-বিতাড়িত লছমনিয়া, আর কোন লক্ষ্মণ বা লাক্ষ্মণেয় নহে, মিথিলা ও কাশী পর্য্যন্ত জয়কারী এবং মিথিলার লসং নামক শকপ্রবর্ত্তক বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনই স্বয়ং। লক্ষ্মণ যৌবনে বীরপুরুষ থাকিলেও, বার্দ্ধক্য ও জরাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁহার বুদ্ধি-ভ্রংশ ও শত্রু সম্মুখে পলায়নপর হইতে নাই, এমন কোন কথা নাই বা অসম্ভবও তাহাতে কিছু দেখা যায় না।

(৫) যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত ও যাঁহারা এরূপ পাণ্ডিত্যখ্যাপনের অতীত, এমনও দেশে অনেক আছেন। অবশ্যই আমার এ বিদ্রূপোক্তি যে তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল হাতের লেখা পুঁথির মধ্যে পুনঃ ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্য-দিগের গ্রন্থ হইতে যে কি ও কত অমূল্য ঐতিহাসিক রত্নরাজি উদ্ধার হইতে পারে, তাহা আজিও এক রকম সর্ব্বসাধারণে যেন অবিদিত হইয়াই রহিয়াছে।

একটা উদাহরণ স্বরূপ দেখাই। এই এক ধরুন্ কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থের মধ্যে, কুলাচার্য্য এড়ূমিশ্রের গ্রন্থ। এড়ূমিশ্র লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের সাময়িক লোক, এবং বহু সময় কেশবসেনের সভাতেই অবস্থান করিতেন। সুতরাং স্বয়ং কেশব-সেন ও তাঁহার পূর্ব্বগত অন্ততঃ পাঁচ সাত পুরুষ সম্বন্ধীয় সংবাদ যদি এড়ূমিশ্রে পাওয়া যায়, তবে তাহা কত দূর বিশ্বাসযোগ্য হইবার কথা। হিন্দু সন্তান মাত্রেই পাঁচ সাত পুরুষের সংবাদ রাখা সকলেরই লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ দরকার; বিশেষতঃ হিন্দুর দশসংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদাই তাহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং কেশবসেন যে নিজের সাত পুরুষের খবর রাখিতেন এটা ঠিক, এবং তাহা হইলে সেই কেশবসেনের সভায় বসিয়া, কেশবসেনের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ যদি এড়ূমিশ্র লিখিয়া থাকেন, তবে তাহারও সেইরূপ ঠিক হইবার কথা এবং এরূপ স্থলে নিতান্ত গণ্ড মূর্খ বাতুল ভিন্ন, আর কেহই তাহাকে বেঠিক বলিতে সাহসী হয় না[৬]। কেশবসেনের পৌত্র দনৌজামাধবের সমসাময়িক কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের গ্রন্থ সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ কথা বলা যাইতে পারে।

এখন এই এড়ূমিশ্র ও হরিমিশ্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গৌড়ে পূর্ব্বকালে আদিশূর হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকজন শূরবংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর পালবংশের আদিরাজ দেবপাল কর্ত্তৃক শূরবংশ বিতাড়িত হইলে, পালবংশীয় কয়েক-জন রাজা গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন দাক্ষিণাত্য হইতে সমাগত হইয়া, পালরাজাদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। অবশেষে বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণসেন, গৌড় নগর ও নবদ্বীপ বখ্‌তিয়ার খিলিজীর করতলগত দেখিয়া, বিক্রমপুর অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং ইহার পরেও বহুদিন ধরিয়া লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মণের বংশাবলী স্বাধীনভাবে বিক্রমপুর ভূভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তথায় ইঁহাদের রাজধানী ছিল পৈনাম নামক স্থানে। ইত্যাদি।

ফলতঃ কুলাচার্য্যদের গ্রন্থ মধ্যে যে এরূপ কত অমূল্য ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা বলিবার নহে। কুলাচার্য্যদিগের দ্বারা যে সুবিশাল ও দেশব্যাপী ব্রাহ্মণ বংশাবলী

---

(৬) কিন্তু আমাদের দেশে এমন পণ্ডিতও আছেন, যাঁহারা এরূপ প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া, স্বীয় অনু-সন্ধিৎসাবৃত্তি দ্বারা নূতন মত চালাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না। অথবা তাহাই বা বলি কেন, তাঁহারা আরও কিছু অগ্রগামী হইয়া চলিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট, এমন কি, ব্যক্তি বিশেষ যে সে নিজের নামটা পর্য্যন্ত মানে না, সে নামটাও তাঁহারা অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির অপূর্ব্ব মহিমাবলে নিরূপণ করিয়া দিয়া থাকেন। তাহা না হইলে কি আর কালিদাস প্রভৃতি মাতৃগুপ্তাদিতে পরিণত হইতেন?

রক্ষিত হইয়াছে, তাহা যে প্রায়ই ঠিক ও অভ্রান্ত, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

বাঙ্গালার আদিকাব্য যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তাহার কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিষয়ক আমার এই প্রস্তাবের আলোচনাতেও আমার প্রধান অবলম্বন সেই কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থাবলী। আমি বহুশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া, তবে এই কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থরাশি পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখনও যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে বাকী আছে, আশা করি, সে সকলও শীঘ্র হস্তগত করিতে সমর্থ হইব। এই কৃত্তিবাস নিজ গ্রন্থে, অর্থাৎ যাহা এখন বটতলায় কৃত্তিবাসের নামে ছাপা হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি নিজের পরিচয় এইরূপে প্রদান করিয়াছেন—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিতমুরারি ওঝার নাতি।"
"মা মালিনী নাম যার বাপ বনমালী।" ইত্যাদি।

এখন এই মুরারি "ওঝা" শব্দই যত নষ্টের গোড়া। আমাদের দেশে ভূতের ওঝা, ডাইনীর ওঝা, এ সকল প্রায় ইতর লোক ও বর্ণব্রাহ্মণেই দেখা যায়। তাই লোকে সহজে কৃত্তিবাসকে ব্রাহ্মণ বলিতেই রাজী নহে এবং যদিই বা ব্রাহ্মণ হয়, তবে সে কোন বর্ণব্রাহ্মণ হইবে। এখন ওঝা যে উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ এবং সে কালে ন্যায়ালঙ্কার বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পদবীর ন্যায় বিদ্যার খ্যাতিস্বরূপে ব্যবহৃত হইত, ইহা অনেকের জানা থাকিলে আর এরূপ ভ্রম ঘটিত না। মুরারি ওঝা যে সময়ের লোক, তখনও বিদ্যালঙ্কারাদি উপাধি ভাল চলিত হয় নাই; তখনও পাণ্ডিত্যের প্রধান খ্যাতি ওঝা, মিশ্র, পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি। অতএব মুরারি ওঝা ও তাঁহার নাতি কৃত্তিবাস কেবল সৎব্রাহ্মণ ও কুলীন নহেন; তাঁহারা কুলরাজচক্রবর্ত্তী, তাঁহাদেরই বংশে এখনকার প্রধান কুলীন বিষ্ণুঠাকুরাদির উৎপত্তি। যাহা হউক, এখন কান্যকুব্জাগত ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে[১] কৃত্তিবাসের বংশাবলী অনুসরণ করিয়া দেখা যাউক, রামায়ণ-প্রদত্ত উক্ত পরিচয়ের সঙ্গে কতটা মিল হয়। বংশাবলী যথাক্রমে পর পর পুরুষ সংখ্যা সহ লিখিলাম;—

শ্রীহর্ষ।১। শ্রীগর্ভ।২। শ্রীনিবাস।৩। মেধাতিথি।৪। অরবিন্দ বা অরব।৫। ত্রিবিক্রম।৬। কাক।৭। ধুরন্ধর বা ধাঁদু।৮। জলাশয়।৯। বাণেশ্বর।১০। প্রাণেশ্বর।১১। গুণধর বা গুঁই।১২। মাধবাচার্য্য।১৩।

---

(১) মতান্তরে ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও দক্ষ ইঁহারা গৌড়ে না আসিয়া, যথাক্রমে ইঁহাদের পিতা ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, সৌভরি, সুধানিধি ও বীতরাগ এই পঞ্চজন আসিয়াছিলেন, যথাক্রমে ইঁহাদের শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ, বাৎস্য ও কাশ্যপ গোত্র। শাণ্ডিল্য আসিয়াছিলেন কান্যকুব্জের জম্বুচত্বর গ্রাম হইতে, ভরদ্বাজ উড়ুম্বর গ্রাম হইতে, সাবর্ণ মন্ত্রগ্রাম হইতে, বাৎস্য তাড়িত গ্রাম হইতে, এবং কাশ্যপ কোলাঞ্চ গ্রাম হইতে। গৌড়াগত হইলে, রাজা আদিশূর ইঁহাদিগকে যথাক্রমে এই পঞ্চগ্রাম প্রদান করেন,—কামঠী, ব্রহ্মপুরী, বটগ্রাম, হরিকোটী এবং কঙ্কগ্রাম। যাহা হউক, সাধারণতঃ ভট্টনারায়ণাদি যে পঞ্চজন কান্যকুব্জ
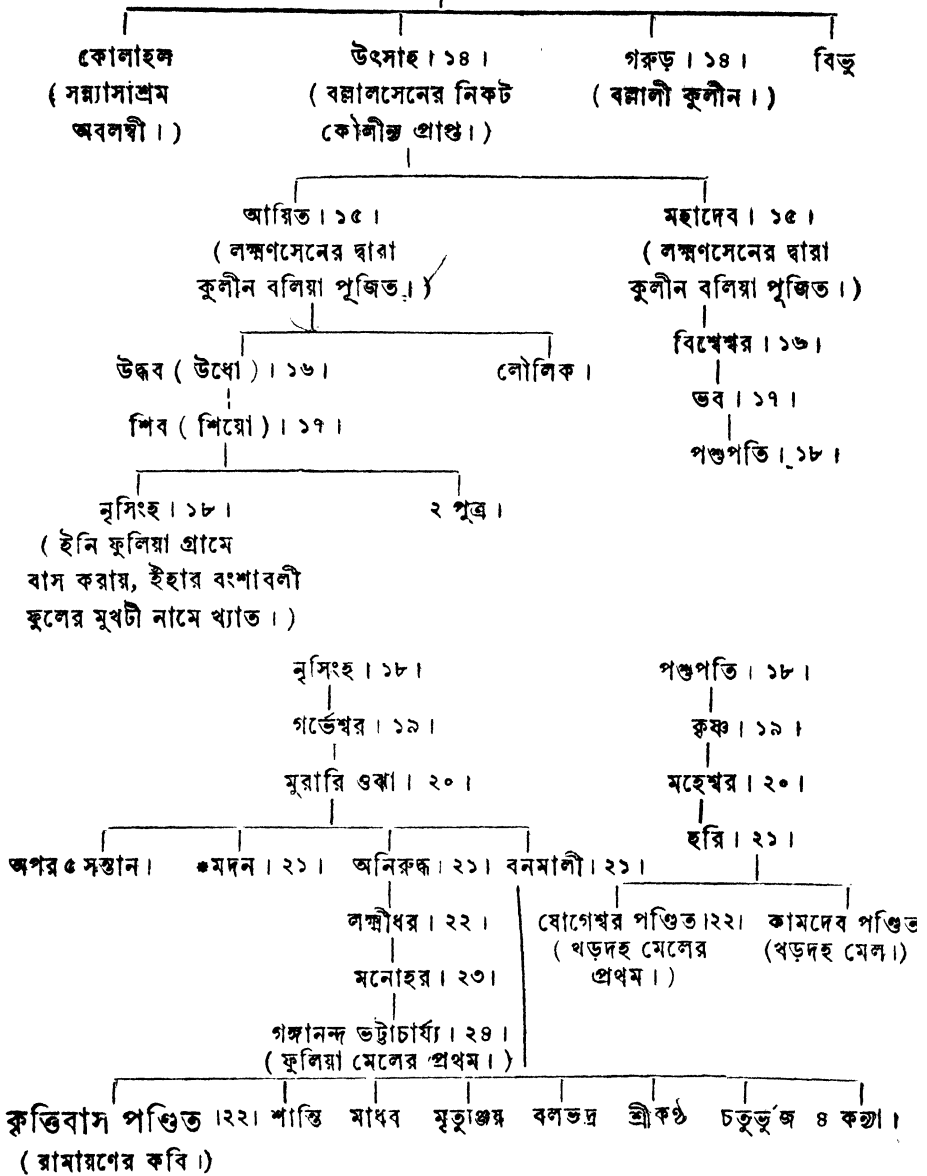
হইতে গৌড়াগত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন, আমি এখানে তাহাই মানিয়া লইয়া উল্লেখ করিলাম। আমার বিবেচনায় ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চনামই ঠিক। উপরে গোত্র এবং পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বাসস্থানের কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা এই পঞ্চজনের প্রতি প্রযুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

* এই মদনের বংশে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কবি ফুলের মুখটী ভারতচন্দ্ররায় মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশপরম্পরা, যথা—মদন।২১। রাঘব।২২। দেবানন্দ।২৩। প্রয়াগ।২৪।

কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী মুখটী সম্বন্ধে, ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশে, এই কারিকা দৃষ্ট হয়——

"ফুলিয়া মুখটী মুরারিজ বনমালী।——

শ্রীমদ্বনাই মুখজস্ত ররাজমৌলৌ
গাঙ্গঃ পুরো মুখরপণ্ডিতযোগহেতুঃ।
লভ্যঃ সদা সুমতি মিশ্রো দিবাকরোসৌ
ক্ষেম্যো বৃহস্পতিক আর্ত্তি বিশোপি চট্টঃ॥

কিঞ্চ। বনমালিনা কৃতাচার্ত্তি গাং পুরো সংশয়ে যদা।
মিশ্রে দিবাকরে কিঞ্চিদার্ত্ত্যা দোষাদ্বিমুক্তবান্॥
চট্টোবৃহস্পতিক্ষেম্যঃ তৎসুতা জজ্ঞিরেপি সন্।
কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তিজনপ্রিয়ঃ॥
মাধবঃ সাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো মহাশয়ঃ।
বলঃ শ্রীকণ্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ॥"

এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, বনমালীর ৭ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসকে ধ্রুবানন্দ মিশ্র "কবি ও ধীমান্" এই কয়টী বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের অপর ছয় ভ্রাতার নাম, জ্যেষ্ঠাদিক্রমে শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ।

পুনশ্চ, ধ্রুবানন্দের বনমালী বিষয়ক উক্ত কুলকারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাসের ভগ্নী বা বনমালীর কন্যা চারিটী। তাহার মধ্যে বনমালী মুখোপাধ্যায় পুরন্দর গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রথমা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় কুলে কিছু খাট হইয়া যান। তাহার পর আবার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ দিবাকর মিশ্রকে প্রদান করায় সে দোষ কাটিয়া যায়। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যা ক্রমান্বয়ে বৃহস্পতি চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে সম্প্রদান করেন।

অতএব উপরোক্ত বংশতালিকা ও কুলকারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, আদিশূরের আনীত ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত ২২ পুরুষ। তিনি মুরারি ওঝার পৌত্র, বনমালী মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই ছয়টি, নাম—শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ। ভগ্নী ৪টীর নাম প্রকাশ নাই, তবে ভগ্নীপতি চারিজনের নাম এই—পুরন্দর গাঙ্গুলী, দিবাকর মিশ্র, বৃহস্পতি চট্ট এবং বিশ্বেশ্বর চট্ট।

জগদীশ।২৫। গোপাল।২৬। রামনারায়ণ ২৭। রামকান্ত।২৮। ভুরশিটের ভূম্যধিকারী রাজা নরেন্দ্র রায়।২৯। নরেন্দ্রের পুত্র ভারতচন্দ্র রায়।৩০। ভারতচন্দ্রের বহুপূর্ব্বেই মুরারি ওঝার বংশাবলীর এই শাখা কৌলীন্যশূন্য হইয়াছিল।

এখন কৃত্তিবাস কতদিনের লোক, তাহা দেখা যাউক। উপরে নিরূপিত হইয়াছে যে, ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃঃ অব্দে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় আনীত হয়েন। সেই সময় হইতে কৃত্তিবাস ২২ পুরুষ। এখন প্রতিপুরুষে ৩০ বৎসর ধরিলে, ২২ পুরুষ হইতে ৬৬০ বৎসর অতীত হয়। সুতরাং মোটামুটি কৃত্তিবাসের সময় ১৩১৪ শক বা ১৩৯২ খৃঃ অব্দ হইতেছে। অবশ্য, অন্যবিধ উপায়ে গণনা করিলে ইহা হইতে অনেকটা তফাত বাদ হইতে পারে এবং ইহাও জ্ঞাতব্য যে, যেখানে অন্য কোন ভাল উপায়ের অভাব, সেখানে কাজে কাজে পুরুষ গণনার দ্বারা কাল নিরূপণ করিতে হয়। পুনশ্চ, এও দেখিতে হইবে, অন্য চারি গোত্রের তুলনায়, সমসময়ে মুখটীবংশে অনেক বেশী পুরুষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বংশে পুরুষ হইতে পুরুষান্তর উৎপাদনে অনেক অল্প সময় লাগিয়াছে। অতএব এ বংশগণনায় ৩০ অপেক্ষা আরও কিছু কম বৎসরে পুরুষ গণনা করিলে, বোধ হয় কৃত্তিবাসের কাল আরও সঙ্গত হইতে পারে।

এ ছাড়া আরও একটী বিষয় দ্রষ্টব্য। দেবীবর ঘটক যে সময় কুলীনদের মেলবন্ধন করেন, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃত্তিবাসের জেঠ্তুত ভাই লক্ষ্মীধরের পৌত্র গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং ঐ গঙ্গানন্দ ভট্টকে লইয়াই ফুলিয়া মেলবদ্ধ হয়। তাহা হইলেই জানা যাইতেছে, দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধন হওয়ার অনেক আগে কৃত্তিবাস। তবে উপরোক্ত বংশ-তালিকায় ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, ঐ একই বংশের মহাদেব শাখায়[১] আর একজন, অর্থাৎ যোগেশ্বর পণ্ডিতও সেই মেলবন্ধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাকে লইয়াই খড়দহ মেলের সৃষ্টি। এখন কথা হইতেছে যে, যোগেশ্বর পণ্ডিত সে সময় জীবিত ছিলেন বলিয়া, কৃত্তিবাসকেও যে সেই সময়ের লোক হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; যেহেতু, বংশ এবং বংশের শাখা বিশেষে কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ অল্পজীবিহেতু, সমগণনার পুরুষেও সময়ের অনেক অন্তর হইতে পারে। অথবা ধরিলাম যে, কৃত্তিবাস পণ্ডিত ও যোগেশ্বর পণ্ডিত মূল শ্রীহর্ষ হইতে সমপুরুষ সংখ্যা হেতু উভয়েই সমসময়ের সমান বয়সের লোক; কিন্তু তাহা হইলেও ত তাঁহারা মেল-বন্ধনের সময়ের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু, গঙ্গানন্দ ভট্ট তখন যুবা পুরুষ; কিন্তু যোগেশ্বর পণ্ডিত অতিশয় বৃদ্ধ, কারণ দেখা যায় যে, মেলবন্ধনের পূর্ব্বেই একে একে তাঁহাকে এগারটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছিল এবং শেষ কন্যার বিবাহ

---

(১) আম্রিত শাখায় কৃত্তিবাসের উৎপত্তি, আর মহাদেব শাখায় যোগেশ্বরের উৎপত্তি। সুতরাং উভয়ে ৮ পুরুষের ছাড়াছাড়ি। যেখানে ৮ পুরুষে ছাড়াছাড়ি, সেখানে কোন্ শাখায় কে কম বয়সে মরে, কে বেশী বাঁচে তাহার ঠিক না থাকায়, উভয়তঃ সমসংখ্যক পুরুষগণনায়, সময়ের অনেক ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইতে পারে। তাই বলি, মূল প্রবন্ধভাগে যোগেশ্বরের কথা না পাড়িলেও চলিত। তবে উহারই মধ্যে আহ্লাদের বিষয় এই যে, যোগেশ্বরের কথা আমার বক্তব্যের সহায়তা করিয়াছে বই বিপরীতে যায় নাই।

মধুচট্টের সঙ্গে দেওয়াতেই তিনি যে দোষলিপ্ত হন, তাহা হইতে তাঁহাকে লইয়া খড়দহ-মেলের সৃষ্টি হয়;———

"ক্ষেম্যাশ্চট্টমধুর্বিরাম সময়ে যোগেশ্বরস্তাত্বতং,
কর্ম্মৈকাদশতঃ———————" মহাবংশ।

কেবল তাহাই নহে। আরও দেখ, একদিকে যেমন এই সময়ে গঙ্গানন্দ ভট্টের কেবল রাম ও বাসু নামে দুইটী মাত্র পুত্র হইয়াছে; অন্যদিকে যোগেশ্বরের তখন ১১ কন্যা ও ১১ জামাই এবং মুকুন্দ, শঙ্কর, ত্রিবিক্রম, কমলাপতি, শত্রুঘ্ন, জানকীনাথ ও রুক্মিণী এই সাত পুত্র। আবার পৌত্রও তাঁহার তখন এক এক সন্তানে কতকগুলি করিয়া হইয়াছিল দেখ; প্রথম পুত্র মুকুন্দের ৪ পুত্র, দ্বিতীয় পুত্র শঙ্করের ৫ পুত্র এবং ষষ্ঠ পুত্র জানকী-নাথের ৪ পুত্র। এখন যে লোকের এতগুলি বংশাবলী, তাহার বয়স কত হইতে পারে বল দেখি? অন্ততঃ আশি বা পঁচাশি, ইহারত কম নহে। অতএব কৃত্তিবাস, যোগেশ্বরের সঙ্গে সমকালে ও সমান বয়স হইলেও, মেলবন্ধনের সময়ের অন্ততঃ ৮০ বৎসর আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ কৃত্তিবাস, যোগেশ্বরের অনেক আগের লোক; যেহেতু কৃত্তিবাস এবং তাঁহার জেঠ্তুত ভাই গঙ্গানন্দ ভট্টের পিতা লক্ষ্মীধর, অথবা লক্ষ্মীধরের পুত্র ও গঙ্গানন্দের পিতা মনোহর, ইহারা জীবিত থাকিলে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গানন্দকে ভট্টকে লইয়া কুলবিচার হইত না অথবা দেবীবরের কুলবিচারের মধ্যে অবশ্যই ইহাদের উল্লেখ থাকিত; কিন্তু তাহা না থাকাতে ইহাই নিঃসন্দেহ অবধারিত হইতেছে যে, মেলবন্ধনের বহুপূর্ব্বেই ভাই ও ভাইপো সমেত কৃত্তিবাস গতাসু হইয়াছেন।

আর এক কথা, উপরের মেলবন্ধনের সমকালিক যে সকল বিবরণ লিখিলাম, তাহার অধিকাংশ ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশ দৃষ্টে। মেলবন্ধনের সময় ধ্রুবানন্দের যুবা বয়স। তাহার পর বৃদ্ধাবস্থায় তিনি দেবীবরের অনুরোধে এবং মেলবন্ধন হওয়ার কিছুকাল পরে, কুলীনদিগের বংশ এবং বিবরণ সম্বলিত মহাবংশ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে উৰ্দ্ধতন দশ পুরুষ হইতে, ধ্রুবানন্দের সমসাময়িক বিবরণ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। উহা হইতেই যোগেশ্বরের তাদৃশ বংশবিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাবংশে কৃত্তিবাসের খুড়তুত ও জেঠ্তুত ভাইদের অনেকেরই উত্তরোত্তর কাহারও তিন, কাহারও বা চারি পুরুষের পর্য্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়;—যেমন গঙ্গানন্দ ভট্টের দুই পুত্র লইয়া ৪ পুরুষ হয়; কিন্তু কৃত্তিবাস ও তাঁহার সহোদর ভাইদের বংশাবলী সম্বন্ধে একেবারে কোনই বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহাতে এই কয় প্রকার সিদ্ধান্ত হইতে পারে অর্থাৎ কৃত্তিবাস ও তাঁহার ভাইদের মধ্যে, কেহ হয়ত নিষ্কুল হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা পুত্রকন্যা উৎপাদনের দ্বারা কুল করিবার পূর্ব্বেই গতাসু হইয়াছিলেন, অথবা কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে ফুলিয়া

ও চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের বৃদ্ধ লোকের মুখে এরূপ জনপ্রবাদ শুনিয়াছি যে, তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

যাহা হউক, উপরে যাহা লেখা হইল, তদ্দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহ জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাস পণ্ডিত দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেলবন্ধন হওয়ার অনেক আগেকার লোক। যোগেশ্বর পণ্ডিতের সমকালিক ও সমবয়স্ক হইলেও, মেলবন্ধনের সময়ের অন্ততঃ ৭০ কি ৮০ বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হয়; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে যোগেশ্বরেরও অনেক পূর্ব্বে অতি বৃদ্ধ বয়সেই গতাসু হইয়াছেন, তখন উহার উপর ন্যূনকল্পে আর ২০ বৎসর চড়াইয়া, মেলবন্ধনের শতবর্ষ পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের জন্ম ধরিলে অযৌক্তিক হইতে পারে না। এখন মোটের উপর বলিতে গেলে, উপরে যত কিছু বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়-বিষয়ক কেবল এই একটী মাত্র সত্য একরূপ নিঃসন্দেহ ভাবেই অবধারিত হইতেছে যে, লক্ষীধর কর্ত্তৃক মেলবন্ধন কার্য্যের ন্যূনাধিক শতবৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখন দেখিতে হইবে যে, মেলবন্ধন হইয়াছিল কখন। অনেকের বিশ্বাস যে, দেবীবর চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক, সুতরাং তাঁহারই সমকালে মেলবন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কিন্তু এ বিশ্বাসের মূল সূত্র কি? যতদূর দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ঘটক নুলা পঞ্চাননের একটা কারিকাই তদ্রূপ বিশ্বাসের মূল সূত্র[১০]। ঐ কারিকায় যে কয়টি ঘটনার উল্লেখ আছে, লেখকের লিখন ভঙ্গীতে পাঠকেরা বুঝিয়া থাকেন, যেন সে কয়টি ঘটনাই এক সময়ে ঘটিয়াছিল।

---

(১০) নুলা পঞ্চাননের সে কারিকাটি এই,—

"চয়ে ছোড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম। রঘো বেটা মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ। মিথিলার পক্ষ ধরে যে করেছে মাথ॥
তিনজনে তিনপথে কাঁটা দিল শেষ। ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত। প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম। বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম॥
সেই কালে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে। নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ। তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার। অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥"

দেবীবরের মেলবন্ধন; নিমাই সন্ন্যাস; রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি-দীধিতি এবং রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের ২৮ তত্ত্ব স্মৃতি এই দুই গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার; এই কয়টি ঘটনা, নুলা পঞ্চাননের উক্ত কারিকা পাঠে, ঠিক এক সময়ে ঘটিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে, সিদ্ধান্তকারককে বিশেষ দোষী করিতে পারা যায় না। ফলতঃ কারিকাটির বাক্যবিন্যাসই এরূপ যে, তাহাতে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু প্রকৃত কথা, ঘটনাগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য নিতান্ত নগণ্য ও উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে। নিমাইয়ের

বস্তুতঃ দেবীবর কর্ত্তৃক কুলীনদের মেলবন্ধনের কার্য্য, চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাদুর্ভাব হইবার খুব অনেক আগে না হউক, কতক পরিমাণ আগে যে হইয়া গিয়াছে, সে কথা নিঃসংশয়ে বুঝাইবার জন্য, আর একটি বংশাবলীর তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশে, এই কয়জন বল্লালসেন কর্ত্তৃক কুলীন বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন—ভট্টনারায়ণ হইতে ৯ম পুরুষে জাহ্লন ও মহেশ্বর এবং ১১শ পুরুষে দেবল, বামন ও মকরন্দ[১১]। মকরন্দের বংশে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের উৎপত্তি। যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা দেশ হইতে ন্যায়শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যিনি প্রথমকালে চৈতন্যের ন্যায় গুরু ও শেষকালে চৈতন্যের ভক্ত এবং শিষ্য, দেবলের বংশে, সেই বাসুদেবের উৎপত্তি। কিন্তু এখানে আমাদের উল্লেখ প্রয়োজন, মহেশ্বরের বংশাবলী। এই বংশাবলী, মহেশমিশ্রের নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইল।—

মহেশ্বর। ৯।

- মহাদেব। ১০।
  - তিকো
    - লেঙ্গুড়ী।
    - ভেঙ্গুড়ী
  - পুরো
  - দুর্ব্বলী। ১১।
    - অনন্ত
    - সঙ্কেত। ১২।
      - উৎসাহ। ১৩।
        - আনন্দ। ১৪।
          - পিথাই।
          - লথাই। ১৫।
            - গোবিন্দ। ১৬।
              - সর্ব্বানন্দ ঘটক। ১৭।
                - দেবীবর ঘটক। ১৮।
          - নিধাই।
        - কন্দ
        - রঘু
        - গণ
        - ভীম
        - শ্রীরঙ্গ
          - নারায়ণ।
        - অপর ৪ পুত্র।
      - বৎস।
    - হরি। ১২।
      - উদয়ন। ১৩।
        - মাধব। ১৪।
          - বিষ্ণু। ১৫।
    - নারায়ণ
    - ভাস্কর
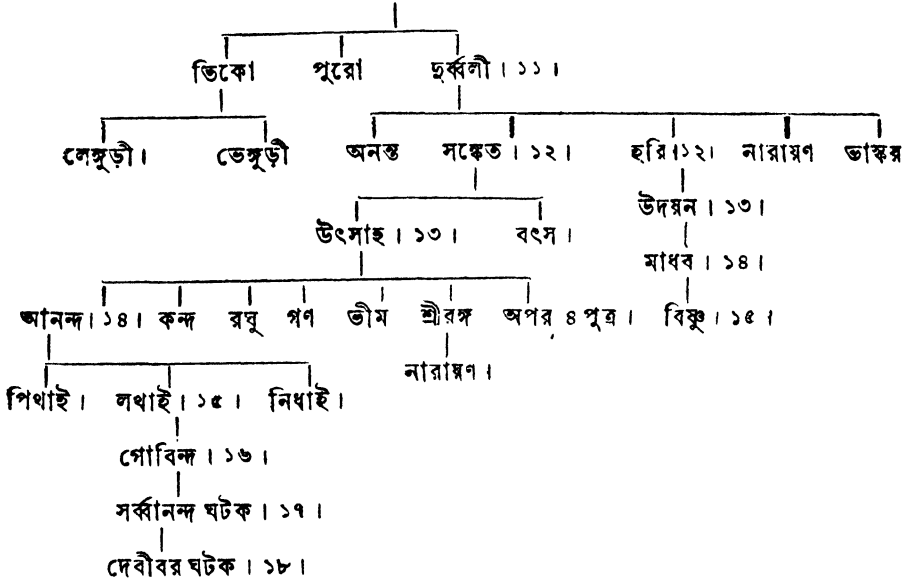
সন্ন্যাসকে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া, তাহার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা অবলোকন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মেলবন্ধন তাহার প্রায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এবং রঘুনাথের ন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতি তাহার ১৫।২০ বৎসর পরে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই কয়টি ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যে প্রায় ১০০।১১০ বৎসরকাল অতীত হইয়াছে এবং তাহা উপস্থিত প্রবন্ধের ন্যায় বিষয় বিচারে নিতান্ত ফেলিবার জিনিষ নহে। মুলাপঞ্চাননের নিজের লেখাতেই জানা যাইতেছে এবং প্রকৃত ঘটনাও ইহা বটে যে, মুলাপঞ্চাননের নিজের উৎপত্তি, বর্ণিত ঘটনাগুলির অনেক পরে এবং শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়াই তাহার কারিকা সকল রচিত।

১১। এ পর্য্যন্ত কৌলীন্য ও বংশাবলী সম্বন্ধে যিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সহজেই প্রতীত হয় যে,
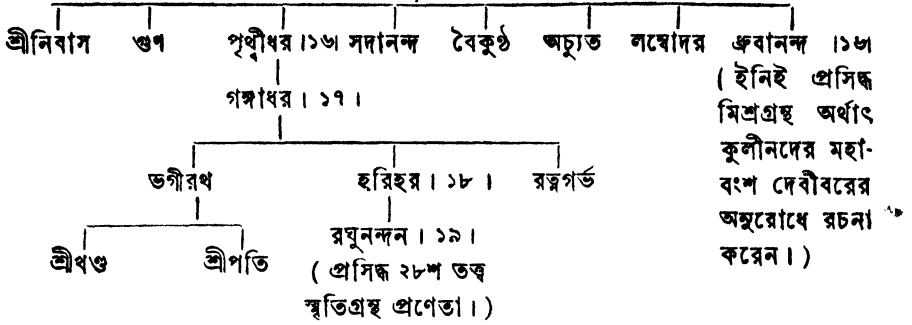
এক্ষণে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রাদুর্ভাবকাল বা জন্ম-সময় রূপ অতি বৃহৎ ও পরিচিত ঘটনার মধ্যস্থল মানদণ্ডরূপে স্থাপন করিয়া, কৃত্তিবাসের সময়ের শেষ মীমাংসা যথাসম্ভব সম্পন্ন করা যাইতেছে।

১৪০৭ শকে চৈতন্ত মহাপ্রভুর জন্ম। উপরে দেখান গিয়াছে যে দেবীবর কর্তৃক মেল বন্ধনের সময় হইতে ন্যূনধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব। এখন চৈতন্যদেবের জন্ম-শকের কত বৎসর পূর্ব্বে মেলবন্ধন হইয়াছিল, তাহা যদি নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মোটামুটী অথচ নিঃসংশয়রূপে কৃত্তিবাসের কাল নিরূপিত হইতে আর কোনই প্রতিবন্ধক থাকে না। অবশ্য তদ্দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সন তারিখ পর্য্যন্ত যে একেবারে নির্ভুল ও ঠিক হইবে, ইহা বলিতে যাওয়া এবং বিশ্বাস করা, উভয়ই বাতুলের কার্য্য। ইহা সকল সময়ে ও সকল স্থানেই মোটামুটী রকমে হইয়া থাকে। মনে কর যেমন বিদ্যাপতির কাল নির্ণয় করিতে হইবে; এস্থলে বিদ্যাপতির কি জন্ম কি মৃত্যু, কোনটাই ঠিক পাইবার যো নাই। এরূপ স্থলে একটি মাত্র এই ঘটনা

মূল পুস্তক দৃষ্টে প্রায়ই নহে, ঘটকদিগের নিকট কথা সংগ্রহ করিয়া। এই জন্যই বোধ হয় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের প্রদত্ত বংশ তালিকায় কোথাও একটা পুরুষ পড়িয়া গিয়াছে; আবার কোথাও বা নিম্নের এক পুরুষ উর্দ্ধে উঠিয়া,—উপরের পুরুষ সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, কোন পুস্তকবিশেষ হইতে উঠাইয়া সে ভুল দেখাইতে ইচ্ছা করি না। এই বংশ তালিকায় আর একটা কথা লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত, অর্থাৎ মুখোপাধ্যায় বংশে, যিনি বল্লালের কাছে কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন, তিনি মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে ১৪শ পুরুষ। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে যাঁহারা সেই মর্য্যাদা পান, তাঁহারা মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে কেহ ৯ম এবং কেহ বা ১১শ পুরুষ, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবশ্য ইহা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না যে, মুখোপাধ্যায় বংশ হইতে বন্দ্যোবংশের লোকেরা অধিক দীর্ঘজীবি থাকাতেই, উভয়ের মধ্যে এইরূপ পুরুষঘটিত অন্তরতা ঘটিয়াছে। কৌলীন্য প্রাপ্তির পরবর্ত্তী কালেও, মুখো বংশে এইরূপ পুরুষাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যাঁহারা বন্দ্যোবংশোদ্ভব তাহারা মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে কেহ ৩০, কেহ ৩১।৩২ বা ৩৩ পুরুষ; কিন্তু মুখোবংশীয়দের সে স্থলে ৩৭।৩৮।৩৯ পুরুষ পর্য্যন্ত গণনা হইতে দেখা যায়।

পাওয়া যায় যে, ১৩২৩ শকে মিথিলার রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। এখন এই শক চৈতন্যের জন্ম শক ১৪০৭ হইতে বাদ দিলে ৮৪ পাওয়া যায়; সুতরাং উহারই অবলম্বনে সাধারণতঃ ঘোষিত হইয়া থাকে যে, বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৩২৩ শকে বিদ্যাপতি বৃদ্ধ ছিলেন কি যুবা ছিলেন; অথবা তাহার কত বৎসর আগে তাঁহার জন্ম ও কত বর্ষ পরে মৃত্যু হয়, তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। তথাপি যে ঐ শক, বিদ্যাপতির জীবনের কোন এক সময়কে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাই মোটের উপর যথেষ্ট ধরিয়া, ঐ ১৩২৩ শককে বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল বলিয়া গণনা করা যায়। যেখানে আদি অন্ত সকলই অনিশ্চিত এবং যেখানে সেই আদি বা অন্ত এতদুভয়ের যে কোন দিক্ উদ্ধার করিবার কোনই উপায় কোন কালে পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে জীবনকালস্পর্শী কোন একটা সময়ের সন্ধান পাইলেই তাহাকে যথেষ্ট বলিয়া ধরা যায়। সর্ব্বত্র ইহাই রীতি। এখানেও তদ্রূপ। কৃত্তিবাসের যে সময় আমি নির্ণয় করিতে যাইতেছি, তাহা কৃত্তিবাসের কোন এক বা কতক সময়কে স্পর্শ করিলেই যথেষ্ট। এখানে যে প্রকারে ও যে যে উপাদানে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করা যাইতেছে, তাহাতে এই প্রবন্ধের পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই কাল কৃত্তিবাসের জীবনকালের কোন এক অংশকে বহুলাংশে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে।

উপরে যে বংশ-তালিকা প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে বল্লালী কুলীন বন্দ্যঘটীয় মহেশ্বরবংশ হইতে ১৯ সংখ্যায় উৎপন্ন ২৮শতত্ত্ব স্মৃতিপ্রণেতা রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য, চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী, সুতরাং ২।৫ বৎসরের তফাত বাদ হইলেও, রঘুনন্দন এবং চৈতন্য এ উভয়ের বয়স প্রায় একই ছিল; যেহেতু আবহমানকাল সহাধ্যায়ীদের মধ্যে সেই নিয়মই দেখা যায়। অতএব এখন রঘুনন্দনের খুল্লপ্রপিতামহ ধ্রুবানন্দ মিশ্র, রঘুনন্দনের কত আগে উদয় হইয়া মহাবংশ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই একই বংশের অপর শাখায় দেবীবর ঘটক উৎপন্ন হইয়াই বা রঘুনন্দনের কত আগে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন, ইহা নিরূপণ করিতে পারিলে, সহাধ্যায়ী সম্বন্ধক্রমে চৈতন্যদেবেরও তাহা তত আগে বলিয়া ধরিয়া লইতে আপত্তি হইতে পারে না। তাহার পর চৈতন্যের জন্মরূপ বৃহৎ ও সন্দেহরহিত ঘটনা লক্ষ্য করিয়া আলোচ্য অবশিষ্ট অংশ সহজেই মীমাংসিত হইতে পারিবে।

উপরে প্রদত্ত বংশ-তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, মূল একই বংশের দুই বিভিন্ন শাখায় রঘুনন্দন ও দেবীবরের জন্ম। পুরুষ গণনায়, রঘুনন্দন] ১৯ ও দেবীবর ১৮। ইহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, তবে বুঝি দেবীবর ও রঘুনন্দন এক সময়ের লোক, অন্ততঃ দেবীবর এক পুরুষ আগে বলিয়া দেবীবরের বার্দ্ধক্য ও রঘুনন্দনের যৌবনাবস্থা, উভয়ের দেখা শুনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এটা বড়ই ভুল। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি

যে, কোন দুই বংশে, অথবা একই বংশের কোন দুই শাখায়, পুরুষ গণনাতে সংখ্যা সমতা দেখিলেই তাহাদের সমসাময়িকত্ব অবধারণ করা অতি ভ্রমের কার্য্য। বিভিন্ন বংশ বা একই বংশের বিভিন্ন শাখাভেদে, বংশীয়গণের দীর্ঘজীবিত্ব বা অল্পজীবিত্ব হেতু, পুরুষ গণনায় সংখ্যা সমতা স্থলে কাল ব্যবধান অতি বিপুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এখানেও দেবীবর পুরুষ সংখ্যায় ১৮ ও রঘুনন্দনে ১৯ হইলেও দেবীবর রঘুনন্দন অপেক্ষা অনেক আগের লোক এবং একথা নিম্নোক্ত বিবরণ দ্বারাও বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতে পারিবে।

উপরে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে, মেলবন্ধনের কিছু কাল পরে, দেবীবর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধ্রুবানন্দ কুলীনদিগের মহাবংশ রচনা করেন। ধ্রুবানন্দ ঐ পুস্তকে ঊর্দ্ধতন ১০ পুরুষ হইতে, নিজের সময়ের, এমন কি, শিশু এবং বালক কুলীন পুরুষদেরও নাম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দের নিজের বংশ কুলীনবংশ; তিনি যখন অন্যবংশের বালকের নাম পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, তখন নিজের বংশের আবাল শিশু পর্য্যন্ত ছাড়িবার কথা নহে। ফলতঃ হইয়াছেও তাহাই। আট ভায়ের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, ধ্রুবানন্দের তৃতীয় ভ্রাতা পৃথ্বীধরের প্রপৌত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বাপেরা তিন ভাই। ভগীরথ, হরিহর, রত্নগর্ভ। ইহার মধ্যে ভগীরথের দুইটি পুত্রের পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে; কিন্তু রঘুনন্দনের বাপ হরিহর ও খুড়ো রত্নগর্ভ ইহাদের কোন পুত্র সন্তান অথবা কোন প্রকার কুলক্রিয়ার উল্লেখ একেবারেই নাই। সুতরাং এই কারণ হইতে নিঃসন্দেহ জানা যাইতেছে যে, যখন মহাবংশ রচিত হয়; তখন রঘুনন্দনের জন্ম হয় নাই। এদিকে রঘুনন্দনের যখন জ্যেঠার সন্তানের উল্লেখ আছে, তখন রঘুনন্দনের জন্মের যে অনেক আগে মহাবংশ রচিত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা হইলে কত আগে?— এ প্রশ্নের অনেকটা ঠিক করিতে পারা যাইত, যদি হরিহরের কত সন্তান এবং তাহার মধ্যে রঘুনন্দন আগের কি পরের এটা জানিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা যখন জানিতে পারা যাইতেছে না, তখন মোটের উপর রঘুনন্দনের জন্ম হইবার দশ বৎসর আগে মহাবংশ রচিত বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। ধ্রুবানন্দ নিজে অতি বৃদ্ধবয়সে যে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, সে পক্ষের প্রমাণ—এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি সহোদর জ্যেষ্ঠের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত (অর্থাৎ উপরোক্ত ভগীরথের পুত্রদ্বয়) দেখিতে পান, সে ব্যক্তি কখনও অতিবৃদ্ধ না হইয়া যায় না।

ভাল, মহাবংশ এদিকে হইল যেন রঘুনন্দনের জন্মের দশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এখন কথা হইতেছে যে মেলবন্ধনের কত পরে রচিত।

দেবীবর কুলীনদিগের দোষের সমীকরণ করিয়া ৩৬ মেল বন্ধ করেন। যাহারা মেলী, অর্থাৎ যাঁহাদের লইয়া মেলবন্ধন হয়, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় জীবনকালে নিজ নিজ মেল তদবস্থায় রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে আর কোন নূতন দোষ

স্পর্শ হইতে দেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের পরে বহু স্থলেই আর সেরূপ রহিল না; তাঁহাদের পুত্র পৌত্রদের মধ্যে অনেকই ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। কেহ নিজের, কেহ পুত্র-কন্যার বিবাহে, মেলের বিপরীত কার্য্য করিতে থাকায়, মেলের মধ্যে মাধবরাঢ়ী, নারায়ণ-দাসী প্রভৃতি 'যূথ'[১২] এবং যজ্ঞেশ্বরী, হড়সিদ্ধান্তি, ঋতুধ্বজী প্রভৃতি 'থাক'[১৩] সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এখন বুঝ দেখি, ইহাতে কত সময় যায়? একটা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলি। মেল বন্ধনের সময় সুন্দর বাড়ুয্যে যুবাপুরুষ মাত্র; তিনি খড়দহ মেল-ভুক্ত হইয়াছিলেন। মেলভুক্ত হওয়ার পর তাঁহার পুত্র হয় রঘুনন্দন। এই রঘু-নন্দনের কন্যা হইলে, সেই কন্যা লইয়া যজ্ঞেশ্বর মুখটীর সঙ্গে কুল করায়, সেই দোষে খড়দহ মেলে একটা থাক হইল যজ্ঞেশ্বরী। মেলবন্ধনের পর রঘুনন্দনের নাম, তাহার পর তাহার কন্যা হওয়া ও সেই কন্যা বয়স্থা হইলে তবে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে কুল করা, ইহাতে কত বর্ষ গত হইতে পারে? ৩০।৩৫ বৎসরের ত কম নহে। অথচ এই যজ্ঞেশ্বরী থাক এবং তাহার পরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য থাকেরও উল্লেখ মহাবংশ মধ্যে দেখা যায়। ফলতঃ মহাবংশ মধ্যে ঐরূপ অনেক যূথ ও থাকের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার দ্বারা অবশ্য এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন আর কি হইতে পারে যে, মেলবন্ধনের প্রায় ৪০ বৎসর পরে ধ্রুবানন্দ মিশ্র কর্ত্তৃক মহাবংশ রচিত হয়।

অতএব মেলবন্ধনের যদি ৪০ বৎসরের পরে এবং রঘুনন্দনের জন্মের যদি ১০ বৎসর আগে মহাবংশ রচিত হয়; তাহা হইলে এবং রঘুনন্দনের জন্মকাল যদি রঘুনন্দনের সহাধ্যায়ী চৈতন্যদেবের জন্মকালের সঙ্গে এক বলিয়া ধরা যায়, তবে অবশ্যই বলিতে

---

(১২) মেলে মেলে, অর্থাৎ এক মেলের সঙ্গে প্রতিযোগী অপর মেলের সঙ্গে কুলক্রিয়া হইলে, তাহাকে যূথ বলে।

(১৩) মেলী ও অমেল এ উভয়ে কুলক্রিয়া হইলে তাহাকে থাক বলে। ফলতঃ থাক, যে কোন দোষ সংস্পৃষ্ট হইলে, তাহাতেই এক একটা থাক উপস্থিত হইয়া থাকে। যূথের আর ব্যবহার নাই, থাকই প্রবল। অনেক প্রাচীন যূথ এখন থাক বলিয়াই গণিত হয়। কুলীনের সর্ব্বনাশের গোড়াটা কেমন একবার দেখ! একেত মেলবন্ধনের সময় হইতে নিয়ম হয় যে, স্বীয় মেলের বাহিরে বিবাহের আদান প্রদান হইবে না; তাহার পর এই সকল থাক ও যূথ হওয়ায় আরও সঙ্কীর্ণতা হইল যে, স্বীয় স্বীয় থাক বা যূথের ভিতরে ভিন্ন আদান প্রদান চলিবে না। এখন এক এক থাকে ঘর হইল ৮।১০টি, কোথাও বা এমন ঘটিয়া গিয়াছে যে, ২।৩টি। সুতরাং ইহার মধ্যে পাত্রই বা মিলে কত এবং কন্যার বিবাহই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং স্বভাব কুলীনদের মধ্যে, বিশেষ এই পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে কএক ঘর কুলীনের বাস আছে, সেইখানেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, বিবাহের অভাবে ৮।১০টা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কুমারী অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতিপথে, এরূপ অবস্থায় যেরূপ অসৎফল ফলা উচিত, তাহাও সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি এই নরাধম নরপিশাচ কুলীনদিগের না লজ্জা না ধিক্কার, কিছুই ইহাদের অনুভূতির মধ্যে আইসে না। যে কেহ ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গীয় স্থানের অবস্থা অবলোকন করিবে, সেইই আমার এ কথায় সত্যতা অনুভব করিতে পারিবে।

হইবে যে, চৈতন্যদেবের জন্মের ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক কুলীনদিগের মেলবন্ধন হইয়াছিল।[১৪] পুনশ্চ, পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, মেলবন্ধনের ন্যূনাধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের জন্ম। তাহা হইলে এই ৫০ এবং ১০০ একত্র করিয়া বলিতে হইতেছে যে, চৈতন্যদেবের জন্মের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আনুমানিক ১২৫৭ শকে বা ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুষ গণনাতেও তাহাই পাওয়া যায়। যথা—
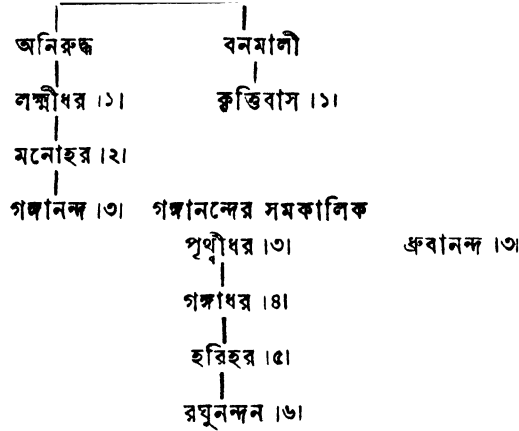
(১৪) পূর্ব্বে একস্থানে নুলাপঞ্চাননের কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ঐ কারিকা দৃষ্টে সাধারণে এখন এইরূপ বিশ্বাস প্রায় স্থির দাঁড়াইয়াছে যে, দেবীবর ঘটক চৈতন্যদেবের সমকালে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন। ইহার উপরেও আবার, "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক কৌলীন্যবিষয়ক গ্রন্থপ্রণেতা, কোথাকার একটা ঘটকের নিম্নোক্ত বচন উঠাইয়া, দেবীবরের কাল সম্বন্ধে কি প্রমাণ করিতে চাহেন, তাহা দেখ,—

"নিত্যানন্দের দুই পুত্র গঙ্গা আর বীরু। মাধব গঙ্গার স্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে গুরু॥
যে কালে বীরুর কন্যা পারুণিয়া যায়। সেই কালে লোকে দেখে দেবীর উদয়॥
বন্দ্যবংশে অংশে তার হৈল আবির্ভাব। সঙ্কেত বাঁড়ুরি নাম অতি প্রাদুর্ভাব॥
সঙ্কেত দুর্ব্বলী পুত্র লোকে পরিচয়। তাহার পঞ্চমে দেখ দেবী মহাশয়॥"

ইহার অর্থ, চৈতন্য মহাপ্রভুর সহচর নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী যৎকালে ফুলিয়ার মুখটী পার্ব্বতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে কন্যা দান করেন, সেই সময়ে দেবীবরের উদয় হয়। ইহা ঠিক হইলে দেবীবর চৈতন্যেরও সমকালিক হইলেন না, চৈতন্যের দুই তিন পুরুষ পরে। যে হেতু, নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক পরে, উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কার গ্রহণ করিয়া গৃহী হয়েন এবং চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পরেও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার এগার সন্তান নষ্ট হওয়ার পর, বীরভদ্রের জন্ম হয় এবং নিত্যানন্দের পরলোক গমনকালীন বীরভদ্র বালক মাত্র। তাহার পর তিনি বড় হইয়াছেন, তাঁহার কন্যা হইয়া বয়স্থা হইয়াছে এবং তবে ত পার্ব্বতী মুখ্যোর সঙ্গে বিবাহ; সুতরাং সে চৈতন্যের ২।৩ পুরুষ পরে নয়ত কি ?

ইহার মধ্যে এক পুরুষ ছাড়িয়া দিয়া, ৫ পুরুষে ন্যূনকল্পে প্রতি পুরুষ ৩০ বৎসর করিয়া ধরিলেও, ১৫০ বৎসর পাওয়া যায়। সাধারণতঃ তিন পুরুষে একশত বৎসর করিয়া ধরার নিয়মই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত সকলেরই বিশ্বাস বিদ্যাপতি ও তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাস, এই দুইজন বাঙ্গালার আদিকবি। কিন্তু এখন এই সকল একরূপ স্থির প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাস তাঁহাদেরও কত আগের লোক। যদি বলা যায় যে, বিদ্যাপতির যে কাল ধরা যায় অর্থাৎ ১৩২৩ শক, তখন তাঁহার কবি খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, আর কৃত্তিবাসের যে কাল ধরা হইল, অর্থাৎ ১২৫৭ শক, তাহা তাঁহার জন্ম সময়, ভাল তাহাই হউক, এটাও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতির কবিখ্যাতি হইতে কৃত্তিবাসের জন্ম ৬৬ বৎসর আগে। সুতরাং এস্থলে, অল্প পরিমাণে হউক, বা অধিক পরিমাণেই হউক, কৃত্তিবাস যে বিদ্যাপতির অপেক্ষা আগের ও প্রাচীন, এ কথায় সন্দেহ মাত্র নাই।

ওদিকে ত ঐ, এদিকে আবার তামাসা দেখ। আর আর মেলের সঙ্গে ফুলিয়া মেলও দেবীবর বাঁধিয়া গেলেন। মেলবন্ধন হওয়ার কতকাল পরে, ফুলিয়া মেলে বিভিন্ন বিভিন্ন দোষ সংস্পর্শ হেতু তাহাতে হইল দুইটী থাকের সৃষ্টি,—মাধবরায়ী ও নারায়ণদাসী। তাহাতেও ক্ষান্ত নাই; আরও কতকাল পরে, আরও কত কত দোষ সংস্পর্শে থাকের মধ্যে হইল বিবিধ থাক। সেই সকল থাকের একটার নাম বীরভদ্রী। এ থাকের কারণ কেহ জান কি?—নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র গোস্বামী সন্দিগ্ধ বটব্যাল হেতু, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া পার্ব্বতী মুখুয্যে দোষগ্রস্ত হওয়ায়, আর কেহ তাহার কন্যা বিবাহ করে না। পার্ব্বতী তখন নিরুপায় হইয়া, গয়ঘড় হরি বন্দ্যকে বলপূর্ব্বক আটকাইয়া, তাহাকে কন্যা দান করিল। হরি বন্দ্য কিন্তু ভোরে উঠিয়াই পলাইলেন। এখন সেখানে দৈবগতিকে উপস্থিত ছিল হরি বন্দ্যের পুত্র রামদাস। পার্ব্বতী তখন রামদাসকে ধরিয়াই বলিল, "বিবাহ তোমার বাপ করে নাই, তুমিই করিয়াছ, অতএব বাসি বিবাহ কুশণ্ডিকাদি তোমাকে করিতে হইবে;" ইহা বলিয়া বলপূর্ব্বক রামদাসকে দিয়া তাহাই করাইল। ওদিকে পার্ব্বতীর অপর স্ত্রী ও প্রোক্ত কন্যার মাতা এবং হরি বন্দ্যের স্ত্রী ও রামদাসের মাতা, ইহারা পরস্পর সহোদরা ভগ্নী। সুতরাং রামদাসকে যাহাকে লইয়া বাসি বিয়া ও কুশণ্ডিকা করিতে হইল, তিনি সম্পর্কে হইলেন রামদাসের আগে ভগ্নী, পরে বিমাতা, শেষে পত্নী। এতদ্বিষয় নিম্নলিখিত ঘটক কারিকায় আছে—

"আদৌ পিত্রে ততঃ পুত্রে ভ্রাত্রে তৎ কন্যকাং দদৌ। বলাৎকারে পার্ব্বতীশস্ত্রিসম্বন্ধান্বিতো বদেৎ॥"

"হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি। মুখের কন্যা বিহা করি গেল তার জাতি॥
কন্যার বরের মাতা দুই সহোদরা। বিমাতা ভগিনীপতি কোথা আছে কারা॥" (কুলকারিকা, দোষকাণ্ড)।

ইহাই লইয়া বীরভদ্রী থাক হইল!

দেবীবরের উদয়কাল সম্বন্ধে লোকে কি অপূর্ব্ব প্রমাণ সকলই উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যে মূল্য এই উদ্ধৃত অংশের, নুলোপঞ্চাননেরও তাহাই। প্রাচীন ঘটকেরা যেরূপ বিদ্বান্ ছিলেন ও যেরূপ সাবধানতার সহিত ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিতেন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক, অনভিজ্ঞ, বাঙ্গালা কারিকাকারক ঘটকে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদের লেখা সর্ব্বদাই অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হয়।

অতএব বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পৌর্ব্বাপর্য্য এখন এইরূপ দাঁড়াইতেছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত বাঙ্গালার আদিকবি ও লেখক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্যের পিতৃস্থানীয়। দ্বিতীয় স্থানীয় চৈতন্যদেবের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। তৃতীয় স্থানীয়, চৈতন্যদেবের জন্ম সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা বসুবংশীয় গুণরাজ খাঁ বা মালাধর বসু। চতুর্থ, চৈতন্যদেবের শেষ বয়সের সময় রচিত চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন দাস। পঞ্চম, চৈতন্যের অন্তর্দ্ধান হওয়ার কিছু পরে রচিত চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ষষ্ঠ, চণ্ডীমঙ্গল প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী অক্বর বাদশাহের সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সপ্তম, পূর্ব্বগত সকল অপেক্ষা অতি মহাকবি ও অতিশয় প্রতিষ্ঠাশালী, কাশীরাম দাস, বাঙ্গালা মহাভারতের কর্ত্তা। ইনি তিনশত বৎসর হইল, কাঁটোয়া ও দাঁইহাটের কাছে এবং অধুনা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত সিদ্ধিগ্রাম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টম, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্র রায়। কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই ব্যবধানকালে, বাঙ্গালার আরও অনেক পুঁথিলেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখের জন্য এখানে স্থানাভাব।

কৃত্তিবাস সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কবি বলিয়া, কৃত্তিবাসে গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার এবং ছন্দে মাত্রা ও ওজনের ব্যভিচার সর্ব্বত্রই অতিশয় বেশী বেশী এবং ছন্দও এক পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। পয়ারই প্রায় সর্ব্বত্র, ত্রিপদী কথনও সামান্য দুই চারিপদ মাত্র। পয়ারের কোথাও ১৪, কোথাও কোথাও ১৫, ১৬, ১৮ অক্ষর, অথবা তদধিকও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আসল কৃত্তিবাস আপাততঃ পাঠককে দেখাইবার কোনই উপায় নাই।[১৫] যেহেতু, এখন বাজারে যাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে কৃত্তিবাসের নামমাত্র আছে, তাঁহার রচনা ভাগ তাহাতে কিছুই নাই বলিলে হয়। তাঁহার নামে যে রামায়ণ বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ জয়গোপালী কাণ্ড। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে একজন পণ্ডিত, তাঁহার নিকট কৃত্তিবাসের আসল রচনা ভাল না লাগায়, তাহা সংশোধন বা অন্য কথায় খুন খারাপী করিয়া, আসলের পরিবর্ত্তে নিজের রচিত ১৪ অক্ষর পরিমিত পয়ারাদি ছন্দে পুস্তক পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাই এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ নামে মুদ্রিত ও

---

(১৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ অধুনা কৃত্তিবাসের মূল রচনা যাহা, তাহা উদ্ধার করিবার ভার লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা যদি এ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন এবং একটু শীঘ্র শীঘ্র পারেন; তাহা হইলে তাঁহাদের সভ্যগণের মধ্যে যিনি যিনি যথার্থ কৃতি হইয়া তাহা সাধন করিয়া তুলিবেন, তাহাতে তাঁহাদের গয়ায় মঠ দেওয়ার ফল ফলিবে নিশ্চয়। আমার নিকট আসল কৃত্তিবাসের যে একখণ্ড হাতের লেখা পুঁথি ছিল, তাহা প্রোক্ত সংস্কারের সাহায্যার্থ সাহিত্য পরিষদে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তথাপি যাহা কিছু লিখিলাম ও উদ্ধৃত করিলাম, তাহা কেবল স্মৃতি হইতে।

বিক্রীত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসের এমন কোন দুই পংক্তি বোধ হয় নাই, যাহা জয়-গোপালের হাতে রূপান্তরিত হইয়া নূতন না হইয়াছে। তবে উহারই মধ্যে অঙ্গদ রায়বারে অঙ্গদ ও ইন্দ্রজিৎ এবং তাহার পর রাবণ ও অঙ্গদে যে কথোপকথন, তাহা এতই সুন্দর ও রসপ্রদ যে, এমন যে জয়গোপাল তিনিও তাহার মধ্যে দৈবকৃপায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়াতে, সে অংশের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতএব বর্ত্তমান মুদ্রিত রামায়ণে, কৃত্তিবাসের আসল রচনার কেবল ঐ অংশ টুকুই দেখিতে পাওয়া যায়। যে রচনার নমুনা ঐ অংশ টুকুতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ধরণে প্রায় সমগ্র রামায়ণই রচিত হইয়াছিল।

প্রভৃত গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার এবং ছন্দের যথেচ্ছা ব্যভিচার, এ সকল সত্ত্বেও, যে চিত্তমোহকরী রচনা অঙ্গদ রায়বারে ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের সহ অঙ্গদের বাক্‌যুদ্ধে এবং যে রস সেই রচনায় সীমা ছাড়াইয়া উপছিয়া পড়িতেছে, রামায়ণের সমগ্র রচনাতেই কৃত্তিবাস সেই মোহকরী শক্তির সন্নিবেশ এবং সেই রসমাধুরীর পূর্ণমাত্রার প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল ভাবুক পাঠককে লৌহকে চুম্বক-বৎ নিরবচ্ছিন্ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। কৃত্তিবাসের এই রামায়ণ, গত পাঁচশত বৎসর হইতে, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলকেই কাব্যাংশে সমান সুমোহিত; ইতিকর্ত্তব্যতাবিষয়ে সমান শিক্ষিত এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সমান অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। কৃত্তিবাসের নামেই এমন একটা মোহকরী আকর্ষণ শক্তি জন্মিয়া গিয়াছে যে, জয়গোপালের হাতে মূল রামায়ণ এতাদৃক্ বিকলাঙ্গতা প্রাপ্ত হইলেও, কেবল কৃত্তিবাসের নামের গুণেই তাহা সর্ব্বসাধারণে সমান আদরের সহিত চলিয়া যাইতেছে, এবং যদি কৃত্তিবাসের ভাগ্যে সংস্কার ও মূল উদ্ধার না ঘটে, তাহা হইলেও চিরকাল এইরূপ চলিয়া যাইতে থাকিবে। এই দরিদ্র ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে কি নিরুপম অমৃতধারাই প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কৃত্তিবাস অনেক নবাব সুবোর কাছে বেড়াইয়াছিলেন এবং শেষে নাকি কোন রাজার অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়াই, রামায়ণ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না; কৃত্তিবাসের জীবনীতে তদ্রূপ বা অপর কোন বিশেষ ঘটনা পরিজ্ঞাত হইবার আর কোনই উপায় নাই বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। যাহাহউক, কৃত্তিবাসের রচনা পাঠ করিলে, তিনি যে কখনও কোন নবাব বা রাজা, রাজবাড়ী বা রাজসভা এবং তাহাদের চালচলন দেখিয়াছিলেন, অথবা খড়ুয়া ঘর-পরিশোভিত, কথঞ্চিৎ দিনপাতক্ষম মধ্যবিত্ত গৃহস্থপূর্ণ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপল্লী স্বীয় বাসস্থান ফুলিয়া গ্রামের চতুঃসীমার বাহিরে কখনও গিয়াছিলেন, এমনটা যেন মনে আইসে না। যেহেতু তদ্রূপ ক্ষুদ্রপল্লীতে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা এবং তাহারই অতিরঞ্জিত বা উন্মাদ মাত্রায় স্ফীত ধারণা যাহা কিছু, সেই সকলের দ্বারাই তাঁহার

কাব্য আগাগোড়া চিহ্নিত ও চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। মুড়িমুড়কীপ্রিয় কাঙ্গালের রাজ-বিভূতির ধারণা যেমন, চাষাভুষার মধ্যে প্রচলিত সামান্ত একটা গীত অনুসারে—

"এবার মরে রাজা হব,
খাটে বসে মুড়ি মুড়কীর ধামা খাব।"

কৃত্তিবাসেরও সোণার লঙ্কা এবং রাবণের ত্রিলোকজিৎ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির ধারণাও তদ্রূপ। তদানীন্তন গ্রাম্যমণ্ডল এবং তাহার বাড়ী ঘর ও আসবাব আয়োজনাদির দৃষ্টে তাহা উদ্ভূত। মানুষের মন পার্শ্বস্থ পদার্থনিকরজাত ভাবরাশিতেই গঠিত হইয়া থাকে এবং যেরূপ গঠিত হয়, মানুষ সেই মানসিক গণ্ডির বাহিরে, কি চিন্তা কি কাজে, কোন প্রকারেই যাইতে সমর্থ হয় না।

হনুমান্ সোণার লঙ্কায় অগ্নি দিতে উঠিয়াই, আগে লাফ দিয়া বড় ঘরের চালের উপর পড়িল। ফলতঃ কি রাবণ, কি বিভীষণ, কি অন্য কেহ! সোণার লঙ্কার চৌরী—খড়ুয়া ঘর সকলেরই, কুম্ভকর্ণের ঘরখানাও একখান অতি বড় ধাওড়া চৌচালা। অথবা, এখনও যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, কাহারও বংশে নারিকেল গাছ পুঁতিতে নাই, কাহারও বা চণ্ডীমণ্ডপ করিলে বংশ নষ্ট হয়, সেইরূপ, কে জানে এদের, এ রাবণের বংশেও, পাকা ঘর করিতে বুঝি পূর্ব্বপুরুষের মানা ছিল, অথবা পাকাঘর করিলে বুঝি সহিত না কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না।—নতুবা এমন একসা সোণার লঙ্কাখানও এত বড় ত্রিলোকজিৎ ঐশ্বর্য্যটা, তাহার মধ্যেও, বলিব কি মাথামুণ্ড, বলি—কেবল খড়ুয়া ঘর। আবার দেখ, অঙ্গদ রায়বারে লাফ ঝাঁপ দিয়া ত অঙ্গদ হঠাৎ বেখবরে রাজসভায় উপস্থিত; তাহার পর ল্যাজের কুণ্ডলী করিয়া অঙ্গদের উচ্চাসন করার কথাটাও যাউক; অঙ্গদ রাবণে তোকাতুকিও যাউক; শেষে অঙ্গদ রাবণে জড়াজড়ী ও যুদ্ধ। শেষে অঙ্গদ রাবণকে ফেলিয়া দিয়া ও তাহার গায়ে মুতিয়া,—মুকুট লইয়া পালিয়ে পার! তখন রাবণের দশা কি হইল?—রাবণ অধো-মুখে গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছেন ও পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ কেহ যে তাঁহাকে সাহায্য করে নাই, তাই বলিয়া সকলকে গালি পাড়িতেছেন। এত বড় ত্রিলোকজিৎ সোণার লঙ্কাপুরীর রাজসভাটা, তাহাতে এতও ধূলা! সেকালে আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে, এখনকার মত শতরঞ্চি কম্বল বা শপের অভাবে (তাহা মিলিতও না সচরাচরও কেনার সামর্থও ছিল না অনেকের), টোলঘরে বা চণ্ডীমণ্ডপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাসন বিছাইয়া গ্রাম্যলোকের জমায়েত বা সভাধিবেশন হইত; তাহাতে অবশ্য ধূলার অভাব কিছুমাত্রই থাকিত না। তাহাই কি কৃত্তিবাসের আদর্শ এবং রাবণের সভাও কি সেইরূপ ছিল?

আবার দেখ,—কালনেমি বধে, কালনেমির মুণ্ডটা নখে ছিঁড়িয়া, হনুমানের সখ্ হইল যে, উহা লেজে জড়াইয়া ও ছুড়িয়া দিয়া রাবণের সম্মুখে লইয়া ফেলেন। এদিকে সন্ধ্যারাত্র, ঘুট ঘুট অন্ধকার, দিব্য মোলায়েম ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে, এমন

সময়ে আয়েসবিলাসী রাবণরাজা কেন না পাত্র মিত্র লইয়া সভা করিয়া বসিবেন। সভার কার্য্যও চলিতেছে পুরা দরবারে; এমন সময়ে কি একটা হঠাৎ আসিয়া সভাস্থলে ঝুপ করিয়া পড়িল। কি এটা, দেখ দেখ,—কিন্তু দেখে কে? রাজসভায় আলো নাই! সভায় ত নাই, নিকটেও বোধ হয় ছিল না, নতুবা তাহার অপেক্ষা না করিয়াই সকলে জিনিসটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে যাইবেন কে? যাহা হউক, তখন নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া স্থির হইল, মুণ্ডটা কালনেমিরই বটে! বাড়ীর বাহির প্রাঙ্গণের পার্শ্বে দূর্ব্বা আস্তরণের উপর, দাকাটা তামাকের হুঁকা হাতে ও সান্ধ্যসমীরে ঘুট ঘুট অন্ধকারে পা ঢাকিয়া পাড়াগাঁয়ের পাড়াগেঁয়ে গৃহপালিত লোকদের জমায়েৎ কখনও কি পাঠকদিগের লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল? সেকালে উহা সাধারণ ছিল, একালেও এখন না আছে এমন নহে। রাবণের সান্ধ্য সভাতে ও তাহাতে বিশেষ কি?

কৃত্তিবাসের উপমাও তাঁহার পাড়াগাঁ ফুলিয়ার দৃশ্য দৃষ্টেই গৃহীত। কুম্ভকর্ণের নাকের ছিদ্র কত বড়?—না যেন এক এক খান পঁচিশের বন্দ ঘর। এখানে একটু বলার দরকার যে, আমাদের এই নদীয়াজেলায় যে সকল গৃহস্থের খড়ুয়া ঘরে বাস; তাহাদের ঘরের মধ্যে পঁচিশের বন্দ ঘরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাই বলি, যে যত বলুক এবং কৃত্তিবাসের রাজারাজড়া ও নবাবসুবোর সভায় বেড়ানর যতই প্রমাণ দিউক; আমি কিন্তু কেবল তাঁহার কাব্যপাঠ করিয়াই বলিতে পারি যে, কৃত্তিবাস তাঁহার বাসস্থান সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপল্লি ফুলিয়ার চতুঃসীমার বাহিরে কখনও যান নাই; এবং যদিই বা কোথাও গিয়া থাকেন, তাহাও সেই ফুলিয়ার ন্যায় সমান অবস্থাপন্ন স্থান।

উপরে বলিয়াছি যে, কৃত্তিবাসের বিষয় ধারণা, গ্রাম্যধারণার কেবল সম্প্রসারণ নহে; অধিকাংশ স্থলে তাহা উন্মাদগ্রস্তবৎ স্ফীত। অনেক দিনের পর কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত, সুতরাং অতি ক্ষুধার্ত্ত; অনেক আহার করিলেন। আহারীয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কুম্ভকর্ণ যে ধাওড়া চৌরী খুড়ুয়া ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তেমন দশটা চৌরীতেও তাহার স্থান সঙ্কুলান হয় না। এত আহারের পর মুখশুদ্ধির জন্য কাজেই একটা পাণ খাওয়া উচিত। কাজেই কৃত্তিবাসও কুম্ভকর্ণকে পাণ খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন। সে পাণ খাওয়া কিরূপ?

"পাঁচ সাত ছালা গুয়া খাইল আট দশ বোঝা পাণ।
তবু না পুরিল বীরের বাম চোয়াল খান ॥
কত মণ খয়ের খাইল যেন বুটের রাশি।
মুখেতে ঢালিল চূণ শতেক কলসী ॥"

কি সর্ব্বনেশে পাণ খাওয়া! এতদ্দ্বারা কৃত্তিবাসের পয়ার ও তাহার অক্ষর সংখ্যার প্রতিও দৃষ্টি করা উচিত। তাহার যুদ্ধের বাদ্যোদম হইতেছে, বিশ লক্ষ ঢাক, দশ লক্ষ মাদল, ত্রিশ লক্ষ সানাই ইত্যাদি সরঞ্জাম ত আছেই। আমাদের দেশী বাজনায়, সকলের

অপেক্ষা কাঁসির আদরটা বড়ই কম, প্রায় একটা বা জোর দুইটা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু এখানে কাঁসিরই কত, তাহা একবার দেখ ;—

"আট লক্ষ ঢোল বাজে নয় লক্ষ বাঁশি।
দগড়ে রগড় দিতে তিন লক্ষ কাঁশি॥"

আর দগড়ে রগড় কাজ নাই, এই পর্য্যন্তই থাকুক। এই ত ব্যাপার, কিন্তু তথাপি কৃত্তিবাসের প্রতি অক্ষর কবিত্বময়ী এবং সমস্ত কবিতার রস গড়াইয়া পড়িতেছে। ফলতঃ কৃত্তিবাসের আসল রচনা পড়িয়া যে অসীম আমোদ ও আনন্দ পাওয়া যায় ও তাহাতে মনের যে এক অতি সুন্দর তৃপ্তির উদয় হয়, তাহা বাঙ্গালার আর কোন কাব্য পড়িয়া হয় না। বাঙ্গালার আদিলেখক এবং কবিগুরুর পক্ষে তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। কৃত্তিবাসের কাব্য সমালোচনা আমার এখানে উদ্দেশ্য নহে, তবে প্রসঙ্গক্রমে যা দুই একটা কথা বলা গেল এই মাত্র। তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট হউক।

উপরেই বলিয়াছি যে, কৃত্তিবাসের জীবনী সম্বন্ধে এখন, এই দূরতর সময়ে কোন বিশেষ ঘটনাই উদ্ধার হইবার উপায় নাই। তাহা সর্ব্বগ্রাসকারী অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কৃত্তিবাস হইতে ঊর্দ্ধে পঞ্চম পুরুষে নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়[১৬] প্রথম ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি করেন এবং সেই হইতে ইহাদের ফুলিয়া গ্রামে বাস। নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমায় বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের বাসস্থান হইতে চারিক্রোশ দূরে এবং রাণাঘাট হইতে একক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমকোণে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। কৃত্তিবাসের সময়ে এবং তাঁহারও অনেক দিন পর পর্য্যন্ত, ফুলিয়া গ্রামের নীচে দিয়া ভাগীরথী গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন, এখনও সুস্পষ্টরূপে গঙ্গার প্রাচীনগর্ভ বা খাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানে গঙ্গা ফুলিয়ার দুই ক্রোশ পশ্চিমে বয়ড়া গ্রামের নীচে প্রবাহিত। এই বয়ড়ায় একটী ডাকঘর আছে, তাহা পূর্ব্বে ফুলিয়ার সীমানায় ছিল। কিন্তু তথায় ডাকঘরের প্রতি স্থানীয় লোকের অসদ্ব্যবহার হেতু, তাহা উঠিয়া বয়ড়াগ্রামে আসিয়াছে

---

(১৬) এই মুখোপাধ্যায় শব্দ যদিও ব্যবহার করিলাম বটে, কিন্তু মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় আদি "উপাধ্যায়" শব্দযুক্ত পদবী ; দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবন্ধনের পূর্ব্বে ছিল না। তখনকার পদবী মুখটী, বন্দ্যঘটী, চট্ট ইত্যাদি। মেলবন্ধনের সময় গঙ্গানন্দ মুখো, যোগেশ্বর মুখো এবং এই প্রবন্ধ লেখকের পূর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বানন্দ (সবাই) বন্দ্য প্রভৃতি পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি হেতু, আপন আপন উপাধিতে "উপাধ্যায়" যোগ করিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হয়েন। ক্রমে উহা মুখ, বন্দ্য, চট্ট ও গাঙ্গুলী বংশে সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তখনকার হিসাবে বলিতে গেলে, নৃসিংহ মুখটী বলাই উচিত ছিল।

এবং ফুলিয়ার যে মূল সত্ব, তাহার চিহ্নস্বরূপ ফুলিয়ার নাম যোগ করিয়া, ডাকঘরটির এখন নামকরণ হইয়াছে "ফুলিয়া বয়ড়া" ডাকঘর।

যে ফুলিয়া অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান এবং যেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতি কদাচিৎ স্থান পাইত; যেখানে এত ঘনভাবে, যে চালে চালে কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং যে গ্রামের নামে, কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মেল দুইটীর মধ্যে একতরের নামকরণ হইয়াছিল "ফুলিয়া মেল"; সেই ফুলিয়া এখন কালের কুটিল গতিতে জনশূন্য ও জঙ্গলময় হইয়াছে। যেমন তেমন জঙ্গল নহে, তথায় ব্যাঘ্রাদি বন্যপশু সকল নির্ব্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দ মনে বসবাস করিয়া থাকে। দিবাভাগেও তথায় একক কেহ যাইতে সাহস করে কি না সন্দেহ।

গ্রামের (গ্রাম আর তথায় এখন কোথায়?) এত দুর্দ্দশার মধ্যে একটা সুখের কথা এই যে, যে স্থানে কৃত্তিবাসের বাসগৃহ ছিল; সর্ব্বসাধারণে এখনও তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও লোকে সেই জঙ্গল পতিত ভূখণ্ডকে কৃত্তিবাসের ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। জঙ্গলও সাধারণ নহে। এ ভিটায় এমন জঙ্গল যে এখন লোকের কোন গাছ গাছড়ার দরকার হইলে, যদি কোথাও খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তবে শেষ অনুসন্ধান স্থান কৃত্তিবাসের ভিঠা;—"কোথাও না পাইয়া থাক, কৃত্তিবাসের ভিটায় খোঁজ করিয়া দেখ, অবশ্য পাইবে।" ফলতঃ কৃত্তিবাসের পুণ্য প্রভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, যে সকল গাছ গাছড়া গ্রাম্যলোকের গ্রাম্যঔষধে সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে; তাহা প্রায় সমস্তই কৃত্তিবাসের ভিটায় খুঁজিলে পাওয়া যায়।

ভক্তশিরোমণি বৈষ্ণবপ্রধান হরিদাস ঠাকুরও বহুদিন ফুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেখানে কৃত্তিবাস ঠাকুরের ভিটা, সর্ব্বসাধারণে তাহারই সংলগ্ন এক ভূমি খণ্ডকে হরিদাসের পাট বা আশ্রমস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। হরিভক্ত হরিদাস বোধ হয়, যেন সেই অসাধারণ ব্যক্তি রামচরিতপ্রণেতাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়াই তাহার বসতস্থানের সান্নিধ্যকে পরম পুণ্যপ্রদ ভাবিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তথায় আপনার আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। যেমন কৃত্তিবাস, তেমনি হরিদাস; সুতরাং তদুভয়ের বাসস্থানের একত্র সন্নিবেশ অতি উপযুক্তই হইয়াছে বলিতে হইবে। রতনেই রতন মিলিয়া থাকে, একথার সম্পূর্ণ সার্থকতা যে এইখানে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মধ্যে একবার কৃত্তিবাসের ভিটার একটা কীর্ত্তিস্থাপনের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য কতকটা টাকাও সাক্ষরিত এবং আদায় হইয়াছিল। তাহার পর জানিনা, কেমন করিয়া তাহা আস্তে আস্তে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। যাহা হউক, নির্ব্বাণ হওয়াতে আমি দুঃখিত নহি, বরং প্রভূত সুখী, যেহেতু তাহাতে আমাদের জাতীয় চরিত্র রক্ষিত হইয়াছে। আন্দোলন সময়ে, আমার বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল যে,

পাছে এইবার বুঝি গুণের গুণ প্রতিষ্ঠায়, আমাদের চিরপ্রচলিত জাতীয় চরিত্রে কলঙ্কচিহ্ন লাগিয়া যায়। তা হইবে কেন?

কয়েক বৎসর হইল, বঙ্গবাসীতে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করিয়া যে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধ তাহারই সম্প্রসারণ মাত্র। ইতি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

এই প্রবন্ধ লেখা শেষ হওয়ার কিছুকাল পর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামে একখানি পুস্তক আমার হাতে পৌঁছে। তাহাতে ১৪২৩ শকের হাতের লেখা রামায়ণ পুঁথি হইতে কৃত্তিবাসের নিজ দত্ত আত্মবিবরণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন মনে হইতেছে, ইহা বুঝি সেই সাপের পা ও ডুমুরের ফুল স্বরূপ শ্রীযুক্ত হারাধনদত্ত ভক্তিনিধির প্রাচীন রামায়ণের পুঁথি, যাহার অস্তিত্ব আছে, অথচ লোকের চর্ম্মচক্ষে ভিড়ে না! যাহা হউক, পরিচয়টার উৎপত্তি যেমন করিয়াই হউক ও যেখান হইতেই তাহা উদ্ধৃত করা হউক, উহা পড়িলে কিন্তু যেন খাটি বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। উহার মধ্যে অনেক কথা আছে, যাহা এই প্রবন্ধোক্ত অনেক কথার সহ মিলে এবং তদুক্ত সময়টাও, এই প্রবন্ধ নিরূপিত সময়ের সহ কতকাংশ একতাযুক্ত দৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে, পরিচয়টা এখানে উদ্ধৃত করার বিশেষ আবশ্যকতা বিবেচনা করি।

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ[১] মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে[২] ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥

---

(১) ইঁনি সেই দনৌজা-মাধব, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র। এদিকে নৃসিংহ মুখটী ওঝাও, লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক পুজিত কুলীন আয়িত মুখটীর প্রপৌত্র। সুতরাং দনৌজামাধব ও নৃসিংহ মুখটী, এ উভয়েরই সময়ের সমতা হইতেছে।

(২) পূর্ব্বরাজাজায়।

সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুজে খুজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায়॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিগে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালি জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা। ৩
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী। ৪
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাঁহার তনয়॥ ৫
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাতপুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥ ৬

৩। ফুলিয়ার সংলগ্ন গ্রাম মালিপোঁতা; এ দুয়ে একই গ্রামে যেন দুই বিভিন্ন পাড়া। জানিনা, কথিত মালিজাতির বাসস্থানের সঙ্গে, এই "মালিপোঁতা" অর্থাৎ মালির ভিটা অর্থযুক্ত গ্রামের কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

৪। দক্ষিণ পশ্চিমে এখনও গঙ্গার সাবেক খাদের চিহ্ন আছে। অন্য সময়ে এই খাদ শুকনা থাকে। বর্ষায় যে বৎসর বেশী জল বাড়ে, সে বৎসর গঙ্গা প্লাবিত হইয়া এই খাদে প্রবেশ করিলে, সে জলকে এখনও গঙ্গাজল বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

৫। ফুং মুং নৃসিংহজো গাভো।—

"————তৎসুতাশ্চাভবংস্ত্রয়ঃ।
মুরারিশ্চাথ গোবিন্দঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যসমা ইমে॥"

এখানে মিল হইল। ধ্রুবানন্দ। মহাবংশ।

৬। ফুং মুং গর্ভেশ্বরজো মুরারিঃ।—

"————————অষ্টৌ তস্য সুনবঃ।
ভৈরবঃ সৌরিমদনোঽনিরুদ্ধো বনমালিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো নিবাসশ্চ ব্যাসশ্চেতি মহৌজসঃ॥" ধ্রুবানন্দ। মহাবংশ।

এখানে মিলিল না। মহাবংশ মতে ৮ পুত্রের নাম ভৈরব, সৌরী, মদন, অনিরুদ্ধ, বনমালী, মার্কণ্ডেয়,

জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী ॥
মদরহিত ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সমশাস্ত্রে অবগতি ॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোঁসাই প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাঢ়য়ে সম্পদে ॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী ॥ [৭]
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস।
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।
মুখটী বংশের কথা আরও কৈতে আছে ॥
সূর্য্যপণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম বিভাকর। [৮]
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥

শ্রীনিবাস ও ব্যাস। কিন্তু উপরের পদ্য অনুসারে সাতপুত্রের নাম ভৈরব, মুরারি, মার্কণ্ডেয়, ব্যাস, সুশীল, ভগবান বনমালী। অথচ মদনের বংশে কবি ভারতচন্দ্র ও অনিরুদ্ধবংশে বিষ্ণুঠাকুরাদি প্রসিদ্ধ কুলীনবংশ।

(৭) এখানেও মিলিল না, প্রবন্ধভাগে দেখান হইয়াছে যে কৃত্তিবাসের বাপ বনমালীর ৭ পুত্র ও ৪ কন্যা।

(৮) সূর্য্যঠাকুরের পুত্রগণের পরিচয় কি মহাবংশ কি কুলপঞ্জিকা কোথাও পাইলাম না।

রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর॥ [৯]
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল। [১০]
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাহার॥
মুখটী বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জন শিখে যাঁহার আচার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবারে শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলেন কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ। [১১]
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারে ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে॥

৯। গোবিন্দের পুত্রাদির পরিচয়ও পাইলাম না।

১০। "গজপত্যশ্বপতিশ্চ হেরম্বোবামনস্তথা। ভৈরবস্যাত্মজা এতে——"ধ্রুবানন্দ। মহাবংশ। এখানে মিলিল।

১১। বার বৎসরের ছেলে বড়গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মা পার হইয়া উত্তরদেশে পড়িতে যাওয়ায়, বিশেষতঃ তথনকার কালে, কিছু যেন আশ্চর্য্য বোধ হয়। হয় ত অপর কোন আত্মীয় ব্যক্তিও উত্তরদেশে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, সেই সূত্রে কৃত্তিবাসেরও তথায় গমন ঘটিয়া থাকিবে। তথনও কি নবদ্বীপের বিদ্যা-বিষয়ক খ্যাতি প্রবল হয় নাই? বোধ হয় না হওয়ার কথা, নতুবা দুয়ারে নবদ্বীপ ফেলিয়া, তথনকার কালে সেই দুর্গম উত্তরদেশে অল্পবয়স্ক বালকেরা পড়িতে যাইবে কেন?

বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উঝাকার।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥[১২]
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্ত ঘটি বেলা যখন দেওয়ালে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধায়ি আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি॥

১২। এ কোন্ হিন্দু গৌড়েশ্বর? মুসলমান অধিকার হওয়ার পর একজন মাত্র হিন্দু গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তিনি রাজা গণেশ। তাঁহার প্রকৃত নাম কংসনারায়ণ। "কংস" মুসলমান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকের হাতে পড়িয়া, "কানিস" "গানিস" ও অবশেষে "গণেশে" পরিণত হইয়াছে। ইহার রাজত্বকাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খৃঃ পর্য্যন্ত। প্রবন্ধে কৃত্তিবাসের অনুমানিক জন্মকাল ১৩৩৫ খৃঃ ধরা হইয়াছে। সুতরাং এখন তিনি যদি সত্য সত্যই কংসনারায়ণের কাছে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বয়স তখন ৫০ পঞ্চাশ বা তাহারই একটু এদিক্ ওদিক্ হইবে। উদ্ধৃত পদ্যে দেখা যাইতেছে যে, তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া আগে 'ঘরকে' আসেন ও তাহার পরে গৌড়েশ্বরের সহিত দেখা করেন। সুতরাং আগে ঘরে বসিয়া গৌড়ে হিন্দুরাজার খবর পাইলে তবে গৌড়ে যান। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান রাজত্বপ্রবাহের মধ্যে, কংসনারায়ণের অতি বিরল সাত বৎসরের রাজত্বের খবর কি, সে কালের ন্যায় সেই খবরাখবরশূন্য সময়ে, সুদূর আঁধিয়ারা পল্লী ফুলিয়া পর্য্যন্ত যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল? কে জানে,—কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। তাহার পর গৌড়েশ্বরের রাজসভা-বর্ণনে দেখা যায় যে, তথা হইতে মুসলমান যেন একেবারে নির্ব্বাসিত। কিন্তু বস্তুতঃ তখনও মুসলমানের সংঘট্ট এত বেশী যে, কংসনারায়ণের মৃত্যুর পরেই, তাঁহার পুত্র আর হিন্দুয়ানী রাখিতে না পারিয়া অবিলম্বে মুসলমান হইয়াছিলেন। এদিকে আর এক কথা, সেন-রাজবংশ গৌড়চ্যুত হইলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়া ঘোষিত করিতেন। এমন কি, তাঁহারা বাকলা চন্দ্রদ্বীপে উঠিয়া আসার পরেও, আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলাইতে ত্রুটী করিতেন না; যেহেতু গৌড় অর্থে তখন কেবল গৌড় নগর নহে; বাঙ্গালা দেশও গৌড় আখ্যায় আখ্যাত ছিল। কৃত্তিবাসের এ রাজভেট বাকলা চন্দ্রদ্বীপের গৌড়েশ্বর নহে কি? আমার বোধ হয় যেন তাই। যে পুস্তকটা হইতে পদ্যটী উঠাইলাম, তাহার গ্রন্থকার কিন্তু বলেন যে, এ গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণ। হয়, ভালই। তাহা হইলেও, আমা কর্ত্তৃক নির্ণীত কৃত্তিবাসের সময়ের সঙ্গে গরমিল হইতেছে না।

কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস ।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে ।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে ॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্বরায় বসে আগে গন্ধর্ব্ব অবতার ।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার ॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে ।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরনী ।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর ।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুমার ॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার ।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে ।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে ॥
চারিদিকে নাট্য গীত সর্ব্বলোকে হাসে ।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আভাসে ॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি ।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর ।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিগুমানে ।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে ॥
রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে ।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥

পঞ্চ দেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গোড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহা পণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাত কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে॥

যাহা হউক, এ পদ্যের অনেক কথাই যখন কুলাচার্য্যের গ্রন্থের সহিত মিলিতেছে, তখন উদ্ধৃত পদ্যটাকে কৃত্তিবাসের নিজ দত্ত পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করার পক্ষে বড় একটা প্রতিবন্ধকতা দেখা যাইতেছে না। তবে বংশাবলী সম্বন্ধে যে দুই চারি কথার অমিল হইল, তাহা এরূপেও মীমাংসিত হইতে পারে। একালের ন্যায় সেকালেও কুলীন-ঠাকুরদের দূর দূর স্থানে অনেক বিবাহ হইত এবং এখনকার এক মায়ের সন্তান অন্য মায়ের সন্তানদের খোঁজ না রাখার ন্যায় তখনও সম্ভবতঃ সকলে সকলের খোঁজ রাখিত না। এক বাপের বিবিধ স্ত্রীর সন্তান পরস্পর খোঁজ না রাখিলেও, ঘটক ঠাকুরদের কাছে কিন্তু কোনটাই এড়াইয়া যাইতে পারিত না; যেহেতু তাহাদের ব্যবসায়ই ছিল তাহার সন্ধান রাখা। সুতরাং বংশাবলী সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের সহিত কুলাচার্য্যের দুই চারি কথা তফাতবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব পদ্যটা যেখানেই পাওয়া যাউক ও যেখান হইতেই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" গ্রন্থকার উহার উদ্ধার করুন, উহাকে খাঁটি জিনিষ বলিয়াই যেন আমার বিশ্বাস হইতেছে।

পদ্যটীর মধ্যে কৃত্তিবাসের জীবনী সম্বন্ধে যে যে ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা পাঠকেরা পদ্যটী পাঠ করিয়াই জানিতে পারিবেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমার আর বেশী কিছু বলিতে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

কৃত্তিবাস তবে সত্যসত্যই রাজা ও রাজদরবার দেখিয়াছিলেন। দেখিলেও তাহা ক্ষণিক, বিশেষতঃ কৃত্তিবাসের এ রাজাও মাঘ মাসের শীত নিবারণের জন্য রৌদ্র পোহাইয়া থাকেন। অতএব এখনও বলি যে এ সকল সত্ত্বেও, গেঁয়ে কবির গেঁয়ে বুদ্ধি ও ধারণার ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য।

আমাদের পরম সুহৃদ শ্রদ্ধাস্পদ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর গবেষণা, প্রভূত অনুসন্ধান ও যথেষ্ট পরিশ্রমের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ পরিষদের প্রথমাবস্থা হইতে যে মহাকবির লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধার করিবার জন্য আমরা যত্নবান্ হইয়াছি, সেই কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যিনি এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক সুবৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের উপকৃত করিয়াছেন, তিনি যে সাহিত্য পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি কৃত্তিবাস পণ্ডিত সম্বন্ধে যেরূপ সুবিস্তৃত আলোচনার অবতারণ করিয়াছেন, তাহা সকলই যে অভ্রান্ত সত্য ও সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে, তাহা মনে করাও ভুল। কিন্তু এরূপ প্রবন্ধ যতদূর সম্ভব, নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? এই কারণে আমরা সাহিত্যানুরাগী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রবন্ধের স্থানবিশেষে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যগতিকে তাঁহার সময়াভাব ঘটায় তিনি প্রবন্ধ তদবস্থায় প্রকাশ এবং যেরূপ পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আবশ্যক, তাহাই স্বতন্ত্রভাবে আমাদের মন্তব্য সহ প্রকাশ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিত হইল। এই মন্তব্য পাঠ করিয়া এরূপ কেহ না মনে করেন যে আমরা প্রফুল্লবাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করিতেছি। আমরা স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যতদূর প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই প্রফুল্লবাবু তাঁহার প্রবন্ধে উপস্থিত করিয়াছেন। যে যে বিষয় তিনি উল্লেখ করেন নাই অথচ যেগুলি আমরা উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়াছি, সেই সেই বিষয়ই বর্ত্তমান প্রস্তাবে আলোচিত হইল।

প্রফুল্লবাবু প্রথমে আদিশূর ও সেনবংশীয় রাজগণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা কৃত্তিবাস প্রবন্ধের প্রকৃত বিষয়ীভূত না হইলেও ঐতিহাসিকগণের বিশেষ প্রীতিকর হইতে পারে ভাবিয়া এ সম্বন্ধে আমরাও দুই এক কথা বলিতেছি—

পালবংশের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে আদিশূর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, একথা লইয়া বহুদিন হইতেই আমরা আলোচনা করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাসেও আদিশূর সম্বন্ধে একটী বিশেষ ভ্রম চলিতেছিল। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয়, গতবর্ষের সংস্করণে তাঁহার ইতিহাসে ঐ ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে। তবে আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়নের প্রকৃতকাল নির্ণয় সম্বন্ধে বড়ই মতভেদ চলিতেছিল, প্রফুল্লবাবু তাহার সমালোচনা করিয়া যে সুন্দর মত প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ দিবেন।

অপরাপর বিশেষ প্রমাণাভাবে তাহাই প্রকৃত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, অর্থাৎ আদিশূর ৬৫৪ শকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। আদিশূরের বংশ বহুদিন গৌড়দেশে রাজত্ব করেন, তৎপরে পালবংশ, তৎপরে সেনবংশের অভ্যুদয়। এই সেনবংশীয় তৃতীয় রাজা লক্ষ্মণসেনকে লইয়াই কথা।

প্রফুল্লবাবুর মতে,—মহারাজ লক্ষ্মণসেন ১১৬৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৭ বর্ষ রাজত্ব করেন। আমরাও এক সময় ইহাই প্রকৃত বলিয়া জানিতাম। একথা বহুদিন হইল, আমরা লিখিয়াছি। এরূপ স্থির করিবার কারণ এই—

লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস সুক্তিকর্ণামৃত নামক একখানি কবিতাসংগ্রহ সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ করেন যে এই গ্রন্থ ১১২৭ শকে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণসেনের 'রসৈকবিংশে' প্রকাশিত হয়। সুতরাং সেই সময়ের লোক যখন লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্যই যেন মনে হয়, লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীধরদাসের সেই বচনটী এই—

"শাকে সপ্তবিংশত্যাধিকশতোপেত দশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে। ১
শ্রীধরদাসেনেদং সুক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥"

কোন পণ্ডিত আমাদের নিকট সুক্তিকর্ণামৃতের বচন পাঠাইয়া দেন, তাহা এই—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাম্।
শ্রীমল্লক্ষ্মণক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে॥" ২

আবার 'সেনরাজগণ' প্রণেতা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ এই বচনটী এইরূপ উদ্ধার করিয়াছেন—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য হি রসরসে চাব্দে॥" ৩

দেখুন, উপরে এক পুস্তকের তিনটী পাঠ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাদের মধ্যে কোন্ পাঠ আমরা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? আমাদের বিবেচনায় প্রথম চরণ ব্যতীত অপর চরণ কোনটীরই ঠিক নহে। উক্ত বচনদ্বারা এইমাত্র জানা যাইতেছে যে ১১২৭ শকে অর্থাৎ ১২০৫ খৃষ্টাব্দে সুক্তিকর্ণামৃত রচিত হয়। 'শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈক-বিংশে' এই টুকু দ্বারা এমন জানা যায় না যে উহা লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব-পরিচায়ক। উহা

(১) Dr. Rajendra Lala's Notices of Sanskrit MSS. Vol. III. p. 14.

(২) বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ ৬০২ পৃষ্ঠা।

(৩) সেনরাজগণ ৪৭ পৃঃ।

যায় কবি 'লসং' নামক কোন অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, এইমাত্র বোধ হয়। লসং লক্ষ্মণসেনের জন্মাব্দে অর্থাৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি।[৪] এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ অব্দেই লসং আরম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে ৮৬ লসং হয়। কিন্তু আমরা উক্ত রচনের কোনটী হইতে ৮৬ সংখ্যা পাইতেছি না। সংস্কৃতবিৎ ঔফ্রেক্ট-সাহেব জর্ম্মণ প্রাচ্যসভার পত্রিকায়[৫] সুক্তিকর্ণামৃত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও ঐ শ্লোকটী একেকালেই উদ্ধৃত করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার সংগৃহীত পুথিতে ঐ শ্লোকটী ছিল না। ইত্যাদি নানা কারণে ঐ শ্লোকটীর উপর আমাদের আস্থা নাই।

বিশেষতঃ মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ারের[৬] সমসাময়িক মিনাজের লেখায় স্পষ্ট জানা যায়, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ছাড়িয়া 'সক্‌নাতে'[৭] পলায়ন করেন। এরূপস্থলে, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহার ৬ বর্ষ পূর্ব্বে তিনি গৌড়রাজ্য হারাইয়াছেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরগণ অনেক দিন বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপ হারাইবার পর লক্ষ্মণসেন আর কোথাও যে রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের গ্রন্থ পাঠে স্পষ্ট জানা যায়, যখন যবনেরা গৌড় আক্রমণ করে, তখন লক্ষ্মণসেনের পুত্র রাজা কেশব যবনের ভয়ে গৌড় ছাড়িয়া পলায়ন করেন। আবার কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র লিখিয়াছেন, রাজা কেশব স্বজন ও কুলীন ব্রাহ্মণগণ সহ (বঙ্গে) এক রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রাজা তাঁহার ও ব্রাহ্মণগণের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং কেশবের নিকট আপন পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত কুলবিধি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে কেশবের সহচর কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র তাঁহার নিকট কুলবিধি কীর্ত্তন করেন। এই রাজার নাম কি, তাহা আমরা অসম্পূর্ণ এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি নাই; এড়ুমিশ্রের সম্পূর্ণ কারিকা বাহির হইলে বোধ হয়, তাঁহার নাম পাওয়া যাইতে পারে। তবে আমরা যেটুকু পাইয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিয়াছি ঐ রাজাও সেন-বংশীয় কুলবিধাতা মহারাজ বল্লালসেনের এক পৌত্র।

---

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXV, pt. I. p. 27.

(৫) Deutsches Morgelandes Gesellschaft.

(৬) বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ কেবল 'বখতিয়ার' নাম করিয়া থাকেন, কিন্তু এটী মহাভুল। বখ্‌তিয়ার, কোনকালে এদেশে আগমন করেন নাই। যিনি নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তিনি বখতিয়ারের পুত্র মহম্মদ, এই জন্য তাঁহার নাম পারসী ভাষায় 'মুহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার'।

(৭) 'সক্‌নাৎ' নাম লইয়াও গোল। অনেকের মতে সক্‌নাৎ 'সমতট' শব্দের রূপান্তর। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় 'সক্‌নাৎ' 'জগনাথ' বা সংস্কৃত 'জগন্নাথ' শব্দের রূপান্তর বা অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

এদিকে আবার হিমালয়ের যোগেশ্বর মন্দির হইতে আবিষ্কৃত খোদিতলিপি দ্বারা জানা তেছে—যে ভট্টনারায়ণবংশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধবসেন কেদার- গিয়াছিলেন। মিন্‌হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরি পাঠে জানা যায়, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের া আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই রাজা লক্ষ্মণের অমাত্য, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব দেশ ছাড়িয়া ন করিয়াছিলেন। আমাদের বোধ হয়, সেই সময় মাধবসেনও তীর্থযাত্রাচ্ছলে ন্নাথে পলায়ন করেন।* অনেক ঐতিহাসিকই লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেনের পর ত্র মাধবসেন এবং মাধবসেনের পর তাঁহার ভ্রাতা কেশবসেন রাজত্ব করেন। র্ষের উপর হইল, আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি, সেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন ও কেশবসেন রাজা হন নাই। হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের কা দ্বারা বোধ হইবে যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জীবদ্দশাতেই কেশব গৌড়ে "রাজা" া খ্যাত ছিলেন এবং যখন তিনি বিক্রমপুরে পলাইয়া যান, তখন তথায় বল্লালের এক পৌত্র রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার নাম কি? বিশ্বরূপ। আজ পাঁচ বৎসর আমরা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন পাইয়াছি। তাম্রশাসনে 'গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রোঃ নৃপঃ' বলিয়া বিশ্বরূপকে সম্বোধন করা য়াছে। যখন রাজা কেশব বিক্রমপুরে পলাইয়া যান, তখন যে যবনেরা তাঁহার অনুসরণ ন নাই, তাই বা কে বলিবে? বোধ হয়, লক্ষ্মণপুত্র বিশ্বরূপসেন যবনের সহিত ঘোরতর করিয়া কেশবকে উদ্ধার করেন, এই জন্যই তিনি 'যবনকুলের কালরুদ্র' বলিয়া বর্ণিত য়াছেন। বিশ্বরূপের পর ঠিক কে রাজা হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। ম্‌-ই-অক্‌বরীতে রাজা নৌজা (দনৌজার) পূর্ব্বে সদাসেন নামে এক রাজার উল্লেখ । কিন্তু উক্ত বিশ্বরূপ বা সদাসেন কুলাচার্য্যের নিকট তেমন আদৃত হন নাই। প্রাচীন কুলাচার্য্যই সগৌরবে দনৌজামাধবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দনৌজা- র সভায় কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নৃসিংহ বা নরসিংহ ওঝা সম্মানিত হন। দনৌজামাধব প্রধান প্রধান পণ্ডিত কুলীনদিগকে আহ্বান করিয়া এক সমীকরণ করেন। র সম্রাট্ বুল্‌বনের অভিযান ও তুগ্রিলখাঁর বিদ্রোহ ঘটে। এই অশান্তির সময়েই সিংহ ওঝা দেশত্যাগ করিয়া ফুলিয়ায় আগমন করেন। দনৌজামাধবও বিক্রমপুর ত্যাগ চন্দ্রদ্বীপে গিয়া রাজধানী স্থাপন করেন।

পাঁচ বৎসর হইল, আমরা সর্ব্বপ্রথম বিশ্বকোষে কুলীন শব্দে সাহিত্য সমাজের কৃত্তিবাস ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের যে বংশাবলী* প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে

---

* এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় ঐ সমস্ত প্রমাণ তুলিয়া দিয়াছি।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXV. pt. I. p. 28.

যখন এই বংশাবলী প্রকাশ হয়, তৎপূর্ব্বে বোধ হয় অনেকেই জানিতেন না যে, কৃত্তিবাস আমাদের তি প্রাচীন কবি। বিশ্বকোষে উক্ত বংশাবলী ও কৃত্তিবাস শব্দ প্রকাশিত হইবার দেড়বর্ষ পরে

নৃসিংহ ও তাঁহার সহোদর প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ কুলীনগণ যে যে স্থানে গিয়া বাস ক
তাহা লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রতাপ প্রায় বিলুপ্ত হইলেও বঙ্গীয় কুলীন সমাজে চন্দ্র
সেনরাজগণ 'গৌড়াধিপ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[১০] নৃসিংহবংশীয় মুরারি ওঝার
আমাদের কবি কৃত্তিবাসও সম্ভবতঃ ঐরূপ নাম মাত্র 'গৌড়েশ্বর' উপাধিধারী
চন্দ্রদ্বীপরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে প্রফুল্ল বাবু যে মত প্র
করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, কৃত্তি
গৌড়াধিপ কংসনারায়ণের সভায় গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কংসনারায়ণের রাজত্ব
তাঁহার সময়ে গৌড়ে যবনসমৃদ্ধি, গৌড়ের রাজসভার যেরূপ সর্ব্ববিষয়ের আড়ম্বর
ও আদবকায়দা তৎকালীন দেশীয় মুসলমানদিগের ইতিহাস-পাঠে আমরা জা
পারি, কৃত্তিবাসের বর্ণনায় তাহার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। তখনকার
যবন-প্রভাবের গুণেই আমরা অল্পদিন মধ্যেই কংসনারায়ণের পুত্রকে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দী
দেখি। কিন্তু সেই চিত্র অস্ফুটভাবেও কৃত্তিবাসের কোথাও দেখিতে পাই ন
বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণনীয় গৌড়েশ্বর মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন
তাঁহার গৌড়েশ্বরের—

"আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর। মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর

উক্ত বর্ণনাটী পাঠ করিয়া যিনি যতই উচ্চভাব মনে করুন, কিন্তু আমাদের
চন্দ্রদ্বীপের সেনবংশের অন্তিম অবস্থা স্মরণ করিয়া দেয়। পূর্ব্ববৎ সে আড়ম্বর
অথচ সেই প্রাচীন নয় দেউড়ী শোভা পাইতেছে। হিন্দু রাজা এখনও
পূরা ব্রাহ্মণ্যভাব বজায় রাখিয়াছেন। বড় বড় অমাত্যগণের উপাধিতে যবন স
ঘটিয়াছে, কিন্তু রীতিনীতি চাল চলন এখনও ম্লেচ্ছভাবাক্রান্ত হয় নাই। য

বঙ্গবাসী পত্রিকায় এবং তৎপরে জন্মভূমিসম্পাদক জন্মভূমি পত্রিকায় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আলোচনা ক
তাঁহারা যে সকল বিষয় উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বহুপূর্ব্বেই বিশ্বকোষে ঐ সমস্ত প্রকাশিত হইয়া
জন্মভূমি-সম্পাদক মহাশয় বিশ্বকোষ দৃষ্টে ঐ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিলেও দুঃখের বিষয় তিনি
স্বীকার করেন নাই। এখানে একটী বিশেষ কথা বলিয়া রাখি, শ্রীহর্ষের বংশাবলী মধ্যে বি
এইরূপ ছাপা হয়—শ্রীহর্ষ, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র শ্রীনিবাস, তৎপুত্র মেধাতিথি, তৎপুত্র অরব ই
(বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ ৩৩৬ পৃষ্ঠা।) কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কোন কুলাচার্য্য গ্রন্থে শ্রীনিবাসপুত্র মেধা
নাম নাই। বিশ্বকোষে মুদ্রাকরের দোষে ঐ ভ্রমটী ঘটিয়া ছিল। এই ভ্রমটী বহুদিন হইতেই সং
করিব মনে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জন্মভূমি-সম্পাদক এবং এখন দেখিতেছি প্রফুল্লবা
অবিকল ঐ ভ্রমটী গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আমরা সেই ভ্রমটী এইরূপে সংশোধন করিয়া লইলাম
মেধাতিথি, তৎপুত্র শ্রীহর্ষ, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র শ্রীনিবাস, তৎপুত্র অরব ইত্যাদি।

(১০) চন্দ্রদ্বীপরাজবংশাবলীর একখানি প্রাচীন পুথি পাইয়াছি। পুথিখানির নাম 'গৌড়রাজবংশাবলী

স্বাধীন রাজত্ব ছিল, ততদিন আমরা এই ভাব দেখিয়াছি। এই সকল আলো-
য়া যেন প্রফুল্ল বাবুর অনুমানই কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

পাঁচ বৎসর হইল, আমরা লিখিয়াছি, "কুলপঞ্জিকা অনুসারে মহারাজ লক্ষ্মণ-
র প্রতিষ্ঠিত আদিত্যের অধস্তন ৮ম পুরুষে এবং গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের ঊর্দ্ধতন
পুরুষে কৃত্তিবাস আবির্ভূত হন। এরূপ স্থলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ন্যূনাধিক
বর্ষ পরে এবং চৈতন্যের সমসাময়িক গঙ্গানন্দের ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের
কাল স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে কৃত্তিবাস ১৪১৫ হইতে ১৪১০ খৃষ্টাব্দের
মান ছিলেন।" [১১]

রে দীনেশ বাবু স্থির করিয়াছেন—কৃত্তিবাসের কাব্যরচনার কাল ১৩৮৫ হইতে
খৃষ্টাব্দের মধ্যে। [১২]

ন প্রফুল্ল বাবু প্রকাশ করিতেছেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ১৫০ বর্ষ পূর্ব্বে
২৫৭ শকে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল।

দেখিতে হইবে, তিনটী মতের মধ্যে কোনটীকে আমরা অধিক প্রামাণিক বলিয়া
রিতে পারি?

বাবুর মতে—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়ীয় কুলীন
দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবদ্ধ হন। কিন্তু আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি এবং
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ঘটকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে চৈতন্যদেবের বিদ্যমান
লের সৃষ্টি হয়। এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে
প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

দেবের সমসাময়িক বন্দ্যঘটীয় কুলীন জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এই
লে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থের নাম আছে। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে
রিচয় পাওয়া যায়—

রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥"

বাবু লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাসের ভিটার পার্শ্বেই হরিদাস ঠাকুরের পাট। কবি
ফুলিয়ার সেই হরিদাস সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। যখন চৈতন্যদেব
হইতে হরিদাস ঠাকুরকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ভক্ত হরিদাস সেই
পাইয়া যখন ফুলিয়া ছাড়িয়া চৈতন্যকে দেখিবার জন্য ছুটিলেন, সেই সময় উপলক্ষ্য
জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

আজ্ঞা শ্রীহরিদাস চলিলা উৎকল। ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুষ সব কান্দিয়া বিকল॥
দাস প্রিয় বড় স্বসেন পণ্ডিত। মুরারি-হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত॥

---

[১১] বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১২৮ পৃষ্ঠা।

[১২] বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ, কৃত্তিবাস শব্দ ৫০২ পৃষ্ঠা।

দুর্গাবর মনোহর মহা সে কুলীন। তাহার নন্দন সুষেন পণ্ডিত প্রবীণ॥
ফুলিয়ার দেবতা শ্রীহরিদাস ঠাকুর। অনুব্রজি তারে সঙ্গে গেলা কথো দূর॥
(৭০ পত্র। ২য়

জয়ানন্দের উক্ত কবিতা কয়টী হইতে আমরা দুইটী বিষয় জানিতে পারিতেছি—
মুরারির বংশে কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান ক
সেই মুরারির বংশে হৃদয়ানন্দস্বরূপ (মনোহরের পুত্র) সুষেণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ
২য়, পণ্ডিতবর সুষেণ ফুলিয়ার গৌরব হরিদাসকে অতিশয় ভালবাসিতেন। যখন
উৎকলাভিমুখে যাত্রা করেন, অপরাপর লোকের সহিত সুষেণ পণ্ডিতও ...
হরিদাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

এই সুষেণ পণ্ডিতের পরিচয় বেশী করিয়া দিতে হইবে না। মহাবংশাবলী ...
সকল কুলাচার্য্যগ্রন্থেই ফুলিয়ার মহাকুলীন সুষেণ পণ্ডিতের পরিচয় আছে। ...
লইয়া ফুলিয়া-মেল হয়, সেই গঙ্গানন্দের ইনি জ্যেষ্ঠ সহোদর। কৃত্তিবাস প...
সুষেণ পণ্ডিতের খুল্লপিতামহ। যখন গঙ্গানন্দকে লইয়া ফুলিয়া মেল হয়, তখন ...
মৃত্যু হইয়াছিল।

হরিদাস ঠাকুর যখন নীলাচলে মহাপ্রভুকে দেখিতে যান, তখন গৌরাঙ্গের ...
প্রায় ৩৫।৩৬ বর্ষ অর্থাৎ ১৪৪২-৪৩ শক (=১৫২০-২১ খৃষ্টাব্দ) হইবে, ...
হরিদাসের বয়ঃক্রম প্রায় ৭৫ বর্ষ। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চৈতন্যের জীবদ্দশাতে...
পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর গঙ্গানন্দকে লইয়া ফুলিয়া মেল হয়। এই মেলের সময় গ...
দুইটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল। তাহাতে গঙ্গানন্দকেও বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ...
এরূপ স্থলে হরিদাসের বন্ধু গঙ্গানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুষেণ পণ্ডিতেরও বয়স অ...
হরিদাস ঠাকুরের সমান হইয়াছিল, তাহা মোটামুটী স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে ...
এরূপ স্থলে আনুমানিক ১৩৭০ হইতে ১৩৭৫ শকের মধ্যে সুষেণ পণ্ডিতের জন্মকাল ...
লইলাম। তাহার অন্ততঃ ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার খুল্লপিতামহ কৃত্তিবাস পণ্ডিত ...
ছিলেন ধরিয়া লইতে বোধ হয় অনেকের আপত্তি হইবে না। এরূপ ...
সুষেণ পণ্ডিতের পিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাস সুষেণের ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ...
হইতে ১৩৩৫ শকের (১৪০৮ হইতে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে বিদ্যমান ...
ইহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। এরূপ মোটামুটী কালনির্ণয় স্থলে দুই ...
বর্ষের এদিক্ ওদিক্ ধর্ত্তব্য নহে। অতএব প্রায় পাঁচ বর্ষ পূর্ব্বে আমরা কৃত্তি...
কালনির্ণয় করিয়াছি, এখনও তাহাই যেন সত্যের অনেকটা কাছাকাছি বলি...
হইতেছে। যে পর্য্যন্ত আরও বিশিষ্ট প্রমাণ বাহির না হইবে, ততদিন আমরা কৃ...
১৪০৮ হইতে ১৪২০ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি।

এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার ...

প্রায় পাঁচ শত বর্ষ হইতে চলিল, কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। [illegible] পাঁচালী গায়ক ও শত শত লেখকের হাতে পড়িয়া কৃত্তিবাসের মূলগ্রন্থ [illegible] হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও বড় কষ্ট হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বঙ্গবা[illegible]ই [illegible]দরের জিনিস। পূর্ব্বে বঙ্গের প্রতি ঘরে নিত্য এই গ্রন্থ পঠিত হইত। [illegible] প্রাচীন লেখকগণ যেখানে প্রাচীনতম রচনার ভাব বা অর্থ সহজে বুঝিতে পা[illegible], অথবা বঙ্গভাষার সেই শৈশবকালের পদ বা শব্দবিন্যাস তৎপরবর্ত্তী কালের জন[illegible]র প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলেই তাঁহারা মাজিয়া ঘষিয়া নূতন রং ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা কেবল জয়গোপালকে দোষ দিই কেন? এখন আমরা দেখিতেছি, এরূপ শত শত জয়গোপাল কৃত্তিবাসের সেই প্রাচীনতম রচনার মুণ্ডপাত করিতে কত চেষ্টা কত যত্নই না করিয়াছিল! তাহারা ভাল ভাবিয়া যে কার্য্য করিয়া গিয়াছে, এখন আমাদের নিকট তাহা অমৃতে গরলবৎ বোধ হইতেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের দুইখানি প্রাচীন হস্তলিপি মিলাইয়া দেখুন, কেবল পাঠান্তর নয়, অনেক স্থলেই ভাবান্তর, অর্থান্তর, এমন কি ছন্দের ও বিষয়েরও রূপান্তর দেখিতে পাইবেন। সাহিত্য-পরিষদ্ নানা স্থান হইতে ১৪।১৫ খানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি পাইয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দুই শ্রেণীর পুথি বাহির করিয়াছি। এক শ্রেণীর পুথি 'রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যান' হইতে আরম্ভ এবং অপর শ্রেণীর পুথি 'দশরথের বিবাহ' হইতে আরম্ভ। এত গেল শ্রেণী-বিভাগ। তার পর একশ্রেণীর দুইখানি পুথি লইয়া দেখিতেছি, অনেক স্থলেই এত অধিক পাঠান্তর যে দুইখানিকেই ভিন্ন পুথি বলিয়া [illegible]। এক শ্রেণীর একখানি পুথিতে যে বিষয় লইয়া ১০।১২টী কবিতা লিখিত হইয়াছে, আবার সেই শ্রেণীর আর একখানি পুথিতে দেখি সেই বিষয় লইয়া ৫০।৬০টী কবিতা আছে। এখন ভাবুন দেখি, আমরা কিরূপ সমস্যায় পড়িয়াছি। কৃত্তিবাসের মূল গ্রন্থ উদ্ধার করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা বোধ হয় এখন অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। এই কারণেই পরিষদ্ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশে এত বিলম্ব ঘটিতেছে। পরিষদে ১৪।১৫ খানি পুথি সংগৃহীত হইলেও ১২৫ বর্ষের অধিক পুরাতন পুথি আসে নাই। একেত রামায়ণের এইরূপ পুথিবিভ্রাট! তাহার উপর প্রায় পাঁচশত বর্ষের রচনা ১২৫ বর্ষের পুথি হইতে উদ্ধার করিতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল গ্রন্থ উদ্ধার করিতে হইলে অন্ততঃ দুইশত কি আড়াই শত বর্ষের প্রাচীন পুথি চাই। যত দিন না এরূপ প্রাচীন পুথি সংগ্রহ হইতেছে, ততদিন কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ করা উচিত নহে। যিনি আমাদের এই পুথি-বিভ্রাট মিটাইতে পারিবেন, যিনি কৃত্তিবাসের মূল গ্রন্থ উদ্ধার করিতে কৃতকার্য্য হইবেন, তিনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার সমাধা করিবেন; বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট চিরঋণী হইবেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব*।

আমি নিজে ব্যবসায়ী ভূতত্ত্ববিদ্ নহি অথবা ভূতত্ত্ববিদ্যায় সাধারণ দৃষ্টি ব্যতীত, তাহাতে পাণ্ডিত্যও আমার কিছুই নাই। সুতরাং অদ্য আমার এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্যার পরিভাষা বা দাঁড়াদস্তুরের যে কোন ধার ধারি না, তাহা বলাই বাহুল্য এবং তজ্জন্য যদি কোন দোষের কথা হয়, তবে তাহা ক্ষমার যোগ্য। আমি আমার বিষয় কার্য্য উপলক্ষে এই বঙ্গভূমির প্রায় সমস্ত স্থানই তন্ন তন্ন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। সেই ভ্রমণকালে, বাঙ্গালাদেশের ভূমিভাগের প্রতি কিঞ্চিৎ যত্ন ও মনোযোগের সহিত অবলোকন করায়, তাহাতে যেখানে সেখানে যেমন দেখিয়াছি ও যেখানে যেখানে যেমন বুঝিয়াছি এবং সেই সকলের ফলস্বরূপ মনের মধ্যে যে একটা ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাই এখন, পুনর্ব্বিবেচনায় কিছু কিছু বা ছাটিয়া কুটিয়া, কিছু কিছু বা জোড়া গাঁথা দিয়া, অদ্যকার এই প্রবন্ধ আকারে অবতারণা করিলাম। জানি না, ইহা কাহারও প্রীতিকর হইবে কি না। এ কথায় কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, তবে [illegible] অপূর্ব্ববিদ্যা-খরচে লোক সকলকে এ অদ্ভুত বিদ্যায় বিদ্বান্ করিবার চেষ্টা প্রয়োজন ?—নষ্টস্য কান্যা গতিঃ ! অথবা তোমরা বলিতে পার, এ অঙ্গুলী কণ্ডুয়নরোগের ঔষধ কি ?

[illegible] গ্রন্থে আছে, "মানুষ যতই উঠা পড়া করিতে থাকে, ততই তাহার জ্ঞানলাভ হয়।" (Man will run to and fro and the knowledge will gather) এও না হয়, সেই [illegible] উঠা পড়ার মধ্যে একটা বলিয়া ধরায় ক্ষতি কি ? উঠিয়াছ ত অনেকবার ; একবার [illegible] হয় পড়িয়াই দেখ না, কেমন লাগে।

---

* [illegible] প্র ভূতত্ত্ব প্রবন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধের বৃত্তান্ত আছে। (৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মূল মহাভারতের বনপর্ব্বে [illegible]৩ অধ্যায়ে, পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা বিবরণে এরূপ লিখিত আছে যে, যেখানে কৌশিকী তীর্থ, অর্থাৎ যে স্থানে বর্ত্তমান নাম কুশী ও সাবেক নাম কৌশিকী নদী গঙ্গায় আসিয়া সংমিলিত হইয়াছে; রাজা যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং তথা হইতে সাগরতীরে কলিঙ্গনামে দেশ দেখিয়াছিলেন। অনেকেরই সম্ভবতঃ এ সংবাদে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবার কথা, কারণ—কোথায় কুশীসঙ্গম আর কোথায় গঙ্গার সহ সাগর-সংমিলন! এখনকার হিসাবে এ দুয়ের মধ্যে ৩৪৫ মাইল ব্যবধান, অথচ ইহারই নাম কুশীসঙ্গমের "কিঞ্চিৎ পরে!" এ আবার কোন দেশী "কিঞ্চিৎ পরে" তা কে জানে। আমাদের দেশে ত "সেকান্দরা" হয় "সেকান্দরী" হাত; এক কথায় "সেকান্দরী" বিশেষণ সংযোগে সকল জিনিসই অতি বড় বড় মাপের বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু এখানে সে "সেকান্দরী কিঞ্চিৎ" বলিলেও পাওয়া যায় না। কুশীর সহ গঙ্গার সঙ্গম এখন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত কাহালগাঁ নামক গ্রামের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত। এই কাহালগাঁ কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলওয়ে লাইনের দূরত্ব অনুসারে ২৪৫ মাইল এবং কলিকাতা হইতে বর্ত্তমান সাগরসঙ্গম ন্যূনাধিক একশত মাইল হইবে। এখানে কেহ হয়ত মহাভারতোক্তির সঙ্গতি নিরূপণ প্রয়াসে বলিতে পারেন যে, কুশীসঙ্গম সে কালে—সে মহাভারতের কালে, হয় ত আরও দক্ষিণে ছিল। কিন্তু কুশীসঙ্গমকে "কিঞ্চিৎ পরের" সহিত সঙ্গত করিতে তাহাকে কতই দক্ষিণে আর লইয়া যাইতে পারিবে? বিশেষতঃ এই প্রদেশ যাঁহারা বিশেষরূপে দেখিয়াছেন এবং কুশীনদীর অববাহিকা সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র দর্শন আছে, তাঁহারা আর একথা বলিবেন না; তাৎকালিক কুশীসঙ্গমকে যদি একান্তই স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান সঙ্গমস্থল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তরে ভিন্ন দক্ষিণে কখনই তাহার অবস্থান নির্দ্দেশ করিবেন না। বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে কুশীর খাদ পরিবর্ত্তনের চিহ্ন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

অথবা বোকা মহাভারতকারের এরূপ অসম্ভব,—উপস্থিত ব্যাপারের সহ এমন গরমিল,—সুতরাং বোকা উক্তি উড়াইবার আরও এক উপায় আছে; যাহা অতি সহজ, সুশ্রাব্য, নিজেরও কিছু কিছু বিদ্যাবত্তাপ্রকাশক, অথচ তাহার জন্য কাহার কাছে বিশেষ জবাবদিহি করিতেও হয় না। ঐ উপায় টা ?—'কোথায় হিমালয়ের কোলে বদরিকাশ্রমে বসিয়া গাছের ছাল আঁচড়াইয়া মহাভারত লেখা',—আর কোথায় গঙ্গাসাগর-সঙ্গম! পেটের জ্বালায় অস্থির ভিক্ষাভোজী ব্যাসঠাকুরের পক্ষে তাহা যতটা জানা সম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, অনুমান ও জনশ্রুতি যাহার মূল, সেই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষতঃ ঋষিপ্রণীত পুরাণাদিতে যাহা কিছু লেখা, তাহা সকলই অলীক খেয়াল এবং কল্পনায় পরিপূর্ণ।' আমাদেরই কিছু পূর্ব্বগত সেই সর্ব্বদর্শী

ইংরেজীনবিশগণ, যাঁহারা স্বজাতীয় হিন্দুর ঘরে গোহাড় ফেলিয়া আপনাকে বীরপুরুষ ভাবিতেন; যাঁহারা "বাঙ্গালা জানি না" বলিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন এবং সাহেবদিগকে "ক খ" র দাগা বুলাইতে দিলে আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়া—আনন্দিত হইতেন; তাঁহাদের বিশ্বাস এবং উপায়টা ঐরূপই ছিল। এ শ্রেণীর জীব এখন খুঁজিলে, দুই একটী পাওয়া যায় কি না জানি না। পাওয়া গেলেও, সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; এবং এখনকার ইংরেজীনবিশ যাঁহারা, তাঁহারা ততটা অবিশ্বাসী নহেন এবং বিদ্যার গৌরবও তাঁহাদের সে প্রকারের নাই, বাদ কেবল ইংরেজীতে চিঠী পত্রটা লেখা। তা—সেটা—পূর্ব্বকার ইংরেজীনবিশদের তুলনায় অতি সামান্য রোগ বলিয়াই ধরিতে হয়।

যাহাহউক, বোকা ব্যাসঠাকুরের বোকা কথা যে একেবারে ফেলিবার জিনিষ নহে, তাহা অপরবিধ কয়েকটী প্রামাণিক উপায় দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। খৃষ্ট জন্মিবার তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বা প্রায় চারিশত বৎসর প্রাগব্দে, মগধেশ্বর সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন গ্রীক রাজদূত থাকিতেন, তাঁহার নাম মিগাস্থিনিস্[১]। মিগাস্থিনিস্ তাঁহার ভারতীয় বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র—অর্থাৎ পাটনা হইতে গঙ্গাসাগর সঙ্গম ন্যূনাধিক তিনশত মাইল হইবে। তাহা হইলে এই সাগরসঙ্গম, কলিকাতার কত উত্তরে আসিয়া পড়িয়াছে! বর্ত্তমান হিসাবে, গঙ্গাসাগরসঙ্গম পাটনা হইতে, রেলপথের মাপ লইয়া ধরিলে, প্রায় ৪৫০ মাইল এবং প্রচলিত লোক চলাচলের পথ অনুসারে ৫০০ মাইলের কম হইবে না। পুনশ্চ, কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর পঞ্চম তরঙ্গে, রাজা ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, রাজা ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আইসেন, তখন গৌড় নগরের অত্যল্প দেশ পরেই সাগর-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। এখনকার ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্গণও বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গাসাগর এক সময়ে, রাজমহল বা তাহার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্গণের একথা আরও আশ্চর্য্য নহে কি?

কাশ্মীরপতি রাজা ললিতাদিত্য, যিনি গৌড়নগরের অত্যল্প দেশ পরেই পূর্ব্বসমুদ্র প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী দিনের লোক নহেন। রাজতরঙ্গিণী অনুসারে, ইনি ৬১৯ শকে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৬৫৫ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ১৮১৯ শক হইতে তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ৬১৯ শক বাদ দিলে ১২০০ বৎসর অন্তর হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, ন্যূনাধিক বারশত বৎসর পূর্ব্বে, গৌড়ের অতি নিকট পর্য্যন্ত, পূর্ণ প্রবাহে না হউক, অন্ততঃ এখন যেমন খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে এবং মেঘনা নদীর মুখে, সেইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে দ্বীপ, স্থলভূমি ও জলাভূমিসমন্বিত পূর্ব্বসমুদ্র প্রবাহিত ছিল। সর্ব্বত্র জাল বুনানীর মত নদীর ঘটা, মধ্যে মধ্যে কোন কোনটা আবার এত বিস্তৃত যে কূল কিনারা নজর

১। Megasthenes Frag. VI.

হয় না, কোথাও বা নদীর মুখের নিকট সমুদ্রখাড়ী ভূমধ্যে প্রবেশ করিয়া তরঙ্গখেলা খেলি-
তেছে, কোথায় বা চরভূমি ভাটার সময় জাগিয়া উঠে, জোয়ারের কালে ডুবিয়া যায় এবং
কোথাও বা ভূমিভাগ জলরেখা উত্তীর্ণ হইয়া সুন্দরী প্রভৃতি বাদাবন-সুলভ বিবিধ জঙ্গলে
পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। এই যে চিত্র এখনকার, তখনও বোধ হয়, গৌড়ের অ[illegible]ত দক্ষি-
কটে ইহার বিদ্যমানতা ছিল। সুতরাং বলিতে হয় যে, তখনকার কালে এখনকার এই
নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশপরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ
এই কয়টী জেলার অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে দ্বীপ ও চরভূমি সকল প্রবল ও প্রশস্ত হইতে
থাকায়, যত ও যেমন সমুদ্র সরিয়া গিয়াছে, ততই দেশ সকল ক্রমাধিবেশিত হইতে
আরম্ভ করিয়াছে এবং এই রূপেই কালে উক্ত কয়েকটী জেলা-সমন্বিত গাঙ্গেয় দ্বীপের
উদয় হইয়াছে। ইত্যাকার ক্রমোত্তর দ্বীপাধিবাস হইতেই, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ,
চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপান্তক নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত দ্বীপান্তক, নাম ভিন্ন, এই গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যে আরও অসংখ্য স্থান আছে,
যাহাদের অন্তভাগে "দীয়া" শব্দ সংযোজিত, যেমন কাঁটাদীয়া, সাগরদীয়া, আলেকদীয়া,
কালাদীয়া, জয়দীয়া, মহেন্দ্রদীয়া ইত্যাদি। এখানে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য যে, এই "দীয়া"
দ্বীপ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। পুনশ্চ বাদা কাটিয়া বসত হওয়ায়, অনেক স্থানের [illegible]
কাটী হইয়াছে, যথা বিদ্যানন্দকাটী, রায়েরকাটী, স্বরূপকাটী, আদিলকাটী [illegible]
কাটী, কালীকাটী ইত্যাদি। এখনও এই বর্ত্তমান কালেও বরিশাল জেলায় [illegible]
নদী ও সমুদ্র খাড়ী সকল সরিয়া যাওয়ায় ভূমিভাগের উদয়ে যেমন তাহা অ[illegible]বেশিত
হইতেছে; চরভূমিতে অধিবাস হেতু, সেই সকল স্থানের চরান্তক নাম হইতেছে, যেমন
শিবচর, গোপালচর, মধুচর, ঘোষের চর, পাঁচচর, চরভদ্রাসন ইত্যাদি। কয়েকটা [illegible]রগণাও
হইয়াছে, তাহাদের নাম চরান্তক, যেমন চর যাজিরা ইত্যাদি।

উপরে বলা হইয়াছে যে, বারশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া প্রভৃতি জেলার অস্তিত্ব ছিল
না। কিন্তু ঐ সময়েরই ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাগী-
রথীতটে নবদ্বীপ নগরে গৌড়পতি বল্লাল এবং লক্ষ্মণসেনের সাময়িক বাসস্থানরূপে
নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে মরা সমুদ্র বা বাদা ছিল, সেখানে
এমন পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটিল, ইহা ভাবিয়া হয়ত অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন।
কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় বিন্দুমাত্র নাই; যেহেতু যে পরিবর্ত্তন বার[illegible]ত পূর্ব্বে
ঘটিয়াছিল, এখনও তাহার অভিনয় চলিতেছে, এবং বর্ত্তমান সময়ের সে অভিনয়
নিষ্পন্ন হইতে কি পরিমাণে সময় লইতেছে তাহা দেখিলেই তদ্দ্বারা সে কালের
সেই পরিবর্ত্তনে কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা অনায়াসে অবধারিত হইতে [illegible]
তখনকার ও এখনকার এ উভয় কালের যে অভিনয়, তাহা উভয়তঃ একই [illegible]
একই কারণ হইতে উৎপন্ন এবং পরিশেষে একবিধ ফলে পরিণত হইয়াছে ও [illegible]

[illegible]ধন। নদীর সাগরসঙ্গমস্থলে বাহুরা, মানপুরা প্রভৃতি দ্বীপ, যাহা ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে [illegible] ভাঁটার সময় জাগিয়া উঠিত ও জোয়ারের সময় ডুবিয়া যাইত; যাহা [illegible] সম্পূর্ণ বাদার অবস্থায় পরিণত হয় নাই, সুতরাং বাদা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন [illegible]; এখন তাহাই উচ্চভূমি এবং বহুজনাকীর্ণ গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ দুইটী দ্বীপ সম্বন্ধে যে কিছু খবর, তাহা পাঠকগণ নিরস বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু এই প্রবন্ধ-লেখকের নিকট তাহা বড়ই সরস। ফলতঃ আমাকে এ দুইটী দ্বীপের খবর বড়ই বেশী বেশী রকম রাখিতে হয়, যেহেতু এখান হইতেই আমার আহারীয়ের জন্য খাঁটি ভয়সা ঘৃত আনান হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহার পর নাজীরচর, ফাল্‌কনচর নামে আরও দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, যথায় খৃষ্টীয় ১৮৬০ সালেও জঙ্গলপূর্ণ জলাজমি ছিল, এখন তথায় বহু লোকের বাসস্থান হইয়াছে। ঐরূপ আরও দক্ষিণে এবং সমুদ্র মধ্যে রাবণাবাদ নামক কয়েকটী দ্বীপ, কুক্‌ড়ি-মুক্‌ড়ি চর, ধোপাচর প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দ্বীপ গত ৬০ হইতে ৪০ বৎসর মধ্যে জল হইতে জাগিয়াছে ও তাহাতে লোকাবাস হইয়াছে। তাহার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও বরিশালের অত্যন্ত দক্ষিণভাগে, যেখানে শতবর্ষ পূর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গ বহিত, এখন সে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসিয়াছে। এখনও নিত্য নূতন উত্থিত ভূমি ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিভক্ত হইয়া কালেক্টরী হইতে বি[illegible] হইতেছে এবং নিত্য নূতন জঙ্গল কাটাইয়া সেই সকল স্থানে আবাদ ও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল উদয়-ক্রম-পরিণতি দেখিলে, নবদ্বীপাদি স্থানের উদয় ও বসতি স্থাপন অন্ততঃ অনেক বেশী সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকিবে।

ফলতঃ সুন্দরবনের দক্ষিণে এবং গঙ্গাসাগরের মুখে এখনও নিত্যই সমুদ্র ভরাট হইয়া নূতন জমির উদয় হইতেছে এবং সেজন্য গঙ্গাসাগরসঙ্গম ক্রমেই দূরে যাইয়া পড়িতেছে। যেহেতু, কেবল পঞ্চশত নহে, এখন দ্বিপঞ্চশত নদী সর্ব্বদাই গঙ্গার সহচারিণী থাকিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে অপার মৃত্তিকারাশি আনিয়া নিকটবর্ত্তী সাগরকে শুষ্ক করিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর হইল, অভিজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিতেরা গাজীপুরে একবার [illegible] উপায় প্রয়োগে নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, গঙ্গা প্রতি বৎসরে সাগরসঙ্গম স্থলে [illegible]০০০ মণ মাটি আনিয়া উপস্থিত করিয়া থাকে। এই হিসাব হইয়াছিল, [illegible] বসিয়া। কিন্তু গাজিপুরের দক্ষিণে স্বয়ং গঙ্গা ও তাহার শোণ, অজয় প্রভৃতি শাখা [illegible] সুন্দরবনের মধ্যস্থিত দ্বিপঞ্চশত নদী, তাহার পর উত্তরপূর্ব্বকোণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী প্রভৃতি, এ সকলের দ্বারা আরও কত মাটি বাহিত ও আনীত হইয়া [illegible], তাহার আর হিসাব হয় নাই। এখন ঐ গাজিপুরের হিসাবের সাদৃশ্যে এ সকলের [illegible]বাহিত মাটির পরিমাণ কত, তাহা যদি অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে [illegible] দেখ, কি প্রভূত মাটিই প্রতি বৎসর সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে এবং ইহাতে

যে এত শীঘ্র সমুদ্র ভরাট হইয়া নূতন জমী উত্থিত হইবে ও সেই সকল স্থানে নূতন
বসিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কোথায় ?

অতঃপর আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের মাটির অবস্থা পরীক্ষা করিলে স্থানভেদে
তাহার এই চারি প্রকার প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম বিভাগ।—রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর ভাগীরথীর
উৎপত্তিস্থান ছাপঘাটী পর্য্যন্ত বড়গঙ্গার দক্ষিণে এবং ছাপঘাটী হইতে ভাগীরথীর
পশ্চিমধার বাহিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, এই সমস্ত ভূভাগের সর্ব্বত্রই, প্রায় এক প্রকৃতির
মাটি। অবশ্য ভূতত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহার মধ্যে বিভাগ দৃষ্ট হইতে পারে;
কিন্তু আমাদের এই আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য যতটুকু, তাহার মধ্যে তাদৃশ সূক্ষ্ম বিভাগ
করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। স্থূলতঃ এবং মোটা দৃষ্টিতে যতটুকু দেখিতে ও বুঝিতে
পারা যায়, তাহা হইলেই এখানে যথেষ্ট হইবে। সেই মোটা দৃষ্টিতে এক প্রকৃতির
মাটি বলিতেছি। ইহা সর্ব্বত্রই কাঁকর পাথর পূর্ণ অথবা পাহাড়িয়া কঠিন মাটি।
এ বিষয়ে আরও একটু বলার প্রয়োজন যে, যদিও রাজমহলের দিকে এবং
মেদিনীপুরের দিকে, বিন্ধ্য ও পূর্ব্বঘাট শ্রেণীর প্রকৃতি ভেদে, মাটির প্রকৃতিরও দুই
উপবিভাগ হইতে পারে বটে, কিন্তু উপস্থিত শ্রেণীবিভাগে এবং আমাদের প্রয়োজনে
যতটুকু আবশ্যক, তাহাতে তদুভয়কে একশ্রেণীর মাটি বলিয়া ধরায় কিছুমাত্র অন্যায়
হইবে না। আমাদের প্রয়োজনানুরূপ, উভয়ই সমান কাঁকর পাথর পূর্ণ ও পাহাড়িয়া
মাটি। যেখানে বা কাঁকর পাথর দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ
ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ, সেখানেও মাটি এত কঠিন ও তাহার প্রকৃতি
এরূপ যে, বাঙ্গালার আর কোন স্থানে তাহার অনুরূপ মাটি দেখিতে পাওয়া যায় না
এবং তাহাও যে এই বিভাগের অপরাপর মাটির সঙ্গে সমশ্রেণীর ও সম-ধর্ম্মাক্রান্ত সে পক্ষেও
কোন সন্দেহ থাকে না। এই সমস্ত ভূভাগের মাটি বহু যুগযুগান্তর হইতে নির্ম্মিত;
সুতরাং ইহাকে সোজা কথায় পাকা-মাটি বলিয়া ধরা যাইবে। উহা পাকা মাটিই
বটে। ইহা নিশ্চয় যে, এক সময়ে সমুদ্র গৌড়ের নিকট পর্য্যন্ত ছিল অথবা আরও পূর্ব্বে,
গঙ্গাসাগর সঙ্গম যখন ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজমহলের [illegible]
অবস্থিত ছিল, সেই সময়ের সেই সমুদ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিয়া
প্রবাহিত হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া গেলে, যে সকল চিহ্ন পশ্চাতে [illegible]
থাকে এবং যে সকল জলজীবের পঞ্জরাদি মৃত্তিকার অঙ্গীভূত হইয়া যায়, এ ভূভাগের
কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সুতরাং ঐ মাটিই যে আগে সমুদ্র এবং প[illegible]
সমুদ্র-বাদার পশ্চিম সীমা ছিল, তাহাতে সন্দেহ অতি অল্পই।

দ্বিতীয় বিভাগ। পদ্মা বা বড়-গঙ্গার উত্তর তীর হইতে হিমালয়ের পাদদেশ তর[illegible]
পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ, হিমালয়ের ঢালু ভূমি। ইহা হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ হই[illegible]

পদ্মার উত্তর তট পর্য্যন্ত, ক্রমাগত ঢালু হইয়া আসিয়াছে। এই ভূভাগের সর্ব্বত্রই জমির প্রকৃতি এক প্রকার। সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্র ধৌত বালুকারাশি বিস্তৃত হইয়া আছে এবং তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালুকা-মিশ্রিত দো-আঁশ মাটি জন্মিয়াছে, যদ্দ্বারা মৃত্তিকা-সাধ্য চাষ আবাদাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই ঢালু বালুকাময় জমিতে, সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধৌত জলরাশি অন্তঃ-সলিলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায়, সমস্ত দেশের ভূমিই জলসিক্ত ও আর্দ্র। ফলতঃ জমির জলসিক্ত ভাব এতই অধিক যে, এখানে আলু, ইক্ষু প্রভৃতির চাষে কখনও জলসেচন করিতে হয় না। আমি রঙ্গপুর ও অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করিয়া চাষাদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, এখানে আলু প্রভৃতিতে জলসেচন করিলে, তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বালীর ভাগ এ সকল প্রদেশে এত অধিক যে, কূপ ব্যতীত, পুষ্করিণী খনন করিতে পারা যায় না। পুষ্করিণী খনন করিতে গেলেই, বালী ভাঙ্গিয়া বুজিয়া যায়। ফলতঃ অতি দীর্ঘায়তন দীঘি ভিন্ন, সঙ্কীর্ণ আয়তন পুষ্করিণী খনন, বালীর দৌরাত্ম্যে একরূপ অসাধ্য ব্যাপার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে এ কার্য্যে কাহারই সম্পূর্ণ সফলকাম হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এত বালুকা আসিল কোথা হইতে? ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট শুনিতে পাই যে, পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্ম্মিত হওয়ার "ইওসিন্" যুগে, হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। হিমালয়ের কেবল তটভাগ নহে, তাহার বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তখনও জলমগ্ন ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য যে, এ দেশের এই যে স্তূপাকার অসীম বালুকা ভিত্তি, ইহা কি সেই প্রাচীন ইওসিন্-সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার ফল? কিন্তু তাই বা বলি কি করিয়া, যেহেতু ইওসিন্ যুগ যে, সেত অনেকদিনের কথা! ইওসিনের পরও কয়েকটী স্তর হইয়াছে যথা, মিওসিন্, প্লিওসিন্ এবং ইহার পরে ভূপঞ্জরের চতুর্থযুগের স্তর নির্ম্মাণ-ক্রিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে মিওসিন্ স্তরেই প্রথম মনুষ্য সৃষ্টির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যেও আবার নিম্ন মিওসিনে প্রাপ্ত চিহ্ন-গুলি অতি অস্পষ্ট ও সন্দেহ-সংযুত। উপর মিওসিন্ হইতেই কেবল মানবীয় অস্তিত্বের স্পষ্ট চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়ার আরম্ভ বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই সকল স্তরের এক একটা নির্ম্মিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বর্ষ গত হইয়া যায়। সুতরাং তত কালের সমুদ্র-পরিত্যক্ত বালী কি আজিও প্রস্তরাবস্থায় পরিণত না হইয়া নিজাবস্থায় থাকিতে পারে?—ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। তাই বলিয়াছি যে, উহা হিমালয়ের গাত্র-ধৌত বালুকা। এই প্রদেশ একে হিমালয়ের ঢালু, তায় প্রস্তর-প্রবণ অববাহিকা, সুতরাং বালী জমা এইবার পক্ষে কারণের অভাব কোথায়? অবশ্য, এ বালীও এ সকল ভূভাগ জাগিবার বহুকাল পূর্ব্বে জমিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিভাগের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, প্রথম বিভাগের সহ সম পুরাতন ও নিম্নাংশের জমি

তদপেক্ষা কিছু আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক হইলেও অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিভাগের জমি মোটের উপর এতটা পুরাতন হইলেও, যে দৃঢ়তা তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাহাও ইহার কোন অংশে যে দৃষ্ট হয় না তাহার কারণ, ইহার ঢালু ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

তৃতীয় বিভাগ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতট হইতে নওয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং এদিকে তমোলুকের নিকটবর্ত্তী স্থান। নৈসর্গিক কারণ বশতঃ সমুদ্র সরিয়া গেলে, যেরূপ প্রকৃতির ভূমিভাগ উদিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত স্থানের প্রকৃতি অবিকল তদ্রূপ। ফলতঃ কালে সমুদ্র সরিয়া যাওয়াই, এই সকল ভূভাগের উদয় হইয়াছে এবং সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার সময় যে সকল বালির স্তূপ রাখিয়া গিয়াছে, (যাহাকে চলিত কথায় বালিয়াড়ী বলিয়া থাকে,) তাহাই, তাহাদের প্রাচীনত্বের ইতর বিশেষ হেতু, কোথাও খণ্ড খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে এবং কোথাও বা এখনও অবিকল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়া গিয়াছে। তমোলুকের নিকটস্থ বালিয়াড়ী সকল এখন অবিকল বালুকাস্তূপ মাত্র। কিন্তু চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে, তাহা পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের বহিরাবরণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই বালুকাস্তূপের পরিচয় পাওয়া যায়; তবে কোথাও কোথাও কিয়ৎপরিমাণে বালুকাস্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সকল পর্ব্বতের অভ্যন্তর ভাগের সর্ব্বত্রই সামুদ্রিক জলজ জীবের পঞ্জরে পরিব্যাপ্ত। এ সকল পর্ব্বতগুলি এত খণ্ড খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে, এক চট্টগ্রাম সহরের ভিতর ও পার্শ্বেই গণনায় ১৪।১৫টা হইবে। চট্টগ্রাম প্রদেশের সীতাকুণ্ড তীর্থে যে সকল পর্ব্বতমালা আছে; তাহারা যদিও কিয়ৎপরিমাণে আগ্নেয় স্বভাববিশিষ্ট, তথাপি তাহাদেরও উৎপত্তি ও পরিণতি কথিত প্রকারের সামুদ্রিক বালিয়াড়ী হইতে। ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব সীমায়, দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে যে পর্ব্বতমালা প্রধাবিত হইয়া হিমালয়ে সংলগ্ন হইয়াছে, সে সকল হইতে এই বালিয়াড়ীনির্ম্মিত পর্ব্বতমালার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে সকল পর্ব্বতমালা বহুযুগ পূর্ব্বে সৃষ্ট এবং সমুদ্র যে এক সময়ে তাহারই পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল ও কালে তথা হইতে সরিয়া গিয়া যে এই তৃতীয় বিভাগস্থ ভূমি সকলের উদয় করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এ ভূভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু আধুনিক হইলেও, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বহুপরিমাণে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যদিও অবশ্য সে দৃঢ়তা মোটের উপর ধরিলে, কখনই প্রথম বিভাগের সমকক্ষতায় আসিতে পারে না।

চতুর্থ বিভাগ। এই বিভাগের মৃত্তিকা যাহা, তাহা সর্ব্বত্র পল্বলময়, কোথাও কদাচ কোন বিশেষ কারণে কিছু কিছু দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার পরিমাণ এত অল্প এবং দৃঢ়তাও এত সামান্য যে, তাহা গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না। প্রথম

ও চতুর্থ বিভাগের মধ্যে উভয় উভয়ের তুলনে, মাটি যে কতই পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত, তাহা অতি সুন্দরভাবে গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের পার ও উত্তরে মালদহের পার, এ দুইয়ের মাটি তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমহলের পারে গঙ্গার জলের ধার পর্য্যন্ত, এবং পাথর ও কাঁকরযুক্ত কঠিন রাস্তা, মেটেল মাটি; আর ঠিক তাহার ওপারের সমস্ত জমি, অথবা সমস্ত মালদহ জেলাই দো-আঁস পলী মাটিযুক্ত অথবা কেবল রাজমহল ও মালদহের পার লইয়াই বা বলি কেন, সমস্ত ভাগীরথী ব্যাপিয়া দুই পারের মাটির তুলনা করিলেও, তদুভয়ের মধ্যে বিপুল যে প্রকৃতি ভেদ তাহা সামান্য দৃষ্টিতেও অতিক্রম করিয়া যাইবে না। অবশ্য ভাগীরথীর পশ্চিম পারের নিতান্ত ধারের মাটি লইয়া তুলনা করিও না, তাহা হইলে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইবে না। যে পর্য্যন্ত নদীর ক্রিয়ায় মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্ব্বকালে হইয়া গিয়াছে, তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া তবে মাটির সঙ্গে তুলনা করিলেই, আমার কথার সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবে।

এই চতুর্থ বিভাগের আয়তন, পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা ও তাহার শাখা প্রশাখা, পূর্ব্বে ধলেশ্বরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র। এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগকেই গাঙ্গেয় বদ্বীপ কহে। বদ্বীপের সমস্ত ভূমিভাগই, গঙ্গা এবং তাহার অসংখ্য শাখা নদী সমূহের প্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকায় সমুদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িতে থাকায় নির্ম্মিত হইয়াছে। এজন্য ইহার সমস্ত ভূভাগই পলী মাটি জাত এবং এখন পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে সামান্য টুকরা ভূখণ্ড ব্যতীত, প্রায় সর্ব্বত্রই পলী মাটির চিহ্ন সকল অতি সুস্পষ্ট এবং কোথাও কোথাও একেবারেই অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ পলী মাটি জাত বলিয়া, এ ভূভাগের প্রায় সমস্ত জমির উর্ব্বরতা-শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সঙ্গে অপর কোন বিভাগের মৃত্তিকা তুলনাই হইতে পারে না। এখানে বৎসরের মধ্যে একই জমিতে বহুবার ফসল হইয়া থাকে এবং জমি পতিত থাকিলেও যত শীঘ্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়, এত আর কোথাও হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা নিরস জমি প্রথম বিভাগীয়; তথায় জমি বহুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের জমির ন্যায়, ঘন জঙ্গলপূর্ণ অবস্থা কোনকালেই হইতে দেখা যায় না; অথবা তথায় উদ্ভিদাদির বৃদ্ধি ও বিকাশও তাদৃশ সতেজ বা শীঘ্রতর নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় জমির উর্ব্বরতা গুণ প্রায়ই এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় জমি অপেক্ষা বহুগুণে সতেজ এবং কোন কোন অংশে এমন কি চতুর্থ বিভাগের অনেকটা অনুরূপ।

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি, উভয়ই যদিও সমুদ্র ক্রমে সরিয়া যাওয়ায় জাগিয়াছে বটে; কিন্তু ইহাদের নির্ম্মাণ প্রকরণে যে বিভিন্নতা অনেক, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তৃতীয় প্রকারে মাটি নির্ম্মাণে সমুদ্রের নিত্য জোয়ার ভাটার সময় জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভাটার সময় যে প্রকার

সমুদ্রের ঢালু তীর-ভূমিতে স্তবকে স্তবকে দাগ রাখিয়া জল নীচে গিয়া সরিয়া পড়ে; এখানেও সেইরূপ কোন নৈসর্গিক কারণবশে কালক্রমে যেমন সমুদ্র জল স্তবকে স্তবকে সরিয়া গিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি জমির উদয় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ুর প্রবল আঘাতে বালুকারাশি স্তূপীকৃত হইয়া ও তথাবিধ কারণে ক্রমোত্তর পুষ্টিলাভ করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালিয়াড়ী সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ প্রকারের মৃত্তিকা নির্ম্মাণ করিবার প্রকরণ অন্যবিধ।

যিনি বাঙ্গালার দক্ষিণস্থ চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণভাগ এবং সুন্দরবনের অবস্থা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তিনি এই চতুর্থ প্রকার ভূমি-নির্ম্মাণের কৌশল অতি সহজেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। নদীপ্রবাহে আনীত মৃত্তিকার ক্রিয়াযোগে যখন নদীর সঙ্গম স্থলস্থ সমুদ্রে চর পড়িতে থাকে, তখন তাহা একেবারে খানিকটা পরিমাণ স্থান লইয়া ও তাহার চারিচৌকা সমান ভরাট হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঁচু হইয়া উঠিতে দেখা যায় না। নদীপ্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকা সমুদ্র-গর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আকারে সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ ত্রিকোণক্ষেত্রের তলদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্ত্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোত-বেগ, যে যে স্থান পরিসরে অতি অল্প, তাহা কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, এতন্নিমিত্ত যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ ভূখণ্ডনির্ম্মিত হওয়ার পরিবর্ত্তে কতক অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুখণ্ড দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে এবং সে গুলির প্রায়ই, বিশেষতঃ যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত নিশ্চয়ই, নদীমুখ হইতে সমুদ্রাভিমুখে অল্পবিস্তর যেমন হউক লম্বা আকার প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, ভরাট ভূখণ্ড যখন ক্রমে জমাট বাঁধিয়া যায়, কিন্তু জল ছাড়াইয়া জাগিয়া উঠে নাই; তখন সমুদ্র জলের স্রোত-বেগ যদিও আর তাহাদিগকে কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিম্ন ও নরম অংশ সকল কাটিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে এবং এই সকল গভীর রেখাই, জমী জল ছাড়াইয়া উঠিলে, তখন তাহার মধ্যে অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। উহাদের জলক্রিয়া দ্বারা নবোদিত ভূমি পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতায় প্লাবিত হইয়া, পলিমাটির দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইলে, তখন তাহা একরূপ চিরদিনের মত স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্ণনির্ম্মিত মাটি হইতে নদীনালা বিরল হইয়া, অপূর্ণ নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে এবং তথায় পুনরায় তথাবিধরূপে নির্ম্মাণের কার্য্য করিতে থাকে। পূর্ণনির্ম্মিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল থাকে, তাহা গণনায় ও আয়তনে সামান্য এবং তদ্দ্বারা ভাঙ্গা গড়ার কার্য্যও এত মৃদু হইয়া উঠে যে, তদ্দ্বারা বহুকালেও দেশমধ্যস্থ মৃত্তিকাতে বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। গাঙ্গেয় বদ্বীপ এইরূপেই

গঠিত হইয়াছে এবং এখনও উহার দক্ষিণভাগের গঠন-ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রতাপে চলিতে থাকায়, নিত্য নিত্য মনুষ্যের বাস ও ব্যবহার উপযোগী নূতন নূতন ভূমিখণ্ড সমুদ্রজল ছাড়াইয়া উদয় হইতেছে। উপরে যে প্রকারের ভূগঠনপ্রক্রিয়া বলিলাম, এখনও তাহার অভিনয়ে, সমুদ্রগর্ভের অনেক দূর লইয়া নদী সকলের আনীত মৃত্তিকায় নির্ম্মিত এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এখনও জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে, তখন স্রোতবেগে তাহাদের উপর নদী ও খালের যে খাতরেখা পড়িয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ভাবে জাগা জমির পৃষ্ঠে নদী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে। উহারই মধ্যে আবার যে সকল ভূখণ্ড সমুদ্র জল ছাড়াইয়া মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হইয়াছে, তাহার কতকাংশ বা মূল দেশ ভূমির সহসংলগ্ন; কতক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে পরিণত এবং এ সকলের সর্ব্বত্রই বৃহৎ বৃহৎ ও বিস্তারশীল নদী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল উভয়েরই দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। এ সকল নদী খাল যেমন একদিকে বিপুল বেগে ভাঙ্গা গড়ার কার্য্য করিতেছে, তেমনি অন্য দিকে প্রতি জোয়ারে অতিশয় কর্দ্দমময় ঘোলা জলে সমস্ত স্থান প্লাবিত করিয়া পলি মাটির দ্বারা তাহার কলেবর বর্দ্ধন করিতেছে। কালে যে এ সকল নদীনালাও সরিয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল দেশভাগে সংলগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গৌড়ের পূর্ব্বদক্ষিণস্থ সমুদ্র যখন উক্ত প্রকারে ভরাট হওয়াতে উন্নত ভূখণ্ডের উদয়ে ক্রমেই দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছিল এবং যখন সেই উন্নত ভূখণ্ডে বর্ত্তমান সুন্দরবনের ন্যায় অসংখ্য নদী ও খাল পড়িয়াছিল, সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে এখনকার ন্যায় তখনও সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রবল নদীধারা ছিল গঙ্গার মূলপ্রবাহ।

কিন্তু এই মূলপ্রবাহ, যাহা বর্ত্তমান কালে পদ্মার আকারে এমন দুর্জ্জয় ও প্রসারণশীল দেখা যাইতেছে, তাহা তখন কোন্ বিশেষ খাদ দিয়া প্রবাহিত হইত? প্রথমতঃ নদী সকলের ধর্ম্ম প্রায়ই এরূপ যে, দুই পারের মধ্যে যে দিকে অপেক্ষাকৃত মাটির কঠিনতা হেতু পার্শ্বপ্রসারণ পক্ষে বাধা বেশী, সেইখানেই তাহার ধারা প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রাভিমুখে গমনকালীন, যে পথ অতি সোজা অথচ অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি, সেই পথ প্রোক্ত কঠিন মাটির বাধা বা অধিকার দেশ হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও, নদীস্রোত প্রথমে সেখান দিয়াই গমন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অত্যল্প সময়ের মধ্যেই, নিজের নৈসর্গিক ধর্ম্ম অনুসারে, পার্শ্বস্থ নরম মাটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, কঠিন মাটির বাধা যেখানে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখনকার কালে, বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বকূল হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরে দ্বিতীয় বিভাগীয় ও পূর্ব্বে তৃতীয় বিভাগীয় এই ভূখণ্ডদ্বয়ের সমোচ্চ রেখা পর্য্যন্ত, চরভূমি, জলাভূমি, সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত অনুচ্চচর

ইত্যাদি যদৃচ্ছা বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই সকল কারণ ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, গঙ্গায় যে দুর্জ্জয় মূলপ্রবাহ এখন পদ্মার খাদ দিয়া চলিতেছে, তখন তাহা বর্ত্তমান ভাগীরথী খাদ দিয়া, পদ্মারই ন্যায় সমপ্রবল অথবা হয়ত প্রবলতর বেগেও প্রবাহিত হইত। এখনকার ন্যায় তখনও গঙ্গার অপর যে অসংখ্য শাখা প্রশাখা ছিল, তাহারা ভাগীরথীর পূর্ব্বস্থ তাৎকালিক সেই অসম্পূর্ণ বদ্বীপের বহুলাঙ্গ ব্যাপিয়া আপনাপন জলরাশি ঢালিত। এখন যাহাকে পদ্মা বলা যায়, তখন তাহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি না সন্দেহ; অথবা থাকিলেও হয় ত, সেই অসংখ্য শাখা প্রশাখার মধ্যে, কোন একটী শাখা পদ্মানামে গণিত হইত এবং এখনকার তুলনায়, তখন যে তাহার প্রবলতা অতি সামান্য ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফলতঃ সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, যখন বদ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রথম উত্থিত হয়, তখন মূলগঙ্গার প্রবাহ ভাগীরথী খাদ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়াই লোকে উহাকে গঙ্গা ও উহারই সাগরসঙ্গমকে গঙ্গাসাগরসঙ্গম বলিত এবং তৎস্বরূপেই উহা এতকাল গণিত ও মানীত হইয়া আসিতেছে। নতুবা, এরূপ বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন, গঙ্গার এত বড় বড় শাখা প্রশাখা এবং তাহার মূলস্রোতস্বরূপ পদ্মা, এ সকল থাকিতে তাহাদিগকে ফেলিয়া, সামান্য একটা খাদ ভাগীরথীকে যে লোকে আসল ও মূল গঙ্গা বলিয়া মানিবে, এটা প্রকৃতপক্ষে বড়ই আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় কথা হইয়া পড়ে।

বোধ হয়, যখন বদ্বীপের আর সমস্ত অপূর্ণ ও তাহার স্থানে স্থানে অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া চরভূমিসমন্বিত সমুদ্র খাড়ী সকল প্রবাহিত হইতেছিল এবং হয়ত যখন গৌড়ের অদূরে পর্য্যন্ত সে খাড়ীর শিরোদেশ বর্ত্তমান ছিল, তখনও ভাগীরথীর পূর্ব্বকূল সহ ভূমি দক্ষিণে অনেকদূর বিস্তৃত ও নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ এরূপ বিবেচনা ভিন্ন এ দুই কথায় একধা সঙ্গতি হইতে পারে না;—অর্থাৎ প্রথমতঃ রাজতরঙ্গিণী অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, বারশত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়ের অতি নিকটেই সমুদ্রের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত পেরিপ্লুসে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তেজপত্র ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য গঙ্গা বাহিয়া নৌকা ও জাহাজ যোগে গাঙ্গেয় বন্দর অর্থাৎ তমোলুক বা তাম্রলিপ্তিতে আনীত হইত। অবশ্যই গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত না থাকিলে আর, বাণিজ্যদ্রব্য উত্তরবঙ্গ হইতে গঙ্গাদ্বারা বাহিত হইয়া তমোলুক মুখে আসিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা, মূল গঙ্গা ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত থাকিলেও, তদ্দ্বারা এখন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই যে, গঙ্গা তখন তমোলুক পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল। অথবা এখনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট সমুদ্র খাড়ীকেও মেঘনা বলিয়া থাকে; তখনও সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী সমুদ্রখাড়ীকেও গঙ্গা বলিয়া ডাকিত এবং সেই অর্থেই পেরিপ্লুসে,

গাঙ্গেয় বন্দরে বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে গঙ্গারই নির্ব্বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত অনুমানই যে ঠিক, তাহার আনুসঙ্গিক এই দুইটী প্রমাণও পেরিপ্লুস হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়;—১ম গঙ্গার উপর বাণিজ্যদ্রব্য বহনার্থে যে সকল নৌকা ব্যবহৃত হইত, তাহারা সমুদ্রগামী পোত; নদীতে যে সকল নৌকা যাতায়াত করে, তাহারা সম্ভবতঃ তথায় যাইতে সাহস পাইত না বলিয়াই এই সামুদ্রিক পোতের ব্যবহার ছিল। ২য়—ঘন সন্নিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি সহ "খ্রুসে" নামক একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ গঙ্গার মুখে ছিল।[১] অবশ্যই গঙ্গা দক্ষিণভাগে নদীর পরিবর্ত্তে বহুবিস্তৃত সমুদ্র খাড়ী না হইলে আর পেরিপ্লুসের এ দুই কথায় সঙ্গতি হয় না।

ভাগীরথী খাদে গঙ্গা বড় কম দিন প্রবাহিত ছিল না। যেহেতু গঙ্গার উক্ত খাদে প্রবাহিত হওয়ার প্রথম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে পেরিপ্লুসে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে এবং শেষ পরিচয় চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াঙের বিবরণে,[২] তাহা খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে। এই ত প্রায় ছয়শত বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে, মূলগঙ্গার ভাগীরথীখাদে গতি এবং ইহার পরেও যে কতদিন পর্য্যন্ত গঙ্গা তাহার মূল প্রবাহ ঐ খাদে ঢালিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয়, হিউএন্‌সিয়াঙের কিছুকাল পরেই, যখন ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং যৎকালে বদ্বীপের অপরাংশেও বহুল পরিমাণে ভূমিখণ্ড সকল নির্ম্মিত ও জলরেখা ছাড়াইয়া মস্তকোত্তলন করিয়াছে, সেই সময়েই বিবিধ নৈসর্গিক কারণের প্রবলতায়, গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী খাদ পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মা নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খাদ অবলম্বন পূর্ব্বক, ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলের আরও উত্তর পূর্ব্বভাগে সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পদ্মা উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যেও পদ্মা কতটা সরিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন পালঙের নিম্ন দিয়া যাইয়া কীর্ত্তিনাশায় গিয়া মিশিয়াছে, তাহা ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার মূল খাদ ছিল; কিন্তু এখন পদ্মা তাহার ১৬।১৭ ক্রোশ উত্তরে। অন্যূন ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে, যে ক্ষুদ্র নদী কুমার নামে ফরিদপুর জেলার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তাহার বহুলাংশেই পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তাহা হইতে পদ্মা এখন বড়ই সরিয়া গিয়াছে।

পেরিপ্লুসে তমোলুক পর্য্যন্ত গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার কথা লিখিত আছে; এজন্য

---

১ Mc Crindle's Periplus of the Erythrean, p 141-142.

২। হিউএন্‌সিয়াং যদিও ঠিক স্পষ্ট কথায় গঙ্গার পথ নির্দ্দেশ করেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ পাঠ করিলে, তদ্দ্বারা গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত বলিয়াই বোধ হয়। হিউএন্‌সিয়াঙের বিবরণে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না।

হইতে পারে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানও তখন সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্ষণিক উদয় হইয়াছিল, কালে পুনর্ব্বার তাহা বসিয়া যাওয়ায় তথায় সমুদ্রপ্রবাহ প্রবাহিত হয় এবং ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বেও সে সমুদ্রপ্রবাহ সরিয়া যায় নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ যে এক সময়ে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া কিছুকাল বাদাবন থাকিয়া, তাহার পর আবার সমুদ্রগর্ভে বসিয়া গিয়াছিল, তাহার অনেকই প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। কলিকাতার ভূতত্ত্বপরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ৩০।৩৫ ফুট নিম্নে এখনও উন্নতশির সুন্দরী ও অন্যান্য বাদাবনসুলভ বৃক্ষাদির স্কন্ধ অর্থাৎ গুড়িসকল দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহুদিনব্যাপী বনবৃক্ষাদির স্তর দীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকিলে যেরূপ পাথুরে কয়লা হইয়া যায়, এই সকল স্থানের নিম্নে তদ্রূপ অপরিণত পাথুরে কয়লার সামান্য স্তরও লক্ষিত হয়। কলিকাতা শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসনের মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার খননকালে ভূতত্ত্বশাস্ত্রদর্শী ব্লান্‌ফোর্ড সাহেব ঐ স্থানের যে ভূতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে, ঐ স্থানের ৩০ ফুট নিম্নে, অপরিণত অবস্থায় পাথুরে কয়লার স্তর আছে এবং সেই স্তরের মধ্যেও দণ্ডায়মানভাবে কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরস্থিত কয়লা এখনও সম্পূর্ণতঃ পাথুরে কয়লায় পরিণত না হওয়ায়, উহাতে এখনও অগ্নি সংলগ্ন হয় না। এই স্তর সমস্ত কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান লইয়া বিস্তৃত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার স্তরের যেরূপ ধর্ম্ম দেখা গিয়াছে, এখানেও সেইরূপ। ঐ অপরিণত স্তর সর্ব্বত্র সমগভীর মাটির নিম্নে নহে। শিয়ালদহে যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফুট নিম্নে, কেল্লার কাছে তাহাই ৫১ ফুট নীচে নামিয়া গিয়াছে; আবার কোম্পানির বাগানের কাছে তাহা অতি অল্প মাটির নিম্নেই দৃষ্ট হয়। মাটি এরূপ বসিয়া যাওয়ার পক্ষে, ভূকম্পনাদি নানাবিধ নৈসর্গিক কারণই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভূকম্পন ব্যতীত, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়াতেও ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানই ধীরে ধীরে কোথাও বসিয়া যাইতেছে এবং কোথাও বা উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্যার পুস্তকে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। শুনিতে পাই নাকি, ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ঐরূপ ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতেছে।

উপরোক্ত সামান্য এবং মোটামুটী কয়েকটী ভূতত্ত্ববিদ্যার দ্বারা এক্ষণে আমরা এই পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিতেছি যে, এই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান আকার এবং লোকের বাসভূমি এখন যেমন দেখিতে পাই, বারশত বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা নিরূপিত হইতেছে যে, তাৎকালিক দৃশ্য সংক্ষেপতঃ এরূপ ছিল। গঙ্গার মূল স্রোত, যাহা এখন পদ্মা দিয়া যাইতেছে, তাহা তখন ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত এবং সেই প্রবাহ কলিকাতার অনেক উত্তরে সমুদ্রে সংমিলিত ছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন, অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপাকার বহুসংখ্যক চরের

আকারে বিন্যস্ত ছিল। শুকসাগর, শুকচর, অর্থাৎ শুষ্কসাগর, শুষ্কচর; খড়দহ, এড়িয়াদহ, প্রভৃতি দহ; ইত্যাদি নাম সে পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শুকসাগরাদি স্থানের উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ ভূমি তখন বা তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই উদয় হইয়াছিল; যেহেতু বদ্বীপের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই স্থানের ভূমিভাগ অনেকটা শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত কঠিন আকারে দৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও, তৎকালে অতিশয় নদী বহুলতা হেতু, অনেক স্থান যে দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল, সে পক্ষে অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপান্তক নামই তাহার সাক্ষ্যস্থল। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সুন্দরবনের যে অবস্থা, বদ্বীপের আর সমস্ত স্থানেও সেই অবস্থা ছিল অর্থাৎ কোথাও জলাজমী, কোথাও অন্তঃপ্রবিষ্ট সমুদ্রখাড়ী, কোথাও জলমগ্ন চর, কোথাও নিবিড় বাদাবন এবং যেখানে যে জমী সমুদ্রগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই তাহা "পঞ্চশত" বা অসংখ্য নদনদীতে বিভক্ত ও বেষ্টিত হইয়া আছে। এ সকল অপেক্ষাকৃত বহু আধুনিক কালে স্থাপিত 'কাটী', 'দিয়া' ও 'চর' ইত্যাদি নামবিশিষ্ট গ্রাম ও জনপদ সকল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ফলতঃ তৎকালে এই বদ্বীপের যদি কোন কোন স্থানে লোকাবাস হইয়া থাকে, তবে তাহা ভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থ কতক স্থান লইয়া; নতুবা আর সমস্ত যে বাসের অযোগ্য ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। গাঙ্গেয় বদ্বীপ যে তখনও যথোচিত বসবাসযোগ্য হয় নাই, তাহার আর একটা বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়েশ্বর রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ও বেদবিৎ যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, কালে তাহাদের ও তাহাদের ভ্রাতৃবর্গের পুত্র পৌত্রাদিতে ১৫৯ বা তথাবিধ উচ্চ সংখ্যক পরিবার হয়।[১] পরবর্ত্তী গৌড়েশ্বরগণ, তাঁহাদের অধিকার মধ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণ স্থাপনার্থে এই ১৫৯ পরিবারকে রাঢ় ও বারেন্দ্রভেদে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বসবাস করাইবার জন্য, ইঁহাদিগকে ১৫৯ গ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, এই ১৫৯ গ্রামের একটীও গাঙ্গেয় বদ্বীপের মধ্যে নাই; সমস্তই উত্তর বঙ্গে, ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ পশ্চিম বঙ্গে, বিক্রমপুরের নিকট তাৎকালিক পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরভাগে। অথচ এখনকার দৃশ্য ধরিয়া

১। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা গোড়া হইতেই ৫৯ গ্রামে স্থাপিত; সুতরাং গোড়া হইতেই তাহাদের ৫৯ গাঁঞি নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের যে ১০০ গাঁঞি শুনিতে পাই নাকি তাহার কতকগুলি, হিন্দু গৌড়েশ্বরগণ গত হওয়ার পরেও নিরূপিত হইয়াছিল। যাহাহউক, এস্থানে তাহার সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন নাই। গৌড়েশ্বরগণ যখন দেশমধ্যে ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন, তখন ঠিক ১৫৯ পরিবার না হইলেও, অনুরূপ কোন এক সংখ্যক ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং প্রবন্ধভাগে উদ্ধৃত ১৫৯ সংখ্যার দ্বারা পাঠকগণ সেই পর্য্যন্ত বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে। কোন কোন মতে রাঢ়ীব্রাহ্মণের গাঁঞি সংখ্যা ৫৬, কিন্তু সেটা ঠিক নহে। ৫৯ সংখ্যাই ঠিক বলিয়া জানা যায়।

বলিতে গেলে, গাঙ্গেয় বদ্বীপের তুল্য রমণীয়, শিষ্ট নিবাসযোগ্য স্থান ঐ সকল স্থানের একটিতেও নাই ; বিশেষ তায় আবার গঙ্গার তীর। বর্দ্ধমান জেলার চৌৎখণ্ড প্রভৃতি স্থানে পর্য্যন্ত এই ১৫৯ পরিবারের কাহাকে কাহাকে বসান হইয়াছে, অথচ নবদ্বীপ, কৃষ্ণ-নগর ও তৎসন্নিহিত অপরাপর স্থান উপেক্ষিত হইয়াছে ; বদ্বীপের অন্যান্য স্থানেরত কথাই নাই। এ বড়ই আশ্চর্য্য কথা বলিতে হইবে! আমি উপরে যাহা বলিয়া আসি-য়াছি, এ আশ্চর্য্য ঘটনার সেইরূপ কারণ ভিন্ন আর কিছুই নির্দ্দেশিত হইতে পারে না। বদ্বীপের কোনস্থান তখন শিষ্ট নিবাসোপযোগী থাকিলে, তাহাকে সদ্‌ব্রাহ্মণশূন্য রাখা কথ-নই গৌড়েশ্বরগণের অভিপ্রেত হইত না।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের অবস্থা যদি তখন এইরূপই ছিল, তবে তখনকার দেশ বিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং কাজিনগড়ের পরেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। কাজিনগড় ঠিক কোন স্থানে তাহা হিউএন্‌সিয়াঙের ইংরেজী অনুবাদক ঠিকরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। বর্ত্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসন যথায়, তাহারেই নিকট-বর্ত্তী দেশকে কাজিনগড় বলিয়া অনুমান করা যায়। তথায় পর্ব্বতোপরি তেলিয়াগড় নামক প্রাচীন কেল্লা, গৃহাদির অনেক সুরম্য ও সুন্দর ভগ্নাবশেষ এবং অনেক ভগ্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, এই কাজিনগড় ও কুশী নদীর পূর্ব্বতট হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পূর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া পূর্ব্বমুখে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ, ইহা লইয়া প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য।

এখানে হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য। এই দূরত্ব নিরূপণে, বোধ হয়, সমতট রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নিরূপণই হিউএন্‌সিয়াঙের অভিপ্রেত। বর্ত্তমান ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলা বোধ হয় সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই রাজ্য পদ্মার বর্ত্তমান খাদের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিবার কথা ; কালে এই দক্ষিণাংশ, পদ্মা আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া যাওয়ায়, গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সেকালের সমতট রাজ্যের আয়তন এ কালে যে পদ্মার গতির দ্বারা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল সেকালের সমতট কেন ?—এ কালের বিক্রমপুরেরও পদ্মার গতির দ্বারা বহুল রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর ঐকই সংলগ্ন ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্যস্থল দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায়, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সমতটের দক্ষিণস্থ ভূভাগ যে সমুদ্রতট বাহিয়া অবস্থিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সমতট এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বস্থিত ভূভাগ সকল, অর্থাৎ আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান তৎকালে কিরাতাদি বিবিধ অনার্য্য নিবাস ছিল।

ওদিকে আবার কাজিনগড়ের দক্ষিণ হইতে এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তট বাহিয়া প্রাচীন বঙ্গরাজ্য। দক্ষিণে মেদিনীপুরের সীমা পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে বঙ্গ নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই বঙ্গ। ইহা কোন কোন সময়ে রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইত। উহার দক্ষিণ ভাগস্থিত বর্দ্ধমানাদি প্রদেশ রাঢ় এবং তাহার উত্তরস্থ ভূভাগ কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নিরূপিত হয়। গৌড়নগর গোড়ায় প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেরই অন্তর্গত ছিল; পরে গৌড়নগর প্রবল হইয়া উঠায়, সমস্ত বঙ্গরাজ্য এবং কালে বর্ত্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশই গৌড় দেশ ও গৌড়রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। গৌড় নাম প্রবল হওয়ায়, কালে বাঙ্গালার সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ও তাহাদের নাম সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে, সম্ভবতঃ সমস্ত মেদিনীপুর জেলা এবং বালেশ্বর জেলারও কিয়দংশ লইয়া তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি রাজ্য। বর্ত্তমান তমোলুক নগর উহার রাজধানী এবং বাণিজ্য বন্দর ছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে ১১৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে[৫] যে, রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চশত নদীসমন্বিত গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানাদি করিয়া, তথা হইতে ভ্রাতৃগণ সহ সমুদ্রের ধারে ধারে গমন করিয়া, কলিঙ্গ নামক দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ কলিঙ্গের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। এখানে বলা বাহুল্য যে মহাভারতে এই নির্দ্দেশ দ্বারা এমন কিছু বুঝায় না যে, তাম্রলিপ্তি রাজ্য ছিল না। অথবা তখন না থাকিলেও, বারশত বৎসর পূর্ব্বে যে ছিল তাহা নিশ্চয়।

উপরে দেশাদির অবস্থান সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, তাহাই এখানে যথেষ্ট হউক। এই সকল দেশাদির অবস্থান ইতিপূর্ব্বে "বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব" প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। "স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোবীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত॥
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।"
বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়।

লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র।

যে শিশু ভাবি-জীবনে জয়যুক্ত, দুগ্ধপোষ্য অবস্থাতেই তাহার কতক চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়; যে গাছ বাঁচিবে, অঙ্কুরেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভাষার সুদূর অতীত আলোচনা করিলে আমরা এ কথার কতক প্রমাণ পাই। বঙ্গভাষার উৎপত্তির প্রাচীনতা যত দূরই হউক, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই এই অভিনব ভাষার শৈশব জীবনে এক বৈদ্যুতিক তেজ—সজীবতার বিশিষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হয়। তখনকার সুপ্রচারিত কাব্য চৈতন্যভাগবত,* ইহার—

"নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে।
যার পদধূলী, হই কুতূহলী,
সবেই ধরিল শিরে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
শ্রীভুজ তুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
বলে হরি হরি বাণী॥"

ইত্যাদি স্থল আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তখনই বঙ্গভাষা কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সে সময়ের সুপ্রচারিত দার্শনিক গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত। নবীন বঙ্গভাষায় গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্ত হইতে পারে, কঠিন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিবৃত করা যাইতে পারে, চরিতামৃত তখনই ইহা প্রদর্শন করিয়াছে। তখনই আমরা বঙ্গভাষায় গদ্যরচনার পরিস্ফুট চেষ্টা দেখিতে পাই। †

কিছুদিন হইল, আমরা গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত আরও একখানি গদ্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার নাম "আশ্রয় নির্ণয়।" [১] ইহার আরম্ভ এইরূপ—

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় "ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ" প্রবন্ধে অনবধানতাবশতঃ চৈতন্য-ভাগবত রচনার কাল ১৪৯২ শক লিখিত হইয়াছে; বস্তুতঃ, ইহার অনেক পূর্ব্বে, ১৪৫৯ শকে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। পূর্ব্বে ইহার চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। ১৪৯২ শকে চৈতন্যভাগবত নামকরণ হয়। [জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

† আমরা অবগত আছি যে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৩০০ বর্ষের লিখিত একখানি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ পাইয়াছেন। ১১৫০ সালের লিখিত আর একখানি গদ্য গ্রন্থ আমরা তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছি।

১। ঐ নামে পদ্যেও অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ দেখিয়াছি।

"অথ আশ্রয় নির্ণয়। আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। নাম আশ্রয়। মন্ত্রাশ্রয়। ভাবাশ্রয়। প্রেমাশ্রয়। রসাশ্রয়। এই পঞ্চ প্রকার। তথাহি রসভক্তিচন্দ্রিকায়াং।" এই স্থানে পঞ্চ আশ্রয়ের ব্যাখ্যা পদ্যে আছে। তৎপর—"ভক্তি বলি কারে? ভক্তি শ্রীগুরুর চরণ। ভক্তির অস্ত কি? নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় সদা সেবা। অন্য ভাব। ভাব বলি কারে? সিদ্ধ দেহকে ভাব বলি। ভাবের অস্ত কি? সদা সেবা। সেবা কয় মত? সেবা দুই মত। সাধকরূপে বা সিদ্ধ রূপে। তথাহি"—এই স্থানে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যত্র—"অথ সিদ্ধদেহ। সিদ্ধদেহের আখ্যান তিন প্রকার। প্রবর্ত্তের দাস আখ্যান। সাধকের মঞ্জরী আখ্যান। সিদ্ধের সখী আখ্যান।" অতঃপর দশা বর্ণন ও ইহা হইতেও কিছু নমুনা দিতেছি—"অহেতু নবম দশা বড় বিষম। অন্তরে ব্যাকুল বাহিরে অচেতন। দশম দশা সহিতে পারি না। তেহি সে মরিতে চাহি তমালের তলে॥ এই দশম দশা শ্রীমতি রাধিকার। পূর্ব্বরাগ হৈতে নন্দের নন্দনে কিঞ্চিৎ রতি॥ রতি তিন প্রকার। সামর্থা। সামঞ্জসা। সাধারণী। সামর্থারতির পাত্র শ্রীমতী রাধিকা। সামঞ্জসা রতির পাত্র রুক্মিণী। সাধারণী রতির পাত্র কুবজা।" ইত্যাদি।

চৈতন্যচরিতামৃতে "কামগায়ত্রীর" ব্যাখ্যা যেরূপ লিখিত, ইহাতেও সেইরূপই লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থে একটী মাত্র ভণিতা আছে, তাহা পদ্যে লিখিত—

"শ্রীরাধা গোবিন্দ পাদাম্বুজে করি আশ।
আশ্রয়-নির্ণয় কথা কহে কৃষ্ণদাস॥"

এইরূপ গদ্যে ও পদ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তাগণ সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। ঈদৃশ প্রতিভাশালী মহাজনগণের সহায়তা না পাইলে বঙ্গভাষা আজ বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইতে পারিত কি না, কে জানে? এইরূপ উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতগণের রচনা প্রায়ই জটিলতাবর্জ্জিত—প্রাঞ্জল। অদ্য আমরা বৈষ্ণব-জগতে পূজিত এইরূপই এক গ্রন্থকারের পরিচয় দিব; ইনি গৌরব মহিমায় শ্রীরূপাদির সমকক্ষ ছিলেন; ইঁহার রচনাও যথা সম্ভব সহজ ও সরস। আমরা লোকনাথ গোস্বামী প্রণীত সীতাচরিত্রের কথা বলিতেছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে নারীচরিত একখানির অধিক দেখি নাই, সেই একখানিই সীতাচরিত্র।[২]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান অনুসঙ্গী নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু। যশোহরের তালখড়ি গ্রামবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী এই অদ্বৈতের আবাল্য সঙ্গী ছিলেন; পদ্মনাভ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন।[৩] বৃদ্ধবয়সে পদ্মনাভের একটী পুত্র জন্মে

২। সীতা-চরিত্র মুদ্রিত হয় নাই। আমরা যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহা অতি প্রাচীন; কিন্তু লেখক তারিখ না দেওয়ায় প্রতিলিপির প্রাচীনত্ব বলিতে পারিলাম না।

৩। "পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বিদিত সংসারে। প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে॥
পরম বৈষ্ণব অলৌকিক সর্ব্ব কাজ। সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণ রাঢ়ী বিপ্ররাজ॥"—নরোত্তমবিলাস।

ইহারই নাম লোকনাথ।[৪] লোকনাথের মাতার নাম সীতা।[৫] লোকনাথ বাল্যকাল হইতেই ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত। পিতার অভিপ্রায়ানুসারে লোকনাথ অদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন।[৬] অদ্বৈতের শিক্ষা ও সঙ্গ গুণে লোকনাথের হৃদয় কর্ষিত ও ভক্তিলতা শীঘ্রই প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সময়ে গৌরচন্দ্র প্রচারিত প্রেম-ভক্তিতে বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, ভক্তির সুধাধারায় বিরসতা—কঠোরতা ভাসিয়া গিয়াছিল। লোকনাথ বালক হইলেও গৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার চিত্ত এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, একদা যশোহর হইতে একাকী নবদ্বীপে উপস্থিত হন; কিন্তু তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর "বিভোর" অবস্থা। লোকনাথ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি লোকনাথকে অতি কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সঙ্গে থাকিতে দিলেন না, বিলুপ্ত তীর্থপ্রকাশার্থ তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।[৭] বৃন্দাবনে তীর্থপ্রকাশের জন্য বাঙ্গালীর এই সর্ব্ব প্রথম গমন (১৪৩২ শক)। লোকনাথের বৃন্দাবন যাইবার প্রায় দুই মাস পরেই[৮] শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। লোকনাথ বৃন্দা-বনে গেলেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গসুখে বঞ্চিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এই জন্য তিনি বিরলে বসিয়া কখন কখন ক্রন্দন করিতেন।[৯]

লোকনাথ অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত, অদ্বৈত শাখা গণনা-প্রসঙ্গে তাঁহার নাম আছে।[১০] অদ্বৈতের অন্যতম শিষ্য ঈশানদাসও স্বীয় গ্রন্থে একথা লিখিয়াছেন।[১১] কিন্তু মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় প্রণালীতে দৃষ্ট হয় যে, লোকনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য।[১২] বৈষ্ণব-সমাজ-সম্মত এ সকল "গুরু-প্রণালী"কে অপ্রামান্য

৪। "পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি।
লোকনাথ হেন বৃদ্ধ বিপ্রের সন্ততি॥"—ভক্তিরত্নাকর।

৫। "মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।"—ভক্তিরত্নাকর।

৬। "লোকনাথ কহে আইনু পড়িবার তরে।"
"লোকনাথ কহে মোর পিতার সম্মত। শ্রীমদ্ভাগবত পড়ো কৃষ্ণলীলামৃত॥"—অদ্বৈতপ্রকাশ।

৭। "যত দুঃখ যত সুখ জানে মোর মন। কেবল আছয়ে সাক্ষী কুঞ্জ বৃন্দাবন॥
প্রভাতে উঠিয়া তুমি যাহ বৃন্দাবন॥"—প্রেমবিলাস।

৮। "মধ্যে পৌষ মাস আছে মাঘ শুক্ল পক্ষে। তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব যেন দেখে॥"—প্রেমবিলাস।

৯। "আর না দেখিব গোরা তোমার চরণ। রহিলাম আজ্ঞা মাত্র করিয়া ধারণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে করিলা লীলা। বঞ্চিত করিয়া মোরে এথা পাঠাইলা॥"—প্রেমবিলাস।

১০। "লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারী পণ্ডিত।"—চৈতন্যচরিতামৃত ১২ পরি।

১১। "এত শুনি লোকনাথ আনন্দিত হৈলা।
গঙ্গা গর্ভে মোর প্রভু স্থানে মন্ত্র নৈলা॥"—অদ্বৈতপ্রকাশ।

১২। প্রেমবিলাসেও শ্রীমহাপ্রভুর নিকট লোকনাথের তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ ও তাঁহাকে লোকনাথের গুরু বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা—"গুরু মুখে শুনিলে সব হয়েত নির্দ্ধার॥"—প্রেমবিলাস।

বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ এ দুই কথার মূলেই সত্য আছে; **অদ্বৈতপ্রকাশ** গ্রন্থে আমরা ইহার সমাধান দেখিতে পাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, অদ্বৈতচন্দ্র আপন শিষ্য লোকনাথের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি আন্তরিক অত্যাশক্তি দর্শনে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীমহাপ্রভুর হস্তে সমর্পণ করেন; এই হইতেই লোকনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য বলিয়া গৃহীত হন।[১৩]

অদ্বৈত প্রভুর দুই স্ত্রী,—শ্রী ও সীতা;[১৪] ইহারা দুই সহোদরা ভগিনী ছিলেন। বৈষ্ণব সমাজের উপর সীতা দেবীর অল্প আধিপত্য ছিল না। লোকনাথ গুরুপত্নী সীতাদেবীর জীবন সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা সীতাচরিত্র গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সীতাচরিত্রে গ্রন্থকার আপন পরিচয় সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। লোকনাথ যেরূপ বিনয়ী ছিলেন, তাহাতে তাঁহা হইতে তদীয় পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়ার প্রত্যাশা করা বৃথা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্ব্বে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীগণের অনুমতি গ্রহণ করেন। এই অনুমতি-দানকালে লোকনাথ, কৃষ্ণদাসকে স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার বিষয় কোন কথা লিখিতে নিষেধ করিয়া দেন। ভয়, পাছে সুখ্যাতি হইয়া পড়ে।[১৫] চরিতামৃতে এইজন্য লোকনাথ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত হয় নাই। এই লোকনাথ আপন গ্রন্থে আপনার সম্বন্ধে যে কিছু বলিবেন, এ আশা করা যাইতে পারে না।

সীতাচরিত্র অতি বৃহৎ গ্রন্থ নহে, মোটে দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের শেষ এইরূপ—

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥
ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাধিত।
শ্রীসীতার চরিত্র লিখিল লোকনাথ॥"

এই গ্রন্থে অধ্যায়গুলি নামনির্দ্দেশ পৃথক্ করা হয় নাই। এক একটি ভণিতার

১৩। "এত কহি প্রভু (অদ্বৈত) ধরি লোকনাথের কর।
উপনীত হৈলা মহাপ্রভুর গোচর॥
প্রভু কহে অহে নিমাঞি কর অবধান।
লোকনাথে শিকাইবা তত্ত্বানুসন্ধান॥
এত কহি প্রিয় শিষ্যে গৌরে সমর্পিলা।
শ্রীগৌরাঙ্গ লোকনাথে আত্মসাথ কৈলা॥"—অদ্বৈতপ্রকাশ ১২শ অধ্যায়।

১৪। "আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগৎ পুজিতা।
সর্ব্বত্র বিদিতা নাম শ্রী আর সীতা॥"—ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

১৫। ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

অন্তর্বর্ত্তি বিষয় গুলিকে এক একটি অধ্যায় বলিয়া গণ্য করা যায়। সমস্ত গ্রন্থে এরূপ দশটি ভণিতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু শেষ ভণিতাস্থলে "ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ" লিখা আছে *।

অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে সর্ব্বত্র একভাবে যেমন স্বীয় গুরু অথবা ভজনীয় দেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক ভণিতাগুলি লিখিত হইয়াছে, সীতাচরিত্রে সেরূপ একনিষ্ঠ ভণিতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কখন অদ্বৈতের নাম, কখন চৈতন্যপ্রভুর, কখন বা সীতাদ্বৈতের নাম স্মরণ করা হইয়াছে। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামস্মরণের কারণ ইহাই বোধ হয় যে, লোকনাথ শ্রীমহাপ্রভু ও অদ্বৈত, এই উভয় গুরুর নাম গ্রহণই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন। চৈতন্য ও নিতাই অভিন্ন বলিয়া উক্ত, † তাই নিত্যানন্দের নাম গ্রহণও উচিত বিবেচিত হইয়া থাকিবে ‡। এ স্থলে কএকটি ভণিতা উদ্ধৃত হইল—

১ম ভণিতা— "কহে লোকনাথ দাস,
অদ্বৈত চরণে আশ,
সীতার চরিত্র রসখনি।"

২য় ভণিতা— "অদ্বৈত চৈতন্য পাদপদ্মে করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥"

৩য় ভণিতা— "কহে লোকনাথ দাস, শ্রীচৈতন্যপদে আশ,
কৃপা করি দেহ ব্রজবাস॥"

৩য় ভনিতা হইতে আমরা তাঁহার ব্রজবাসে আশক্তির পরিচয় পাইতেছি। "দেহ ব্রজবাস" হইতে আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। নিয়ত ব্রজবাসী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকেও এইরূপই প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। ব্রজবাস হইতে যেন বিচ্যুত না হন, ইহাতে এই ভাবই বোধ হইয়া থাকে।

বলিয়াছি, লোকনাথের রচনাপ্রণালী সরল ও অপেক্ষাকৃত দোষবিবর্জ্জিত। সীতাচরিত্র হইতে যে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দুই পাঁচটি অপ্রচলিত শব্দ যে ইহাতে মিলিবে না, ইহার কোন কারণ নাই। হইতে পারে তখনকার কালে ঐ সকলই পরিশুদ্ধ শব্দ ছিল। দুই চারিটা উদাহরণ দেওয়া অনুচিত হইবে না। যথা—

"না ভাণ্ড" = প্রতারণা করিও না। "মাঙ্গিল" = চাহিল।
"নাম্বিল" = নামিল। "খেদাড়িয়া" = তাড়াইয়া।

---

* হইতে পারে আমরা যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ। এই সন্দেহে, বিশেষ অনুসন্ধানে, সীতাচরিত্রে এই দশটি ভণিতার অধিক নাই, ইহা জ্ঞাত হইয়াছি।

† "অভিন্ন চৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ।"—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

‡ পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা দ্রষ্টব্য।

"বিস্তর" = অনেক। "বাচ্ছল্য" = বাৎসল্য।

"যৈছে" = যেমন। "ভেল" = হৈল।

"ধাউতের" (অর্থ বোধ হইল না।) ইত্যাদি।

মুসলমানী দুই চারিটি শব্দের সমাবেশও ইহাতে আছে; যথা—

"মোকাম।" "সুবা।"

"লস্কর।" "জাহির।" "তাকিত" ইত্যাদি।

সীতাচরিত্রে কোন কোন স্থানে পয়ারের চতুর্দ্দশাক্ষরী রীতি রক্ষিত হয় নাই।

(ক) "আচার্য্য বলেন তোমরা আইলে কোথা হৈতে।"

(খ) "লইতে আইলাম তাঁর পাদপদ্মের ছায়া।"

(গ) "পুমলিঙ্গের শিষ্য মোরা কোন কালে নহি।"

(ঘ) "আমাদের সম পতিতাধম নাহি আর।" ইত্যাদি।

এ স্থলে দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োগ না করিয়া, লোকনাথের সুস্পষ্ট রচনা হইতে গৃহীত কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল;—

"হরি হরি কি হইল মরমের কাজ।
ছাড়ি মহীমণ্ডল, গৌরাঙ্গ সে কোথা গেল,
আচার্য্যের মাথে পৈল বাজ॥
নীলাচলে ছিল গৌর, ভরসা আছিল মোর,
অনায়াসে হৈত দরশন।
কি বুঝিয়া কিবা কৈনু, কেনে পত্র পাঠাইনু,
যৈছে কৃষ্ণ গেলা বৃন্দাবন॥
মনে ছিল বড় সাধ, ধরি প্রভুর শ্রীপাদ,
নীলাচলে ছাড়িব জীবন।
ইহাতে বিপাক হৈল, আগে লীলা সম্বরিল,
এই সব বিধির ঘটন॥
অদ্বৈত ঘরণী কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
ছাড়ি গেলা গৌরগুণমণি।
আর না দেখিব গৌর, শ্রীমুখাম্বুজ সুন্দর,
না শুনিব ও মুখের বাণী॥
নটবর বেশ ধরি, নাচিবেন গৌরহরি,
নয়নেতে না হেরিব আর।
আমি সীতা অভাগিনী, ছাড়ি গেল গৌরমণি,
অবনী লইল অন্ধকার॥

পৃষ্ঠে এলাইয়া কেশ, হইলেন যোগী বেশ,
দুনয়নে বহে সুরধুনী।
সোণার বরণ তনু, ভূতলে হইল রেণু,
মূরছিতে লোটায় অবনী॥
সীতা বলে নবদ্বীপে, শচী আছে কোন্‌রূপে,
হেন বুঝি ছাড়িল জীবন।
কৃষ্ণ মধুপুরে গেল, ব্রজপুর শূন্য হৈল,
তৈছে ভেল নদীয়া ভুবন॥
মুরারি চৈতন্যদাস, করে লঞা শুভ্রবাস,
মুছাইছে শ্রীমুখ সুন্দরে।
কহে লোকনাথ দাস, সীতার চরণে আশ,
মিলিবে চৈতন্য ব্রজপুরে॥" সীতাচরিত্র।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান-কাহিনী সীতাচরিত্রে আছে। সেই বিবরণ শ্রবণে অদ্বৈত ও সীতার বিলাপের পদটি উদ্ধৃত হইল। চৈতন্যমহাপ্রভুর জননী শচীদেবীর তিরোধান সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে স্পষ্ট কিছু লিখিত নাই,* কিন্তু উদ্ধৃত পদে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি সেই নিদারুণ সংবাদও শুনিবার জন্য জীবিতা ছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাবের প্রসঙ্গও ইহাতে আছে। অতএব সীতাচরিত্র ইহারও পরে রচিত হয়।

লোকনাথ বৃন্দাবন হইতে এদেশে আসিয়া আর বাস করেন নাই, কিন্তু সীতাচরিত্রে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী, সুতরাং সে সমুদায়ই গ্রন্থকার অপরের নিকট হইতে শুনিয়া লিখিয়া থাকিবেন; গ্রন্থখানি বৃন্দাবনেই রচিত হওয়া সম্ভব।

গ্রন্থকার অনেক ঘটনা স্বয়ং না লিখিয়া কবি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের উপর বরাত দিয়াছেন;—

"চৈতন্য ভাগবতে আছয়ে বর্ণন।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছে দাস বৃন্দাবন॥" সীতাচরিত্র।

সম্মান গৌরবে ও কুলমর্য্যাদায় কৃষ্ণদাসের গুরুস্থানীয় হইলেও উদারহৃদয়, বিনীত স্বভাব লোকনাথ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপরও কোন কোন বিষয়ের বরাত আছে;—

"ইহার বিশেষ যত কবিরাজ ঠাকুর।
চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিল প্রচুর॥" সীতাচরিত্র।

---

* অদ্বৈতের পত্র-প্রেরণের পূর্ব্বে জগদানন্দের নবদ্বীপ আগমন প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের অল্পপূর্ব্ব পর্য্যন্ত শচীর বিদ্যমানতার কথা চরিতামৃতের লিখার ভাবে বোধ হয়।

সীতাচরিত্র যে অনেক পরে বিরচিত হয়, এমন কি, চৈতন্যচরিতামৃতেরও * পরে রচিত, এই কথায় তাহা জানা যাইতেছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

১ম অধ্যায়—সীতা ও তাঁহার পঞ্চপুত্রের বিবরণ।

২য় অধ্যায়—গৌরাঙ্গের জন্ম ও সীতার নবদ্বীপগমন প্রসঙ্গ।

৩য় অধ্যায়—গৌরাঙ্গের শান্তিপুরে গমন; সীতার স্নেহ ও ভক্তি বিবরণ।

৪র্থ অধ্যায়—গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকথা, তাঁহার অন্তর্দ্ধান বার্ত্তা, শান্তিপুরে শোকতরঙ্গ; নন্দরাম ও যজ্ঞেশ্বরের আখ্যান।

৫ম অধ্যায়—ঐ (নন্দরাম, যজ্ঞেশ্বরের কথা।)

৬ষ্ঠ অধ্যায়—সীতার শিষ্যদ্বয়ের কথা; নীতিশিক্ষা; সীতার অদ্ভুত চরিত; শিষ্যদ্বয়ের স্ত্রীভাব ও স্ত্রীবেশ-ধারণ।

৭ম অধ্যায়—শ্রীচৈতন্য ভৃত্য ঈশানদাসের বিস্তারিত বিবরণ।

৮ম অধ্যায়—বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহত্যাগ; ঈশানদাসের শান্তিপুরে গমন।

৯ম অধ্যায়—জাহ্নুরায়ের বিস্তারিত কথা।

১০ম অধ্যায়—সীতার দুই অদ্ভুত শিষ্যা,—নন্দিনী ও জঙ্গলীর কথা। ইহাদের প্রস্তাব, ইহাদের অদ্ভুত কাণ্ড; পাণ্ডুয়ার প্রতাপশালী ফকিরের আগমন ও পরীক্ষা, পরীক্ষায় নন্দিনী ও জঙ্গলীর জয়লাভ; সীতাদেবীর প্রস্তাব ও মাহাত্ম্য।

এই সকল বিষয়ই এই গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্যও কিছু আছে বলিতে হইবে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

---

* ছাপার চরিতামৃতে গ্রন্থ-সমাপ্তির তারিখ ১৫৩৭ শক লিখিত। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থকার অনুমান করেন, ১৫০৫ শকের মধ্যে চরিতামৃত রচিত হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে যে মূলগ্রন্থ আনয়ন করেন, তাহার প্রতিলিপি বিষ্ণুপুরের রাজবাটীতে আছে, লেখক শ্রীনিবাসশিষ্য স্বয়ং ব্যাসাচার্য্য। সে চরিতামৃতের শেষে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়——

"শাকাগ্নি বিন্দু বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

ইহাতে চরিতামৃত ১৫০৩ শকে পূর্ণ হয় জানা যাইতেছে। সীতাচরিত্র ইহার পর রচিত হয়।

ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর।

সম্প্রতি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত বিদ্যাসুন্দরের একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। হস্তলিপি খানির বয়স একশত বৎসরেরও উপরে। উহার কোন কোন স্থান কীটদষ্ট ও গলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও সমগ্র অংশ উত্তমরূপে পাঠ করা যায়। লেখকের নাম গোপীমোহন গুহ, নিবাস আটীয়া পরগণার বাসাইল গ্রামে।

ভারতচন্দ্র প্রণীত অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, উক্ত প্রসিদ্ধ গীতকাব্যের পঞ্চম মঙ্গলের শেষাংশে আরম্ভ হইয়া সপ্তম মঙ্গলের প্রথমাংশে শেষ হইয়াছে। মানসিংহের নিকট বর্দ্ধমানের পরিচয় প্রসঙ্গে ভবানন্দ মজুমদার উক্ত উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

"দেবী দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুমদারে,
হয়েছে কানুনগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত হয়ে, নানা দ্রব্য ডালি লয়ে,
বর্দ্ধমানে গেলা মজুমদার॥
দিন কত থাকি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে। *
গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সুরঙ্গ দেখিলা গিয়া,
মজুমদারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুমদার, বিশেষ কহেন তার,
যেইরূপে সুরঙ্গ হইল॥"

গ্রন্থ শেষে অষ্টমঙ্গলায় দেবী মজুমদারকে কহিতেছেন—

পঞ্চমে শাপের ছলে, * * * *
* * * * *
এল মানসিংহ রায়, দেখা হেতু তুমি তায়,
বর্দ্ধমানে গেলা আশুসারে।
মানসিংহ শুনি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
জিজ্ঞাসিল বিশেষ তোমায়।
ইতিহাস ছলে সুখে, শুনিনু তোমার মুখে,
আদ্য রস সুন্দর-বিদ্যায়।
পূজি মোর কালীরূপ, সুকবি সুন্দর ভূপ,
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥

হীরা নাম মালিনীর, ঘরে উত্তরিল ধীর,
শুনিল বিদ্যার রূপগান॥
গাঁথিয়া দিলেক মালা, ভুলে বিদ্যা রাজবালা,
দোঁহে দেখা রথের নিকটে।
মোর বরে সন্ধি হৈল, গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল,
বাসর বঞ্চিল অকপটে॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্ট মঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়,
শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥
ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি, বিদ্যা পদ্মিনীর রবি,
অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।
কপট সন্ন্যাসী হৈল, রাজার সাক্ষাৎ কৈল,
নানা মতে বিহার করিল॥
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী, ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি,
কোটাল ধরিতে গেল চোর।
নারীবেশে চোর ধরে, রাজার সাক্ষাৎ করে,
সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোর॥
সপ্তমেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া,
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল, মোর অনুগ্রহ হৈল,
বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে॥"

মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের এই সকল অংশ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই এক অংশ। কিন্তু আমরা বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে বিদ্যাসুন্দরকে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়। এক সময় পণ্ডিত ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ অন্নদা-মঙ্গলের পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন। "অন্নদা-মঙ্গল" রচনার সময় কৌশলক্রমে উক্ত উপাখ্যান উহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেন। পণ্ডিতবর অবশ্যই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের এই হস্ত-লিপি পাঠে তাঁহার সেই অনুমান অকাট্য সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে।

আমরা যে হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছি, ভারতচন্দ্র প্রথমে এই বিদ্যাসুন্দরই রচনা করেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদা-মঙ্গল রচনার সময় রাজার বা সাধারণের আগ্রহবশতঃ প্রথম লিখিত বিদ্যাসুন্দর মাজিয়া ঘসিয়া এবং স্থলবিশেষে

সংক্ষিপ্ত করিয়া অন্নদা-মঙ্গলের সহিত যোগ করিয়া দেন। উভয় বিদ্যাসুন্দরের ভাষা ও বিষয়াদি বিচার করিলে এ বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। আমাদের অবলম্বিত হস্তলিখিত "বিদ্যাসুন্দর" প্রথমে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধে উহাকে আদি বিদ্যাসুন্দর শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছি।

ভারতচন্দ্রের এই আদি বিদ্যাসুন্দরে গণেশ ও কালিকার বন্দনা করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রবণের জন্য বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান বর্ণনা করা হইয়াছে। গণেশ-বন্দনাটী ঠিক অন্নদা-মঙ্গলের গণেশ বন্দনার সহিত মেলে। কেবল একটী চরণে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়—

মুদ্রিত অন্নদা-মঙ্গলে—

"আমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর,
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর, বিঘ্নরাজ বিঘ্নহর,
ইথে পার তবে সে পাইবে॥"

আদি বিদ্যাসুন্দরে—

"আমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর,
নায়কের আশা পূর্ণ কর।
বিঘ্নরাজ বিঘ্নহর, মোর বিঘ্ন দূর কর,
ইথে পার পাইব সত্বর॥"

গণেশ বন্দনাটী প্রথমে বিদ্যাসুন্দরেই ছিল, অন্নদা-মঙ্গল রচনার সময় কবি উহা অন্নদা-মঙ্গলের প্রারম্ভে স্থাপন করিয়া "নায়কের আশা পূর্ণ কর" স্থলে "অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিব" এই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরে যে কালিকা বন্দনা ছিল, কবি অন্নদা-মঙ্গলে তাহা গ্রহণ করেন নাই; তৎপরিবর্ত্তে কৌষিকীবন্দনা লিখিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের কালিকা-বন্দনা এইরূপ—

"ভজহ কালিকা তারা, কল্যাণী কলুষহরা,
করুণা-সাগর-নারায়ণী।
মহাবিদ্যা মহামায়া, মহেশ্বর-অর্দ্ধকায়া,
মহেশ্বরী মহিষ-মর্দ্দিনী।
দুঃখিত জনের গতি, মহালক্ষ্মী মহামতী,
মুক্তকেশী দৈত্যবিনাশিনী॥
বিজয়া বিমলা বিদ্যা, বিরিঞ্চি-বন্দিতা সিদ্ধা,
বিশালাক্ষী বিপদতারিণী।

অমরা অপরাজিতা, অভয়া অসিতা সীতা,
অম্বিকা অসুর-বিনাশিনী॥
কালী সে করুণা-কয়া, কলির কলুষহয়া,
কহিতে করুণা শক্তি কার।
অতি হীন মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
কি বর্ণিব চরিত্র তোমার॥"

পাঠক দেখিবেন, বিদ্যাসুন্দরের সেই কালিকা বন্দনার ভাষা উত্তরকালে কিরূপে রসালঙ্কারভূষিত কৌষিকী প্রভৃতির বন্দনার ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। হস্ত-লিখিত বিদ্যাসুন্দরের ভাষার সহিত মুদ্রিত বিদ্যাসুন্দরের ভাষার তুলনা করিলে সর্ব্বত্রই কবির এই ক্রমোন্নতি দেখা যায়। কাব্যকুতূহলী বাঙ্গালীর ইহা দেখিবার ও যত্নে রক্ষা করিবার সামগ্রী বটে।

কালিকা বন্দনার পর এইরূপে বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ হইয়াছে—

"শুন রাজা মহামতি, নবদ্বীপ অধিপতি,
যদি ইচ্ছা করিলা আপনে।
কালীপদ * * ফুল্লপদ বিবরণ,
শোন রাজা সুন্দর উপাখ্যানে॥
কালীভক্ত সাধুগণে, প্রস্তাব যে জনে শুনে,
কালী তারে হয়েন সদয়।
বিশেষ সুন্দর কথা, * আদিরস গাথা,
বিদ্বানের সন্তোষ বাড়ায়॥
জ্ঞানীজনের জ্ঞানবৃদ্ধি, রসিকের রস বৃদ্ধি,
মূর্খের মূর্খতা নাহি রয়।
কালিকামঙ্গল পোতা, বিচিত্র পয়ার গাঁথা,
শ্রবণে বিনাশে যমভয়॥
সুজন * বন্ধু, মহারাজ গুণসিন্ধু,
বসতি যেহার কাঞ্চীপুর।
কর্ণাট দেশের রাজা, সুত সম পালে প্রজা,
ভুবন-শাসন মহাশূর॥
রঙ্গরস সুখভোগ, পূজা হোম ক্রিয়াযোগ,
ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি কথা।
উত্তম পাঠক মুখে, শ্রবণ করয়ে সুখে,
ভারতপুরাণ মহা শ্রোতা॥

আদিপর্ব্ব উপাখ্যান, শুনিলেন বিবরণ,
কুরুপাণ্ডবের উৎপত্তি।
মৃগ হেতু অরণ্যেতে, শাপবিদ্ধ যেন মতে,
হৈয়াছিল পাণ্ডু নরপতি॥
* * শৃঙ্গার রসে, মুনি-পত্নী মৃগীবেশে,
তাহাকে মারিলা রাজা বাণ।
শাপ দিলা মুনিবরে, এ মতি ঘটিবে তোরে,
কামিনী সংযোগে যাবে প্রাণ॥
দুঃখ ভাবি পরস্পরে, কাননে প্রবেশ করে,
সঙ্গে লৈয়া কামিনী যুবতী।
সশরীরে স্বর্গ চায়, অপুত্রের হেতু তায়,
নিষেধ করিলা সুরপতি॥
শুন রাজা মহাজন, তনয় পরম ধন,
অপুত্রের স্বর্গে নাহি স্থিতি।
অতএব নিজ স্থানে, রহ * পত্নীসনে,
স্বর্গপাবা জন্মিলে সন্ততি।
দেবঋষি বাক্য শুনি, শোকাকুল নৃপমণি,
কহিলেন সব বিবরণ॥
রাজার কাতর ভাষে, * * উপহাসে,
জন্ম হবে ক্ষেত্রজ নন্দন।
তবে রাজা কুন্তীস্থানে, জিজ্ঞাসিল দুঃখমনে,
বল দেখি কি হবে ইহার॥
রাজার আদেশে রাণী, * অর্চ্চিয়া আনি,
জন্মাইল সুত আপনার।
গুণসিন্ধু নরপতি, শুনিয়া আকুল মতি,
অপুত্রের হেতু ভাবে দুঃখ॥
কি মোর সংসার যত্ন, অপত্য পরম রত্ন,
নাহি দিল বিধাতা বিমুখ।
দেখিয়া রাজার শোক, বিষাদিত সব লোক,
পাত্রগণ করয়ে সান্ত্বনা॥
পুরোহিত বলে রাজা, করহ দেবীর পূজা,
পুত্র হবে তোমার কামনা।

কালিকা অখিল মাতা, চতুর্ব্বর্গ-ফল-দাতা,
সুখ-মোক্ষ-সম্পদ-দায়িনী।
রূপ-গুণ-শীল-যুত, উত্তম পাইবা সুত,
পূজ তুমি ত্রৈলোক্য-তারিণী॥
এত শুনি মহারাজা, আরম্ভে কালীর পূজা,
নানা দ্রব্য করিলা সম্ভার।
মৃণ্ময়ী কালী মূর্ত্তি, নির্ম্মাইলা নরপতি,
হেরিলে ভুবন চমৎকার॥
বিবসনা এলোকেশী, • • •
নরশির গলায় ভূষণ।
নব জলদের ঘটা, জিনিয়া অঙ্গের ছটা,
অট্টহাস করাল বদন॥
কটি তটে নরকর, দেখি অতি ভয়ঙ্কর,
শ্রবণে কুণ্ডল কাটি নর।
রতন কিরীট শিরে, কেবল তিমির হরে,
আরোহণ শিবের উপর॥
আগম তন্ত্রের মতে, নির্ম্মাইলা নরনাথে,
প্রকাশিলা অবনী মণ্ডলে।
কালিকা-মঙ্গল পোতা, বিচিত্র পয়ার গাথা,
কবিতা ভারতচন্দ্রে বলে॥”

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্তোষের জন্য তাঁহারই ইচ্ছামত কালিকা মাহাত্ম্য বর্ণনোদ্দেশে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচনা করেন। কালিকা মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া কবি স্বয়ংই এই গ্রন্থকে কালিকা-মঙ্গল আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। গীতিকাব্য রচনায় ভারতচন্দ্রের ইহাই প্রথম উদ্যম। প্রথম রচনা বলিয়াই ইহাতে অনেক দোষ, অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু যেমন অঙ্কুরেই বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনিই এই প্রথম উদ্যমের রচনাতেও ভারতের পরবর্ত্তী রসাল ভাষার বীণা-ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। উত্তরকালে যখন ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নপূর্ণা পূজায় কীর্ত্তনের জন্য অন্নদা-মঙ্গল রচনা করেন, তখন সাধারণে আগ্রহবশতঃই হউক বা নিজের অভিপ্রায়েই হউক এই কালিকা-মঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান) কাটিয়া ছাটিয়া ঘসিয়া মাজিয়া অনেক পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দর পাঠ না করিয়া কেবল অন্নদা-মঙ্গল পাঠ করিলেও একথা যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। কবি

কালিকা-মঙ্গলকে জোর করিয়া অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে গুঁজিয়া দিলেও উহা ভাল মিশ খায় নাই। তৈলে জল মিশ্রণের ন্যায় পৃথক্‌ই রহিয়াছে। অন্নদামঙ্গলের সকল উপাখ্যানেই অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেই অন্নদা নামের পরিবর্ত্তে কালী নাম রহিয়াছে। কবি স্বয়ং এ ত্রুটি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হউক সংশোধন করিতে পারেন নাই। তবে কতকটা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য দেবীর মুখে একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন—

"সপ্তমেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া,
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।"

অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের শেষভাগে দেবী, বিদ্যা ও সুন্দরকে বলিতেছেন,

"তোরা মোর দাস দাসী, শাপেতে ভূতলে আসি,
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।
ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস,
নানা মতে আমারে তুষিলা॥"

কে কাহাকে কি জন্য কি শাপ দিল, তাহার কোন কথাই অন্নদা-মঙ্গলে নাই। হরি হোড়, ভবানন্দ ইহারাও শাপেই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ, অন্নদা-মঙ্গলে আছে, নাই কেবল বিদ্যা ও সুন্দরের শাপের কথা। হঠাৎ প্রস্তাব শেষে শাপের নাম করায় কেমন অসংলগ্ন হইয়াছে। কবি যেন নিতান্ত অনুরোধে ঠেকিয়া বা দায়ে পড়িয়া একটী অঙ্গহীন উপাখ্যান অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছেন। ভবানন্দের মুখে ইতিহাস-রূপে বর্ণনা করায় উহা যে অন্নদা-মঙ্গলের অঙ্গ নহে, তাহা স্পষ্টই দেখান হইয়াছে। অথচ আবার অষ্টমঙ্গলার তালিকায় ধরিয়া কবি একটা গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ অসামঞ্জস্য বা অঙ্গহানি নাই। উহাতে বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্ববিবরণ শাপবৃত্তান্ত উত্তমরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বেহারান্তর্গত কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধু, সন্তান লাভের জন্য কালীপূজা করিলে, দেবী সন্তুষ্ট হইয়া সন্তানলাভের বর দিলেন। কিন্তু দেবী রাজাকে বর দিয়া কাহাকে তাঁহার সন্তান করিয়া দিবেন সেজন্য বড় চিন্তিত হইলেন——

"রাজাকে সন্তান দিতে, ভাবে কালী নিজ চিতে,
হেনকালে দেবীর বিদিত।
বসন্ত সামন্ত সাথে, মনসিজ এক রথে,
আসিয়া হইল উপস্থিত॥
মায় দেখি উচ্চাসনে, ভৈরব ভৈরবীগণে,
সভ্রমে করিল অবস্থান।

প্রণমি দেবীর পায়,　　চলিল মন্মথ রায়,
কালান্তরে গেল নিজস্থান।
যোগানন্দ নামে এক,　　নরদেহ আছিলেক,
যোগবতী তাহার • • •
কঠোর তপের ফলে,　　কালীপদ কৃপাবলে,
হৈল দুই ভৈরব ভৈরবী॥
সে দোঁহে আছিল তথি,　　যবে আইল রতি পতি,
অহঙ্কারে না কৈল উত্থান।
পুত্র হেতু নৃপবর,　　মাগিয়া লৈয়াছে বর,
ছল পাইয়া দেবী করে মান॥
দেবীবলে যোগানন্দ,　　এ কর্ম্ম করিলা মন্দ,
কামকে না করিলা আদর।
শুনি যোগানন্দ বলে,　　তব পাদপদ্ম বলে,
মন্মথকে নাহি মোর ডর॥

॰　•　॰　॰　॰

দেবী বলে নরাধম,　　না জান দেবের মর্ম্ম,
কামকে করিলা অপমান।
জন্ম যাইয়া মহীতলে,　　কামকে যে দোষ দিলে,
সেহি মত পাইবা অপমান॥
এত শুনি যোগানন্দ,　　বলে কর্ম্ম হইল মন্দ,
কেন মাতা হইলা নিঠুর।
কাম দোষে হৈল শাপ,　　মনে অতি পরিতাপ,
দেব সভা হৈতে হৈল দূর॥
অনেক তপের ফলে,　　যোগ] আরাধনা বলে,
পেয়েছিলাম অভয়চরণ।
জননী জঠর বাসে,　　বন্দী হৈলাম মায়াপাশে,
পুনঃ দুঃখ সংসারে পতন॥
ভৈরবের বাক্য শুনি,　　হাস্যমুখে নারায়ণী,
বলে পুত্র না ভাবিয় শোক।
মহীতলে বিহরিয়া,　　আমা পূজা প্রকাশিয়া,
পুনশ্চ আসিবা শিবলোক॥

ভৈরব বলেন মাতা, সুখমোক্ষপদ-দাতা,
কেমনে চরণ ছাড়ি যাব।
যদি আজ্ঞা কৈলা মোকে, যাইতে ধরণী লোকে,
বল আমি কোথায় জন্মিব॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী, এ তিন ভুবনে জানি,
তাতে আমি অধম দুর্ম্মতি।
যদি মোরা যাব ক্ষিতি, চরণে রাখিবা তথি,
অধমের আর নাহি গতি॥
নির্ম্মল ভকতি দানে, কাটি পাশ বন্ধনে,
রাতুল চরণে দেহ স্থান।
দেবী বলে বাছা অরে, যাও গুণসিন্ধুঘরে,
পাবা ভক্তি মুকতি কল্যাণ॥
যোগবতী ধরাতলে, বীরসিংহ নৃপ ঘরে,
জন্ম লইয়া ভজ ভগবতী।
আমার কৃপায় রামা, ভুবনমণ্ডলে তোমা,
ঘুষিবেক রসের খেয়াতি॥
যোগানন্দ পতি হবে, মর্ত্ত্যে সুখে বিহারিবে,
ভক্তি দোঁহে আমার পাইবা।
ক্রোধে তোমা শাপ দিল, তাহে ভাল বর হৈল,
রাজপুত্র রাজকন্যা হবা॥”

এই যোগানন্দ ও যোগবতীর মর্ত্ত্যে সুন্দর ও বিদ্যারূপে জন্মগ্রহণ, কালিকার পূজা প্রকাশ ও পুনরায় স্বর্গে গমন বর্ণনাই বিদ্যাসুন্দর বা কালিকা-মঙ্গল। অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্ভূত করিবার জন্য কবি এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত ছাড়িয়া দিয়া উপাখ্যানটীকে অঙ্গহীন করিয়াছেন।

অন্নদা-মঙ্গলে মিশাইবার জন্য কালিকা-মঙ্গলকে বহু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই গুণসিন্ধু রাজার কালীপূজা, বরলাভ, সুন্দরের জন্ম, বিদ্যার জন্ম, যোগানন্দ ও যোগবতীর মর্ত্ত্যে আগমন প্রভৃতি বহু বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেক কথা মাজিয়া ঘসিয়া চাকচিক্যশালী ও রসাল করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের প্রথম লিখিত কালিকামঙ্গলের এক অঙ্গ-হীন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। সংক্ষিপ্ত ও অঙ্গহীন হইলেও ইহা রচনার পারিপাট্যে, শব্দ বিন্যাসে ও রসালতায় বড়ই সুদৃশ্য হইয়াছে। পাঠক বিদ্যাসুন্দরের মধুর ভাষাবৈচিত্র্যে বিহ্বল হইয়া ইহার অঙ্গহীনতা বা সংক্ষিপ্ততার কথা ভাবিতে অবসর পান না।

অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরে ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের মধ্যাহ্ন জ্যোতিঃ দর্শন করিলে তৃপ্ত হইতে পারা যায়, কিন্তু প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধালোকের ন্যায় তাঁহার প্রাথমিক কবিত্ব-বিভা কাব্যামোদীর নিকট এক অতি অপূর্ব্ব পদার্থ। উহা কেবল প্রথম রচিত কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেই পাওয়া যায়। সহৃদয় কাব্যকৌতুকী বাঙ্গালীর ইহা সযত্নে রক্ষণীয় বটে।

কালিকামঙ্গল রচয়িতা প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর নির্দ্দেশানুসারে দেখা যায় যে ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গতঃ অন্নদামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছিলেন।

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

ভারতচন্দ্র স্বতন্ত্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন এ কথা প্রাণরাম বলেন না। ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে প্রথম রচিত বিদ্যাসুন্দরের (কালিকামঙ্গল) অতি অল্প পরেই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর পূর্ব্বরচিত বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা রসাল হওয়াতে আদি বিদ্যাসুন্দর সাধারণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। ক্রমে লোকে উহার কথা এক প্রকার বিস্মৃতই হইয়াছিল। এই জন্যই পরবর্ত্তী কবি উহার উল্লেখ করেন নাই।

পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা আদি বিদ্যাসুন্দরে যে যে বিষয় অধিক আছে, তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

বিদ্যা ও রাজার বিবাহবিষয়ক কথোপকথন।

"রাজা বলে শুন কন্যা আমার বচন। তুমি কন্যা হৈতে মোর দুঃখ বিমোচন॥
বিবাহের হেতু মাতা বলহ আপনি। দেশে দেশে আছে বহু * *
যথায় তোমার ইচ্ছা বরে হয় মন। ধরিয়া আনিব সেহি রাজার নন্দন॥
এই মতে বিদ্যারে জিজ্ঞাসে নরপতি। বিচার করয়ে মনে বিদ্যা গুণবতী॥
ভারত কহিছে রাজা আছে নিরূপণ। অলঙ্ঘ্য কালীর বাক্য না যায় খণ্ডন॥

বীর সিংহ রাজকন্যা, রূপে লক্ষ্মী গুণে ধন্যা,
গুণবতী যেন সরস্বতী।
ভাবে বিদ্যা মনে মন, কি বলিব নিরূপণ,
যে হেতু পুছেন নরপতি॥
শাস্ত্রের বিচার করি, বোলে বিদ্যাসুন্দরী,
পিতা মোর শুনহ বচন।
হেট মুখে বিদ্যা কয়, শোন শোন মহাশয়,
আছে যে বিধির নিরূপণ॥

ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রমত, বিচার করিলাম কত,
বিচার করিয়া কৈলাম সার।
প্রতিজ্ঞা করিলাম মনে, পণ্ডিত সকল সনে,
বিচারে যে জিনিবে আমার॥
শুন রাজা নরপতি, বিদ্বান্ বরিব পতি,
অবিদ্বানে নাহি প্রয়োজন।
দেখিল শাস্ত্রের নীত, শাস্ত্রে যার নাহি *
সেহি অন্ধ থাকিতে লোচন॥
মূর্খ জীব যার পতি, সে নারীর অধোগতি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় পতিযোগে।
পতি পাপে হয় পাপ, জীবনে না ঘুচে তাপ,
অন্তেতে নরক ভোগ ভোগে।
পণ্ডিত যাহার পতি, সতত ধর্ম্মেতে মতি,
মূর্খের শরীরে সর্ব্ব দোষ।
মূর্খের জীবন জরা, কেবল * ভরা,
যাবত জীবন অসন্তোষ॥
প্রতিজ্ঞার কথা জানি, পণ্ডিত সকলে *
লাজে রহে না কহে বচন॥
কন্যার বচন শুনি, চিন্তাযুক্ত নৃপমণি,
আসিয়া মিলিল ভট্টগণ॥"

প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। এজন্য আমরা আর উদ্ধৃত না করিয়া, সংশোধন করাতে কালিকামঙ্গলের (আদি-বিদ্যাসুন্দরের) সহিত অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরের যে পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহার একটু আদর্শ দেখাইয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব।

হস্তলিখিত গ্রন্থের পাঠ।

"মালিনী বলিছে বাপু তোরে দেই খোটা। যত টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোটা॥
তবে সে প্রত্যয় হয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইলাম দুইকাহন ভাগ্যে বেটা ভাঙ্গী॥
সেরের কাহন দরে কিনিল সন্দেশ। আনিয়াছি আধসের পাইয়া বহু ক্লেশ॥
আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি জানি॥
অগোর চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। জয়িত্রী এলাচ তাহা না মিলে সকল॥
দুই পণে আনিয়াছি একপণ পান। আমি যাহা পাই তাহা নাহি পাও আন॥
অবাক্ হইলাম হাটে দেখিয়া গুবাক। নাহি বিনে দোকানীর নাহি সরে বাক্॥
কত কষ্টে আনিয়াছি আম্র গোটা নয়। ফিরিয়া না কহে মুল যে কহে সে নয়॥

দুঃখেতে আনিল দুগ্ধ গিয়া নদীপার। আমি বিনা কাহার শকতি আনিবার॥
খুন হৈয়াছিলাম বাছা চুণ চাহিয়া। শেষে না হইল কড়ি আনিল চাহিয়া॥
লেখাবুঝ আরে বাপু! ভূমে পাতি খড়ি। শেষে নাকি বল মাসী কড়ি করে চুরী॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। এমনি বাড়িবে দেখি উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি মহাভাগবত। এত না দেখিয়াছি চাহিয়া ভাগবত॥"

মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ।

"বেসাতি কড়ির লেখা বুঝায় বাছনি। মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনপোরে মাসী দেয় খোটা। যটি টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোটা॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায়। এ টাকা উচিত দেওয়া কেবল জুয়ায়॥
তবে সে প্রত্যয় হয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইনু দু কাহণে ভাগ্যে বেটা ভাঙ্গী॥
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ। আনিয়াছি আধসের পাইতে সন্দেশ॥
আটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা। যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুই পণে একপণ আনিয়াছি পান। আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক্ হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক। নাহি বিনা দোকানীর না সরে গো বাক॥
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে। আমা বিনা কাহার শকতি আনিবারে॥
আটপণে আনিয়াছি কাঠ আট আঁটি। নষ্টলোকে কাষ্ঠ বেঁচে তাহে নাহি আঁটী॥
খুন হয়েছিনু বাছা চূণ চেয়ে চেয়ে। শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে খড়ি পাতি। পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ি পাতি॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। বুঝিবা বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে কবিরায় ভারত ভারত। এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥"

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্য-মঙ্গল।

নবদ্বীপচন্দ্রের অভ্যুদয়ে তাঁহার অনুগৃহীত শত শত ভক্তবৃন্দের অপূর্ব্ব প্রেম-তরঙ্গে যে সময় বঙ্গভূমি নবীনভাব ধারণ করিয়াছিল, বৈষ্ণবগণের সেই সুখের দিনে কবি জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন অনেকেই এই সুকবির নাম অভিনব বলিয়া মনে করিবেন, বাস্তবিক কীটদষ্ট পুরাতন পুথির মধ্যে এই মহাত্মার নাম গুপ্ত থাকায়, আমরা অনেকেই পূর্ব্বে এই বৈষ্ণব কবির নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই; কিন্তু এমন এক দিন গিয়াছে, যে দিন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে পল্লিতে পল্লিতে জয়ানন্দের সুললিত সঙ্গীতাবলী শ্রুত হইত, শত শত ব্যক্তি আত্মহারা হইয়া সেই মধুর গাথা শ্রবণ করিতেন। জয়ানন্দের সেই গীত-পুস্তকের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল"।

সম্প্রতি এই চৈতন্য-মঙ্গলের একখণ্ড পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় পুথিখানি খণ্ডিত। পুথির মধ্যে ১, ১৭ হইতে ৩৬ এবং ৩৮ হইতে ৪০ সংখ্যক পত্র নাই, আর সকল পত্র আছে। শেষ পত্রের সংখ্যা ৭৬। দেখা যাইতেছে, গ্রন্থের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়াছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমরা অবশিষ্ট পাতাগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

পুথির শেষে নকল হইবার সন, তারিখ ও লিপিকারের নামাদি এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল নবখণ্ড সমাপ্তঃ॥ * ॥ জথা দৃষ্টত্যাদি॥ শ্রীধর্ম্মদাস আচার্য্যকস্য লিখনমিতি॥ শকাব্দা। ১৬০১॥ মাহ চৈত্র বৃহস্পতিবারে কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠী দিবসে বেলা তৃতীয় প্রহরে শ্রীযা[১]দপ দাসের পুস্তক সাঙ্গ হৈল॥ * ॥ ইতি ২স ৯মং[২] তারিখ ১৩ চৈত্র।"

গ্রন্থের উক্ত সমাপ্তি বাক্য অনুসারে আমাদের আলোচ্য পুথিখানি ২১৮ বর্ষের পুরাতন হইতেছে। পুথির অবস্থা ও লিখন ভঙ্গী অনুসারেও তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

সম্পূর্ণ পুথিখানির শ্লোক সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারি হাজার হইবে; কিন্তু আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহারই আলোচনা করিব। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, যে পুথির এক তৃতীয়াংশ পাওয়া যাইতেছে না, সেই খণ্ডিত পুথির আলোচনায় প্রয়োজন কি? যখন সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যাইবে, তখন আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। এখন এই

১। লেখা অস্পষ্ট।

২। '২ স ৯ ম' এই চারিটী অক্ষরও কোন অব্দজ্ঞাপক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপস্থিত আমরা ইহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিলাম না।

খণ্ডিত পুথি হইতে যে সকল বিষয় অপরিষ্কার বা অভাব দৃষ্ট হইবে, হয়ত সম্পূর্ণ পুথি পাইলে তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারিবে।

কিন্তু আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ এত বৃদ্ধি হইয়াছে, যে সাধারণের নিকট সেই অতি প্রয়োজনীয় কথা গুলি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। হয়ত অনেকের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যানুরাগী, বৈষ্ণবতত্ত্বানুসন্ধায়ী এবং পুরাতত্ত্বপ্রিয় সুহৃদ্‌বৃন্দের কতকটা রুচিকর হইবে ভাবিয়াই আজ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছি।

পুথিখানি যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই কএকটী বিষয় জানিতে পারিব।

১। গ্রন্থকারের পরিচয়।

২। কবির পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষায় রচিত কতকগুলি প্রধান প্রধান গ্রন্থের তালিকা।

৩। তখনকার শ্রীহট্ট ও নবদ্বীপের অবস্থা।

৪। চৈতন্য-চরিতাখ্যায়কগণ যে সকল বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, তাহার কতক কতক পরিস্ফুট বর্ণনা।

৫। তৎকালীন বঙ্গভাষার অবস্থা।

৬। কবির কবিত্বের পরিচয়।

এই কএটী মুখ্য বিষয় ব্যতীত ছোটখাট আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই খণ্ডিত পুস্তকে দেখিতে পাই। সেই জন্যই এই পুথিখানি আমাদের আলোচ্য।

কবির পরিচয়।

কবি জয়ানন্দ গ্রন্থের নানা স্থানে* এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ;—

১। "শুক্লাঃ দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। জয়ানন্দের জন্ম মাতামহ গৃহবাসে ॥
গুহিআ নাম ছিল মাএর মড়াছিআ বাদে। জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে ॥
জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি। পরম ভাগবত উপমা দিতে নাঞি ॥
পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য পুস্তক লিখনে। আপনে চিন্তাএ পাঠ যত শিষ্যগণে ॥
বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র তপস্যার ফলে। জয়ানন্দ জন্ম হৈল চৈতন্যমঙ্গলে ॥"

(২য় পত্র। ২ পৃষ্ঠা। ৩-৪ পংক্তি)

২। "শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। জয়ানন্দের জনম হৈল সে দিবসে ॥
গুহিআ নাম ছিল মায়ের মড়াছিআ বাদে। জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে ॥
মা রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী। তার গর্ভে জন্মিঞা চৈতন্যানন্দে ভাসি ॥

---

* পুথিখানিতে তেমন বেশী বর্ণাশুদ্ধি নাই, বঙ্গভাষার সেই সাবেক রূপ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্য আমরা অধিকাংশ স্থলেই আদর্শের অনুরূপ উদ্ধৃত করিব।

খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্প ভক্তি।*

বাণীনাথ মিশ্র ষট্ রাত্রি উপবাসি। দুর্ব্বাসা ভারতী ব্যাস জগৎ প্রকাশে॥
যার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতে। অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে॥
জেঠা বৈষ্ণবমিশ্র সর্ব্বতীর্থ প্লুত। ছোট ভাই রামানন্দমিশ্র ভাগবত॥
বন্দ্যাঘটিবংশে রঘুনাথ উপাসক। তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্যভাবক॥
এত দূরে বৈরাগ্যখণ্ড সাঙ্গ হৈল। গাইব সন্ন্যাস খণ্ড মন প্রকাশিল॥
চিন্তিঞা চৈতন্য গদাধর পাদদ্বন্দ্ব। বৈরাগ্যখণ্ড সাঙ্গ হৈল গাএ জয়ানন্দ" ॥ ৪৩।২।২-৮।

৩। "জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র গোসাঞি। চৈতন্যচরণ ধ্যান ইহা বই নাঞি॥
চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পাদদ্বন্দ্ব। আনন্দেতে তীর্থখণ্ড গাএ জয়ানন্দ॥"৫৪।১।৬-৭।

৪। "চৈতন্য চলিল গৌড়দেশে। শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞাবিশেষে॥

"তুঙ্গনা ভদ্রখ পাড়া, ছাড়িয়া অসুরগড়া,
সরো নগরে বাসা করি।
রেমুণা বাঁসদা দিঞা, দাঁতিনে রহিল গিঞা,
জলেশ্বরে রহিলা শর্ব্বরী।
ছাড়িঞা দেবশরণ, প্রবেশিলা মান্দারণ,
বর্দ্ধমানে দিল দরশন।
জ্যৈষ্ঠ মাসের তাতে, তপ্ত সিকতাপথে,
তরুতলে করিল শয়ন॥
বর্দ্ধমান সন্নিকটে, ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে,
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে সুবুদ্ধিমিশ্র, গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য,
তার ঘরে করিল বিশ্রাম॥
তাহার নন্দন গুআ, জয়ানন্দ নাম থুঞা,
রোদনী রান্ধিল তার লঞা।
রোদনী ভোজন করি, চলিলা নদিয়াপুরী,
বায়ড়া উত্তরিলা গিঞা॥
আশ্চর্য্য বিজয়খণ্ড, কেবল অমৃত কুণ্ড,
কর্ণরন্ধ্রে জগজন পিএ।
চৈতন্য পদারবিন্দ, সুধাময় মকরন্দ,
জয়ানন্দ সেই আসে জীএ॥" ৭০।২।১৫,৭১।১।১-৩।

---

* এখানে বোধহয় লেখকের দোষে দুই একটী কবিতা পড়িয়া গিয়াছে।

৫। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞিির প্রসাদমালা পাঞা।
শ্রীঅভিরাম গোসাঞিির কেবল বর পাঞা॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞিির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল কিছু গীত প্রচরি॥ ২।২।২।

৬। অভিরাম গোসাঞিির পাদোদক প্রসাদে।
পণ্ডিত গোসাঞিির আজ্ঞা চৈতন্য আশীর্ব্বাদে॥
বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র তপস্যার:ফলে।
জয়ানন্দের মন হৈল চৈতন্য মঙ্গলে॥ ৪৩।২।১-২।

উপরে উদ্ধৃত কবিতাগুলি হইতে আমরা কবির এইরূপ পরিচয় পাইতেছি ;—

যে সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে তখনকার খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বন্দ্যঘটীয় কুলে কবি জয়ানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তখন বৈশাখ মাস শুক্লদ্বাদশী তিথি। মাতামহ-গৃহেই কবির জন্ম। কবির মাতার নাম রোদনী, পিতার নাম শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র। *

কবির জ্যেঠার নাম বৈষ্ণব মিশ্র ও খুড়ার নাম রামানন্দ মিশ্র। বাণীনাথ মিশ্র নামে তাঁহার এক আত্মীয় ছিলেন, ইনি কবির খুড়া কি জ্যেঠা ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই বাণীনাথের পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র।

উপরের পরিচয় হইতে মোটা মুটী বুঝা যায়, যে ব্রাহ্মণকুলে জয়ানন্দ জন্মিয়াছিলেন, সেই বংশে বিদ্বান্ সৎপণ্ডিতের অভাব ছিল না। জয়ানন্দের পূর্ব্বপুরুষ রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহার পিতা চৈতন্যের শিষ্য ও মাতা নিত্যানন্দের ভক্তা হইলেও কবির খুড়া জ্যেঠারা চৈতন্যকে ভক্তি করিতেন না। এইরূপ এক পরিবার মধ্যেই তখন মতবৈলক্ষণ্য ছিল। বৈষ্ণবাচারদর্পণেও চৈতন্যশাখায় বর্দ্ধমানবাসী সুবুদ্ধিমিশ্রের নাম আছে। কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতে মূল শাখা বর্ণনে "সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কোমল নয়ান।" এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

জয়ানন্দ-জননীর সন্তান হইয়া বাঁচিত না। সুবুদ্ধিমিশ্রের অনেক সাধ্যসাধনার পর কবির জন্ম হইল। প্রথমে পিতা মাতা ভাবেন নাই যে এ সন্তান বাঁচিবে, তাঁহাদের কুলোজ্জ্বল করিবে। কাজেই এরূপ স্থলে যাহা হয় তাহাই হইল। যে কারণে চৈতন্যদেবের 'নিমাই' নাম রাখা হইয়াছিল, সেই কারণে কবির প্রথম 'গুইয়া' নাম রাখা হইল। গুইয়া কিরূপে জয়ানন্দ হইল? তাহা কবি নিজেই বলিয়াছেন।

---

* এখনকার কালে হইলে কবি 'শ্রীসুবুদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়' এইরূপে আপনার পিতার পরিচয় দিতেন। কিন্তু সে সময়ে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' 'মুখোপাধ্যায়' ইত্যাদি অভিনব উপাধির সৃষ্টি হয় নাই। তখন ব্রাহ্মণসমাজে 'মিশ্র' 'ওঝা' এইরূপ উপাধিই সচরাচর চলিত ছিল। জয়ানন্দ তৎকালের নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস অবস্থায় নীলাচল হইতে নদীয়ায় ফিরিয়া আসিতেছেন। বর্দ্ধমান হইয়া তিনি আমাইপুরা গ্রামে শিষ্য সুবুদ্ধিমিশ্রের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।[১] কবির মাতা রোদনী রন্ধন করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক চৈতন্যদেবকে ভোজন করাইলেন। এই অবস্থান কালে গৌরাঙ্গদেব কবির 'গুইয়া' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'জয়ানন্দ' নাম রাখিলেন। জয়ানন্দ চৈতন্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু কে? তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে না। তবে "অভিরাম গোসাঞির পাদোদকপ্রসাদে" এই ভণিতা অনুসারে যেন অভিরাম গোস্বামীকে তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া বোধ হয়। কবি নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্রের প্রসাদে এবং গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন।

কোন্ শকে জয়ানন্দের জন্ম ও কোন্ শকে চৈতন্যমঙ্গল সম্পূর্ণ হয়, এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান পুথিতে কোন কথা লিখিত নাই। তবে গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাবলী ও তখনকার বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহায্যে আমরা মোটামুটী কালনির্ণয় করিতে পারিব।

চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস অবস্থায় নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তৎপূর্ব্বেই জয়ানন্দের জন্ম হইয়াছিল, তাহা কবির নিজ রচনা হইতেই জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিঞা সন্ন্যাস। আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে। কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃতে ভাসাল সকলে॥"

চৈ-চরি ১ম খং ১৩ পরিং।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত বচনানুসারে জানা যাইতেছে, ১৪৩১ শকে মহাপ্রভু গৃহ ত্যাগ করেন, তৎপরে তিনি ৬ বর্ষ অর্থাৎ ১৪৩৭ শক পর্য্যন্ত একবার নীলাচল, একবার গৌড়, একবার বৃন্দাবন, একবার দক্ষিণাপথ, এইরূপে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। এরূপ স্থলে তিনি ১৪৩৭ শকের পূর্ব্বে জয়ানন্দের পিতৃনিবাস আমাইপুরা গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে জয়ানন্দের জন্ম হয়। যখন মহাপ্রভু প্রথম জয়ানন্দকে দর্শন করেন, তখনও তাঁহার জয়ানন্দ নাম হয় নাই, পিতামাতা 'গুইয়া' বলিয়া ডাকিতেন। তখনও

১। "শশীমুখী সখী সুবুদ্ধিমিশ্র জানি।
চৈতন্যের শাখা বাস অম্বিকাতে শুনি॥" (বৈষ্ণবাচারদর্পণ)

বৈষ্ণবাচারদর্পণ বেশী প্রাচীন গ্রন্থ নয়। বোধ হয় আমাইপুরা স্থানে ভ্রমক্রমে অম্বিকা নাম গৃহীত হইয়াছে।

বোধ হয় কবি শৈশব অতিক্রম করেন নাই, বড় হইলে তাহার নামটী পাকা হইয়া যাইত, তখন বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত আর নাম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত না। সাধারণতঃ শৈশবকালেই নামকরণ হইয়া থাকে। চৈতন্যপ্রভুর "গুইয়া" নামটী ভাল লাগে নাই, তাই তিনি 'জয়ানন্দ' নাম রাখিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে অনুমান ১৪৩৩ হইতে ১৪৩৫ শকের মধ্যে কবি জন্ম গ্রহণ করেন। কবি স্বচক্ষে চৈতন্যদেবের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই তাহার আভাস দিয়াছেন—

"নদীয়ার লোক যত তার তুমি আঁখি।
এ বোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাখি॥" (৯।১।৩)

কবি কোন্ সময়ে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন, তাহাই এখন বিবেচ্য।

কবি গ্রন্থের প্রথমাংশেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি বঙ্গীয় বৈষ্ণব গ্রন্থকার ও গ্রন্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকাটী উদ্ধৃত করিলাম—

"চৈতন্য অনন্ত রূপ অনন্তাবতার।　　অনন্ত কবীন্দ্রে গাএ মহিমা জাহার॥
রামায়ণ করিল বাল্মীক মহাকবি।　　পাঁচালী করিল **কৃত্তিবাস** অনুভবি॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়।　　**গুণরাজখান** কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর **চণ্ডীদাস**।　　শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।　　চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার॥
চৈতন্যসহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।　　**সার্ব্বভৌম** রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে।　　সংক্ষেপ করিল তিঁহি গোবিন্দবিজয়ে॥
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।　　**শ্রীবৃন্দাবনদাস** রচিল সর্ব্বোপরি॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।　　সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহি **পরমানন্দগুপ্ত**।　　গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপালবসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।　　চৈতন্য-মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।　　জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গাএ শেষে॥
আর শত শত কবি জন্মিব অপার।　　চৈতন্যমঙ্গল তাঁরা করিব প্রচার॥
চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব।　　আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ॥"

(২।২।৯—১২, ৩।১।১—৩)

উপরে যে কয়টী কবিতা উদ্ধৃত হইল, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যানুরাগীর নিকট সেই কবিতা কয়টীর মূল্য অধিক। ঐ কবিতা প্রমাণ করিতেছে, কবি জয়ানন্দের পূর্ব্বে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী, বৃন্দাবন-দাস, গৌরীদাস পণ্ডিত, পরমানন্দ গুপ্ত ও গোপালবসু নামক কবিগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ভক্ত বৈষ্ণবগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের

পরিচয় এখানে নিষ্প্রয়োজন, তাঁহাদের আদরের গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিতেছে, ঐ সকল কবির পরিচয়ও অনেকে অবগত হইয়াছেন; কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের "চৈতন্যচরিত্র" পরমানন্দপুরীর "গোবিন্দবিজয়," গৌরীদাস পণ্ডিতের "চৈতন্য-সঙ্গীত," পরমানন্দ গুপ্তের "গৌরাঙ্গ-বিজয়," এবং গোপাল বসুর "চৈতন্যমঙ্গল" এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ কয়জন দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন? আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গসাহিত্য সমুদ্রমন্থন করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বর্ণিত শত শত বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের মধ্যে আমরা এই কয়খানি গ্রন্থের নামোল্লেখও পাইলাম না। পুরাতন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় এখন যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। সুতরাং এই সকল গ্রন্থের সন্ধান করা বড়ই দুষ্কর। ঐ সকল গ্রন্থ বাহির হইলে চৈতন্য-জীবনের অনেক সমস্যা পূরণ হইতে পারে! বড়ই সুখের বিষয়, কৃত্তি-বাসকে আমরা যেমন বঙ্গের বাল্মীকি বলিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, কবি জয়ানন্দও তাঁহাকে যেন সেইরূপ ভাবিয়াই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, ১৪৫৭ শকে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। ১৪৯২ শকে লোচনদাসের সহিত বিরোধভঞ্জনার্থ বৃন্দাবনদাসের সেই চৈতন্য-মঙ্গল একটু রূপান্তরিত হইয়া 'চৈতন্যভাগবত' নামে প্রচারিত হয়। ১৪৫৭শকের পরে অর্থাৎ বৃন্দাবনের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইবার পরে যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, তৎপূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না? বোধ হয় তখনও চৈতন্যভাগবত নাম হয় নাই। তাহা হইলে কবি জয়ানন্দ বিশেষ করিয়া বৃন্দাবনের ভাগবত নাম অথবা ভাগবত-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসের গ্রন্থগত নাম লইয়া বিরোধ, তখন-কার বৈষ্ণব-সমাজ একেবারে বিস্মৃত হন নাই। এদিকে দেখা যায় (অচ্যুত বাবুর মতে) লোচনদাস ১৪৫৯ শকে নরহরি সরকারের আদেশে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। কিন্তু কবি জয়ানন্দ লোচনদাসের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। এরূপ স্থলে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে যে, জয়ানন্দ লোচনদাসের পূর্ব্বে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ সন্দেহ জয়ানন্দের লেখাতেই ভঞ্জন হইবে। তিনি গ্রন্থের উপসংহারে অদ্বৈত প্রভুর দেহত্যাগের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ১৪৮০ শকে অদ্বৈতাচার্য্য অপ্রকট হন। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ১৪৮০ শকের পরে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করেন। তবে এখন কথা হইতেছে, অদ্বৈতপ্রভু অপ্রকট হইবার বহুপূর্ব্বে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইলেও জয়ানন্দ তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন? তাহার দুইটী কারণ হইতে পারে, ১ম জয়ানন্দ একে লোচনদাস অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাহাতে

আবার লোচনের গ্রন্থ (অচ্যুত বাবুর মতে) চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকের রচনা, ইহাতে বালক কবির কবিতা-নৈপুণ্য ও অমানুষী বর্ণনা ব্যতীত চৈতন্য-জীবনের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বর্ণিত না থাকায়, তাঁহার নাম ও গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া জয়ানন্দ আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ—কবি জয়ানন্দ নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্রের একজন গোড়া ছিলেন, কবির রচনাতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ঠাকুর নরহরি চৈতন্যকে যে চক্ষে দেখিতেন, নিত্যানন্দকে তেমনটী মনে করিতেন না। এই কারণে নিত্যানন্দশিষ্য বৃন্দাবন নিজ গ্রন্থে ঠাকুর নরহরির নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তবে নরহরি চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ ছিলেন, তিনিই মহাপ্রভুকে চামরব্যজন করিতেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"কোন-কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ চামর ঢুলায়॥"

যে কারণে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নরহরির নাম করেন নাই, সেই কারণে নিত্যানন্দের শিষ্যাপুত্র জয়ানন্দ নরহরির প্রিয় শিষ্য লোচনদাসের নামটী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনিও বৃন্দাবনদাসের ন্যায়—

"আর আর শত কবি জন্মিব অপার।
চৈতন্যমঙ্গল তারা করিব প্রচার॥" (৩।১।২)

এই 'চৈতন্য মঙ্গল' প্রসঙ্গে বোধ হয় লোচনদাসের আভাস দিয়াছেন।[১]

যাহা হউক—এখন আমরা মোটামুটি আমাদের আলোচ্য চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল ধরিয়া লইতে পারি। অদ্বৈতাচার্য্যের অপ্রকট হইবার পর অর্থাৎ ১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ শকের পূর্ব্বে কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রচার করিয়াছিলেন। ভক্ত কবি নিজে চামর হস্তে দেশে দেশে চৈতন্যমঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

কবি চৈতন্য-জীবন ও গান পালা বিশেষে বিভক্ত করিবার জন্য ৯ খণ্ডে স্বীয় গ্রন্থের বিভাগ করিয়াছেন। তিনি এই ৯ খণ্ডের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"প্রথমেত আদিখণ্ড যুগ ধর্ম্ম কর্ম্ম। দ্বিতীয় নদীয়াখণ্ড গৌরাঙ্গের জন্ম॥
তৃতীয়ে বৈরাগ্যখণ্ড ছাড়ি গৃহবাস॥ চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ড প্রভুর সন্ন্যাস॥
পঞ্চমে উৎকলখণ্ড গেলা নীলাচল। ষষ্ঠে প্রকাশখণ্ড প্রকাশ উজ্জ্বল॥
সপ্তমেত তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি। অষ্টমে বিজয়খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী॥
নবমে উত্তরখণ্ডে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ। যুগাবতার যত করিল গৌরাঙ্গ॥
এই নবখণ্ড গীত চৈতন্যমঙ্গল। শুনিলে সকল পাপ যাএ রসাতল॥"(৩।১।৩-৬)

১। "শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনরহরি দাস। যাহার সঙ্কেত নিত্যানন্দের বিলাস॥" জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে এরূপ প্রয়োগ আছে, তাহাতে বোধ হয় নিত্যানন্দের সহিত নরহরির বেশ সদ্ভাব ছিল।

দেশের অবস্থা।

এই নবখণ্ড চৈতন্য-মঙ্গলে চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃদেবের নবদ্বীপে আগমন-কারণ ও তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা কবি জয়ানন্দ অতি সুললিত ভাষায় অকপটে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কথাগুলি তুলিয়া দিলাম—

"শ্রীহট্টদেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল। ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিঞা। নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইয়া॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র পুরন্দর। সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল সত্বর॥
কোন দেশে রহিব সভার অনুমান। এ দেশে না পাব রক্ষা চল অন্য স্থান॥
মোসভার বসতিযোগ্য গঙ্গার কূলে। নন্দ যেন ছাড়িলেন উৎপাতে গোকুলে॥
পূর্ব্বে মোরে কহিঞাছিলা এক যতিরাজ। এ দেশ ছাড়িঞা জাহ নদীয়া সমাজ॥
অনাচার দেশেতে বসতযোগ্য নহে। শ্রীহট্টে উত্তম লোক তিলার্দ্ধ না রহে॥
কৃষ্ণ আর্ত্তি রতি মতি সমাজে বসতি। তীর্থপূত জ্ঞানযুত জিতেন্দ্রিয় যতি॥
গঙ্গা বৈষ্ণব মহাপ্রসাদে বিশ্বাস। অল্প ভাগ্যে নহে লোক এ সবে প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নান করিব বসিব নবদ্বীপে। বৈকুণ্ঠনিবাস আর কিবা জপতপে॥
দিব্য দোলা চড়ি মিশ্র সবান্ধবে আসি। গঙ্গা নবদ্বীপ দেখি প্রেমানন্দে ভাসি॥
ভূমি স্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডলে। নানা বর্ণের লোক বসে জাহ্নবীর কূলে॥
চিন্তিঞা চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-কমল। জয়ানন্দানন্দে গাএ প্রভুর মঙ্গল॥

সুহইরাগ।

নানা চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী নানা জাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহরা নানা বর্ণে বৃক্ষলতা॥
জয় জয় ধন্য নদীয়া-নগরী অলকানন্দার কূলে।
কমলা ভাবিনী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুলমালে॥
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যানগরী বিজুরী ছটাক পড়ে॥
নাট পাঠশাল দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
মঠমণ্ডপ সুযন্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপণ॥
প্রতিদ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতিগলি নৃত্য-গীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ॥
দ্বিজরূপ ধরি দেবতা গন্ধর্ব্ব জন্ম লভিলা নবদ্বীপে।
হইঞা দ্বিজনারী ইন্দ্র বিদ্যাধরী সঙ্গীত গঙ্গা সমীপে॥
স্বর্গ ছাড়ি যত গন্ধর্ব্বমণ্ডলী জন্মিল বৈদ্যবনিতা।
দেবঋষি মুনি দ্বিজরূপ ধরি অধ্যয়ন শ্রুতি গীতা॥

গোধূলি সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খ ধ্বনি প্রতি ঘরে ।
শ্বেত চামর ময়ূর পাখা তাতে চন্দ্রাতপ শোভা করে ॥
ইষ্টকারচিত প্রাচীর প্রাঙ্গণ সুযন্ত্রিত গৃহদ্বারে ।
হিঙ্গুল হরিতাল কাঁচ ঢাল চৌখণ্ডি চৌকাঠসালে ॥
সালে রসাল বিশালক স্তম্ভ রাজিত চন্দ্রার্কতিলকে ।
ময়ূর শুক সারস পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে ॥
খাট পাট সিংহাসন আসন চৌখণ্ডি ময়ূর পাখা ।
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা ॥
ডাবর বাটা গুবাক সংপূট দর্পণ রসবাটিকা ।
তাম্রহাণ্ডি রসপিত্তলকলস বারাণসীর ত্রিপদিকা ॥
শঙ্খ বাটা বাটি সর্ব্বাঙ্গ থাল রসময় রসখুরি ।
তিরোহুত গাড়ু তাম্রমুখারমণ্ডল শীতল পিত্তল ঝারি ॥
পাষাণভাজন অতি সুগঠন খড়িকা রঙ্গিকাপড়া ।
উড়িআ গৌড়ীআ চিরণী বিচিত্র সাঁপুড়া ॥
টাড় গাঁঠ্যা কড়ি হিরণ্যমাদলী কেয়ূরকঙ্কণ রত্ননূপুরে ।
হেমকিয়া পাতা বিদ্রুম মুকুতা কাশ্মীরদেশের খুরে ॥
তবক সুরপান-বাটা কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি ।...
পাটনেত ভোট সকলাত কম্বল শ্রীরামখানি জমকা ।
ভোটভোট্টদেশের ইন্দ্রনীলমণি লক্ষ্মীবিলাসতারকা ॥
লেখিতে না পারি যত দাস দাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে ।
যে যে দ্রব্য সব ভুবন দুর্লভ বিকাএ নদীয়ার হাটে ॥
চিন্তিঞা চৈতন্য গদাধর প্রাণনাথ পদপঙ্কজ মকরন্দে ।
চৈতন্যমঙ্গল নিগম নিগূঢ় গাএ দ্বিজ জয়ানন্দে ॥

কাণাড়া রাগ ।

শচী গর্ভে অষ্টকন্যা যথাকালে হৈল । দৈবনির্ব্বন্ধে দিন কথো কাল গেল ॥
জগন্নাথমিশ্র হৈল মিশ্র পুরন্দর । সৎকবি পণ্ডিত মহাতার্কিক সুন্দর ॥
উগ্রতপ দেখি সর্ব্ব লোকে চমৎকার । স্নান সন্ধ্যা নিত্য শ্রাদ্ধ ভূদেব আচার ॥
বলি হোম জপ যজ্ঞ পূজা ধূপ দীপে । শ্রীভাগবত পাঠ করেন গোবিন্দ সমীপে ॥
আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ নাম । দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম ॥
নিরবধি ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞা । নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পালাইঞা ॥
তবে জগন্নাথমিশ্র দেখিঞা কৌতুকে । বিশ্বরূপ দশকর্ম্ম করি একে একে ॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয় । ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধন প্রাণ লয়ে তার জাতিনাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্দে। ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্যাগ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ। নবদ্বীপবিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিহ প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা। গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল। নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ম্ময় রাজা। রত্নসিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ-নিবাস করিল বারাণসী॥
বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যারণ্য নবদ্বীপে। ভট্টাচার্য্য শিরোমণি সভার সমীপে॥
নদীয়া উচ্ছন্ন হেন শুনি গৌড়েশ্বর। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখে মহা ঘোরতর॥
কালী খড়্গাখর্পরধারিণী দিগম্বরী। মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্দ করি॥
ধরিঞা রাজার কেশে বুকে মারে শেল। কর্ণরন্ধ্রে নাসারন্ধ্রে ঢালে তপ্ত তেল॥
আজি তোর গঙ্গাএ পেলিমু গৌড়পাট। সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট্॥
গৌড়েন্দ্র বলিল মাতা মোর দেহে থাক। নবদ্বীপ বসাইব যদি প্রাণ রাখ॥
নাকে খত দিল রাজা তবে কালী ছাড়ে। মূর্চ্ছা গেল গৌড়েন্দ্র ধরণীতলে পড়ে॥
প্রভাতে কহিল স্বপ্ন রাজার বিশ্বাসে। শুনিঞা আশ্চর্য্য স্বপ্ন সর্ব্বলোকে ত্রাসে॥
গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু। রাজকর নাহি সর্ব্ব লোক চাস চসু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে। রাজকর দণ্ডি হয়ে ত্রিশূল সে পরে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে। ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈষ্ণ ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বসে। নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥
নাট গীত বাদ্য বাজু প্রতি ঘরে ঘরে। কলসে পতাকা উড়ু মন্দির উপরে॥
পুষ্পের রাজার পড়ু গন্ধের উভার। শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক যন্ত্র জয় জয় কার॥
পূর্ব্বে যেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী। তার শতগুণ অধিক যেন শুনি॥
নবদ্বীপের সীমাএ যবন যবে দেখ। আপন ইচ্ছায় মার প্রাণ জার রাখ॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান। হাট ঘাট মানা নাহি করু গঙ্গাস্নান॥
নবদ্বীপের প্রজাএ কি মোর অধিকার। সত্য সত্য বলি আমি সংসারের সার॥
রাজার আজ্ঞাএ নবদ্বীপ পুন সৃষ্টি। শরৎকালে রাত্রিশেষে হৈল পুষ্পবৃষ্টি॥

মহা মহা জন যে ছাড়িঞাছিল গ্রাম। নবদ্বীপে আইল সভে পূর্ণ হৈল কাম ॥
চিন্তিঞা চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব। আনন্দে নদীয়াখণ্ড রচে জয়ানন্দ ॥"

উদ্ধৃত কবিতা কয়টী হইতে এইমাত্র জানিতে পারি, এক সময়ে শ্রীহট্টে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল। সেই মহা মড়কের সময় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পুরন্দর মিশ্র সস্ত্রীক নবদ্বীপে পলাইয়া আসেন। যে নবদ্বীপ এক সময়ে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের প্রিয় রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, মিশ্র মহাশয়ের আগমনকালে সেই নবদ্বীপের পূর্ব্বসমৃদ্ধি তখনও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও অসংখ্য মন্দির বিবিধ জাতির নিবাসভূত অট্টালিকাশ্রেণী নবদ্বীপের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপে যবনের ঘোরতর উপদ্রব বাড়িয়াছিল। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পিরলিয়া গ্রামের লোকেরা অনেকেই যবন হইয়া যায়। নবদ্বীপের উপর পিরলিয়া[১] গ্রামীদেরই কিছু বেশী আক্রোশ, তাহারা মুসলমান রাজাকে জানাইল যে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। যবনরাজ সে কথা শুনিয়া আর কি স্থির থাকিতে পারেন? নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া যবন করিবার আদেশ করিলেন। গৌড়াধিপের আজ্ঞায় পিরলিয়া গ্রামীরা আসিয়া যাহাকে যাহাকে পারিল, যবন করিতে লাগিল। এই উৎপাতের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই নবদ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম একজন। এই দুঃসময়ে বিশ্বরূপের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণাদির করুণ আর্ত্তনাদে মহামায়ার দয়া হইল। ভক্ত কবি লিখিয়াছেন, মহামায়া দিগম্বরী খড়্গখর্পরধারিণী ভীষণা কালী মূর্ত্তিতে নিদ্রিত যবনরাজের নেত্রপথে সমুদিত হইলেন। স্বপ্নে যবনরাজ অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহার মতিগতি ফিরিল, তিনি নবদ্বীপের উপর আর কোন অত্যাচার করিলেন না, নবদ্বীপবাসীকে অভয় দান করিলেন। এখানে একটী কথা বলিবার আছে। কবি জয়ানন্দ একজন পরম বৈষ্ণব ও তাঁহার খুড়া জ্যেঠা এবং পূর্ব্বপুরুষগণ রামোপাসক ছিলেন। তিনি বিষ্ণু অথবা হনুমান্ কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছরাজের দর্পচূর্ণকাহিনী বর্ণনা করিলেন না কেন? আমাদের বোধ হয় কবির বর্ণনার মধ্যে কিছু সত্য ঘটনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই শাক্তগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। শাক্তগণের কোনরূপ অনুষ্ঠানে দৈবগতিকে যবনরাজের মন ফিরিয়াছিল, তাই বোধ হয় ম্লেচ্ছাধিপ উত্ত্যক্ত নবদ্বীপবাসীকে অভয়দান করিয়া ছিলেন। বাস্তবিক মহাঝটিকার পূর্ব্বে সমুদ্র যেমন স্থির ভাব ধারণ করে, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপ সেইরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

তৎকালে গৃহস্থের তৈজসাদি ও বিলাসদ্রব্যের মধ্যে ডাবর, বাটা, পানের ডিবা, দর্পণ, রসবাটিকা, তামার হাঁড়ি, পিত্তল কলস, বারাণসী তেপায়া, বাটা বাটী, রসময় থাল, রসখুরি, ত্রিহুতের গাড়ু, পিত্তলের ঝারি, পাথরের বাসন, খড়িকারঙের কাপড়, উড়িয়া

১। বর্ত্তমান পিরালী সম্প্রদায়ের সহিত এই পিরলিয়া গ্রামীদের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি?

গৌড়িয়া কুলুপ, বিচিত্র চিরুণী, সাঁপুড়া, টাড়, গেঁঠো কড়ি, সোণার মাদুলী, কাশ্মীর দেশের খুর (?), কাঞ্চিদেশের বেলী, পাটের কাপড়, ভোট কম্বল, শ্রীরামখানি জমকা, ভোজভোট্টদেশের ইন্দ্রনীলমণি, লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। এ ছাড়া কৃষ্ণকেলি বসন, বিষ্ণুতৈল, লক্ষ্মীবিলাস খাট প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্যের কথাও জয়ানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়ানন্দ তখনকার খাদ্য সামগ্রীর এইরূপ একটী তালিকা দিয়াছেন—

"ব্যঞ্জনে লাঁফরা মুদ্গ স্থপ ছানাবড়ি।
ওলভাজা ঝোল বড়া নারিকেলকোরা বড়ি॥
বড় আম্লা কাঁজিবড়া দধিবড়া ক্ষীর ছেনা।
অমৃতগুটিকা দুগ্ধ কোরা চিনি পানা॥
মধুমণ্ডা ঘৃতমণ্ডা চিনিমণ্ডা পিঠা।
আর্শা ডালিমা আর পর্জুস কাকরা॥
সোসবড়া কন্দবন সাতপুলি সর্করা।
দেউলিসাকর মধু সাকবড়িয়া পুলি।
মরিচা ঝাঝরি মধুশ্রবা ঝিলিমিলি॥
দুঃখহরা মনোহরা খইচুর নবাত।
কৃষ্ণকেলি হংসকেলি ছাওয়া পারিজাত॥
হরিবল্লভ নয়নসুখ আর দুধারি।
চন্দ্রকাতি গঙ্গাজল অনুপান শিকরি॥
এরণ্ডি পদ্মফল ক্ষীরী ক্ষীরশা ক্ষীরড়া।
সোয়ারি সোমদণ্ডা হাতিশুণ্ডা দোহড়া।" ইত্যাদি

বিশেষ কথা।

কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র হইলেও এই মঙ্গলাখ্য গীত পুস্তক হইতে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায়, চৈতন্যভাগবতাদিতে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।

১ম। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, বঙ্গীয় চৈতন্যচরিতাখ্যায়কগণ কেবল এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীহট্টদেশের কোন স্থানে তাঁহারা বসবাস করিতেন এবং শ্রীহট্টে বসবাসের পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা লেখেন নাই। কিন্তু কবি জয়ানন্দ স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"শ্রীহট্টদেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম। সর্ব্ব সুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম॥
পূর্ব্বে সরস্বতী উত্তরদিগেতে গোমতী। পশ্চিমে ঢোলসমুদ্র দক্ষিণে করাতি॥
জয়পুরে শত শত ব্রাহ্মণের ঘর। দিব্যমূর্ত্তি মহাবিদ্যা মহা ধনেশ্বর॥
রবির মহাকুল মহাবংশপ্রসূত। দিগ্বিজয়ী নিজ দর্শনব্যাখ্যাচতুর্মুখ॥

হেন বংশে জগন্নাথমিশ্রের উৎপত্তি। শচী বিভা দিল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥
বাসুদেব চক্রবর্ত্তী জন্মিলা শ্রীহট্টে। শচী জগন্নাথ নাম ধরিলা নিকটে ॥" (৫।২।৫-৬)

এখন জানিলাম, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্ট প্রদেশের অন্তর্গত জয়পুর নামক স্থানে বাস করিতেন। এই জয়পুরের পূর্ব্ব সীমায় সরস্বতী, উত্তর সীমায় গোমতী, পশ্চিমে চোলসমুদ্র এবং দক্ষিণে করাতি।

এদিকে আবার শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ মধুকরমিশ্র শ্রীহট্টে আসিয়া বরগঙ্গা নামক স্থানে বাস করেন। তাঁহার অন্যতর মধ্যমপুত্র উপেন্দ্রমিশ্র কৈলাস পর্ব্বতের নিকট গুপ্ত-বৃন্দাবনে ইক্ষুনদীর পশ্চিম পারে অমৃত নামক গুপ্তকুণ্ডের সন্নিধানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তৎপুত্র জগন্নাথমিশ্র দেশে ব্যাকরণাদি শেষ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন[১]। এখানে জগন্নাথ মিশ্র নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন[২]।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, শ্রীহট্টে ভীষণ মারিভয় হওয়াতেই জগন্নাথমিশ্র পত্নী শচীদেবী ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে

১। "আসীৎ শ্রীহট্টমধ্যস্থো মিশ্রো মধুকরাভিধঃ।
পাশ্চাত্যবৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
বরেণাপ্যেব তেনেহ কিয়দ্ভূমি করোৎকরা।
বরগঙ্গেতি যো দেশঃ সুজনৈঃ পরিগীয়তে ॥
তস্য মধ্যস্থৈকপুত্রো হিত্বা দেশস্থ পৈতৃকম্।
শ্রীমদুপেন্দ্রমিশ্রাখ্যঃ প্রধানং স্থানমাগমৎ ॥
কৈলাসসন্নিধানে তু গুপ্তবৃন্দাবনং মহৎ।
ইক্ষু নাম্নী তস্য পূর্ব্বে কালিন্দী সদৃশী নদী ॥
বৃদ্ধগোপেশ্বরস্তত্র দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ।
কৈলাসস্যোত্তরে কুণ্ডং গুপ্তং পরমশোভনম্ ॥
আস্তেঽমৃতাখ্যং লোকৈস্তৎ কদাচিদপি দৃশ্যতে।
বভূবুঃ সপ্তপুত্রাশ্চ তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ ॥ (১ম সর্গ)।
ধীমন্তং স্বসুতং বীক্ষ্য জগন্নাথং গুণার্ণবম্।
কাতন্ত্রাদীনি শাস্ত্রাণি পঠয়ামাস স দ্বিজঃ ॥
আবেশং তস্য তত্রৈব দৃষ্ট্বা মিশ্রঃ প্রতাপবান্।
প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্বীপে মনোরমে ॥"

২। "নিশম্য গুণরূপাণি শ্রীলবৈদিকসত্তমঃ।
নীলাম্বরো দ্বিজবরো দ্রষ্টুং তং প্রযযৌ মুদা ॥
দৃষ্ট্বা তং নরশার্দ্দূলং চক্রবর্ত্তী স্বধর্ম্মরাট্।
অস্মৈ কন্যাং প্রদাস্যামি সুশীলায় মহাত্মনে ॥

আসিয়া বাস করেন। এরূপ স্থলে শ্রীহট্টে বাসকালেই জগন্নাথের সহিত শচীর বিবাহ হইয়াছিল স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপেই শচীর সহিত জগন্নাথের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন দুই বিভিন্ন মত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কোনটী প্রকৃত তাহার মীমাংসা করা উচিত। কিন্তু মীমাংসা করিবার আমরা যোগ্যপাত্র নহি। বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন কোন বহুদর্শী ব্যক্তি ইহার মীমাংসা করিলেই ভাল হয়।

আমাদের পরম সুহৃদ্ শ্রীহট্টবাসী অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় প্রদ্যুম্নমিশ্রকে চৈতন্যদেবের খুড়তাত ভাই ও তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এদিকে কবি জয়ানন্দও চৈতন্যের সমসাময়িক হইতেছেন। এরূপ স্থলে কাহার কথা বিশ্বাস করা যাইবে? জয়ানন্দ তখনকার নবদ্বীপবাসী অধিকাংশ ভক্তেরই সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ নবদ্বীপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সহজেই বোধ হয় তিনি স্বচক্ষে নবদ্বীপ দর্শন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া সকল বৈষ্ণবই শচী ঠাকুরাণীর চরণ দর্শন করিয়া যাইতেন। এরূপ স্থলে জয়ানন্দ যদি শচী ঠাকুরাণীকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট পূর্ব্বপরিচয় পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে জয়ানন্দের কথাই অধিক বিশ্বাস করিতে হয়। বিশেষতঃ শচীদেবীর নবদ্বীপে বিবাহ হইলে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ আহ্লাদের সহিত এ কথার উত্থাপন করিতেন। আরও দেখা যাইতেছে, কবি জয়ানন্দ চৈতন্যপার্ষদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী, পরমানন্দগুপ্ত প্রভৃতির রচিত চৈতন্যচরিত ও তৎকালীন চৈতন্যদেবের প্রধান প্রধান ভক্তগণের মুখে অনেক কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা কবি জয়ানন্দের বর্ণনাই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। শ্রীহট্টবাসী চৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস প্রথমে জয়পুর নামক স্থানেই ছিল, তৎপরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টবাসী চৈতন্যদেবের জ্ঞাতিগণ গুপ্তবৃন্দাবন বা বর্ত্তমান ঢাকা দক্ষিণনামক গ্রামে আসিয়া বাস করিলে সেই স্থানও চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট তীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকিবে।[৩]

ইতি নিশ্চিত্য মনসা গত্বা স নিজকেতনম্।
ভার্য্যায়ৈ কথয়ামাস মনসা যৎ কৃতন্ত তৎ॥
প্রাজাপত্যবিধানেন জগন্নাথায় ধীমতে।
শুভে দিনে প্রদদৌ তু শচীং স্বীয় সুতাং বরাম্।
কৃত্বা পাণিগ্রহং শচ্যা নবদ্বীপে দ্বিজোত্তমঃ।
জগন্নাথোঽবসৎ প্রীত্যা কান্তয়া শৌর্য্যায়াবৃতঃ॥" (চৈতন্যোদয়াবলী ২ সর্গ)।

৩। বঙ্গের পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ করায় তাঁহাদের মধ্যে ভরদ্বাজগোত্রের অভাব হইয়াছে। যথা—

শ্রীহট্টে বাস করিবার পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ কোথায় ছিলেন ? এ সম্বন্ধে জয়ানন্দ লিয়াছেন—

> "চৈতন্য গোসাঞ্রির পূর্ব্বপুরুষ আছিল যাজপুরে ।
> শ্রীহট্টদেশেরে পালায়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে ॥
> সেই বংশে পরম বৈষ্ণব কমললোচন তাঁর নাম ।
> পূর্ব্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি তাঁর ঘরে করিল বিশ্রাম ॥"(৪৮।২।১)

এখন জানা গেল, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকলের যাজপুরে বাস করিতেন। রাজা ভ্রমরের ভয়ে সেই স্থান হইতে তাহারা শ্রীহট্টদেশে পলায়ন করেন।

> "যোহি গৌরাঙ্গরূপেণ তারয়ামাস পাতকাৎ ।
> যন্নামকীর্ত্তনাল্লোকাঃ পৃথিব্যাং সাধকোত্তমাঃ ।
> ভবন্তি যস্য কর্ম্মাণি অত্যাশ্চর্য্যানি ভূতলে ।
> তস্য সন্ন্যাসনাদেব ভরদ্বাজো ন বিদ্যতে ॥" (বৈদিক কুলপঞ্জিকা ।)

এরূপ স্থলে চৈতন্যের জ্ঞাতিবংশের অস্তিত্বেও ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।

শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র যেরূপ বংশাবলী দিয়াছেন তাহা এই—
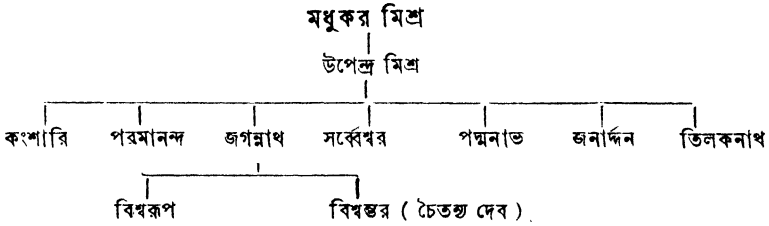
অচ্যুত বাবু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, শ্রীহট্টে ঢাকার দক্ষিণে চৈতন্যের জ্ঞাতি বংশীয় যে সকল ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাঁহাদের 'বৎস গোত্র ও পঞ্চম প্রবর।'

কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলপঞ্জিকায় যেরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ—

১০০২ শকে সমাগত চারি ব্রাহ্মণের অন্যতম জিতামিত্র মিশ্র, তৎপুত্র ২ মাধব, তৎপুত্র ৩ কন্দর্প, তৎপুত্র ৪ অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র ৫ বিশ্বপতি, তৎপুত্র ৪ ভর্গদেব, তৎপুত্র ৭ কার্ত্তিক, তৎপুত্র ৮ দর্পহারী, তৎপুত্র ৯ শিবরাম, তৎপুত্র ১০ রমাপতি, তৎপুত্র ১১ জগন্নাথ। জগন্নাথের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও নিমাই গৌরাঙ্গ (বংশাভাব)।

গোপীনাথ কণ্ঠাভরণরচিত চৈতন্য-চরিতেও ঠিক এইরূপ বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার কথা গুলি তুলিয়া দিলাম—

> "যতো জিতামিত্র স্তথাত্মজা ইহ কামেশরামেশ রমেশ মাধবাঃ।
> আদ্যত্রয়াণাং তনয়ো ন বিদ্যতে কন্দর্পকং পুত্রমবাপ মাধবঃ ॥
> তস্যানিরুদ্ধাহ্বয় নন্দনোঽজনি ততঃ সুতো বিশ্বপতীতি বিশ্রুতঃ।
> বভূব ভর্গাভিধ সন্ততিস্ততঃ প্রকীর্ত্তিতস্তস্য সুতশ্চ কার্ত্তিকঃ ॥
> শ্রীদর্পহারী তনয়োভবত্ততঃ স চ প্রপেদে শিবরামনন্দনং।
> শিবস্য পুত্রো বিদিতো রমাপতিস্ততো জগন্নাথ সমাহ্বয় দ্বিজঃ ॥

উৎকলের ইতিহাসে 'ভ্রমর' নামে কোন রাজার স্পষ্ট নামোল্লেখ নাই। এরূপ স্থলে কেহ হয়ত বলিতে পারেন, জয়ানন্দ এ নাম কোথায় পাইলেন? নামটী জয়ানন্দের মনঃকল্পিত নহে। কটক জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর হইতে উৎকলাধিপ কপিলেন্দ্র-দেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের "ভ্রমর" উপাধি দৃষ্ট হয়।* যে সময় মুসলমানরাজগণের প্রবল প্রতাপ সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময় এই ভ্রমরবর কপিলেন্দ্ররাজ মালব, গৌড় ও দিল্লীশ্বরগণের গৌরব খর্ব্ব করিয়া স্বাধীনতা ও হিন্দুপ্রতাপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২য়। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, হরিদাস ঠাকুর বুড়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীবিষ্ণুদাসেত্যভিধস্য ধর্ম্মিণো রথীতরস্যাত্মজমুখীং সহোদরাম্।
শচীতি নাম্নীং শ্রিয়মেব সুশ্রিয়া যতি র্জগন্নাথ ইবাগ্রহীৎ স চ ॥
ততঃ শচীগর্ভ সমুদ্ভবাবুভৌ যশোনিধানাবতি ভাববোধকৌ।
অপূর্ব্বরূপোঽপ্রতিমোঽপি পূর্ব্বজঃ শ্রীবিশ্বরূপেত্যভিধানধারকঃ ॥
বাল্যকালে বিহায়ৈব সর্ব্বান্ বিষ্ণুপরায়ণঃ।
সন্ন্যাসমুত্তমং মত্বা ধ্রুববৎ কাননং যযৌ ॥
শচী চ ক্লিষ্ট চিত্তাপি চৈতন্যাশাবশাদ্গৃহে।
গত্যন্তরবিহীনা সা নীতিজ্ঞাসীৎ সুনীতিবিৎ ॥
হরিনামপ্রচারায় কলিবধান্ত কর্ম্মণে।
পূর্ণিমায়াং শকাব্দেহ্ব্ধিবিয়দ্বেদবিধৌ ভবে ॥
ফাল্গুনে ফাল্গুনীযোগে গোগ্রহে রজনীমুখে।
শ্রীশচ্যা গর্ব্ভদুগ্ধাব্ধে গৌরচন্দ্রোদয়োঽভবৎ ॥
গোপীশো গৌরচন্দ্রঃ কলুষবিগলিতোঽসৌ কলেঃ কালরূপঃ।
সংসারেঽসারসারে স্মরশরশমনঃ সারসন্ন্যাসিশিষ্টঃ ॥
ইতীব শাঠ্যেন শঠঃ শঠাশিরো বিরাগরাগৈরভিরঞ্জিতাকৃতিঃ।
শাকে শশাঙ্কানলবেদচন্দ্রমে বিহায় গেহং প্রজাগাম কাননং ॥"

উপরে যে দুইটী তালিকা দেওয়া গেল, কেবল জগন্নাথমিশ্রের নাম ভিন্ন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর কোন নামে মিল নাই। এরূপ স্থলে কোনটী প্রকৃত ও কোনটী অপ্রকৃত, তাহা স্থির করা বিষম সমস্যার বিষয়। গোস্বামী-পাদগণ এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিলে ভাল হয়। তবে বলিয়া রাখি, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বংশাবলী লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা যেমন বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, সেইরূপ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যেও সমাজদারগণ বহুকাল হইতে বংশাবলী লিখিয়া অতি যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এরূপ স্থলে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রাচীন কুলপঞ্জিকায় যে বংশাবলী রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এককালে উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

* বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ গোপীনাথপুর শব্দ দ্রষ্টব্য।

"বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥" (চৈ॰ ভা॰ আদিখণ্ড)

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহার 'হরিদাস ঠাকুরের জীবন-চরিতে' লিখিয়াছেন, বুড়নে হরিদাসের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম সুমতি শর্ম্মা ও মাতার নাম গৌরীদেবী। কিন্তু আমাদের আলোচ্য চৈতন্য-মঙ্গলে কবি জয়ানন্দ এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"একদিন নাচে গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে। হরিদাস ঠাকুর আসি মেলিলা স্বরূপে॥
মহাবৈরাগ্য শুদ্ধ হেম কলেবর। উজ্জ্বলা মায়ের নাম বাপ মনোহর॥
স্বর্ণদীতীরে ভাট কলাগাছি গ্রাম। হীনকুলে জন্ম হয়ে উপরি পূর্ব্বনাম॥"(১৪।২।১১-১৩)

উক্ত কবিতানুসারে হরিদাস ঠাকুরের মাতার নাম উজ্জ্বলা, পিতার নাম মনোহর, তিনি গঙ্গাতীরে কলাগাছি গ্রামে (ভাটবংশে ?) হীনকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

এখন কথা হইতেছে, বৃন্দাবনদাস জয়ানন্দের অনেক পূর্ব্বে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, জয়ানন্দও তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ বৃন্দাবনের পুস্তক দেখিয়া শুনিয়া জয়ানন্দ হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে এরূপ ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন কেন? জয়ানন্দ হরিদাসের মাতা পিতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু বৃন্দাবন কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, বৃন্দাবন অপেক্ষা জয়ানন্দ হরিদাস ঠাকুরের বেশী পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনদাসের ভ্রমটী সংশোধন করিয়াছেন এইরূপ অনুমিত হয়। বুড়নের সহিত হরিদাসের বিশেষ সংস্রব ছিল, তাহাও কবি জয়ানন্দ জানিতেন। সে কথাও তিনি লিখিয়াছেন—

'বুড়ন হইতে আইল হরিদাস।" (৭৩।২।৯)

বুড়নে হরিদাসের অনেক লীলাখেলা হইয়াছিল, বোধ হয় সেই জন্যই বৃন্দাবন বুড়ন হরিদাসের জন্মস্থান মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার জন্মস্থান কলাগাছি গ্রাম।

৩য়। অনেকে বলিয়া থাকেন, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্গী গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ কর্ম্মকার নহেন। কিন্তু কবি জয়ানন্দ মহাপ্রভুর অনুসঙ্গিগণের মধ্যে স্পষ্ট গোবিন্দ কর্ম্মকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

"হেনকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসি।
সন্ন্যাসরহস্য যত গৌরাঙ্গে প্রকাশি॥
শুনিঞা আনন্দময় হৈল গৌরচন্দ্র।
গঙ্গা পার হৈঞা আগে রৈলা নিত্যানন্দ॥
মুকুন্দদত্ত বৈদ্য **গোবিন্দ কর্ম্মকার**।
মোর সঙ্গে আইস নদীয়া গঙ্গাপার॥
আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর আচার্য্য হরি।
বাসুদেব দত্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগাই গঙ্গাদাস।
তোমা সভা বিদ্যমানে লইব সন্ন্যাস॥" (৪২।২।৪ ৫)

'গোবিন্দ দাসের কড়চা' নামে যে চৈতন্যজীবনী প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত।

৪র্থ। কোন কোন চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়াছেন, সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব যখন প্রথম নীলাচলে যাত্রা করেন, তৎকালে গৌড়াধিপের সহিত উৎকলরাজের যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই জন্য রামচন্দ্র খাঁন তাঁহাকে প্রথমে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়ানন্দের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন কথাই লেখা নাই। বরং জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, যে সময় নীলাচলে মহাপ্রভু অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় একবার উৎকলাধিপ প্রতাপরুদ্রের বঙ্গজয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব গৌড়াধিপের প্রভূত পরাক্রমের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। কোন সময় এ প্রসঙ্গ ঐতিহাসিকগণের সামান্য কাজে আসিতে পারে ভাবিয়া জয়ানন্দের কথাগুলি তুলিয়া দিলাম—

"এই মতে আছেন (চৈতন্য) বৎসর দুই চারি। গৌড়ে উৎকলে পড়িল মহা সাড়ী॥
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ। শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাস॥
চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল। প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্রে কুবুদ্ধি লাগিল।
কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর। সিংহ শার্দ্দুল দেখ কতেক অন্তর॥
ওড্রদেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে। জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এতদিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর। গৌড়মুখে শয়ন ভোজন পাছে কর॥
কাঞ্চিদেশ জিনি কর নানা রাজ্য। গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে। তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইব উৎকলে॥
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র। বিজয়ানগরে গেলা করিবারে যুদ্ধ॥"

(বিজয়খণ্ড ৭০।২ পৃঃ)

৫ম। এখন যেমন ইংরাজ রাজত্বে অনেক শিক্ষিত হিন্দু ইংরাজী অনুকরণ করিতে ছাড়েন না, সেইরূপ মুসলমান প্রাধান্যকালে মুসলমানী অনুকরণ চলিতেছিল, তখনকার সমাজ লক্ষ্য করিয়া জয়ানন্দ চৈতন্যের মুখে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

"শূদ্রাণী লইয়া ঘর করিব ব্রাহ্মণে। কন্যা বিচিবেক যে সব শাস্ত্রে জানে॥
ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ী পারস্য পড়িবে। মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে॥
মনসরিয়া বৃত্তি সে করিব দ্বিজবরে। ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তরে॥
শূদ্র জগদ্গুরু হব ম্লেচ্ছ হবেক রাজা। রাজা সর্ব্বস্ব হরিবেক দুঃখিত হব প্রজা॥"(৭০।১)

৬ষ্ঠ। মহাপ্রভু কিরূপে অন্তর্ধান করিলেন, সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী ভক্ত বৈষ্ণব লেখকগণ কেহ স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। অনেক ভক্ত বৈষ্ণবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সেই নিদারুণ কথা প্রকাশ করিতে নাই, সে কথা মনে

হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু আমাদের জ্ঞাতব্য সেই বিশেষ কথাটী যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈষ্ণব লেখক স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই, ভক্ত কবি জয়ানন্দ পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—

"নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে। বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল একক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥
আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে। ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে। নিভৃতে তাঁহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্বপারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটাএ শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোঁসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানাবর্ণে দিব্যমালা আইল কোথা হইতে। কত বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ। গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ॥
মায়াশরীর তথা রহিল সে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥
অনেক সেবক সর্প দংশ হৈঞা মইলা। উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈলা॥"

(৭৫।২।১৪-১৫,৭৬।১।১-৩)

এখন আমরা জানিলাম, রথযাত্রার সময়ে গৌরাঙ্গের কোমল পদাঙ্গে একটী ইষ্টকের আঘাত লাগে। কিন্তু তখন তেমন বেদনা হয় নাই। তিনি সর্ব্ব পারিষদ্ সঙ্গে শেষবার নরেন্দ্র-সরোবরে জলক্রীড়া করিলেন। ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া উঠিল। টোটাশ্রমে শয়নাবস্থায় তিনি পণ্ডিত গোঁসাইকে কহিলেন, আগামী কল্য দশ দণ্ড রাত্রে মায়া শরীর ত্যাগ করিব। এইরূপে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে চৈতন্য লীলা সম্বরণ করিলেন।

ভাষা।

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপাদি অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, কবি জয়ানন্দ সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তখনও বঙ্গভাষা ব্যাকরণের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, এখনকার বঙ্গভাষার সহিত তখনকার ভাষার অনেকটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। জয়ানন্দের গ্রন্থে ক্রিয়ায় নাম পুরুষ, কর্ত্তার উত্তম পুরুষ, আবার কর্ত্তার নাম পুরুষ, ক্রিয়ার উত্তমপুরুষ, তৃতীয়ায় "তে" বিভক্তি, সপ্তমীর "তে" স্থলে "এ" বা "ত" এবং মধ্যম পুরুষে 'সি' প্রয়োগ প্রভৃতি নানারূপ দৃষ্ট হয় *। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম;—

* পুঁথির সর্ব্বত্রই প্রাকৃত নিয়মানুসারে "য়" স্থানে "জ", যেমন জায়—(বর্ত্তমান যায়) এবং পদান্ত "য়া" স্থানে "আ" প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন চিন্তিআ।

১। করিল=করিলাম।

"কান্দে ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষাদ ভাবিঞা।
কোন কর্ম্ম করিল ব্রহ্মপুরী গিঞা॥" (৫৬।২।৬।)

২। যায়=যাও। খায়=খাও।

"ব্রহ্মচারী হৈলা তুমি হবিষ্যান্ন খায়।
আমি সব পড়ি তুমি পড়িতে না যায়॥" (১৩।২।১৩।)

৩। এ=(সপ্তম্যন্ত) তে।

"হেন বেলাএ দ্বারকাএ পড়িল প্রমাদ।" (৫৯।১।৫।)

৪। ত=(সপ্তম্যন্ত) তে।

"সপ্তমেত তীর্থখণ্ডে নানাতীর্থ করি।" (৩।১।৫।)

৫। সি (মধ্যম পুরুষে)।

"ঈষৎ হাসিআ প্রভু তাহারে জিজ্ঞাসি।
আমারে ভাণ্ডিআ বেটা মন্দিরে পালাসি॥"

৬। বোলাহ=বল।

"তুমি কৃষ্ণ-চৈতন্য বোলাহ সন্ন্যাসী-মণি॥" (৬৬।১।১৫।)

৭। বলু=বল বা বলহ।

"প্রতিজ্ঞা করিঞা বলু মোর বিদ্যমানে।" (৫২।১।৯।)

৮। ছাড়িব=ছাড়িবে।

"লক্ষ্মী কভু না ছাড়িব তোমার তপ বলে।" (৫৭।২।১৩।)

৯। সাজাব=সাজাইবে।

"বিপ্রগণ ভোগ আছে সাজাব সতত।" (৫৮।২।১৪।)

১০। পেলাইয়া=ফেলাইয়া।

"হাথের মোহন পুথি দূরে পেলাইয়া।" (১৪।১।১৭।)

১১। ইবে=এবে, এখন।

"ইবে অভাগিনী হইলাঙ্ হেন প্রায় বাসি।" (৪২।১।১৮।)

১২। তমু=তবু, তথাপি।

"তমু এই স্থান না ছাড়িব কোন কালে।" (৬১।২।৮।)

১৩। তথির=তাহার।

"যদুবংশ ক্ষয় হএ তথির লাগিঞা।" (৫৯।১।১২।)

১৪। নৈ=নদী।

"কটক দেখি স্নান করি মহানৈ কূলে।" (৫২।২।৬।)

১৫। ওড়স্যা=উড়িষ্যা।

"ওড়ন্তার ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা লোকে ঘোষে।" (৫৭।২।১৫ ।)

১৬। দেলু=দেউল, দেবালয়।

"জগন্নাথের দেলু রহি সিংহাসন মাঝে।" (৫৩।১।৫ ।)

এতদ্ভিন্ন অনেক অপ্রচলিত শব্দেরও প্রয়োগ আছে, সহজে তাহাদের অর্থগ্রহ হয় না। প্রমাণ স্বরূপ কতকগুলি উদ্ধৃত হইল ;—

১। চামালি।

"নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে রসের চামালি।" (৭৬।২।২৫ ।)

২। মগরা।

"বিংশতি যোজন ক্ষেত্র নগর মথুরা।
পূর্ব্বে কাগার ছিল ইবে সে মগরা॥" (৬৮।২।৮ ।)

৩। নাছ।

"জন্মে জন্মে হঙো তাঁর নাছের কুকুর॥" (২।১।৩ ।)

৪। উভার।

"পুষ্পবৃষ্টি নীলাচলে গন্ধের উভার।" (৪৯।২।৪ ।)

৫। চিড়িপো *।

"আমা সঙ্গে বিবাদ করিল চিড়িপো। (৫২।১।১৩ ।)

৬। ফেট *=বন্ধ করা।

"পুনরপি দ্বার ফেটি দেউল প্রবেশিল।"

৭। সম্ভেট *=সাক্ষাৎকার।

"জগন্নাথের আজ্ঞা সার্ব্বভৌমে কপাট ফেট।
চৈতন্য গোসাঞি করাহ সম্ভেট॥" (৫২।১।১৫ ।)

৮। এলঙ্কা=এড়কা।

"মুসলের কক্ষে যত এলঙ্কা জন্মিল।
সেই এলঙ্কার যুদ্ধে যদুবংশ মৈল॥" (৫৯।২।১৩ ।)

৯। উদ্‌গ্রাহ।

"উদ্‌গ্রাহ করিতে চৈতন্য গোসাঞি জান॥" (৬২।২।১০ ।)

১০। ঠাসিঠুসি=ঠুক্‌ঠাক্।

"ঠাসিঠুসি শব্দ শুনি দেলু ভিতরে।" (৫৯।২।১৩ ।) ইত্যাদি।

কবিত্ব।

চণ্ডীদাস অথবা বিদ্যাপতির মত জয়ানন্দ প্রথম শ্রেণীর প্রেমিক কবি নহেন ও ভক্ত হইলেও আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ত্বপ্রকাশে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমানও হইতে পারেন না,

* এই শব্দ গুলি উৎকল ভাষায় এখনও প্রচলিত আছে।

লোকচরিত্র চিত্রনে বা স্বভাবের শোভায় বিমুগ্ধ করিতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বা ঘনরামের আসন গ্রহণ করিতেও সমর্থ নহেন না কিম্বা ভাষার ওজস্বিতায় কাশীরাম দাসের সমকক্ষ নহেন; তথাপি কিন্তু ভক্তের কাছে, ভক্তির সরল আলেখ্য দেখিয়া যাঁহারা বিমুগ্ধ হন তাঁহাদের নিকট, কবি জয়ানন্দ একজন সামান্ত ব্যক্তি নহেন। কবিরাজ গোস্বামীর মত তিনিও একজন বিনয়ী কবি। তিনিও বহুস্থলে—

"বৈষ্ণব চরণ ধূলা লাগু মোর গাএ।
সবংশে বিকায়ু মুঞি বৈষ্ণবের পাএ॥"

এরূপ সরল প্রাণের কথায় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণের অমূল্য নিধি বিনয় হইতে কবি জয়ানন্দ বঞ্চিত ছিলেন না। এই মহাগুণেই তাঁহার তুলিকায় শ্রীচৈতন্যদেব বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ প্রতিফলিত হইয়াছেন। করুণ রস বর্ণনায় কবি অনেকটা সিদ্ধ হইয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহার করুণ রসাশ্রিত সরল পদগুলি পড়িতে পড়িতে ভাবাবেশে অনেক সময় হৃদয় গলিয়া যায়। মহাপ্রভু যে দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তৎপূর্ব্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার যে সকল কথা হয়, তাহা বাস্তবিক হৃদয়স্পর্শী। তৎকালে কবি জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে এইরূপ বারমাস্যা বর্ণনা করিয়াছেন—

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে। (ধ্রু)

ফাল্গুনে পৌর্ণমাসী তোমার জন্ম দিনে। উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান কর গৃহাঙ্গনে॥
পিষ্টক পায়স পুষ্প ধূপ দীপ গন্ধে। সংকীর্ত্তনে নাচে প্রভু পরম আনন্দে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

তোমার জন্মতিথি পূজা। আনন্দিত নবদ্বীপ বৃদ্ধ বাল্য যুবা॥ ১॥
চৈত্রে চাতক পক্ষ পিউ পিউ ডাকে। শুনিয়া যে প্রাণ করে কি কহিব কাকে॥
প্রচণ্ড উদ্ভট বাত তপ্ত সিকতা। কেমনে ভ্রমিবে প্রভু পাদাম্বুজে বার্ত্তা॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

তোমার নিদারুণ হিয়া। গঙ্গাএ প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া॥ ২॥
বৈশাখে চম্পকমালা নূতন গামছা। দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি-বসনের কোঁছা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সরু পৈতা কান্ধে। রূপ দেখিয়া কুলবধূ বুক নাহি বান্ধে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

বিষম বৈশাখের রৌদ্রে। তোমার বিচ্ছেদে মরি দুঃখ-সমুদ্রে॥
বসন্তে কোকিল পাখী ডাকে কুহু কুহু। তোমা দেখিয়া মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
চূতাঙ্কুর খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোল। তুমি দূরদেশে আমি জুড়াব কার কোল॥
মোরে না যাইও ভাণ্ডিঞা। মনের পোড়নি কারে কহিব ভাঙ্গিঞা॥ ৩॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে সুবাসিত জলে স্নান করাইব। দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি অঙ্গে পরাইব॥
গঙ্গাজল চামরে চৌদিকে দিব বা। হৃদয়ে তুলিয়া থুব দুখানি রাঙ্গা পা॥

আমি কি বলিতে জানি। বিষ হেন কান্তে যেন ঝুমির্ল হরিণী ॥ ৪ ॥
আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাহুরির নাদ। দারুণ বিধাতা মোরে লাগিল বিবাদ ॥
মেঘের শবদ শুনি ময়ূরের নাট। কেমনে বঞ্চিব আমি নদীয়ার বাট ॥ ৫ ॥
লক্ষ্মীবিলাস গৃহে পালঙ্ক শয়নে। সে সব চিন্তিতে আমি না জীব শ্রাবণে ॥
প্রভু তুমি বড় দয়াবান। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি প্রভু কর অবধান ॥ ৬ ॥
ভাদ্রে ভানুতাপ সহনে না যাএ। কাদম্বিনী নাদে নিদ্রা মদন জাগাএ ॥
যার প্রাণনাথ ভাদ্রে নাহি থাকে ঘরে। প্রাণ উচাটন তার বজ্রাঘাত মারে ॥
বিষম ভাদ্রের খরা। জীয়ন্তেই মরা প্রাণনাথ নাহি জারা ॥ ৭ ॥
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা আনন্দিত মহী। কান্ত বিনু সেই দুঃখ কার প্রাণে সহি ॥
শরৎ সময় শোভা নদীয়া নগরী। গৌরচন্দ্র রমণী তারকা সারি সারি ॥
মোরে কহ উপদেশ। যথাতথা থাক প্রভু করিহ উদ্দেশ ॥ ৮ ॥
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয় বা। করঙ্ক কৌপীনে কত আচ্ছাদিবে গা ॥
কত পুণ্য করিঞা হইলা যে তোমার দাসী। ইবে অভাগিনী হইলাঙ হেন প্রায় বাসী ॥
তুমি সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী। তোমার সমুখে আমি কি বলিতে জানি ॥ ৯ ॥
হেমন্ত নূতন ধান্য জগৎ প্রকাশে। সর্ব্ব সুখময় গৃহে কি কাজ সন্ন্যাসে ॥
পাটনেত ভোট সকলাত কম্বল। সুখে নিদ্রা যায় আমি থাকি পদতল ॥
তুমি সর্ব্ব জীব অধিকারী। কত সুখ বিনোদ হঞা দণ্ডধারী ॥ ১০ ॥
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে। কান্ত আলিঙ্গনে শীত তিলেক না থাকে ॥
তপ্ত জলে স্নান তোমার অগ্নি জলে পাশে। নানা সুখ আমোদ করহ গৃহবাসে ॥
পৌষে প্রবল শীত তোমারে না সহে। কীর্ত্তন অধিক সে সন্ন্যাসধর্ম্ম নহে ॥ ১১ ॥
মাঘ মাসে স্নান কর হবিষ্যান্ন খায়। শ্রীভাগবত পঢ় আর শিষ্যেরে পঢ়ায় ॥
বলি বৈশ্ব শ্রাদ্ধ কর ভূদেব আচার। পবিত্রতা দেখি নবদ্বীপে চমৎকার ॥
বিষম মাঘ মাসের শীত। কত নিবারণ দিব এ দারুণ চিত ॥ ১২ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী যত কৈল নিবেদন। দৃক্‌পাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ ॥
শ্রবণ যুগলে প্রভু দিঞা দুই হাত। জয়ানন্দ বলে প্রভু অনাথের নাথ ॥" (বৈরাগ্যখণ্ড)

উপরে যে বারমাস্যা উদ্ধৃত হইল, উহা হইতেই কবির ভাবশুদ্ধ সরল রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া ইতিপূর্ব্বে কবির বর্ণিত নবদ্বীপের বর্ণনা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও কবির কবিত্বের পরিচয় আছে। কিন্তু উপরে যে বারমাস্যা উদ্ধৃত করিলাম তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। পদকল্পতরুর ১৭৮৩ সংখ্যক পদেও আমরা উক্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা দেখিতে পাই। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, কেবল মাঘ মাসের বর্ণনা ব্যতীত আর সকল অংশে তাহার সহিত আমাদের উদ্ধৃত বারমাস্যার মিল আছে। যে টুকু মিলেনা তাহা এই—

"মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এইত দারুণ শেল রহল সংপ্রতি। পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে লহ নিজ পাশ। বিরহ সাগরে ডুবে এ লোচনদাস॥"

পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদে লোচনদাসের ভণিতা দৃষ্টে অনেক বৈষ্ণবেই আমাদের আলোচ্য বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা লোচনদাসের রচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখন আমরা যেরূপ প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে বৈষ্ণব-সমাজে প্রশংসিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা লোচনের রচনা নহে বলিয়াই মনে হইতেছে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্য-প্রেমবিলাস নামক গ্রন্থে তাঁহার অনেক পদ আছে, তন্মধ্যে চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গে তিনি এই বারমাস্যার কিছুমাত্র আভাস দেন নাই। তাঁহার রচনা হইলে তাঁহার রচিত চৈতন্যমঙ্গল অথবা চৈতন্যপ্রেমবিলাসে যথাস্থানে আমরা উক্ত বারমাস্যাটী পাইতাম; কিন্তু যথাস্থানে না থাকায় অপরের রচনা বলিয়াই মনে হইতেছে। আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন যে পদকল্পতরুর দেড়শত বর্ষের প্রাচীন পুথিতে লোচনের ভণিতাযুক্ত উক্ত বারমাস্যা তিনি পান নাই। বিশেষতঃ যখন দুইশত আট বর্ষের প্রাচীন পুথিতে জয়ানন্দের ভণিতাযুক্ত পদ রহিয়াছে, এবং যতদিন না তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রাচীন পুথিতে লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত উক্ত পদ না বাহির হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা এই বারমাস্যা জয়ানন্দের বিরচিত বলিয়াই গ্রহণ করিব। জয়ানন্দ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈষ্ণব লেখকগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যদি লোচনের পদ হইতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি অকপটচিত্তে লোচনদাসের নামোল্লেখ করিতে কাতর হইতেন না। কেবল আমাদের সংগৃহীত একখানি পুথিতে নহে, এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত বৈরাগ্যখণ্ড নামক জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের অংশ বিশেষে এবং সংপ্রতি সংগৃহীত আর একখানি প্রাচীন পুথিতে কেবল জয়ানন্দের ভণিতা পাইয়াছি। এই সকল কারণে উদ্ধৃত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা জয়ানন্দের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

জয়ানন্দের ভাষা ও কবিত্ব সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে কেবল জয়ানন্দ গ্রন্থের উপসংহারে যে সংক্ষিপ্ত চৈতন্যজীবনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"প্রথমে প্রভুর জন্ম কর্ম্ম সুপ্রকাশ। ফাল্গুন মাসে রাহু চন্দ্র সর্ব্বগ্রাস॥
নিমাঞি গৌরাঙ্গ আদি বিশ্বম্ভর নাম। এই তিন নাম ভুবন মঙ্গলধাম॥
পাদপদ্ম ধ্বজবজ্র অঙ্কুশ চিহ্ন দেখি। শচী জগন্নাথমিশ্র মনে বড় সুখী॥
ছয় মাসে নিদ্রাচ্ছলে পালঙ্ক-শয়ন। শিরে সর্প দণ্ড ধরে দেখে সর্ব্বজন॥
ক্রন্দনের ছলে কত কত কত মায়া করি। সর্ব্বলোক মুখে বোলাএ হরি হরি॥
শিশু সঙ্গে রঙ্গে নিত্য গৃহাঙ্গন মাঝে। লবে বলে কনক নূপুর পাএ বাজে॥
ধনলোভে মারিবারে লৈঞা গেলা চোরে। চোর ভ্রমাঞিঞা প্রভু আইলেন ঘরে॥

শিশুসঙ্গে গঙ্গাতটে বালির আওআসে। হাথতালি দিয়া তথা কীর্ত্তন প্রকাশে॥
রুষিআ মাএর মুখে ইটাল মারিঞা। তুলসী মঞ্জরী দিলা ভক্তি প্রচারিঞা॥
রাত্রিদিনে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে। নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরি-বাসরে॥
এক বিপ্র কৃষ্ণে অন্ন নিবেদিঞা আইলা। ছুইঞা তাহার অন্ন ব্যঞ্জন খাইলা॥
সুদর্শন পণ্ডিত সে হাথে দিল খড়ি। চৈতন্যেত গুরুতে মারিল পুথির বাড়ি॥
করে দিন কর্ণবেধ সময় হইলে। স্বর্গ হইতে মালা পড়ে গণেশ-ঘট উপরে॥
ছালিয়াধরা রাজার দূত খাইলেক সর্পে। কৃষ্ণ বোলাইয়া তার ঘুচাইল গর্ব্বে॥
পাটুআ শ্রীধরের পাটুআ চুরি করি। উদ্ধত হইলা কারো বচন না ধরি॥
বুঢ়ন হইতে আইলা শ্রীহরিদাস। সাঁপে মুক্ত করিল কুক্কুর গঙ্গাদাস॥
কুলবধূ সভার পূরিল অভিলাষ। অল্পকালে জ্যেষ্ঠ ভাই করিল সন্ন্যাস॥
শুভক্ষণে চূড়া উপনয়ন করিল। কামিনীমোহনরূপ গৌরাঙ্গ ধরিল॥
কলাপে আলাপ করি হৈলা অধ্যাপক। শব্দ অর্থ বাখানিতে পণ্ডিত হএ বক॥
নবদ্বীপে বিদিত পণ্ডিত গঙ্গাদাস। তাঁর ঘরে সর্ব্ববিদ্যা করিল প্রকাশ॥
কলাপে আলাপ মাত্র সকল জানিলা। বিবাদ করিঞা নবদ্বীপে পড়াইলা॥
বৈকুণ্ঠবিজয় কৈল মিশ্র পুরন্দর। লক্ষ্মী বিভা করিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
প্রতি সূত্রে শব্দ বাখানিলা বিষ্ণুভক্তি। সে বাখান বুঝে হেন নাহি কারো শক্তি॥
তবে প্রভু করিলেন দিগ্বিজয়ী জয়। শেষে তার করিলেন সর্ব্ববন্ধ ক্ষয়॥
গদাধর শ্রীনিবাসে কহিঞা বিশেষে। ধন উপার্জ্জন ছলে গেলা বঙ্গদেশে॥
প্রাচ্যভূমি বঙ্গদেশ তীর্থ হৈল তথা। সর্পাঘাতে বৈকুণ্ঠে চলিলা লক্ষ্মীমাতা॥
বঙ্গ হৈতে আসি বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা করি। আনন্দে ভ্রমিঞা বুলেন নদীয়া নগরী॥
বাপ মরিতে গয়া যাইতে দেখি ঈশ্বরপুরী। রাজগিরি পর্ব্বতে রহি তাঁরে কৃপা করি॥
পাপভার খণ্ডাইল বিপ্রপাদোদকে। মুনীন্দ্র মাধবেন্দ্রপুরী মঠে ষড়্ভুজ দেখে॥
গয়াশিরে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান দিলা। একে একে বংশাবলী সব উদ্ধারিলা॥
গয়াতে গৌরাঙ্গ বড় বাঢ়িল মহিমা। চরণ পরশে মুক্ত পাষাণপ্রতিমা॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী তারে পাদোদক দিল। পাদোদক খাঞা বুঢ়ি অন্তর্ধান হৈল॥
গয়া হৈতে আসি শ্রীনিবাসের মন্দিরে। কুন্দপুষ্প তোলাইলা সর্ব্ব দিনান্তরে॥
তবে কত দিনে বায়ু ধরিঞা আছিল। প্রেমভক্তি যত ছিল সব প্রকাশিল॥
শ্রীনিবাস ঘরে বিষ্ণুখট্টার উপরে। আত্ম প্রকাশিল প্রভু সভার গোচরে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি ছাড়িলা বারাণসী। গৌরাঙ্গ-মহিমা শুনি নবদ্বীপে আসি॥
ষড়্ভুজ দেখাইল নিত্যানন্দ স্বরূপে। নন্দন আচার্য্য ঘরে রহিলা নবদ্বীপে॥
বরাহ মূর্ত্তি দেখাইল মুরারিগুপ্তেরে। কান্ধে চড়ি অনুগ্রহ করি দাসী-পুত্রেরে॥
ভাবাবেশে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র। হস্তে হল মুষল দিলেন নিত্যানন্দ॥

শ্রীনিবাস পিতা শ্রাদ্ধ সময় নিকটে।...

ভোজন সময়ে প্রভুর কেশ আউলাইল। চতুর্ভুজ হই দুই হস্তে বান্ধিল॥

নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা দণ্ডভঙ্গ ছলে। ঝাঁপ দিঞা গৌরাঙ্গ পড়েন গঙ্গায় জলে॥

মহাপাপে মুক্ত কৈল জগাই মাধাই। ধুবালিআ সিঙ্কালিআ দস্যু দুই ভাই॥

নিমলিয়া গ্রামেত কাজির ঘর ভাঙ্গি। সাত-প্রহরিয়া ভাবে হৈলা বড় রঙ্গী॥

ঘরে ঘরে নবদ্বীপে হরিসংকীর্ত্তন। সিমলিয়া গ্রাম ছাড়ি পালাইল যবন॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ভিক্ষার তণ্ডুল। কাড়িঞা খাইল বিপ্র হইল ব্যাকুল॥

সংকীর্ত্তনে নাচিতে রুক্মিণী ভাব হৈলা। সকল বৈষ্ণব স্তনপান করাইলা॥

সকল বৈষ্ণবে প্রভুর নানা মূর্ত্তি দেখে। স্তুতি করি সভে বর পাইল একে একে॥

গৌরাঙ্গের অবশেষ হরিদাস পাইলা। শ্রীধরের ভাঙ্গা লোহ পাত্রে জল খাইলা॥

সর্ব্ব-পারিষদ লৈঞা নিত্যানন্দ সঙ্গে। অদ্বৈতের বাড়ী গেল কোন কোন রঙ্গে॥

শ্রীনিবাস মন্দিরে প্রভু সংকীর্ত্তনে নাচে। বৈকুণ্ঠ সম্পদ প্রেম সভাকারে জাচে॥

শ্রীনিবাসের মরা পুত্র জীবতত্ত্ব কহে। পুত্রশোক দূরে গেল সংকীর্ত্তনে রহে॥

গৌরাঙ্গের অনুগ্রহ বড় শ্রীনিবাসে। পাশরিল পুত্রশোক গৌরাঙ্গ সম্ভাষে॥

ভক্তি করি সভায় বহিল সাজি ধুতি। দেবানন্দ পণ্ডিতের করিল দুর্গতি॥

দেশে দেশে ছিল যত পার্ষদগণ। নবদ্বীপে গিয়া সভে মিলিলা তখন॥

বড় বড় পঢ়ুয়ারে বিড়ম্বিল শ্লোকে। চিনিতে না পারিলেক নবদ্বীপের লোকে॥

বলি বৈশ্য শ্রাদ্ধ করি ভূদেব আচার। পবিত্রতা দেখি নবদ্বীপে চমৎকার॥

পিতৃভূমি চৈতন্য দেখিল জয়পুর। দুখী দাসী তারে কৃপা করিল প্রচুর॥

শ্রীনিবাসভ্রাতৃসুতা নারায়ণী মুখে। হরি বোলাইঞা কান্দাইলা প্রেমসুখে॥

কীর্ত্তনে নাচিতে প্রভুর বায়ু জন্মিল। পাএ দড়ি দিঞা ওঝা প্রভুরে রাখিল॥

রাজার মানুষ আসি ধরি লৈঞা জাএ। হরি বোলাইঞা প্রভু তাহারে কান্দাএ॥

আচার্য্য গোসাঞির পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ। করিলা প্রকাশ তার দেহে গৌরচন্দ॥

হরিদাস ঠাকুর প্রভুর পাত্রাবশেষ পাএ। আর অবশেষ নারায়ণী মাত্র খাএ॥

বৈরাগ্যে সভারে তত্ত্ব কথা প্রকাশিলা। ইতিহাস-কথাএ বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিলা॥

নবদ্বীপ সুখময় ছাড়ি গৃহবাস। কাঁটোআ জাহ্নবীতটে করিলা প্রকাশ॥

সন্ন্যাসে ধরিল নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। দেখিআ সংসারের লোক করে ধন্য ধন্য॥

চতুর্ভুজ দেখি শুনি কেশব ভারতী। নিত্যানন্দ ফিরিঞা পেলিল আগম পুথি॥

বক্রেশ্বর যাইতে পুনঃ নিবর্ত্ত হইলা। দ্বাদশ দিবস শান্তিপুরেতে রহিলা॥

নিত্যানন্দ আগে পলাইলা নীলাচলে। নিভৃতে রহিলা কেহো লখিতে না পারে॥

অদ্বৈত প্রবোধ করি গেলা নীলাচলে। দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমিলা সকলে॥

কাশীমিশ্রের বাড়ী টোটা রম্য স্থান। জগন্নাথের আজ্ঞা তথা হৈলা অধিষ্ঠান॥

সার্ব্বভৌম সঙ্গে হৈলা বেদান্ত বিচার। উদ্‌গ্রাহ শুনিয়া সার্ব্বভৌম চমৎকার॥
সার্ব্বভৌমে দেখাইল ষড়্ভুজ মূর্ত্তি। ত্রিপাদ দেখিল ক্ষেত্রে বিস্তাবাচস্পতি॥
পরমানন্দপুরি গোসাঞি মেলিলা সেতুবন্ধে। বড় অনুগ্রহ করি রায় রামানন্দে॥
প্রতাপরুদ্র রাজা দেখিলেন অষ্টভুজে। বাণীনাথপট্টনাএ দিলেন পদাম্বুজে॥
বড় অনুগ্রহ মাত্র প্রদ্যুম্ন কানাঞি। তার কোলে নিদ্রা গেল চৈতন্য গোসাঞি॥
বিষ্ণুপুরি দামোদর বিশেশ্বর। গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গে নিরন্তর॥
জগন্নাথের আজ্ঞা মনে আনন্দাবশেষে। মথুরা যাইতে প্রবেশিলা গৌড়দেশে॥
নিভৃতে রহিলা বিস্তাবাচস্পতি ঘরে। সর্ব্বলোক দেখিলেক বুলিয়া নগরে॥
অনেক পার্ষদ সঙ্গে আনন্দ বিশেষ। নিত্যানন্দ স্বরূপে পাঠাইল গৌড়দেশ॥
পথেত ঈশ্বর ভাবে শ্রীরামদাস। ত্রিভঙ্গে মুরলী দেখে লোকে ত্রাস॥
দধির পসরা মাথে গদাধরদাসে। পথমধ্যে রাধাভাব করিল প্রকাশে॥
পরমেশ্বর দাস ঈশ্বর ভাবে গত। পুরন্দর পণ্ডিত অঙ্গদ ভাবে মত্ত॥
গাছ উপাড়িঞা সে গাছের ডালে চড়ে। ঘরের উপরে কেহো গড়ি দিঞা পড়ে॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। নিত্যানন্দ ভাবে তিঁহো হইলা যেমতি॥
তিন মাস বিহ্বল আছিলা সতন্তর। পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের ঘর॥
শ্রীরামদাস কৃষ্ণভাবে হাসি হাসি। কদম্বের ফুল ফুটিল জাম্বিরের গাছে আসি॥
গদাধর দাস ঘরে সভারে নাচান। গায়ন মাধবঘোষ দানখণ্ড গান॥
কাজিমুখে হরিবোল বলাই নিত্যানন্দ। মুরারি চৈতন্যদাসে রাঘব সনে দ্বন্দ্ব॥
পানিয়ে ডুবিঞা থাকে দিন পাঁচ সাত। কালসর্প খাএ সে শরীরে রক্তপাত॥
সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ বণিকের ঘরে। মহামহোৎসবে রাত্রিদিনে নৃত্য করে॥
সুবর্ণ রজত হীরা মুক্তা নূপুরে। ছবি মনোহর পট্টবস্ত্র প্রচুরে॥
শান্তিপুরে অদ্বৈত মন্দিরে নিত্যানন্দ। অচ্যুতানন্দের সঙ্গে ভ্রমেন স্বচ্ছন্দ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ হিরণ্যের ঘরে। দস্যু ব্রাহ্মণ রাত্রে গেল কাটিবারে॥
রাত্রি পোহাইল দস্যু পালাইল ভয়ে। ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে অন্ধ হৈঞা রএ॥
দস্যু প্রতি ব্রাহ্মণেরে বড় কৃপা করি। প্রেমাশ্রু পুলকে ভাসে দেখি সর্ব্বোপরি॥
নীলাচলে বিপ্র আর গৌরাঙ্গ রহিলা। নিত্যানন্দে গৌড়রাজ্য প্রভু সমর্পিলা॥
কথো দিনে নিত্যানন্দ রথযাত্রা কালে। সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা নীলাচলে॥
দবীরখাসে ঘুচাইল সংসার বন্ধন। দুই ভাইর নাম থুইল রূপ সনাতন॥
পুনরপি মথুরা চলিলা গৌরচন্দ্র। সংকীর্ত্তনে গৌড়ে ভাসিলা নিত্যানন্দ॥
গৌরচন্দ্র তীর্থযাত্রা গেলা বারাণসী। বিধিমতে বিড়ম্বিল পাষণ্ড সন্ন্যাসী॥
প্রয়াগে চলিলা বেণীমাধবেরে স্নান। অযোধ্যাএ সরযূ ঘর্ঘর যজ্ঞস্থান॥
স্বর্গদ্বার ছাড়ি প্রভু চলিলেন ত্বরা। অনেক দুর্গম পথে গেলেন মথুরা॥

দেখিলেন মথুরার মদনমোহন। কালিন্দী কদম্বতলা গিরি গোবর্দ্ধন॥
কেশীঘাট বংশীবট দেখি একে একে। ভাণ্ডীর বহুলাবন দেখিল প্রত্যেকে॥
জন্মভূমি রঙ্গভূমি বিশ্রামঘাট। গোবিন্দরায় ভ্রাতৃবট শিলাপাট॥
বিপথে ত্রিমল্লদেশে বেঙ্কট পর্ব্বতে। দেখিল ত্রিমল্লরায় রত্ন ঝরে মাথে॥
কুড়িয়া গরুড়মিশ্র তার কুষ্ঠ ঘুচাইল। দম্পতি সহিত নীলাচলে পাঠাইল॥
মর্হট্ট সোরষ্ট শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি। বিজয়ানগর দিঞা গেলেন বিরিঞ্চি॥
মহানৈ পার হৈঞা গেলা নীলাচলে। নীলাচলে রহি অষ্টাবিংশতি বৎসরে॥
ধর্ম্মময় সর্ব্বলোক বসুমতী ধন্যা। হেমসেতু অবধি করিল প্রেম বন্যা॥
প্রেমের সাগরে নিত্যানন্দ কর্ণধারে। কলির কলুষভরা ডুবিল পাথারে॥
যমালয় শূন্য হইল নরক যন্ত্রণা। যম গেল ব্রহ্মার ঠাঞি করিঞা মন্ত্রণা॥
যম বলেন ব্রহ্মা মোর বিষয় কর দূর। পাপী সব উদ্ধারিল শ্রীচৈতন্য ঠাকুর॥
চৌরাশি নরককুণ্ড সব শূন্য হৈল। ষাটি সহস্র দূত ঘরে বসিঞা রহিল॥
কথো পাপী উদ্ধারিল শ্রীজগন্নাথে। কথো পাপী মুক্ত হৈল মহাপ্রসাদ ভাতে॥
কথো পাপী মুক্ত হৈল সেবিঞা তুলসী। কথো পাপী মুক্ত হৈল গঙ্গা বারাণসী॥
কথো পাপী মুক্ত হৈল শিলা শালগ্রামে। কথো কথো পাপী মুক্ত হৈল হরিনামে॥
যমালয় শূন্য হইল আর পাপী নাহি। শমনের কথা শুনি ব্রহ্মা হাসে সেই ঠাঞি॥
ইন্দ্র শঙ্কর সঙ্গে চলিলা আপনি। সকল দেবতা মেলি করি জয়ধ্বনি॥
নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে। বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল একক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠপুরী॥
নিত্যানন্দ গেলা রথযাত্রার নিকটে। অদ্বৈত চন্দ্রেরে সব কহি নিষ্কপটে॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ এক রূপ। না বুঝিঞা বলে লোক কলহ স্বরূপ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে সমর্পণ করি। সংকীর্ত্তন যজ্ঞ সব তোমার অধিকারী॥
আঠাইস বৎসর* আমি নীলাচলে রহি। স্থানান্তরে যাব আমি নিষ্কপটে কহি॥
অনেক বৈষ্ণব হব অনেক বৈষ্ণবী। সেবকানুসেবকে ব্যাপিবেক পৃথিবী॥
এ বাড়ীর অধিকার পণ্ডিত গোসাঞি। তাঁহার অধিক মোর প্রিয় বড় নাহি॥
শ্রীহরিদাস ঠাকুর রহিলা নীলাচলে। টোটা নির্ম্মাইয়া দিল সমুদ্রের কোলে॥
অনেক সেবক সঙ্গে রঙ্গে নিত্যানন্দ। গৌড়দেশ পাঠাইয়া দিল গৌরচন্দ্র॥
আষাঢ়ে প্রতাপরুদ্র প্রভু ঘরে বসি। কৃষ্ণকথা অদ্বৈতে কহেন হাসি হাসি॥

---

* কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে ২৪ বর্ষ গৃহবাস ও ২৪ বর্ষ সন্ন্যাস অবস্থায় নীলাচলে বাস। কিন্তু জয়ানন্দের মতে বিংশতি বর্ষে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যথা—

"চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ড শুন এক চিত্তে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সন্ন্যাস যে মতে॥
বয়েস অল্প গৌরচন্দ্র বিংশতি বৎসর। মহা বৈরাগ্য শুদ্ধ হেম কলেবর॥"

দাঁড়ায়ে প্রভুর ভিতে কৌপীনের ডোর। অগ্নি দেহ অঙ্গ কথাএ কৃষ্ণ প্রাণ মোর ॥
হরিতকী কাষ্ঠে মৈলা মহেন্দ্র ভারতী। মুখে অগ্নি দিল তার তিন শত যতি ॥
হরিদাস ঠাকুর আগে করিল বিজয়। ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্দ্দশীর সময় ॥
আষাঢ় বঞ্চিত রথবিজয় নাচিতে। ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে ॥
অদ্বৈত চলিলা প্রাতকালে গৌড়দেশে। নিভৃতে তাঁহারে তথা কহিল বিশেষে ॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে ॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটাএ শয়ন অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সব কথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বদা ॥
নানা বর্ণে দিব্য মালা আইল কোথা হৈতে। কত বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে ॥
রথ আন রথ আন ডাকে দেবগণ। গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ ॥
মায়া শরীর তথা রহিল সে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেল জম্বুদ্বীপ ছাড়ি ॥
অনেক সেবক সর্প দংশাইঞা মৈলা। উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈলা ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি শুনি। বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেলা শচী ঠাকুরাণী ॥
সর্ব্ব পারিষদ লৈঞা শ্রীরামদাস। নিত্যানন্দ প্রবোধিল করিঞা আশ্বাস ॥
পুরুষোত্তম আদি অদ্বৈত পারিষদ। চৈতন্য-বিজয় শুনি হৈলা নিঃশবদ ॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ। চৈতন্য বিজয় লীলা করেন শ্রবণ ॥
নিত্যানন্দ প্রবোধিঞা সর্ব্ব পারিষদে। চৈতন্যানন্দে নাচে কীর্ত্তন সম্পদে ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরো। আচণ্ডাল আদি যদি বৈষ্ণব না করো ॥
জাতিভেদ না করিব চণ্ডাল জবনে। প্রেমভক্তি দিঞা সভাএ নাচামু কীর্ত্তনে ॥
সর্ব্বশক্তি ধরে শ্রীরামদাস। ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ করিব প্রকাশ ॥
কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে। অন্ধ বধির জড় নাচিব স্বচ্ছন্দে ॥
আইমু চৈতন্য লআইমু সে চৈতন্য। গৌড় উৎকল রাজ্য করিমু ধন্য ধন্য ॥
এই প্রতিজ্ঞা নিত্যানন্দের সভে শুনি। সকল বৈষ্ণব করে জয় জয় ধ্বনি ॥
কথো দিনে নিত্যানন্দ শিখাসূত্র ধরি। মহামল্লবেশ ক্ষিতি পর্য্যটন করি ॥
সূর্য্যদাসনন্দিনী শ্রীবসু জানকী। পাণিগ্রহণ করিল স্বচ্ছন্দ কৌতুকী ॥
বসু গর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র। জাহ্নবীনন্দন রামভদ্র মহামল্ল ॥
মুরারি চৈতন্যদাস ব্যাঘ্র ধরি আনে। নাগশয্যায় নিদ্রা জাএ সর্ব্বলোকে জানে ॥
শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর পানির ভিতরে। কুম্ভীর ধরিঞা আনে সভার গোচরে ॥
কাজি সনে বাদ করি প্রেম উনমাদে। সাতদিন গঙ্গাদাস ছিল গঙ্গাহ্রদে ॥
প্রেমের উন্মাদ বড় কমলাকর পিপলাই। নিজ অঙ্গ কাটি তমু বাহ্য জ্ঞান নাই ॥
কাজি সনে বাদ করিল গদাধরদাস। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁফ দিলা দেখি লোকে ত্রাস ॥
মণ্ডুর বিষ খাইলেন পুরুষোত্তম দাসে। বিষ জীর্ণ করিলেন প্রেমানন্দ রসে ॥

বাল্যভাবে সঞ্জয় পণ্ডিত নাচিতে । মুখ হৈতে সর্প বারাইল আচম্বিতে ॥
ভাবাবেশে মুরারিগুপ্ত হৈলা হনুমান্ । লেঙ্গুড় বারাইল হস্ত দ্বাদশ প্রমাণ ॥
পুরন্দর পণ্ডিত গাছের চূড়ে চড়ে । ষোল হাত লেঙ্গুড় গাছের তলে পড়ে ॥
পরমেশ্বর দাস মাটি খাইল তিন আড়ি । বলরাম দাস পোড়ে জবনের সাড়ি ॥
কুম্ভীর বান্ধিআ আনে কালিআ কৃষ্ণদাস । দেখিঞা শ্রীনিত্যানন্দের বাড়িল উল্লাস ॥
শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে । মহাকুলীন যোগেশ্বর বংশ জাহে রহে ॥
অদ্বৈত-চন্দ্রের বংশ শান্তিপুরে বসে । সীতা অদ্বৈত পুত্র পৌত্র প্রকাশে ॥
সংকীর্ত্তন দেবালয় হৈবে সর্ব্বরাজ্যে । খণ্ডিল ধরণীভার গুরুতর কার্য্যে ॥
চৈতন্যের প্রাণধন প্রভু নিত্যানন্দ । তিলক বিচ্ছেদ না দেখিল জেন অন্ধ ॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন আলয় । গৌরীদাস পণ্ডিত সে করিঞা সহায় ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত তাঁরা চারি ভাই মেলি । নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে রসের টামালি ॥
সহস্র সহস্র কত অদ্বৈতসেবক । তাঁহার সেবক সব সংসারব্যাপক ॥
চৈতন্যের সেবক জত নাহিক অবধি । নিত্যানন্দ সেবকের অনেক সমৃদ্ধি ॥
জত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্র সহিতে । সহস্র বৎসরে তাহা না পারি কহিতে ॥
সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ । নিত্যানন্দ প্রসাদে সে তারা শুক সম ॥
কলিযুগে ধর্ম্মময় হইল সংসার । খণ্ডিলেক ধরণীর জত গুরুভার ॥
নিত্যানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতেরে কহি । নিষ্কপটে পণ্ডিত আমি আছি এই মহী ॥
আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি । নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিলা ছাড়ি ক্ষিতি ॥
একাদশী দিবসে প্রলয় মত হৈলা । অনন্তের নাকশ্বাস পৃথিবী কাঁপিলা ॥
নিত্যানন্দ-বিজয় শুনিল যে মহান্ত । বীরভদ্র দেখি সভে দাঁড়াইল একান্ত ॥
সীতা অদ্বৈত অন্তরে রহিল বড় দুখ । হাহা চৈতন্য-নিত্যানন্দ স্বরূপ ॥
আচার্য্য গোসাঞি কথো দিন বঞ্চিলা । পৃথিবী ছাড়িব ইহা অভাবে কহিলা ॥
পৌষমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি হৈলা । আচার্য্য গোসাঞি বৈকুণ্ঠবিজয় করিলা ॥
স্বস্তি জয় জয় চৈতন্য-মঙ্গল । অবতার শিরোমণি প্রকাশ সকল ॥
চৈতন্য গাএ জেবা চৈতন্য গাওয়াএ । চৈতন্যসেবক তার চৈতন্য সহায় ॥
তার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র আদি যত । জয়ানন্দে আশীর্ব্বাদ পুত্র অভিমত ॥
চিন্তিঞা চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব । আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ ॥” ইতি ।

পরিশিষ্ট।

উপরোক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের তিনখানি পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই তিনখানি পুথিতেই বৃন্দাবনদাসের প্রসঙ্গ আছে—

"বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিত্তে।
জগত মোহিত যায় ভাগবত গীতে ॥" (আদিখণ্ড)

লোচনদাসের এই কবিতা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল রচিত হইবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবত নামেই বৈষ্ণব-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং বৃন্দাবন ও লোচনের গ্রন্থগত নাম লইয়া যে বিরোধের প্রবাদ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার মূল কি? কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তমের গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের উল্লেখ আছে। ইহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-মঙ্গল নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই চৈতন্য-মঙ্গলই পরে চৈতন্যভাগবত নামে খ্যাত হয়, এই মাত্র প্রবাদ শুনা যায় বটে, কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা পাই নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়, তখনও চৈতন্য-ভাগবত নামকরণ হয় নাই। কিন্তু চৈতন্যভাগবত নামধেয় গ্রন্থও যে বৃন্দাবনে গিয়াছিল, তাহা বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর সীতাচরিত্র পাঠে জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও লোকনাথ উভয়ে একত্র বৃন্দাবনে বাস করিতেন। একজন চৈতন্য-মঙ্গল ও অপর ব্যক্তি চৈতন্যভাগবত নাম গ্রহণ করিলেন, ইহার কারণ কি? "ভাগবত" নামটী বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়। অচ্যুত বাবু লিখিয়াছেন, ১৪৯২ শকে চৈতন্যভাগবত নামকরণ হয়। কিন্তু তাঁহার মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫০৩ শকে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে (১৫০৪ শকে) তিরোহিত হন।' অতএব কেহ বলিতে পারেন, চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনে আসিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণদাস গ্রন্থ সমাধা অথবা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণদাসের সঙ্গী লোকনাথ গোস্বামী চৈতন্য-ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের দুইমাস পূর্ব্বে (১৪৩২ শকে) তাঁহার আদেশে লোকনাথ বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারার্থ আগমন করেন। তখন লোকনাথের বয়ঃক্রম ১৭।১৮ বর্ষের কম হইবে না। কারণ চৈতন্যদেব একজন নিতান্ত বালককে কিছু আর তীর্থোদ্ধারের জন্য

পাঠান নাই। এরূপ স্থলে আনুমানিক ১৪১৪ কি ১৪১৫ শকে লোকনাথের জন্ম কাল মোটামুটি ধরিয়া লইতে হয়। লোকনাথ আপনার সীতাচরিত্রে চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। যদি চরিতামৃত শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বর্ষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত এরূপ বৃদ্ধাবস্থায় (বৈষ্ণব সাহিত্যে) আর কাহাকেও আমরা গ্রন্থ রচনা করিতে দেখি নাই। আমাদের বোধ হয়, যে সময়ে কৃষ্ণদাস চরিতামৃত রচনা করিতেছিলেন, লোকনাথও সেই সময়েই সীতাচরিত্র রচনা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া এমন বোধ হয় না যে চরিতামৃত সম্পূর্ণ হইবার পরে তিনি আপনার গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে চৈতন্যভাগবত দেখিয়াছেন, অথচ তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ ও সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবত নাম শুনেন নাই, বিস্ময়ের কথা বটে ! এইজন্যই আমরা বলিতেছি, চৈতন্যভাগবতের নাম করণ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা প্রকৃত কি না তৎপক্ষে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে।

অচ্যুত বাবু এক পত্রে লিখিয়াছেন, বৃন্দাবন দাস নরহরি ঠাকুরের নামোল্লেখ করেন নাই বলিয়া, লোচনদাসও প্রথমতঃ আপনার গ্রন্থে নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন নাই। পরে বিরোধ ভঞ্জন হইলে তিনি আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়া নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন। এইরূপ বিরোধভঞ্জনের পরই তিনি চৈতন্যভাগবত নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বলিয়া বৃন্দাবন দাস (পরে) আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়াও নরহরি ঠাকুরের নাম স্বীয় গ্রন্থে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি যে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। লোচনের গ্রন্থে শত শত বার নিত্যানন্দের নামোল্লেখ আছে ও লোচন যে ভাবে নিত্যানন্দকে ভক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে 'নিত্যানন্দ' শব্দ পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এরূপ নাম-যোজনা ও স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক লেখা একই কথা। কিন্তু লোচনদাস যে দুইবার করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের বোধ হইতেছে, লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত হইবার বহু পরে আপনার চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন। কতপরে লোচনদাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই এখন বিবেচ্য। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, "লোচনদাস ১৪শ বর্ষের সময় ১৪৫৯ শকে নরহরি ঠাকুরের আদেশে চৈতন্য-মঙ্গল প্রকাশ করেন।" কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় ঐ মত স্বীকার করেন না, তাঁহার বিশ্বাস, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান হইবার বহুবর্ষ পরে লোচনের চৈতন্য-মঙ্গল রচিত হয়। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লোচনের গুরু নরহরি ঠাকুরের এই পদটী আবৃত্তি করিয়া থাকেন,—

"গৌরলীলা দরশনে,　　বাঞ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিএ কিছু রাখি।
মুই অতি অধম,　　লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিআ তাহা লিখি॥
গৌর-গদাধর-লীলা,　　আদ্রব করএ শিলা,
কার সাধ্য করএ বর্ণন।
শারদা লিখেন যদি,　　নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
গ্রন্থ লিখিবে যে,　　এখনও জন্মেনি সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হলে,　　বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাইব প্রভু॥
কিছু কিছু পদ লিখি,　　যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করএ প্রভু লীলা।
নরহরি পাবে সুখ,　　ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥"　(পদসমুদ্র)

ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন, এই পদ যখন রচিত হয়, তখন লোচনের জন্ম হয় নাই। পরে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহার বহুবর্ষ পরে তিনি চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করেন।

আমাদেরও এখন বোধ হইতেছে যে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের বহুবর্ষ পরে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশিত হয়। ১৪৮০ শকের কিছু পরে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তখনও লোচনের চৈতন্য-মঙ্গল বিরচিত হয় নাই। তাই জয়ানন্দ লোচনের ও তাহার গ্রন্থের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কাহারও মতে, ১৪৬৩ শকে নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব ঘটে। তৎপূর্ব্বেই লোচনদাস তাঁহার গুরুর নিকট চৈতন্য-চরিত প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু গুরুর জীবদ্দশাতেই যে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থে "চৈতন্য-ভাগবত" নামের উল্লেখ ও জয়ানন্দ কর্ত্তৃক তাঁহার অনুল্লেখে এখন লোচনদাসের গ্রন্থ পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়াই মনে হইতেছে। জয়ানন্দের গ্রন্থ ঐতিহাসিকতায় লোচন-দাসের গ্রন্থ অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার কবিত্ব লোচনের রসোদ্দীপক বর্ণনায় হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যামোদী বঙ্গবাসীর নিকট জয়ানন্দের ইতিহাস তেমন মূল্যবান্ বলিয়া গণ্য হয় নাই, তাই লোচনদাসের ললিত পীযূষপূরিত শ্রুতিমধুর রচনায় জয়ানন্দের কীর্ত্তিকলাপ কোথায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। যেমন মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

প্রকাশিত হইলে গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আদর কমিয়া যায়; লোচনদাসের অভ্যুদয়ে জয়ানন্দের যশোভাতি সেইরূপ মেঘাচ্ছাদিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ জয়ানন্দ মহাপ্রভুর দেহাত্যয়ের কথা প্রকাশ করায় ভক্ত বৈষ্ণব-সমাজে অপ্রীতিকর হইয়া পড়েন, কিন্তু লোচনদাস বৈষ্ণবগণের মনোমত কথা লিখিয়া সহজেই ভক্তগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবগণ লোচনদাসের কবিতা-রসালাপে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অপরের রচিত কোন কোন সুমধুর পদ লোচনের নামে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই জন্যই বোধ হয়, এখনকার মুদ্রিত পদকল্পতরুতে জয়ানন্দ-রচিত "বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা" লোচনদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

হরিনামের শব্দ-তত্ত্ব।

বাঙ্গলাভাষায় ঈশ্বরের যত নাম আছে, বোধ হয় হরিনামই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহু বিস্তৃত, আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায়। পত্র লিখিতে হইলে শিরোভাগে অগ্রে হরিনাম লিখিতে হয়। বাড়ীতে পীড়া হইলে গৃহিণী অগ্রে হরিকে পূজা দিবার মানসিক করেন। আমাদের শাস্ত্রে—

'আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।'

তুলসীতলায় হরির লুট কুড়াইবার সময় আমাদের সুকুমার মতি শিশুরা হরিনামের মাধুর্য্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদও পায়। মৃত্যুর পর যখন আমাদের দেহ শ্মশান অভিমুখে নীত হয়, তখন পবিত্র হরিনামের শব্দে ঘোর পাষণ্ডও দ্রবীভূত হয়। এমন কি কেহ কেহ হরিনামের মাহাত্ম্য এতদূর অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহাদের বিবেচনায় এই কলিযুগে হরিনাম ব্যতিরেকে পরলোকে সদ্গতির উপায়ান্তর নাই। কি রাজধানী কি ক্ষুদ্রপল্লী সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মসভার প্রতিবাদস্বরূপ হরিসভার অভ্যুত্থান দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত হরিনামাবলী বস্ত্রে অঙ্কিত করিয়া উত্তরীয় স্বরূপ ব্যবহার করেন। ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়া 'হরি বল' বলিয়া গৃহস্থকে সম্বোধন করে। ঈশ্বরের এতাদৃশ ব্যাপক নাম আমাদের ভাষায় আর কি আছে?

সহজেই জানিতে কৌতুহল জন্মে হরিনামের অর্থ কি? অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি অতি বিচিত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

'হরি' শব্দের অর্থ হরিৎবর্ণ। ইহা মূলে বিশেষণ শব্দ এবং হরিৎবর্ণ বস্তুমাত্রেরই বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে; কিন্তু অতি প্রাচীনকালেই ইহা একটি বস্তু বিশেষের প্রধান বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে হইতে, সেই বস্তুরই নামান্তর স্বরূপ বিশেষ্য পদ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বস্তুটি অপর কিছু নহে, আমাদের বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতির 'সোম'।

আমাদের আর্য্য পিতামহগণের ভারতবর্ষ-প্রবেশের বহুপূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে এবং তাঁহাদের ইরাণীয় জ্ঞাতিগণের মধ্যে উক্ত উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়। আমাদের পিতামহগণ যাহাকে 'সোম' বলিতেন, তাঁহাদের ইরাণীয় জ্ঞাতিগণের রসনায় তাহা 'হোম' এই আকারে উচ্চারিত হইত।

'সোম' এক প্রকার উদ্ভিদ্। কিন্তু ভারবর্ষে ইহা একবারেই জন্মে না। সুতরাং পিতামহ এদেশে আসিলে আর সোমের দর্শন পাইতেন না। ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের আদিম বাসস্থান হইতে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইরাণীয় জ্ঞাতিগণের সহিত যেদেশে বসবাস করিতেন তথা হইতে) যত্নের সহিত আনাইয়া লইতেন। যাঁহারা আনয়ন করিতেন, তাঁহারা অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া

শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত অধুনাতন মহাপ্রসাদের ন্যায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিতেন। কিন্তু মহাপ্রসাদ যেমন না খাইলেও চলে, তৎকালে সোম সেরূপ না পাইলে চলিত না। সোম-যাগই প্রশস্ত দেবোপাসনা বলিয়া তৎকালে গণ্য ছিল। সুতরাং সোমবর্জ্জিত দেশে প্রবিষ্ট হইয়া সোমযাগের জন্য পিতামহগণকে বড়ই ক্লেশ পাইতে হইত। হিমালয়ের উত্তরে পর্ব্বতময় প্রদেশে লোক পাঠাইতে হইত এবং একজন কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিলে অনেকে আগ্রহের সহিত তাহার কিয়দংশ যাচ্ঞা করিয়া লইতেন। এরূপ অবস্থায় সোম-সংগ্রহকারিগণের অর্থোপার্জ্জনের একটি নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য অর্থ-সংগ্রহের দ্বার স্বরূপ হইয়া উঠিলে এ কালের ন্যায় সে কালেও প্রবঞ্চনায় জড়িত হইয়া পড়িত। বঞ্চকেরা সোমজাতীয় বিবিধ উদ্ভিদ্ যাহা প্রকৃত সোম নহে, তাহা সোম বলিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহা প্রকাশ হইলে পিতামহগণ এক কঠোর আইন জারি করিলেন, 'কেহ সোম বিক্রয় করিতে পাইবে না' অর্থাৎ দ্বিজাতি সমাজে কেহ সোম বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না, করিলে সমাজে পতিত হইবে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে যেমন সোমক্রয়ের কথা আছে, তেমনি বিক্রেতার সর্ব্বনাশ ঘটারও উল্লেখ আছে। কিছুকাল উদীচ্য বর্ব্বর জাতীয় লোক 'সোম' আনিয়া বেচিয়া যাইত। কিন্তু কালে এইরূপে 'সোম' সংগ্রহও উঠিয়া গেল। তখন এক্ষণকার ক্রিয়াকাণ্ডে মধু অভাবে যেমন গুড় ব্যবহারের রীতি আছে, তেমনি সোমঅভাবে তজ্জাতীয় অন্য উদ্ভিদ্ ব্যবহারের রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। তাই এক্ষণে আর 'সোম' কিরূপ উদ্ভিদ্, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাইনা। অনেকের ধারণা 'সোম' একপ্রকার লতা, তাহা নহে, উহা একপ্রকার খর্ব্বাকার বৃক্ষ। বৈদিক শাস্ত্রে সোম রাজা বলিয়া উল্লিখিত। 'সোম রাজন্' শব্দ বড়ই প্রচলিত ছিল। সুতরাং সোমকে অনেকে আদর করিয়া 'সোমরাজ' বলিত। বাঙ্গলা দেশে 'সোমরাজ' নামে একজাতীয় ক্ষুদ্রাবয়ব বৃক্ষ আছে। ইহার 'সোমরাজ' উপাধি কিরূপে হইল, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এই বৃক্ষের বীজ বা পত্র রোগবিশেষে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। সোমেরও রোগনিবারক গুণ ছিল। ইহাই কি বাঙ্গলার সোমরাজের হেতু, না কোনকালে এই সোমরাজ বৃক্ষ প্রকৃত সোমের অভাবে তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত? একথা আমার স্পষ্ট জানা নাই। যাহা হউক ইদানীন্তনকালে আর সোমযাগ করিতে হইলে কেহই হিমালয় অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ করেন না, কিন্তু বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দার সময়ে তাহাই করিতে হইত। এখন আমাদের ব্রাহ্মণেরা সোমের পরিবর্ত্তে পূতিকা (পুঁইশাক) ব্যবহার করেন। তাই এখন 'সোম' লতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যখন প্রকৃত সোম দেখি নাই, তখন পুঁই শাকের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য কি তাহা বর্ণনা করা আমাদের অসাধ্য, তবে এক প্রধান সৌসাদৃশ্য 'বর্ণ' বলিয়া বিবেচিত হয়। পুঁই শাকের ন্যায় 'সোম'ও একপ্রকার হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ্ ছিল।

সোমলতার স্তুতিগায়কেরা সোমকে ভূয়োভূয়ঃ 'হরি' নামে সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন। কুতূহলী পাঠক ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডল দেখিবেন। আর সোমবল্লী হইতে যে আসব প্রস্তুত হইত, বেদে তাহারও নাম 'হরি'। এই আসব ইন্দ্র দেবতার প্রিয় পানীয় বলিয়া গণ্য। হরি প্রস্তুত হইলে ইন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারেন না; হরি যজ্ঞ স্থলে আসিয়াই অনিবার্য্য-বেগে ইন্দ্রকে তথায় আকর্ষণ করিয়া আনেন, সুতরাং যজমানের ইষ্ট সিদ্ধি হয়।

এই ভাব বদ্ধমূল হইলে 'হরি' ইন্দ্রের বাহক বলিয়া ঋষি-রচিত কাব্যে বর্ণিত হইতে আরম্ভ হইলেন। কোন কোন কবি তাঁহাকে একবারে অশ্ব করিয়া তুলিলেন। আবার অন্য কবি ইন্দ্রের রথে এক জোড়া 'হরি' যুতিয়া দিলেন। সুতরাং 'হরিবাহন' ইন্দ্র কিছুকাল হরিনামক অশ্বদ্বয় কর্তৃক আকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে আগমন করিতে লাগিলেন।

হরি নামক সোমরস এইরূপে ইন্দ্রের অশ্বে পরিণত হইলেন; কিন্তু পিতামহগণ প্রত্যক্ষ সোমরসকেই যে কেবল সোম বলিবেন তাহা নহে—তদপেক্ষা মহীয়ান্ পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত তাঁহাদের এক পরোক্ষ দেবতা ছিল—তিনি সোমরসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—তাঁহারও নাম সোম। তিনিই প্রকৃত সোমদেব এবং তাঁহারও নামান্তর হরি।

পিতামহগণ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার সত্তা অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেন। সেই সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপ বা আকার সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা ও কর্ম্মের পরিচয় দেয় বলিয়া তাহা উপাসনার অঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সেই সেই বস্তুর পরোক্ষ বা নিরাকার অধিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত হইতেন। এইরূপে সাকারে নিরাকারের পূজাবিধি দ্বিজাতিসমাজে সমাদৃত হয়। দেবতা বলিলে এই বিধিতে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতা উভয় পদার্থই বুঝাইত।

বৈদিক উপাসনাতে এইরূপ সাকার দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দেবতা দুইটি অগ্নি ও সোম। জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময় অগ্নিতে ঈশ্বরের প্রকাশকতা, শক্তিমত্তা ও সর্ব্বব্যাপিতা যেমন জাজ্জ্বল্যমান, মনোহরকান্তি, মাদক, বলকারক ও রোগনিবারক সোমে তেমনি তাহার সৌন্দর্য্য ও মনুষ্যের প্রতি হিতৈষিতাও জাজ্জ্বল্যমান। প্রত্যক্ষ দেবতা অগ্নি একটা জড় পদার্থমাত্র, প্রত্যক্ষদেবতা 'সোম' তদপেক্ষা বিস্ময়কর এক অনির্ব্বচনীয় প্রাণময় পদার্থ। সুতরাং সেকালের চিন্তাশীল যাজকেরা অগ্নি অপেক্ষা সোমের মহিমা অধিক বিবেচনা করিতেন।

ইন্দ্র কি বাস্তবিকই তীব্র সোমরস চুমুক দিয়া পান করিতেন বলিয়া সেকালের ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন? কদাচ নহে।—ইন্দ্র একজন উৎকৃষ্ট নিরাকার দেবতা। ইনি পরমৈশ্বর্য্য। বাঙ্গালায় 'প্রভু' বলিলে যাহা বুঝায়, ঋষিদের মুখে ইন্দ্র বলিলে তাহাই বুঝাইত। কবিরা ইন্দ্রকে নানা সাজে সাজাইতেন, কিন্তু 'ব্রহ্মগণ' অর্থাৎ তদানীন্তন

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নিরাকার ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন। যজ্ঞভূমিতে নিরাকার ইন্দ্র এবং নিরাকার সোম বা হরি যেরূপ মিলিত হইলে তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয় সখ্য বিদ্যমান আছে বলিয়া কোনও কোন কবি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে হরি ইন্দ্রের 'সখা'। হরি আসিলে ইন্দ্রও আইসেন। হরি ইন্দ্রকে আকর্ষণ করেন। যজ্ঞে অনেক সময়ে ইন্দ্র ও হরির (সোমের) যুগপৎ স্তুতিগান হইত।

ইন্দ্রের একটি বৈদিক নাম অর্জ্জুন। ইন্দ্রের আকর্ষক, বাহক, চালক ও সখা 'হরি' বেদে যেমন সুপরিচিত, পাণ্ডব অর্জ্জুনের আকর্ষক, বাহক, চালক ও সখা হরি মহাভারতের ইতিহাসে তেমনি সুপরিচিত। অর্জ্জুন নামে পাণ্ডুরাজার পুত্র কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন কি না তাহা এখানে বিবেচ্য নহে, কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণার্জ্জুন-বিষয়িণী কথায় বেদোক্ত ইন্দ্র ও হরির সম্পর্কবিষয়ক ভাব সকল যে জড়িত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

'হরি' যেমন ঋষিদের প্রধান দেবতা ছিলেন, আজিও তিনি আমাদের তেমনি প্রধান দেবতা। হরির গুণ গানের জন্য যেমন সামবেদের জন্ম—তেমনি হরির গুণগানের জন্যই আমাদের ভাষায় সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী সকল রচিত। 'মাদক' হরি চিরকালই গানের উদ্দীপক, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যে মনে করেন, যে বস্ত্রহরণ বা পাপহরণ করাই হরির 'হরিত্ব', তাহা নহে। বস্ত্রহরণ ও পাপহরণ দুইটিই আমার মতে কল্পনামাত্র। হরির হরিত্ব বাস্তবিক কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বের মূল।—আমাদের 'হরি' দেবতা 'শ্যামসুন্দর' ছিলেন বলিয়াই 'হরি' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মহীরুহ তরুলতাগণের উজ্জ্বল শ্যামকান্তিতেই ঋষিরা সর্ব্বপ্রথমে হরিকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়াছিলেন। আর আমরা যে সর্ব্বতোভাবে সে ভাব বিস্মৃত হইয়াছি, তাই বা কেমনে বলিব। অদ্যাপি ত আমরাও তুলসীতে হরিকে দেখিতে চেষ্টা করি? তবে তুলসী আর হরি নাই, হরিপ্রিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অগ্নির আলোক এবং উত্তাপ তরুলতাতে সঞ্চিত হইলে কিরূপে প্রাণের বিকাশ হয়, তাহা চিন্তা করিয়া ঋষিরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং গদগদচিত্তে সেই প্রাণের মূলস্বরূপ পরোক্ষ 'হরি' দেবতার গুণ গানের দ্বারা বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে "মহাভারত" লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। এই আলোচনার ফলে আজ কয়েক বৎসর, এক নূতন মত উদ্ভাবিত হইয়াছে। জর্ম্মাণ-অধ্যাপক ডাঃ বুহ্লার (Dr. Bühler) এই নূতন মতের একপ্রকার প্রথম উদ্ভাবক। তিনি মহাভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে; খৃষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান স্মৃতিগ্রন্থগুলির ন্যায় মহাভারতখানিও একখানি উৎকৃষ্ট সদৃষ্টান্ত স্মৃতিগ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক লাডউইগ (Prof. Ludwig) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহাভারতে ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক হোল্‌জ্‌মান (Prof. Holtzman) এই বিষয় ও তদানুসঙ্গিক বিষয় সকল আলোচনা করিয়া "মহাভারত—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে" এই নামে চারিখণ্ড পরিমিত এক বৃহদায়তন পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহার পর ডাঃ ডাহ্‌ল্‌মান (Dr. Dahlmann) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে *Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch* অর্থাৎ "মহাভারত আলোচনা, কাব্য ও বিধিপুস্তক" নামে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ডাহ্‌ল্‌মান আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র, অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত", পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র এবং জৈনদিগের জাতকগ্রন্থ ও ধর্ম্মকথার উপাখ্যান গুলির সহিত মহাভারতোক্ত উপাখ্যান গুলির সাদৃশ্য দেখিয়া এবং অন্যান্য কথার আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান মহাভারতের কাব্যাংশ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেও অতি অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ত্তমান ছিল। ডাঃ ডাহ্‌ল্‌মান তাঁহার পুস্তকে নানাসময়ে মহাভারতের ক্রমপুষ্টি কিরূপে ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, মহাভারতের উপাখ্যানাংশ বহুকাল হইতে একটি নীতিকথা রূপে প্রচলিত ছিল; কিন্তু এখন ইহা আনুসঙ্গিক কথার সহিত মিশিয়া এরূপভাবে গঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে উপাখ্যানাংশ বাদ দিয়া নীতি কথাটুকু বাছিয়া লওয়া একপ্রকার অসম্ভব। পিতৃহীন পাণ্ডবগণ দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া যুদ্ধদ্বারা স্বার্থসাধন করেন। অন্যায় কর্ত্তৃক ন্যায়ের উৎপীড়ন, পরে নির্দ্দোষিতার জয়লাভ দেখানই এই নীতি কথাটির উদ্দেশ্য। ক্রমে এই দৃষ্টান্তটিকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইবার জন্য ইহাতে উত্তরকালে নানাবিধ গল্প প্রবেশ করিয়াছে। নায়ক যুধিষ্ঠির দুর্দ্দশায় অধীর হইয়া না পড়েন, এজন্য কোন কবি নলোপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহের বৈধতা প্রমাণের জন্য শকুন্তলোপাখ্যান, আসুর বিবাহের বৈধতা প্রমাণের জন্য মাদ্রী, লক্ষণা, সুভদ্রা, অম্বা ও অম্বালিকা হরণ ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন। হয়ত এইরূপে নিয়োগপ্রথা দ্বারা সন্তানোৎ-

"মহাভারত" সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নূতন মত।

পাদনের বৈধতা প্রমাণের জন্য পরাশর কর্তৃক সত্যবতীর, ব্যাস কর্তৃক অম্বালিকার ও দেবগণ কর্তৃক কুন্তিমাদ্রীর পুত্রলাভের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্ম্মের পোষকতায় দার্শনিক তত্ত্ব ও নানাবিধ উপাখ্যানাদি সৃষ্ট হইয়াছে। ডাঃ ডাহ্লমান আরও বলেন যে দ্রৌপদীর স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না। অবিভক্ত ঐশ্বর্য্য অবিসম্বাদে কিরূপে ভ্রাতৃগণ ভোগ করিতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য পত্নীরূপে দ্রৌপদীর চিত্র কল্পিত হইয়াছে। অধ্যাপক হোল্‌জমান "দুর্যোধন" নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ভ্রম করিয়া এক সিদ্ধান্ত করেন যে কৌরব বিদ্বেষ্টারা অত্যধিক পাণ্ডবপ্রীতিহেতু মহাভারতের ইতিহাসাংশে বিস্তর জটিলতা ঘটাইয়াছে। তাঁহার মতে "দুর্যোধন" শব্দের অর্থ দুষ্ট অর্থাৎ কুৎসিত যোদ্ধা, কিন্তু বাস্তবিক উহার অর্থ 'দুঃখে বা বহু আয়াসেও যাহাকে যুদ্ধে জয় করা যায় না।' অত্যধিক পাণ্ডবপ্রীতি হইতেই পাণ্ডবপক্ষে অতিমাত্র সততা নানাবিধ জটিল বিধি নিষেধাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সমর্থিত হইয়াছে ; কিন্তু ডাঃ ডাহ্ল্‌মান অধ্যাপক হোল্‌জমানের এই মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। অধ্যাপক লাডউইগ মহাভারতের ঐতিহাসিকতার অভাব সম্বন্ধে যে কথা বলেন, ডাঃ ডাহ্ল্‌মান তাহাই স্বীকার করেন মাত্র। অধ্যাপক লাডউইগ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহাভারত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন, পঞ্চপাণ্ডব গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্ত এই পঞ্চ ঋতুর রূপক মূর্ত্তি, দুর্যোধন শীত ঋতু, দ্রৌপদী পৃথিবী, যুদ্ধাদি ঋতু-পরিবর্ত্তনসূচক পার্থিব পরিবর্ত্তন এবং পাশক্রীড়ার অক্ষপাটীগুলি শীত-ঋতুসঞ্চারক নাক্ষত্রিক অবস্থান ও ক্রীড়ায় জয় পৃথিবীতে শীতাবির্ভাব ইত্যাদি।

মহাভারতের লুপ্তাংশ প্রকাশ।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে পণ্ডিত বামন শাস্ত্রী ইস্‌লাম পুরকর যে পরাশর-ধর্ম্মসংহিতা প্রকাশ করেন, তাহার প্রথম খণ্ডের ৭ম পৃষ্ঠায় এক অপূর্ব্ব সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের শেষ তেইশটী অধ্যায় পাওয়া যায় নাই। কি য়ুরোপ, কি ভারতবর্ষ, যেখানে যতগুলি মহাভারত এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই ঐ তেইশটী অধ্যায় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশেও প্রবাদ আছে, লক্ষশ্লোকী মহাভারত আর এখন পাওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মলয়ালম্ অক্ষরে লিখিত অতি প্রাচীন একখানি মহাভারতের পুঁথিতে ঐ তেইশটি অধ্যায় আছে, এবং বৃদ্ধ গৌতম স্মৃতি নামে কথিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেও তিনি উহা দেখিয়াছেন।

প্রাচীন টীকা।

অধ্যাপক বুহ্লার বলেন, মহাভারতের যতগুলি টীকা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনখানি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত, কিন্তু মনুর যতগুলি টীকা পাওয়া যায়, তাহার প্রাচীনখানি খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে লিখিত।

অধ্যাপক জ্যাকোবি সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গতঃ মহাভারত-রচনা-কালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যে মহাভারতকে যতই কেন প্রাচীন বলিয়া কল্পনা করা হউক না, কিছুতেই তাহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহার প্রমাণার্থ তিনি বলেন যে, মহাভারত মধ্যে শক বা যবনজাতীয় কেহই পঞ্জাববাসী বলিয়া বর্ণিত হয় নাই অথবা পঞ্জাবে বৌদ্ধ বা পারসিক প্রভাবের কোন কথারও উল্লেখ তাহাতে নাই। অধ্যাপক জ্যাকোবি বা ডাহল্‌মানের মত সমীচীন নহে। বৌদ্ধ প্রভাবের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভারতেতিহাস প্রচারিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভারতের কাল।

য়ুরোপীয়গণের সংস্কৃতচর্চ্চার প্রসাদে আজকাল আমাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে নানারহস্য প্রকাশিত হইতেছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্‌ প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতেরা বহুদিন আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে, হিন্দুদিগের পুরাণ নামে-খ্যাত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোনখানিই সহস্র বর্ষের অধিক প্রাচীন নহে। ডাঃ বুহ্লার তাঁহার আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে যে পরিশোধিত ভূমিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে এই পুরাণশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এই জর্ম্মাণ অধ্যাপক ইংরাজ অধ্যাপকের মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, হিন্দুদিগের পুরাণশাস্ত্র সহস্রবর্ষ অপেক্ষা বহু প্রাচীনকালের, তাহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ করা যায়। "হর্ষচরিত"-প্রণেতা বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে (প্রায় ৬২৫ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার হর্ষচরিতে পবনপ্রোক্ত পুরাণের কথার উল্লেখ আছে। বাণভট্টের 'পুস্তকবাচক' (পুস্তকপাঠক) এই "পবনপ্রোক্ত পুরাণ" তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। "ব্রহ্মসিদ্ধান্ত"-প্রণেতা ব্রহ্মগুপ্ত খৃষ্টীয় ৬২৮।২৯ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠে সহজেই বুঝা যায়, তাহার অধিকাংশই "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ" হইতে রূপান্তরিত অবস্থায় গৃহীত হইয়াছে। বাণভট্টের "চণ্ডিকাশতক" ও তাঁহার সমসাময়িক ময়ূরভট্টের "সূর্য্যশতক"ও পুরাণ হইতে গৃহীত বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "চণ্ডিকাশতক" মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যের এবং "সূর্য্যশতক" সৌরপুরাণান্তর্গত অধ্যায় বিশেষের প্রতিচ্ছবি বলিলেই হয়, সুতরাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্যূন ১২শত বৎসর পূর্ব্বে যে "বায়ু," "মার্কণ্ডেয়" ও "সৌর" পুরাণ বর্ত্তমান ছিল, তাহা বলিতে আর কোন বাধা থাকিতেছে না। এতদ্ভিন্ন ডাঃ বুহ্লার আরও দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত "বিজ্ঞানেশ্বরের" মিতাক্ষরা, দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত অপরার্কের "যাজ্ঞবল্কীয় ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধ" এবং হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থে পুরাণবচনের উদ্ধার দেখিতে পাওয়া যায়। অলবীরুণি ১০৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতেতিহাস রচনা করেন, তাহাতে "আদিত্য," "বায়ু," "মৎস্য," "বিষ্ণু" ও "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ" হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুরাণ কতকালের এবং তৎসম্বন্ধে য়ুরোপীয় মতামত।

একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য "দশাবতারচরিত" রচনা করেন। এই সকল শেষোক্ত প্রমাণ যদিও ইংরাজ অধ্যাপকের কথিত কালের বিরুদ্ধ হইতেছে না, তবুও তাহার স্বপক্ষে বিশেষ বলবত্তর প্রমাণ নহে। বীরুণি ও ক্ষেমেন্দ্রের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যও স্মৃতিবচন বলিয়া মার্কণ্ডেয়-পুরাণের কতিপয় প্রমাণ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিন্দুর পুরাণশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল। শঙ্করাচার্য্যের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী কুমারিলভট্টের গ্রন্থেও পুরাণের কথা আছে। তন্ত্রবার্ত্তিকের একস্থলে কুমারিল পুরাণ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে পুরাণশাস্ত্র পৃথিবীবিভাগ, বংশানুক্রম, দেশকাল-পরিমাণ ও ভাবীকথন প্রধানতঃ এই চারিভাগে বিভক্ত। তন্ত্রবার্ত্তিকোক্ত পুরাণ লক্ষণের সহিত এখনকার বৃহৎ পুরাণগুলির অনৈক্য নাই বলা যাইতে পারে। এতভিন্ন ডাঃ বুহ্লার দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে (স্মৃতি গ্রন্থাদিতে) "পুরাণোক্ত" বলিয়া অনেক উদ্ধৃত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সকল স্থানে পুরাণের নামোল্লেখ থাকে না। তিনি আপস্তম্বীয় ধর্ম্মসূত্র হইতে এইরূপ দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহার একটি ভবিষ্যৎপুরাণ হইতে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটি সম্বন্ধে আপস্তম্ব উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অপর শ্লোকটি উদ্ধারের সময়ে আপস্তম্ব কেবলমাত্র "পুরাণবচন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াগিয়াছেন। ডাঃ বুহ্লার অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই দুই শ্লোকের প্রত্যেক পাদ অবিকৃত ভাবে একই অর্থে বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে ঐ দুই শ্লোক সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় ও পদ্মপুরাণে ঐ দুই শ্লোক কিছু রূপান্তরিতভাবে উল্লিখিত আছে। এই সাদৃশ্য দ্বারা ডাঃ বুহ্লার আরও দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মসূত্রাদিতে "পুরাণোক্ত বচন" এরূপ অনামা পুরাণের উল্লেখ যাহা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা এ অনুমান একান্ত অসঙ্গত নহে যে, পূর্ব্বে পুরাণশাস্ত্র নামে যে গ্রন্থ ছিল, তাহা হইতেই বৈদিক ধর্ম্মসূত্রাদিতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তদুক্ত বিধি নিষেধাদিই উত্তরকালে স্মৃতিশাস্ত্রের ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে। ডাঃ বেবারও (Dr. Weber) তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে পূর্ব্বে পুরাণনামে প্রসিদ্ধ এক শ্রেণীর শাস্ত্র ছিল, যাহা মন্থন করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ী বিভিন্ন প্রকৃতির গ্রন্থকর্ত্তাদ্বারা বর্ত্তমান পুরাণ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ডাঃ বুহ্লার এ সম্বন্ধে আরও বলেন, যে বর্ত্তমান পুরাণগুলি যে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, তাহা বাণভট্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও সহজে প্রমাণ করা যায়। বায়ু, বিষ্ণু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভবিষ্য রাজগণের নামের তালিকা প্রায়ই গুপ্তসম্রাট্ ও তাঁহাদের সমসাময়িক রাজগণের নামোল্লেখ করিয়া সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা হইতেও ডাঃ বুহ্লারের পোষক প্রমাণ অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় বর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় কবি কৃষ্ণরাম প্রণীত "রায়মঙ্গল" কাব্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "বড় খাঁ গাজী" নামে এক মুসলমান পীরের কথা আছে। এই গাজী সাহেবের বিবরণ প্রবন্ধ লেখক আরও একটু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সংক্ষেপতঃ তাহাই এই স্থানে বিবৃত হইল।

পীরবুড়া খাঁ গাজী।

"টাকীর জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জমীদারী মধ্যে দক্ষিণে আমাদী নামে এক স্থান আছে। ইহা জামীরা পরগণার অন্তর্গত। এই আমাদীতে পীর বুড়া খাঁর কবর আছে। বুড়া খাঁর সহিতও দেবতা দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ হইয়াছিল, পরে বন্ধুত্ব হয়। এই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বিশ্বাস করিতেছি যে, পীরবুড়া খাঁ রায়মঙ্গলের বড় খাঁ গাজী হইতে পারেন। আমাদীতে প্রবাদ এই যে, বুড়া খাঁই সর্ব্বপ্রথমে জামীরা পরগণা আবাদ করিয়া তাহাতে লোক বাস করান। আবাদে প্রথম দিন বুড়া খাঁ বনে সর্ব্বপ্রথমে একটি জামীর নেবু প্রাপ্ত হন। এই প্রথম প্রাপ্ত ফল হইতে তিনি নব আবাদী পরগণার জামীরা নাম রাখেন। আবাদ হইয়া গেলে, ইনি এখানে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দারাপুত্র লইয়া বাস করেন। বুড়া খাঁর পুত্রের নাম ফতে খাঁ। প্রথম বন আবাদের সময় বুড়া খাঁ দুইটি শালিক পাখীর শাবক প্রাপ্ত হন। এই পাখী দুটিকেও তিনি প্রতিপালন করেন। এই পাখী দুটি এত পোষ মানিয়াছিল যে ইহাদিগকে খাঁচায় রাখিতে হইত না। ইহারা স্বেচ্ছামত উড়িয়া চরিয়া বেড়াইত, আবার আসিত। যখন আবাদ শেষ হইল, প্রজা বসিল, তখন নবাব বুড়া খাঁর নিকট কর চাহিলেন।

ফতেখাঁ কর লইয়া নবাব-সরকারে গমন করিলেন। যাইবার সময় ফতেখাঁ একটি শালিক লইয়া গেলেন, এবং পিতাকে বলিয়া গেলেন, 'যদি আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে শালিক ফিরিয়া আসে, তবে জানিবেন যে আমার মৃত্যু হইয়াছে, তখন যথা-কর্ত্তব্য করিবেন।'

কিছুদিন পরে দৈবগতিকে শালিক ফিরিয়া আসিল। তখন বুড়া খাঁ পুত্রশোকে অধীর হইয়া নিজে জীবিতাবস্থায় কবরস্থ হইবার মনন করিলেন। কবর খোঁড়া হইল। বৃদ্ধের ত্রয়োদশ জন সর্দ্দার ছিলেন। ইঁহারা "তের ইয়ার" নামে খ্যাত। বুড়া খাঁ ইহাদিগকে লইয়া একদিন প্রাতঃকালে কবরে প্রবেশ করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়া কবরস্থানে উপনীত হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই ফতেখাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুড়া খাঁ আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, 'যাহা হউক তুমি ধন সম্পত্তি ভোগ কর, যে কারণেই হউক, এখন আর আমার পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে। এই বলিয়া তিনি জীবিতাবস্থায় স্বেচ্ছায় কবরস্থ হইলেন। ফতেখাঁ এরূপ পিতৃবিয়োগে কাতর হইয়া বিষম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনিও জীবিতাবস্থায়

কবরস্থ হইলেন। শালিক পাখী দুটিও সেইখানে আসিয়া যেন কালপ্রেরিত হইয়াই মরিল। ত্রয়োদশ জন সর্দ্দার প্রভু ও তৎপুত্রের মৃত্যুতে সংসার অসার জানিয়া সেই স্থানেই লীলা সম্বরণ করিল। প্রভুদিগের প্রতি তাহাদের এতটা স্নেহ ও শ্রদ্ধা দেখিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে নদীরূপে গলাইয়া দিলেন। ইহাই "তেরোয়ার" নদী। ইহারা জীবিতাবস্থায় স্বেচ্ছায় কবরস্থ হওয়ায় পীর নামে খ্যাত হইলেন। তদবধি এখানে মুসলমানেরা হাজত ও ভোগ দিয়া থাকে। আমীরা পরগণার পূর্ব্ব জমীদার চৌধুরীরা এই পীরের আস্তানার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কয়েকখানি গ্রাম লাখেরাজ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যাঁহারা ইহার সেবাইত, তাঁহাদের আর সে পূর্ব্ব সম্পত্তি নাই, অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পীরের গোরের উপর একটি গোলোকচাঁপা (গুলাল চাঁপা) ফুলের গাছ আছে। এই গাছে এক সময়ে বটের জটার ন্যায় একটি আশ্চর্য্য রকমের ফল হয়। এই ফল দেখিতে লোকসমাগম হয়। দর্শকেরা ফল দেখিয়া আস্তানার ফকীরের কথামত মুগ্ধ হইয়া মানস সিদ্ধির জন্য এখানে সীরণি দেয়। কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে এই স্থানের মহিমা ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে প্রতি ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই আস্তানায় যাত্রী আসিতে লাগিল। প্রতি বৎসরে এখন সেই সময় এখানে একটি প্রকৃত মেলা হয়। শুনা যায়, যাত্রীরা মানস করিয়া এখানে সীরণি দিতে আসিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে কি না, তাহা বৃক্ষ হইতে সদ্য পুষ্প পতন দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে সময় গাছে ফুল হইবার কথা নহে, সে সময়ও নাকি যাত্রীরা মানস সিদ্ধির অনুকূল টাট্‌কা ফুল পাইয়া থাকে। এই পীরের ফকীরেরা 'সা সাহেব' নামে কথিত হন।"

দ্বিতীয় মাসিক কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৭। ৬ই জুন) তারিখে রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে পরিষৎ-কার্য্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ বি এল, কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু (সহ-সম্পাদক)।

অধিবেশনের আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "ছাতনার ইষ্টক-লিপি"-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ। ইষ্টক লিপি সভাস্থলে প্রদর্শিত হইবে।

৪। অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্ম-মঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির মন্তব্যের আলোচনা।

৬। বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক বিগত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

সম্পাদক বিগত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে কার্য্য বিবরণের এক স্থানে 'উঠাইয়া লইলেন' এইরূপ লিখিত হইয়াছে, উহার পরিবর্ত্তে "প্রত্যাহার করিলেন" এইরূপ লিখিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে সভাপতি মহাশয়ের উক্তির বিবরণ স্থলে

Positive শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই স্থানে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া কোন বাঙ্গলা প্রতি শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। কার্য্য বিবরণ অনুমোদিত হইল।

অতঃপর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। নিম্নে যথাক্রমে, প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত সভ্যের নাম প্রদত্ত হইল।

	প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস, এম এ, বি এল। (এটর্ণি)
২।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র।
৩।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
৪।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।
৫।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মল্লিক।	শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন, বি এ।
৬।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।	শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।
৭।	শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, বি এ।
৮।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯।	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়।
১০।	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
১১।	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ।	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে বি এল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'ছাতনার ইষ্টক লিপি' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় নগেন্দ্রবাবুকে প্রবন্ধ পাঠের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে পঠিত প্রবন্ধের সহিত ঐতিহাসিক বিষয়ের সম্বন্ধ অল্প। কিন্তু আশা করা যায় যে ঐ জাতীয় আলোচনার ফলে ও রাজপুরুষদিগের যত্নে ভবিষ্যতে ইতিহাসের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ আলোকিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মমঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে প্রবন্ধের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। সে আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, যে প্রবন্ধোক্ত অনেক কথার সহিত তাঁহার মত ভেদ আছে। ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর এ মত তিনি স্বীকার করেন না। ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিতে শূন্য শব্দের ব্যবহার দেখিয়াই যে বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যতাবাদ বুঝিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উহা হিন্দু দার্শনিক অভিনবগুপ্তের শূন্যতাবাদ অর্থাৎ (Nothing) হইতে সৃষ্টিপ্রণালীবাদও বুঝাইতে পারে। ফলকথা এরূপ একটী শব্দ

হইতে মত বিশেষের অনুমান তাদৃশ যুক্তি সঙ্গত নহে। পরন্তু ধর্ম্মমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশ গুলি তাদৃশ প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক নহে এবং প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ভাষাগত দোষ দৃষ্ট হইল। তাঁহার মতে প্রবন্ধটী বর্ত্তমান আকারে পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার যোগ্য নহে। তবে সমবেত সভ্যবর্গ যেরূপ বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, যে সভাপতি মহাশয় যে অভিনবগুপ্তের উল্লেখ করিলেন, তিনি প্রথমে শৈব থাকিলেও শেষে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের অপভ্রংশ এরূপ নিশ্চিত করিয়া বলেন নাই। প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অনুমান করিয়াছেন মাত্র। প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সম্পাদক বলিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস প্রবন্ধ পাঠে পত্রিকার পাঠক আনন্দ ও উপকার লাভ করিবে। প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। ঐতিহাসিক হিসাবে প্রবন্ধের মূল্য অল্প নহে। তাঁহার জ্ঞানমতে শূন্যবাদ বৌদ্ধদর্শনের একটী বিশেষত্ব।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে ধর্ম্মপূজার ঐতিহাসিক মূল শূন্যবাদের আলোচনা ঐ সকল পরিষদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তবে যখন কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি যাহা জানেন বলা ভাল। তাঁহাদের গ্রামে ধর্ম্মের মন্দির আছে। ধর্ম্মের পূজক জাতিতে কুম্ভকার বটে, কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরাও ধর্ম্মপূজায় বিশেষভাবে যোগদান করে। তাঁহার বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মের এমন কিছুই নাই, যাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই, শূন্যতাবাদও হিন্দুদর্শনে পাওয়া যায় না এরূপ নহে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধোক্ত ধর্ম্মপূজার বিবরণ শুনিয়া বোধ হইল যেন ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু সম্পর্ক আছে। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের ভাষার আলোচনায় সাহিত্যের উপকার হইতে পারে। শূন্যতাবাদ হিন্দুদর্শনেও আছে।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার শৈশবে তিনি বীরভূম জেলায় ধর্ম্মপূজা দেখিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুরের নিকট অনেকরূপ বলি দিবার প্রথা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র "অহিংসা," সেইজন্য মনে হয়, ধর্ম্মপূজার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। যমরাজকে ধর্ম্মরাজ বলে। তাঁহার বোধ হয়, ধর্ম্মপূজা যমের পূজা। ধর্ম্মের নিকট লোকে রোগ শান্তির জন্য মানসিক করে। তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় বলিলেন, যে বন্দীপুরের শ্যামরায় ঠাকুরের উল্লেখ হইয়াছে, তিনি সেই বন্দীপুরের রায়-বংশধর। বন্দীপুরে উচ্চবর্ণও ধর্ম্মপূজায় যোগ দান করেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও তান্ত্রিক দল আছে। তাহাদের মধ্যে মদ্যপান, শূকর ভোজন প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত আছে।

শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যে তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বলিলেন যে ধর্ম্মপূজা কেন নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হইল? ধর্ম্ম কেন নীচগামী হইলেন? তাহার বিবরণ খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে। সেই পুস্তক তিনি প্রকাশ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু বলিলেন যে প্রবন্ধের ভাষা স্থানে স্থানে সংস্কৃত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার অনেক কথা না বুঝিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। ধর্ম্মপূজার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্রব আছে, এ মত শাস্ত্রী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে মত বিশেষভাবে প্রকাশ না করিলেও তাঁহার অভিপ্রায় যে ঐরূপ তাহা বুঝা যায়। যে যুক্তি বলে শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ সংস্রব প্রমাণিত করিতে চাহেন, তাহা যুক্তি সিদ্ধ নহে। শূন্যতাবাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা অনেকে বুঝেন নাই। শূন্যতাবাদীরা Matter ও Mind (জড় ও চিৎ) এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অভিনবগুপ্ত বৌদ্ধ ছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করেন না, কারণ তিনি নিজ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে "শূলীকে" (মহাদেবকে) নমস্কার করিয়াছেন। প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে উহার ভাষা গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট। সেই জন্য তিনি উহার পত্রিকায় মুদ্রণ বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন। ভাষা সংস্কৃত করিলে তাঁহার আপত্তি থাকিবে না। মৌলিকতা অথবা গবেষণার পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধের কোন অনাদর করেন নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন প্রবন্ধ কি ভাবে মুদ্রিত হইবে, তাহার ভার পত্রিকা-সম্পাদকের উপর অর্পিত হউক। ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদকের প্রস্তাবমতে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন মহাশয়গণ কৃত্তিবাস সমিতির সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবমতে যাঁহারা বিগত অধিবেশনের পর পরিষদে গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। উপহার-দাতার ও উপহার-প্রাপ্ত গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইল।

১ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল—কোঽহং। ২ শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন—কনকাঞ্জলী (শ্রীমতি মানকুমারী রচিত)। ৩ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মজুমদার—রণরাও, সাহিত্য ও সমাজ।

অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

অনুমোদিত

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ২৮শে আষাঢ়।

তৃতীয় মাসিক কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৮শে আষাঢ় (১৮৯৭। ১১ জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় পরিষৎ কার্য্যালয়ে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ দত্ত এফ এইচ্ সি এস্, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক) ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ (সহ-সম্পাদক)।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে ও সভ্যবর্গের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতির মন্তব্যের আলোচনা।

৪। পত্রিকার নাম পরিষদ-পত্রিকা অথবা পরিষৎ পত্রিকা হইবে, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব।

৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৬। বিবিধ বিষয়।

১। সম্পাদক বিগত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে উহা অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত মহাশয়গণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে যথাক্রমে প্রস্তাবক, সমর্থক ও নির্ব্বাচিত সভ্যের নাম প্রদত্ত হইল।

	প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল।
২।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪।	শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

৩। অতঃপর নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির মন্তব্যের আলোচনা হইল।

(ক) সম্পাদকের প্রস্তাবে ও সহ-সম্পাদকের সমর্থনে স্থির হইল যে পরিষদের দুই জন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে নিয়মাবলীর ২য় ধারায় এইরূপ যোগ হউক 'সাধারণতঃ' দেশের বিদ্যা-শিক্ষার ও বিদ্যাচর্চ্চার প্রতি দৃষ্টি রাখা ও প্রয়োজন মত কার্য্য করা।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(গ) শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত ধারায় এইরূপ যোগ হউক। 'কোন ব্যক্তি বিশেষ বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি সাধন বা সহায়তা করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ বা উপাধি দান।'

'কোন স্বদেশীয় ব্যক্তি যদি স্বদেশে বা বিদেশে বিদ্যার জন্য সম্মান লাভ করেন, পরিষদ্ সভায় তাঁহার জন্য আনন্দ প্রকাশ।'

সমর্থকের অভাবে উক্ত প্রস্তাব আলোচিত হইল না।

(ঘ) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভাষা ও সাহিত্য ভিন্ন অন্য আলোচনা পরিষদের উদ্দেশ্যের বিষয়ীভূত নহে এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। রামেন্দ্র বাবু বলিলেন যে একভাবে সকল শাস্ত্রই সাহিত্যের অন্তর্ভূত বটে, কিন্তু সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা অত্যন্ত কঠিন এবং উদ্দেশ্য সংকীর্ণ করিলে পারদর্শিতা অধিক হইবার সম্ভাবনা। লুপ্ত প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার সাধন, বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও ভাষান্তরের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি কার্য্যেই পরিষদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ করা উচিত। বিলাতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ বিশেষ সভা সমিতি আছে। আমাদেরও ঐরূপ হওয়া উচিত। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, ২য় ধারায় (ঙ) অংশ উঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন যে ২য় ধারায় (ঙ) অংশ থাকাই উচিত। বঙ্গদেশ বিলাত নহে। এখানে কোন বিষয়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা হইবার সম্ভাবনা নাই।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে উক্ত (ঙ) অংশে "সাহিত্যের" পর "পুষ্টি ও প্রচার উদ্দেশ্যে তৎ তৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ" এইরূপ যোগ করা উচিত।

রামেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় যতীন্দ্রবাবুর সংশোধিত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, দেশে বিজ্ঞানের প্রচলন না থাকাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এ সময়ে পরিষদ্ হইতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার মতে পরিষদের উদ্দেশ্য সংকোচ করা উচিত নহে। নানা সভ্য নানা বিষয় জানেন। যিনি যাহা জানেন, তিনি তাহারই বিষয় আলোচনা করিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। এরূপ হইলে সকল সভ্যের শক্তি-প্রয়োগের অবসর হইবে এবং সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনার ফলে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইবে। পরিভাষা সংকলনের জন্য যতটুকু করিব, অধিক করিব না, এরূপ সংকোচের কোন হেতু দৃষ্ট হয় না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে বিলাতে যে প্রণালীতে কাজ হয়, তাহা এদেশে করিতে পারিলে ভালই হয়। কিন্তু এরূপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? পরিষদ্ যে প্রণালীতে গঠিত, তাহাতে একটী মাত্র কাজে সময় ও শক্তিক্ষেপ করা সঙ্গত বা সম্ভব নহে। আমরা বিশেষজ্ঞ (Specialist) লইয়া সভা গঠিত করি নাই। সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই সভ্য হইতে পারেন। উদ্দেশ্য সংকোচ করিলে অনেক সভ্য ঝরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। আমাদের শিক্ষা কোন বিষয় বিশেষে (Special Study) যায় নাই। বিলাতে গিয়াছে। সেই জন্য বিলাতে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি (Specialist) পাওয়া যায়। নানা রুচি নানা প্রবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য লইয়া গঠিত পরিষদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত নহে।

সভাপতি মহাশয় যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব বিষয়ে মত গ্রহণ করিলেন। উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এ অধিবেশনে স্থগিত থাকুক। পরবর্ত্তী রবিবার পুনরধিবেশনে এই অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
সম্পাদক।	সভাপতি।

১৩০৪ সাল ৩১শে শ্রাবণ।

তৃতীয় মাসিক স্থগিত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

তৃতীয় অধিবেশনের নির্দ্ধারণ মতে বিগত ৩রা শ্রাবণ (১৮৯৭, ১৮ই জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়েপাঁচ ঘটিকার সময় পরিষৎ কার্য্যালয়ে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল।

উক্ত অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে যে বিষয়-সমূহের আলোচনা স্থগিত ছিল, তাহারই প্রধানতঃ আলোচনা হইয়াছিল। নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতির মন্তব্যের আলোচনা।

২। পত্রিকার নাম পরিষদ পত্রিকা অথবা পরিষৎ পত্রিকা হইবে, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব।

৩। অন্যতম সহ-সম্পাদক নিয়োগ।

৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গদাধর কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি এল্, শ্রীযুক্ত কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল্ (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ (সহ-সম্পাদক)।

১। নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির বহু আলোচনা হইল।

(ক) সম্পাদক, পরিষদ্ কোনরূপ সমালোচনা করিবেন না, এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ও সম্পাদক প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে দ্বিতীয় ধারায় (চ) অংশে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্মতি ভিন্ন এই শব্দগুলি পরিত্যক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় সম্বন্ধে মত গ্রহণ করিলেন।

রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব অথবা শরচ্চন্দ্রবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

এ বিষয়ে নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে ৯ম ধারায় "ব্যক্তি" শব্দ স্থলে "পুরুষ" শব্দ প্রযুক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর প্রস্তাবক মহাশয় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে কোন সভ্যের নির্ব্বাচন প্রস্তাবিত হইলে, সেই প্রস্তাব সকল সভ্যের গোচর করিয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহার বিচার হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ এবং সম্পাদক উক্ত প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(ঘ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে নবম ধারার পর এইরূপ যোগ করা হউক, যথারীতি নির্ব্বাচনের পর, নির্ব্বাচিত সভ্যের নিকট সম্পাদক তাঁহার নির্ব্বাচন সংবাদ ও তৎসহ প্রচলিত নিয়মাবলী একখণ্ড পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(ঙ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে উক্ত ধারার পর এইরূপ যোগ করা হউক 'নির্ব্বাচিত সভ্য তাঁহার নির্ব্বাচন সংবাদ প্রাপ্তির একমাস মধ্যে প্রবেশিকা ও প্রথম মাসের চাঁদা প্রদান না করিলে তিনি সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন না এবং সভ্যের কোন অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না'।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর প্রস্তাবক মহাশয় "ও প্রথম মাসের চাঁদা" এই শব্দগুলি প্রত্যাহার করিলেন। এইরূপে পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(চ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ১০ম ধারার সভ্য শব্দের পূর্ব্বে "সাধারণ" শব্দ যোগ হইল।

(ছ) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষদে বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত করিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পরিত্যক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, বিশিষ্ট সভ্য মহাশয়দিগের উচিত, পরিষদ্‌কে অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য করা এবং পরিষদের উন্নতিকল্পে অধিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করা।

সম্পাদক প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(জ) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা দ্বাদশ জনের অধিক হইবে না।

(ঝ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে কেহ বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলে উক্ত বিষয়ে "ব্যালট" (Ballot) দ্বারা মত গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(ঞ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, গ্রন্থরক্ষকও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(ট) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ২২শ ধারায় প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে "তাহা" শব্দের পর "কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সহ" এইরূপ যোগ হইবে।

(ঠ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, ৩৫।ক ধারার আরম্ভে "আবশ্যক মত" এইরূপ যোগ হইবে।

(ড) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সমূহ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সমর্থকের অভাবে উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা হইল না।

নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। পরিষদের পত্রিকার নাম পরিষদ্‌-পত্রিকা অথবা পরিষৎ পত্রিকা হইবে, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব আলোচনার পূর্ব্বে, সম্পাদক বলিলেন যে, প্রস্তাবকারী মহাশয় এবং যিনি গত অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবদ্বয়ের মধ্যে

অন্যতরটি সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সভায় উপস্থিত নাই। অতএব উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা সেদিন স্থগিত রাখিলে ভাল হয়। উপস্থিত সভ্য মহোদয়গণের অধিকাংশের অভিপ্রায়ানুসারে রজনীবাবুর প্রস্তাব এই ছিল যে, পত্রিকার নাম পরিষৎ পত্রিকা না হইয়া পরিষদ্-পত্রিকা হয়। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও অমৃতলাল বসু মহাশয়গণ এবং সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

৩। সহ-সম্পাদকের প্রস্তাবে এবং সম্পাদকের সমর্থনে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিষদের অন্যতর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে পরিষৎ পত্রিকাতে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

৫। (ক) গ্রন্থরক্ষক মহাশয় নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহারদাতা মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব করিলেন, তাহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল—প্রয়াস।

" বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রাবণী।

(খ) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নোক্ত মহাশয়গণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।	পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।	পণ্ডিত ভূপতি তর্কভূষণ।

পরে সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ৩১শে শ্রাবণ।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ৩১শে শ্রাবণ (১৮৯৭। ১৫ই আগষ্ট) রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। প্রবন্ধ পাঠ।

(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—"জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল।"

(খ) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু—"মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়।"

৪। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে দুইজন সভ্য-নিয়োগ।

৫। শাখা-সমিতি সমূহের সম্পাদকগণ নিয়োগ।

৬। ব্যাকরণ বিষয়ে শাখা-সমিতি গঠন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব।

৭। বিবিধ বিষয়।

উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরীজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি এল, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ (সহ-সম্পাদক)।

(১) সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

(২) যথারীতি প্রস্তাব ও অনুমোদনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত সভ্যের নাম লিখিত হইল।

	প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি।	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল।
২।	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি।	শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ।
৩।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।	শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, নাজির।
৪।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন সেন।

প্রস্তাবক।	সমর্থকের নাম।	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
৫। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দত্ত।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।	ডাক্তার বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, এম বি।
৬। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু।	শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কবিভূষণ।
৭। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি।	পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।

৩। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় বিষয় (প্রবন্ধ পাঠ) ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ আলোচ্য বিষয়ের পর আলোচিত হইল।

৪। সম্পাদকের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

৫। সম্পাদকের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শাখা সমিতি সমূহের সম্পাদকগণ নিযুক্ত হইলেন। যথা—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পারিভাষিক সমিতি ও উদ্ভিদ্ সমিতি এবং রামমোহনের রামায়ণ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ঐতিহাসিক সমিতি ও কবিকঙ্কণ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীদাসী মহাভারত সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত্তিবাসী-রামায়ণ-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৬। সম্পাদক, ব্যাকরণ বিষয়ক শাখা-সমিতি নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, ভাষার উন্নত অবস্থা উপস্থিত হইলে, ব্যাকরণ সঙ্কলিত হওয়া উচিত, বঙ্গভাষার এখনও সে অবস্থা আইসে নাই। অতএব এখন ব্যাকরণ-সমিতি গঠিত হওয়া সঙ্গত নহে।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, কুঞ্জলাল রায়, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, ব্যোমকেশ মুস্তফি এবং অমৃতলাল বসু মহাশয়গণ রজনীবাবুর প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ পাণিনি ও মুগ্ধবোধের অনুবাদ মাত্র। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগের বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। অধিকাংশের মতে রজনীবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল। অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি মতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ ব্যাকরণ-শাখা-সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইলেন—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যো-

পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত (সম্পাদক)।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে বিদ্যানিধি মহাশয়, লেখক মহাশয় কৃত জয়ানন্দের কাল-নির্ণয়ের অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। তিনি একমনে শুনিয়াছেন। জয়ানন্দের সম্পূর্ণ পুঁথি তিনি দেখেন নাই। Asiatic Societyর পুস্তকালয়ে "বৈরাগ্য খণ্ড" মাত্র দেখিয়াছেন। ঐ খণ্ডে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলিয়া কহিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধলেখক, এক স্থলে প্রদ্যুম্নমিশ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে 'শূদ্রাহ্নিকাচার' নামে এক চারিশত বৎসরের পুঁথি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার লেখকও প্রদ্যুম্নমিশ্র, বোধ হয় ইনিও প্রবন্ধোক্ত প্রদ্যুম্নমিশ্র, একই ব্যক্তি।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, জয়ানন্দের পুঁথি পত্রিকায় মুদ্রিত করা হউক। সভাপতি মহাশয় ইহার সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এই মতই সভার অনুমোদিত হইল।

৭। গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস—সিংহল-বিজয়।

(২) " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—প্রাকৃতিক বিজ্ঞাপনের স্থূল মর্ম্ম।

(৩) " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজা হরিশ্চন্দ্র।

(৪) " অচ্যুতচরণ চৌধুরী—হরিদাস ঠাকুরের জীবনী।

পরিষদ্ নিম্নলিখিত ৫ জন মৃত সভ্যের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

৺ গোঁসাইদাস গুপ্ত, চারুচন্দ্র সরকার, সুরেন্দ্রনাথ রায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে ৺ গোঁসাইদাস গুপ্ত ও ৺ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্তজীবনী পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সভাপতি।

১৩০৪ সাল ৪ঠা আশ্বিন।

(১৩০৪ সালের)

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

১। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।
২। „ „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ } সহকারী সভাপতি।
৩। „ „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার }
৪। „ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ }
৫। „ বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, সম্পাদক।
৬। „ „ নগেন্দ্রনাথ বসু পত্রিকা-সম্পাদক।
৭। „ „ কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ, সহকারী সম্পাদক।
৮। „ „ চারুচন্দ্র ঘোষ অন্যতর সহ-সম্পাদক।
৯। „ „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ধনরক্ষক।
১০। „ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, } আয় ব্যয় পরীক্ষক।
১১। „ „ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, }
১২। „ „ অতুলচন্দ্র বসু গ্রন্থরক্ষক।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। „ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।
৩। „ বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ।
৪। „ „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।
৫। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।
৬। „ বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
৭। „ „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
৮। „ „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। „ „ রজনীকান্ত গুপ্ত।
১০। „ „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১। „ „ শরচ্চন্দ্র সরকার।
১২। „ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

৪র্থ ভাগ।] [৪র্থ সংখ্যা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা,
৬-নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৪।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸০ আনা।

১৫ই মাঘ প্রকাশিত হইল।

অশুদ্ধশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি।
ক্ষুর	খুর	২৪২	২৯
নিঃশ্বাস	নিশ্বাস	২৪৪	৩
আরও কাহার	আর কাহারও	২৪৫	২৪
গৃহী দীপ্তয়ঃ	গৃহদীপ্তয়ঃ	২৪৬	৩২
প্রিয়শ্চ	শ্রিয়শ্চ	২৪৬	৩২
সায়নার্য্য	সায়ণাচার্য্য	২৪৯	১৪
সমপ্রান্তিক	সামপ্রান্তিক	২৫০	৪
বি-উপসর্গের	বি-উপসর্গ	২৫৭	১৬
কাহার	কাহারও	২৫৭	২৫
তখন	যখন	২৫৯	৩১
কথা	কয়া	২৬৬	২৭
বিজ্ঞান	বিজ্ঞাপন	২৬৬	২৯
২০৪ খানি	২১০ খানি	২৯৮	১০
১২৯	১৪২	৩১৫	(* চিহ্নিত টীকায়)

☞ কার্য্য-বিবরণের শেষাংশে /০ হইতে ৷০ চিহ্নিত পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ১৷৶০ হইতে ২৷ পত্রাঙ্ক হইবে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

চতুর্থ ভাগ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩৭।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত

বঙ্গাব্দ ১৩০৪।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

উপসর্গের অর্থ-বিচার।

কি বাঙ্গালি—কি ইংরাজি—আর্য্যজাতীয় ভাষা-মাত্রেরই সংগঠনে উপসর্গ-নিচয়ের সবিশেষ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। উপসর্গের গুণেই এক এক মূল শব্দ হইতে বিভিন্ন অর্থবাচক বিভিন্ন শব্দ আবির্ভূত হয়; আর, উপসর্গের গুণেই বিভিন্ন অর্থবাচক বিভিন্ন শব্দ নানাপ্রকার সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া, পরস্পরের ছায়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। কেবল মাত্র উপসর্গের অধিষ্ঠান প্রভাবে 'কৃতি' এই একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইতে কত শব্দই বাহির হইয়াছে;—প্রকৃতি, বিকৃতি, আকৃতি, ব্যাকৃতি, সংস্কৃতি, উপকৃতি, অপকৃতি, অনুকৃতি, প্রতিকৃতি, নিষ্কৃতি, নিরাকৃতি, সুকৃতি, দুষ্কৃতি,—এতগুলা সন্তান-সন্ততি বাহির হইয়াছে! সকলেই স্ব স্ব প্রধান! অথচ আবার খুঁজিলে উহাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-সূত্র সহজেই ধরা পড়ে; কিন্তু খুঁজিবার প্রণালী আছে। এলোমেলো রকমে খুঁজিলে লাভের মধ্যে কেবল কতকগুলা কল্পনা-মূলক আনুমানিক সিদ্ধান্ত সত্যের বেশ ধরিয়া অনুসন্ধাতাকে ছলনা করে; তিনি সে গুলিকে ঠাহরা'ন প্রকৃত সত্য, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা দেখিতে পায় যে, তাহা সত্যের ভাণমাত্র।

উপসর্গ-গ্রস্ত শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার প্রধান উপায়—উপসর্গের নিজের অর্থ কি তাহা স্থির করা। বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়েরা ঠিক্ তাহার উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাঁহাদিগকে কোনো একটি উপসর্গের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা সেই উপসর্গ-বিশিষ্ট বিশেষ একটি শব্দকে সেই উপসর্গের অর্থ-বেশে সাজাইয়া আনেন। সেই সাজানো অর্থের গোড়াতেই যে, সেই উপসর্গটি স্বয়ং বিরাজমান, এটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। বালক সন্দেশ চাহিতেছে, অথচ ঘরে সন্দেশ নাই, এরূপ

স্থলে ধাত্রী যেমন বালকের হস্তে একখণ্ড চিনির ড্যালা দিয়া বলে 'এই নেও সন্দেশ', তেমনি কোন বালক উপসর্গ-গুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, পণ্ডিত মহাশয় বলেন

প্র কি? না প্রকৃষ্টরূপে,
বি কি? না বিশেষরূপে,
সং কি? না সম্যক্‌রূপে ইত্যাদি ইত্যাদি

বিষম ধন্দচক্র!

(১) প্র কি? না প্রকৃষ্টরূপে
(২) প্রকৃষ্ট কি? না প্র পূর্ব্বক কৃষ্ট
(৩) অতএব এটা স্থির যে, প্রশব্দের অর্থ প্র-পূর্ব্বক কৃষ্টরূপে।

ইহারই সহোদর ভ্রাতা আর একটি এই :—

(১) ঘোড়া কি? না ঘোড়ার গাড়ী।
(২) ঘোড়া'র গাড়ী কি? না ঘোড়া পূর্ব্বক গাড়ী।
(৩) অতএব এটা স্থির যে, ঘোড়া শব্দের অর্থ ঘোড়া-পূর্ব্বক গাড়ী।

পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং যখন বলিতেছেন যে প্র-উপসর্গের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে, তখন, একজন যদি বলে যে, ঘোড়া শব্দের অর্থ ঘোড়ার গাড়ী, তবে তাহার অপরাধ কি?

প্র কিনা প্রকৃষ্টরূপে, বি কিনা বিশেষরূপে, সং কিনা সম্যক্‌রূপে, এ সকল ছেলে-ভুলানিয়া কথায় যাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারা থাকুন্, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, উপসর্গ-গুলির প্রকৃত অর্থ যতক্ষণ না রীতিমত অনুসন্ধানদ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে, ততক্ষণ বঙ্গের সাহিত্য এবং বিজ্ঞান মহলে সময়ে সময়ে অলিক্ষত ভাবে শব্দার্থের বিপর্য্যয় ঘটিয়া ভাষার মূলে আঘাত পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমি তাই বলি যে, রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে উপসর্গগুলির প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা হউক্, তাহা হইলে বঙ্গভাষার বিশেষ একটি উপকার সাধন করা হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী মোটে দুইটি মাত্র :—(১) হেতু প্রদর্শন, এবং (২) দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। ন্যায়-শাস্ত্রে হেতুর আর এক নাম সাধন, এইজন্য পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর নাম দেওয়া যাইতে পারে সাংসাধিক (ইংরাজিতে যাহাকে বলে deductive); আর, শেষোক্ত প্রণালীর নাম তো হইতেই পারে দার্ষ্টান্তিক (ইংরাজিতে যাহাকে বলে Inductive)।

মনে কর, আমি এই একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিলাম যে, দ্বিখণ্ডিত ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুমাত্রই রোমন্থন করে। প্রমাণ কি? প্রমাণ আর কিছু না;—গো, মহিষ, হরিণ, ছাগল, এই চারি জাতীয় জন্তুর দৃষ্টান্ত। সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ব্যাপক-সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিবার এই যে প্রণালী, ইহারই নাম দার্ষ্টান্তিক প্রণালী। সাংসাধিক প্রণালী ঠিক্ ইহার উল্টা পিট। মনে কর আলিপুরের পশ্বালয়ে বেড়াইতে গিয়া বাইসন্ নামক একটা জন্তুর সহিত

আমার প্রথম পরিচয় মাত্রেই আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এ জন্তুটা নিশ্চয়ই রোমন্থন করে। প্রমাণ কি ? না যেহেতু ইহার খুর দ্বিখণ্ডিত। হেতু অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বা-বধারিত ব্যাপক সিদ্ধান্ত সম্মুখবর্ত্তী সংকীর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার এই যে প্রণালী, ইহা-রই নাম সাংসাধিক প্রণালী। "সাংসাধিক" অর্থাৎ হেতু দ্বারা সংসাধন করাই যাহার বিশেষ পরিচয় লক্ষণ। নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত প্রণালী সবিশেষ কাজে লাগে ; আর, আবিষ্কৃত তত্ত্বের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার সময় শেষোক্ত প্রণালী সবিশেষ কাজে লাগে।

এইখানে একটি কথা আমি পূর্ব্বাহ্নে বলিয়া রাখিতেছি, পরে যেন পাঠক আমার অভিপ্রায় তাহা ছাড়া আর কোনরূপ না বোঝেন। আমি বলিয়া রাখিতেছি যে, একমেটে প্রমাণকে দোমেটে করিবার জন্য মাঝে মাঝে ইংরাজি ভাষাকে সাক্ষী মান্য করিব। যদি বল যে, প্রমাণ দৃঢ় করিবার কি অন্য উপায় নাই ? তবে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই :—দুই প্রতিবেশীকে সাক্ষী মান্য করিলে, উভয়ে যদি একই রূপ কথা বলে, তবে সে কথা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে ; কিন্তু পরস্পরের অপরি-চিত দুই জন বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে সাক্ষী মান্য করিলে উভয়ে যদি একই রূপ কথা বলে, তবে সে কথার মূলে যে সত্য রহিয়াছে, এ বিষয়ে আর কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। এরূপ যখন সুবিধা পাইতেছি, তখন আমার বিবেচনায় প্রমেয় বিষয়ের প্রমাণ দৃঢ় করিবার জন্য আবশ্যক মতে ইংরাজি ভাষাকে সাক্ষ্য মান্য করা বুদ্ধিমানেরই কার্য্য। আদিম কালের সেই একটি উচ্চ প্রদেশ যেখান হইতে দেশীয় ভাষার পূর্ব্ববাহিনী নদী এবং বিদেশীয় ভাষার পশ্চিমবাহিনী নদী, উভয়ে একত্র যাত্রারম্ভ করিয়া, কালক্রমে দুই বিভিন্ন পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিভিন্ন দিকে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহারই প্রতি আমার প্রকৃত লক্ষ ; ইংরাজি ভাষা কেবল উপলক্ষ মাত্র। ভূমিকা এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাক্।

সূচনা।

প্রথমে আমরা বিবেচ্য উপসর্গের গোটা কত বাছা বাছা দৃষ্টান্ত সারিবন্দি করিয়া সাজাইয়া রাখিব।

তাহার পরে সেই দৃষ্টান্তগুলির আদিস্থিত উপসর্গের যথাবৎ অর্থ অবধারণ করিয়া দার্ষ্টান্তিক প্রণালী অনুসারে সেই অবধারিত অর্থের ব্যাপ্তি সাধন করিব ; এইরূপ ব্যাপ্তি-সাধনের ইংরাজি নাম Generalization।

তাহার পরে সেই প্রতিপাদ্য অর্থটিকে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলির গণ্ডির বাহিরে বিভিন্ন স্থলে প্রয়োগ করিয়া তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষা করিব ; এইরূপ যাথার্থ্য পরীক্ষার ইংরাজি নাম Verification.

প্র এবং নি এই দুই উপসর্গের দৃষ্টান্ত।

প্রশ্বাস ... ... নিঃশ্বাস

প্রবৃত্তি ... ... নিবৃত্তি

প্রবাস ... ... নিবাস

প্রবেশ ... ... নিবেশ

প্রক্ষেপ ... ... নিক্ষেপ

প্রকৃষ্ট ... ... নিকৃষ্ট

এই দৃষ্টান্তগুলিতে প্র এবং নি এই দুই উপসর্গের অর্থ স্পষ্ট ধরা দিতেছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,

প্র = pro = forth

নি = in

প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে; নি-উপসর্গের লক্ষ্য ভিতরের দিকে। তাহার সাক্ষী

প্রশ্বাস = breathing *forth*

নিশ্বাস = *in*haling

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যেও প্র এবং নি উপসর্গের ঐরূপ আড়াআড়ি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

প্রবৃত্তি = *pro*-pensity = সম্মুখের দিকে ঝোঁক।

নিবৃত্তি = ভিতরের দিকে বৃত্তি টানিয়া লওয়া।

প্রবাসের লক্ষ বাড়ীর বাহিরের দিকে।

নিবাসের লক্ষ বাড়ীর ভিতরের দিকে।

প্রবেশের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে, যেমন, সম্মুখস্থিত অরণ্যে প্রবেশ। নিবেশের লক্ষ্য ভিতরের দিকে, যেমন, পুস্তকের অভ্যন্তরে মনোনিবেশ। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—এক দিক্ দিয়া দেখিলে যাহা প্র, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা নি। কোন্ শব্দের বাচ্য বিষয়কে কোন্ দিক দিয়া দেখা হইতেছে, তাহা সেই শব্দের প্রচলিত অর্থ দৃষ্টে অতীব সহজে জানা যাইতে পারে। যেখানে দেখিবে যে, প্র-পূর্ব্বক কোন একটি শব্দের সহিত নি-পূর্ব্বক আর একটি শব্দের অর্থ সাদৃশ্য দেদীপ্যমান, সেখানে নিশ্চয়ই জানিবে যে, দুই শব্দের অর্থ দুই বিপরীত দিক্ দিয়া অবধারণ করা হইতেছে। proclivity এবং inclination এই দুই শব্দের অর্থ অবিকল একই রূপ; অথচ পূর্ব্বোক্ত শব্দের আদিতে pro, শেষোক্ত শব্দের আদিতে in। দুই শব্দেরই অর্থ ঝোঁক। কিন্তু ঝোঁকের লক্ষ তাহার দুই প্রান্তের দুই বিভিন্ন দিকে :—

(১) যে ব্যক্তির ঝোঁক, তাহার সম্মুখ দিকে।

(২) যে বিষয়ের প্রতি ঝোঁক, তাহার ভিতরের দিকে।

ঝোঁকই বলো, টানই বলো, আর প্রবৃত্তিই বলো, তাহা ব্যক্তির দিক্ দিয়া দেখিলে proclivity, বস্তুর দিক্ দিয়া দেখিলে inclination।

প্রবেশ শব্দের প্র প্রবেশ-কর্ত্তার সম্মুখ দিক্ দেখাইয়া দেয়; নিবেশ শব্দের নি লক্ষ্য বস্তুর ভিতরের দিক্ দেখাইয়া দেয়। নিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ শব্দের প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে, যাহা বলিলাম তাহার যাথার্থ্য আরও স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিক্ষেপ শব্দের বিশেষ দৃষ্টি লক্ষ্য বস্তুর ভিতরের দিকে।

নিক্ষেপ = to throw in;

যেমন, দুর্গ মধ্যে গোলা নিক্ষেপ; কিন্তু যখন আমরা বলি যে, "অমুক পুঁথিতে এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত" তখন বুঝিতে হইবে যে, পুঁথির বহিস্থিত প্রক্ষেপ কর্ত্তার দিক্ হইতেই প্রক্ষেপ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। এ স্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গোলাও দুর্গের অভ্যন্তরে নিপতিত হয়, প্রক্ষিপ্ত বচনও পুঁথির অভ্যন্তরে নিপাতিত হয়;—ইহার বেলাই বা প্র হয় কেন, আর, উহার বেলাই বা নি হয় কেন? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, পৃথক্ ফল যাহা দেখিতেছ, তাহা এক যাত্রার ফল নহে। দুর্গের মধ্যে নিপাতিত হইবার জন্যই গোলা হইয়াছে—গোলার কাজই তাই; গোলা দুর্গাভ্যন্তরে অথবা শত্রুর বক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহার জন্ম সার্থক হয়। কিন্তু পুঁথির অভ্যন্তরে নিপতিত হওয়া প্রক্ষিপ্ত বচনের পক্ষে নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা। প্রক্ষিপ্ত বচনের সহিত পুঁথির কোন প্রকার আন্তরিক সম্বন্ধ না থাকাতে নি উপসর্গ কোন সূত্রেই তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে পারে না। পক্ষান্তরে, গোলা-নিক্ষেপের পরিবর্ত্তে গোলা-প্রক্ষেপ স্থল-বিশেষে দিব্য খাটে। ক্রিকেট্ খেলিবার সময় গোলা-নিক্ষেপ অপেক্ষা গোলা-প্রক্ষেপ অধিকতর সংলগ্ন হয়।

প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট শব্দের প্রচলিত অর্থ উত্তমাধম। এ অর্থ কোথা হইতে আইল? আইল যেখান হইতে, তাহা এখন আরও কাহার নিকটে গোপন থাকিতে পারে না।

প্রকৃষ্ট = প্র + কৃষ্ট = সাম্‌নে টানিয়া আনা।

নিকৃষ্ট = নি + কৃষ্ট = ভিতরে টানিয়া রাখা।

গো-বিক্রেতা ভাল গোরুকে সাম্‌নে টানিয়া আনে—যে, ক্রেতা তাহা দেখুক্; আর, তাহার বিপরীত কারণে অধম গোরুকে ভিতরে টানিয়া রাখে।

প্রদর্শনীয় = ভাল; তাই, প্রকৃষ্ট = ভাল।

অপ্রদর্শনীয় = মন্দ; তাই, নিকৃষ্ট = মন্দ।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলিয়া রাখা শ্রেয় মনে করিতেছি যে,

গ্রহণীয় = ভাল; তাই উৎকৃষ্ট (টানিয়া তোলা) = ভাল।

বর্জ্জনীয় = মন্দ; তাই অপকৃষ্ট (টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া) = মন্দ।

উপরের "টানিয়া আনা", "টানিয়া রাখা", "টানিয়া তোলা", "টানিয়া ফেলা", এই যে চারিটি কথা, চারিটিই বিশেষণ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে; চারিটির কোনটিই ক্রিয়াবাচক নহে। অতএব ইহা দ্রষ্টব্য যে,

টানিয়া আনা = টানিয়া আনা বস্তুর বিশেষণ, টানিয়া আনা ক্রিয়া নহে।

টানিয়া তোলা = টানিয়া তোলা বস্তুর বিশেষণ, টানিয়া তোলা ক্রিয়া নহে।

পণ্ডিত মহাশয়কে প্রয়োজন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় তো বলিবেন প্রকৃষ্টরূপে যোজন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা বলি—সম্মুখ দিকে যোজন। ইংরাজিতে এইরূপ একটি বাক্য-প্রয়োগ প্রচলিত আছে যে, I am looking forward to a time when &c., এই কথাটিতে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য বস্তুর সম্বন্ধে forward শব্দটি কেমন সুন্দর বসিয়াছে তাহা দেখা হউক্; তাহা দেখিলে, প্রয়োজন শব্দের গোড়ায় কি সূত্রে প্র গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। প্রয়োজনীয় বস্তুকে মনোনেত্রের সম্মুখে গঠন করিয়া তোলা—যোজনা করিয়া তোলা, আর, তাহার উদ্দেশে সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারণ-পূর্ব্বক পথ চাহিয়া থাকা, নূতন কিছুই নহে; সেই সূত্রে প্রয়োজন শব্দের আদিতে প্র বসিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, এক দিক্ দিয়া দেখিলে যাহা প্র, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা নি। এইরূপ দিক্ পরিবর্ত্তন গতিকে অনেকগুলি প্র-পূর্ব্বক দেশীয় শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ in-পূর্ব্বক (অর্থাৎ নি-পূর্ব্বক) হইয়া গিয়াছে; তাহার সাক্ষী

প্রভাব = *in*-fluence

প্রগাঢ় = *in*-tense

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশীয় এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় প্র-উপসর্গের প্রয়োগ-সাদৃশ্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার সাক্ষী

প্র-বচন = *pro*-verb

প্রণয়ন (পুস্তক-প্রণয়ণ) = *pro*-duce

প্রকীর্ত্তন = *pro*-claim

প্রলম্বন = prolongation

প্রচুর = profuse

প্রজন = progeny *

এতদ্ব্যতীত, প্রবাহ, প্রসারণ, প্রদান, প্রচার, প্রতান, প্রভা, প্রকাশ, প্রবর্দ্ধন, প্রদীপ, প্রদেশ, এইরূপ প্র-পূর্ব্বক নানা শব্দের মধ্য হইতে প্র-উপসর্গের সম্মুখ-প্রবণতা অর্থ

---

* শাস্ত্রে আছে "প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহী-দীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ প্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোস্তি কশ্চন॥"

জাজ্জল্যমান ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নি-উপসর্গেরও অন্তর্নিষ্ঠতা অর্থ অনেকানেক নি-পূর্ব্বক শব্দের গাত্রে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—কেবল দুই চারিটি স্থলে তাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। নিদান শব্দের ঠিক্ অর্থ কি তাহা উপাদান শব্দের সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রাচীর গঠন করিবার সময় আমরা বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ করি, কিন্তু নিদান সেরূপে সংগৃহীত হইতে পারে না, কেননা নিদান নিতান্তই অন্তরের সামগ্রী। ইংরাজি ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, "to consist of" এবং "to consist in" এই দুইরূপ কথার দুইরূপ অর্থ। "অমুক consists of এই এই সামগ্রী" বলিলে বুঝায় যে, সে সামগ্রীগুলি তাহার উপাদান; আর, "অমুক consists in এই সামগ্রী" বলিলে বুঝায় যে, সেটি তাহার নিদান। তাহার সাক্ষী

'Humanity consists of intellect, animality, life, & body' এ কথা বলিলে বুঝায় যে, বুদ্ধি, মন, প্রাণ এবং শরীর, এ-গুলি মনুষ্যত্বের উপাদান। আর, যদি বলি যে,

'Humanity consists in rationality' তবে তাহাতে বুঝায় যে, প্রজ্ঞা মনুষ্যত্বের নিদান।

ন্যায়-শাস্ত্রে নিগমন শব্দের অর্থ—ইংরাজিতে যাহাকে বলে conclusion।

(১) নি = in

(২) গমন = coming

(৩) নিগমন = incoming

(উপরে, 'come' এবং 'গম', 'cow' এবং 'গো', এই প্রকার শব্দ-সাদৃশ্যের সূত্র ধরিয়া গমন শব্দের অর্থ করিলাম coming; ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, আমরা যেখানে বলি 'তোমার ওখানে যা'ব' ইংরাজেরা সেখানে বলে 'I will come to you')। ন্যায়শাস্ত্রের conclusion-এর সঙ্গে income-এর কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে—ইহা শুনিলে টোলের অধ্যাপকেরা দুঃখের হাসি হাসিবেন তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিতেছেন, এ সে income নহে—লক্ষ্মীর income নহে। এ income সরস্বতীর income—বুদ্ধির লোহার সিন্দুকে তত্ত্বের income! আমরা কথায় বলি—"এ থেকে এই আস্চে" অর্থাৎ এইরূপ যুক্তি হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিতেছে। conclusion যুক্তি-পথের মধ্য দিয়া বুদ্ধির বাহির হইতে বুদ্ধির ভিতরে আগমন করে—তাই তাহা নিগমন। মনে কর দূরে উচ্চাকার কি একটা বস্তু আমার নয়নগোচর হইতেছে—কিন্তু তাহা খোঁটা কি মনুষ্য তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহা যে কি তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না। তাহার পরে ঠাহরিয়া দেখিলাম যে, সে বস্তুটা ক্রমশঃ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমার বুদ্ধিতে আসিল যে, এটা নিশ্চয়ই মনুষ্য। বুদ্ধিতে যে আসিল—কোথা হইতে আসিল? "চলিতেছে" এই যুক্তি হইতে। যুক্তি কি? না যোজনা। কিসের সঙ্গে কিসের যোজনা? "উচ্চাকৃতি

পদার্থ" এই ভাবটির সহিত "চলমানতা" এই ভাবটির যোজনা। যে মাত্র আমার মনোমধ্যে ঐ দুই ভাবের যোজনা (Synthesis) হইল, অমনি আমার বুদ্ধিতে আসিল "এ নিশ্চয়ই মনুষ্য।" নিগমন কি অর্থে income তাহা এখন বুঝিতে পারা গেল; যুক্তির পথ দিয়া বুদ্ধিতে আসা=বুদ্ধির অভ্যন্তরে আগমন=নিগমন; এই অর্থে। ন্যায় শাস্ত্রের 'ন্যায়' শব্দটি নিজে কি? তাহা নি+আয়। আয় শব্দের অর্থ আগমন। টাকা ঘরে আসিলে তাহারই নাম আয়। কোন একটি তত্ত্ব অন্যের নিকটে শুনিয়া তাহা যদি মনোমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, তবে তাহা বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। পক্ষান্তরে, যাহা যুক্তি দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা বুদ্ধির আয়ত্তাভ্যন্তরে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপ যুক্তি-পথের মধ্য দিয়া বুদ্ধির অভ্যন্তরে তত্ত্বের আয় অর্থাৎ আমদানি ন্যায়-শব্দের বাচ্য; যেহেতু ন্যায়=নি+আয়। ইউক্লিডের কৃত একটি জ্যামিতির সিদ্ধান্ত তুমি যখন যুক্তি পরিচালনা করিয়া বুদ্ধিতে আয়ত্ত কর—তখন ইউক্লিডের সিদ্ধান্ত তোমার নিজের সিদ্ধান্ত হইয়া দাঁড়ায়—তাহা তোমার বুদ্ধির অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ হইয়া তোমার নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ নিজস্ব সম্পত্তির ভাব হইতে ন্যায়ান্যায়ের ভাব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। যাহাতে যাহার সম্পূর্ণ অধিকার, তাহাই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহাই তাহার নি+আয়। যাহাতে যাহার অধিকার নাই, তাহা কখনই তাহার নিজস্ব হইতে পারে না। চুরি করা সামগ্রী কখনই চোরের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে না; চোর যদি সহস্রবার বলে, যে, সে সামগ্রী তাহার নিজের, তথাপি তাহা তাহার নিজের নহে। তাহা তাহার ন্যায় নহে, নি+আয় নহে; তাহা অন্যায়। আমি নিজে যুক্তি খাটাইয়া যে কোন তত্ত্ব উপার্জ্জন করি, তাহাই আমার বুদ্ধির নিজস্ব সম্পত্তি; ন্যায়-শাস্ত্র অনুসারে তাহাই আমার ন্যায় (=নি+আয়)। তেমনি আবার, আমি নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন বা উৎপাদন করি, তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ অধিকার বর্ত্তে, তাহাই আমার নিজস্ব ধন; নীতি-শাস্ত্র অনুসারে তাহাই আমার ন্যায়=নি+আয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায়ই বলো, আর, নীতি-শাস্ত্রের ন্যায়ই বলো, নিজস্ব সম্পত্তির ভাব দুয়েরই গোড়া'র কথা। নি-উপসর্গের লক্ষ্য উভয় স্থলেই ভিতরের দিকে।

যিনি যাহা সুযুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই তাঁহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; যিনি যাহা সদুপায় দ্বারা উপার্জ্জন করেন, তাহাই তাঁহার অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কোন ব্যক্তি যদি যথেচ্ছা-মূলক কল্পনা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত সকল মনোমধ্যে পোষণ করেন, তবে কোন বিষয়েরই সত্যাসত্য তাঁহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। তেমনি আবার, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের সম্পত্তি অন্যায় রূপে হস্তগত করিয়া নিজে ভোগ করেন, তবে তাহা তাঁহার অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ পায় না বলিয়া তিনি তাহা জীর্ণ করিতে পারেন না—আত্মসাৎ করিতে পারেন না। এইরূপ

দেখা যাইতেছে যে, ন্যায় শাস্ত্রের "ন্যায়" এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের "ন্যায়" দুয়েতেই নি-উপসর্গের অন্তর্নিষ্ঠতা অর্থ সমানরূপে বলবৎ।

নি-উপসর্গ কোন কোন স্থলে নিষেধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেটা তাহার মুখ্য অর্থ নহে—গৌণ অর্থ। নিবৃত্তি শব্দের মুখ্য অর্থ বৃত্তিকে ভিতরে টানিয়া লওয়া; তাহা হইতেই তাহার গৌণ অর্থ দাঁড়াইয়াছে বৃত্তি-শূন্যতা।

প্র-উপসর্গের সহিত নি-উপসর্গের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখা গেল; অতঃপর তাহার সহিত সং এবং বি এ দুই উপসর্গের কাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তদুপলক্ষে ভূমিকা স্বরূপে গোটা দুই কথা বলা আবশ্যক।

প্রথম কথা এই যে, সং-উপসর্গ কখন কখন আপনার গাত্র হইতে অনুস্বার ঝাড়িয়া ফেলিয়া স হয়। স-উপসর্গের অর্থ, সহ, ইহা বিদ্যালয়ের শিশু ছাত্রেরাও জানে, কিন্তু সং উপসর্গেরও যে গোড়ার অর্থ তাই—ইহা বালক দূরে থাকুক, পণ্ডিত মহাশয়েরাও জানেন কি না সন্দেহ; কেননা তাহা জানিলে তাঁহারা এরূপ কথা কখনই বলিতেন না যে, সং = সম্যক্‌রূপে। সায়নাচার্য্যকৃত বেদভাষ্যে "সংবদধ্বং" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "সহবদত"; অতএব সং যে, সহ, ইহা একপ্রকার বেদবাক্য; একদিকে এই যেমন দেখা গেল, যে, স এবং সং দুয়েরই গোড়ার অর্থ, সহ, আর একদিকে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই গোড়ার অর্থের মধ্য হইতে দোহার দুই শাখা অর্থ দুই দিকে ছট্‌কিয়া বাহির হইয়াছে; তাহা এই—

স'এর অর্থ সমান;

সং এর অর্থ এক সঙ্গে।

তার সাক্ষী

সপত্নী = পত্নী ইনি যেমন—উনি তেমনি—উভয়েই সমান।

সংগম = এক সঙ্গে উপস্থিতি।

ইংরাজি ভাষায় সং এবং স'এর অবিকল অনুবাদ con এবং co। সং যেমন অনুস্বার ফেলিয়া দিয়া স হয়, con তেমনি n ফেলিয়া দিয়া co হয়। co এবং con এ দুয়ের মধ্যে যে, অতীব নিকট সম্বন্ধ, তাহার প্রমাণ এই যে, coterminous এবং conterminous এ দুই শব্দের একই অর্থ। মনে কর

ক ——— খ ——— ঘ
গ

ক খ রেখার খ-প্রান্ত এবং গ ঘ রেখার গ-প্রান্ত এক স্থানে মিলিত হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় ক খ এবং গ ঘ রেখাদ্বয়কে coterminous ও বলা যাইতে পারে, conterminous ও বলা যাইতে পারে;—খ এবং গ সমস্থানে পড়িয়াছে বলিয়া রেখাদ্বয় coterminous;

বিবর্জ্জন অর্থ	সজন,	বিজন
	সধবা,	বিধবা
	সবস্ত্র,	বিবস্ত্র
বৈপরীত্য অর্থ	অনুলোম,	বিলোম
	সপক্ষ,	বিপক্ষ
	অনুরক্ত,	বিরক্ত
হেয়তা অর্থ	সুপথ,	বিপথ
	ধর্ম্ম,	বিধর্ম্ম
	সুজাতি,	বিজাতি
বিশেষত্ব অর্থ	দ্বেষ,	বিদ্বেষ
	দলিত,	বিদলিত
	হীন,	বিহীন
পরিবর্ত্তন অর্থ	বর্ণ,	বিবর্ণ
	প্রকৃতি,	বিকৃতি
	প্রকাশ,	বিকাশ
অসামঞ্জস্য অর্থ	অঙ্গ,	ব্যঙ্গ
	সদৃশ,	বিসদৃশ
	সকল,	বিকল

উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত গুলির প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, বি-উপসর্গের গোড়া'র অর্থ একটা কিছু আছে—তাহাই অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নানা অর্থে পরিণত হয়। একই প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অঙ্কুর যেমন মৎস্য-দেহে পাকনা-রূপে, পক্ষি-দেহে ডানা-রূপে, এবং মানব-দেহে হস্তরূপে পরিণত হয়, তেমনি খুব সম্ভব যে, বি-উপসর্গের গোড়া'র অর্থ বিভিন্ন অবস্থা-গতিকে বিভিন্ন শাখা-অর্থে পরিণত হইয়াছে। বি-উপসর্গের সেই গোড়া'র অর্থটি কি, এবং তাহা কোন্ সূত্রে কোন্ শাখা-অর্থে কি করিয়া পরিণত হইয়াছে, তাহারই অন্বেষণে এক্ষণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। বি-উপ[illegible] প্রচলিত অর্থ-গুলির মধ্যে তাহার গোড়া'র অর্থ অতি অল্পই দেখিতে পা[illegible] অর্থই অনেক; তাহার কারণ আর কিছু না—খাঁটি রূপা'র ঘটিবা[illegible] আর একটি কথা এই যে, টাকা অপেক্ষা খাঁটি রূপা দেখিতে [illegible] মনে হয় যে, তাহা অতীব অধম শ্রেণীর রূপা। অতএব, বি-উ[illegible] আমরা খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়াছি, তাহা যদি প্রথম দ[illegible] দৃষ্টিতে হয়, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা দোষ দিব না—কেননা [illegible] হইবারই কথা।

উদাহরণ-মালা।

প্রকীর্ণ, বিকীর্ণ, সংকীর্ণ
প্রক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত
প্রবর্দ্ধন, বিবর্দ্ধন, সম্বর্দ্ধন
প্রকাশ, বিকাশ, সংকাশ

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্র = pro = forth ; এখন বক্তব্য এই যে,

বি = dis ;
সং = con।

তাহার সাক্ষী

বিবাদী সুর = discord ;
সংবাদী সুর = concord।

"পুষ্প প্রকীর্ণ হইতেছে" বলিলে বুঝায় যে, পুষ্প সম্মুখে ছড়ান হইতেছে; "পুষ্প বিকীর্ণ হইতেছে" বলিলে বুঝায় যে, পুষ্প আশপাশে ছড়ান হইতেছে; "পুষ্পরাশি সংকীর্ণ রহিয়াছে" বলিলে বুঝায় যে পুষ্পরাশি একত্র ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রহিয়াছে। শেষোক্ত স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে অনেকে যখন একত্র ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া অবস্থিতি করে, তখন সকলের ঝোঁক কেন্দ্রাভিমুখে। তেমনি

প্রক্ষিপ্ত = সম্মুখে ক্ষিপ্ত
বিক্ষিপ্ত = আশপাশে ক্ষিপ্ত
সংক্ষিপ্ত = একস্থানে কেন্দ্রীভূত

প্রবর্দ্ধন = সম্মুখে বর্দ্ধন
বিবর্দ্ধন = আশপাশে বা আড়ে বর্দ্ধন
সম্বর্দ্ধন = সাকল্যে বর্দ্ধন

প্রকাশ = সম্মুখে কিরণ প্রসারণ
বিকাশ = আশপাশে আলোকের কিরণ অথবা পুষ্পের পাপড়ি বিস্তার
[illegible] = কেন্দ্রীভূত বা ঘণীভূত আভা

[illegible] বুঝায় যে রজতের গাত্রে যেরূপ শুভ্র আভা ঘণীভূত দেখা যায়

[illegible] দৃষ্টিতে পরিউক্ত দৃষ্টান্ত-গুলির প্রতি চক্ষু বুলাইয়া আমরা পাইতেছি যে

[illegible] উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখে ;
[illegible] সর্গের লক্ষ্য আশপাশে ;
[illegible] র লক্ষ্য কেন্দ্রাভিমুখে।
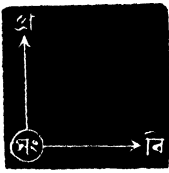
পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হৌক্। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে :—বর্ত্তমান্ প্রবন্ধে সম্মুখ পার্শ্ব কেন্দ্র প্রভৃতি স্থান-বাচক অথবা দিক্ বাচক শব্দ যাহা যখন উল্লেখ করা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহার অর্থ যেন লৌকিক প্রথানুযায়ী মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করা হয়; তাহা না করিয়া কেহ যদি তাহার অর্থ নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার জানা উচিত যে, এখানে আমরা জ্যামিতিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি না—ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতেছি। জাহাজ চালাইবার সময় বটে—ধ্রুব-তারা দেখিয়া অথবা কম্পাসের কাঁটা দেখিয়া অতীব সাবধানে দিক্ নিরূপণ করা হইয়া থাকে আর কর্ত্তব্যও তাই; কিন্তু কথাবার্ত্তা চালাইবার সময় লোকে ধ্রুবতারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উত্তর-পশ্চিমকেও উত্তর বলিতে কুণ্ঠিত হয় না—উত্তর-পূর্ব্বকেও উত্তর বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। শেষোক্ত প্রকার লৌকিক প্রথাকেই আমরা এখানে আদর্শ মান্য করিতেছি। আমাদের এখানকার অভিধানে সম্মুখ দিক্ও যা—সম্মুখ ঘেঁসা দিক্ও তা—দুইই সম্মুখ দিক্; পার্শ্ব এবং পার্শ্ব ঘেঁসা স্থান দুইই আশপাশ; কেন্দ্র এবং কেন্দ্র ঘেঁসা স্থান দুইই কেন্দ্র স্থান।
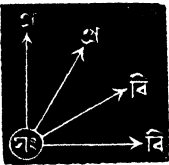
পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হউক্। আর একটি কথা এই যে প্র-উপসর্গের অভিপ্রেত সম্মুখের দিক্ বিশেষ কোন একটা ধরা বাঁধা দিক্ নহে। আমি যখন চিৎ হইয়া শয্যায় শয়ন করি, তখন কড়িকাটের দিক্ আমার সম্মুখ দিক্। আমি যখন দোতালা ঘরের জান্‌লার দ্বার দিয়া মুখ বাড়াইয়া কে গৃহে প্রবেশ করিতেছে, তাহা নিরীক্ষণ করি, তখন নীচের দিক্ আমার সম্মুখ দিক্। অতএব "বৃক্ষ প্রবর্দ্ধিত হইতেছে" এই কথাটির ভিতরে প্র-উপসর্গের বিশেষ সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত যুক্তি-সোপানের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য :—

(১) যে দিকে যাহার গতি সেই দিক্ তাহার সম্মুখ দিক্।

(২) বৃক্ষের গতি উপর দিকে।

(৩) সুতরাং উপর দিক্ই বৃক্ষের সম্মুখ দিক্।

(৪) অতএব উপর দিকে বৃক্ষের বর্দ্ধন
= সম্মুখে বর্দ্ধন
= প্রবর্দ্ধন

তেমনি আবার "গোমুখী হইতে গঙ্গা প্রসৃত হইতেছে" বলিলে এক হিসাবে যেমন বুঝায় যে গঙ্গা নীচে নিপতিত হইতেছে, আর এক হিসাবে তেমনি বুঝায় যে, গঙ্গা সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু "তরু প্রবর্দ্ধিত হইতেছে" না বলিয়া যদি বলা যায় যে, তরু বিবর্দ্ধিত হইতেছে, অথবা "গঙ্গা প্রসৃত হইতেছে" না বলিয়া যদি বলা যায়

যে, গঙ্গা বিস্তৃত হইতেছে, তবে উভয় স্থলেই বুঝায় যে, উদাহৃত বস্তু আড়ে অথবা পার্শ্বে বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিকীর্ণ=আশপাশে ছড়ানো; বিজন=জন মনুষ্য বিবর্জ্জিত। কোথায় আশপাশে, আর, কোথায় বিবর্জ্জিত, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অতএব তুমি যে বলিতেছ যে, বি-উপসর্গের গোড়া'র অর্থ পার্শ্ব-প্রবণতা, আর, সেই গোড়া'র অর্থটি অবস্থা গতিকে রূপান্তরিত হইয়া বিবর্জ্জন অর্থে পরিণত হইয়াছে—এ কথা কোন কার্য্যেরই নহে; কেননা আশপাশ শব্দের মধ্য হইতে বিবর্জ্জন অর্থ টানিয়া বাহির করা অদ্ভুত ভেল্‌কি বাজি। সাপুড়ে যেমন লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া রাজবাটীর সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের আশপাশ হইতে কেউটিয়া সাপ টানিয়া বাহির করে, উহাও সেইরূপ একটা কৃত্রিম কাণ্ড, তাহাতে আর ভুল নাই। ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতির কোন্ কাজটা ভেল্‌কি-বাজি নহে? মনের আনন্দ হইতে যদি মুখের হাসি বাহির হইতে পারে, তবে বি-উপসর্গের পার্শ্ব-প্রবণতা হইতে বিবর্জ্জন অর্থ বাহির হইতে না পারিবে কেন? বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে, মুখের হাস্য এবং মনের আনন্দ এ দুয়ের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান দুইপার্শ্বে ঘাড় নাড়া এবং মনের প্রত্যাখ্যান এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান তাহা অপেক্ষা এক তিলও অধিক নহে। পক্ষী যেমন বাম-দক্ষিণ পার্শ্বে চঞ্চু হেলন দ্বারা অভক্ষ্য সামগ্রী আশপাশে সরাইয়া ফেলিয়া গোবরের মধ্য হইতে ভক্ষ্য কীট বাছিয়া লয়, আমরাও তেমনি দুই পার্শ্বে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার্য্য তত্ত্ব আশপাশে সরাইয়া ফেলিয়া সম্মুখস্থিত বিষয় হইতে স্বীকার্য্য তত্ত্ব বুদ্ধির অভ্যন্তরে টানিয়া লই। মনে কর দর্শকের সম্মুখ প্রদেশে ক্রোশ খানেক দূরে একটা গোরু দাঁড়াইয়া আছে। দর্শক দূরতাপ্রযুক্ত গোরুটাকে অতীব ক্ষুদ্রাকৃতি দেখিয়া মনে ভাবিলেন, "ওটা খরগোশ"। এইরূপ ভাবিয়া কাল্পনিক খরগোশটাকে ধরিবার জন্য মাঠ ভাঙ্গিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। পোয়াটেক পথ অগ্রসর হইয়া থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "না—এটা খরগোশ না—এটা ছাগল।" খরগোশকে মনোনেত্রের সম্মুখ হইতে একপার্শ্বে সরাইয়া ফেলিয়া ছাগলকে মনোনেত্রের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তাহার পরে তথা হইতে আধ ক্রোশটাক পথ অগ্রসর হইয়া দর্শক বলিলেন "না—এটা ছাগল না—এটা গোরু।" ছাগল পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইল, আর, গোরু মনোনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরে দর্শক যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গোরুটা ততই স্পষ্টাকার ধারণ করিয়া আত্ম-সমর্থন করিতে লাগিল। তখন দর্শক স্বীকার করিলেন যে, হাঁ এটা গোরু। গোরুকে তিনি মনোনেত্রের সম্মুখে আনিয়া তাহার যাথার্থ্য নির্ধার্য্য করিলেন, তাই তিনি সম্মুখ দিকে মাথা নাড়িয়া "হাঁ" বলিলেন। গোরুকে যেমন তিনি মনোনেত্রের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, ছাগলকে এবং খরগোশকে তেমনি মনোনেত্রের সম্মুখ হইতে পার্শ্বে সরাইয়া দিলেন; আর, "পার্শ্বে সরাইয়া দিলাম" এই ভাবটি ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিবার জন্য, দুইপার্শ্বে ঘাড়

নাড়িয়া বলিলেন, "না—এটা খরগোশ না; না—এটা ছাগল না।" আশ-পাশের ভাব কি সূত্রে অবস্থা-গতিকে বিবর্জ্জন-ভাবের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে, এক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে; তাহা আর কিছু না—স্বীকার্য্য বিষয়কে মনোনেত্রের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য বর্জ্জনীয় বিষয়কে আশ-পাশে নিক্ষেপ করিবার আকাঙ্ক্ষা; এই সূত্রেই পার্শ্ব প্রবণতার সহিত বর্জ্জনীয়তা কার্য্যগতিকে জড়িত হইয়া পড়ে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে বি-উপসর্গের মধ্যে বৈপরীত্যের ভাব কি সূত্রে প্রবেশ করে? ইহার উত্তর এই যে, বি-উপসর্গের পার্শ্ব-প্রবণতা এবং বর্জ্জনীয়তা দুইই বৈপরীত্যের প্রবেশ-দ্বার। প্রথমে পার্শ্ব-প্রবণতার দ্বার দিয়া কিরূপে বৈপরীত্য প্রবেশ করে, তাহা দেখা যা'ক্।

প্রকৃত কথা এই যে, বি-উপসর্গের বৈপরীত্য মুখ্য বৈপরীত্য নহে; প্রতি-উপসর্গের বৈপরীত্যই মুখ্য বৈপরীত্য; তার সাক্ষী—

প্রাচী = পূর্ব্ব, প্রতীচী = পশ্চিম।

প্র এবং প্রতি'র মধ্যে এইরূপ পূর্ব্ব-পশ্চিমের প্রভেদ। কথাটা এই :—

(১) একদিকে প্র-উপসর্গের সম্মুখ-প্রবণতা;

(২) আর একদিকে প্রতি-উপসর্গের বৈপরীত্য;

(৩) মাঝখানে বি-উপসর্গের পার্শ্ব-প্রবণতা।—

বি-উপসর্গ এইরূপ দুয়ের মাঝখানে পড়া'তে, তাহার গাত্রে কখনও বা প্র-উপসর্গের—কখনও বা প্রতি-উপসর্গের—ছায়া সংক্রমিত হয়।

পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হোক্।
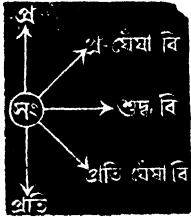
জেলে যখন জাল নিক্ষেপ করে, তখন জাল সম্মুখে প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে বিস্তারিত হয়; এই গতিকে "জাল প্রসারণ কর" এবং "জাল বিস্তার কর" দুয়ের অর্থ একই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। বৃক্ষ অঙ্কুরিতাবস্থা হইতে ক্রমশই উচ্চে প্রবর্দ্ধিত হইবা সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; এই গতিকে দুয়ের অর্থ একই প্রকার হইয়া [illegible]য়। এইরূপ ঘটনা-সূত্রে প্র এবং বি উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হয়। প্র এবং বি'র মধ্যে পরস্পরের ছায়া-সংক্রমণ এই যেমন দেখা গেল, প্রতি এবং বি'র মধ্যেও অবিকল সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লোমাবলী বিপরীত দিকে ফিরান হইলে সেই সঙ্গে তাহা আশপাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; এই গতিকে প্রতিলোম এবং বিলোম এ দুই শব্দের অর্থ অবিকল একই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন, বিবর্জ্জনের দ্বার দিয়া বি-উপসর্গে কিরূপে বৈপরীত্য প্রবেশ করে, তাহা দেখা যাক্।

পৃথিবীতে যদি কেবল ভাল আর মন্দ এই দুই শ্রেণীর বস্তু থাকিত—ভালমন্দের

মাঝামাঝি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে "ভাল না" বলিলেই মন্দ বুঝাইত, "মন্দ না" বলিলেই ভাল বুঝাইত; কিন্তু ভাল এবং মন্দের মাঝামাঝি অসংখ্য বস্তু থাকাতে "ম-সম্মুখে বলিলে "না ভাল না মন্দ" বুঝায়, "ভাল" বুঝায় না; "ভাল না" বলি জলাঞ্জলি দিতে "না ভাল না মন্দ" বুঝানো উচিত—কিন্তু কাজে দেখা যায় তাহার বিপরীত;—তাহা অপাঙ্গ বলিলে মন্দই বুঝায়। সূক্ষ্ম বিচারে

ভাল না = না ভাল না মন্দ; স্থলায়

কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে

কেবল, "মন্দ না" কথাটাই = না ভাল না মন্দ; তি

ভাল না = মন্দ।

এরূপ হয় কেন? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন?

ইহার কারণ আর কিছু না—"তোমার এ কাজটা অতি মন্দ হইয়াছে" না বলিয়া আমরা যখন বলি যে "তোমার এ কাজটা ভাল হয় নাই" তখন তাহার অর্থই এই যে "তোমার এ কাজটা খুবই মন্দ হইয়াছে—তবে কিনা ভদ্রতার অনুরোধে সেরূপ স্পষ্ট কটু কথা তোমার সাক্ষাতে বলিতে আমার মুখে বাধ বাধ ঠেকিতেছে।" এরূপ স্থলে ভাল-না'র অর্থ শুধু কেবল ভাল না হইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না—এখানে তাহার অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবেই মন্দ। এমন কি ইংরাজি সংবাদ পত্রে যদি কোথাও এরূপ লেখা থাকে যে, "অমুক has told what is not true" তবে তাহার অর্থই এই যে অমুক has told a downright lie। এইরূপ লৌকিক ভদ্রতা রক্ষার দায়ে পড়িয়া বিবর্জ্জন অনেক সময় বৈপরীত্যের কটুত্ব-প্রশমন কার্য্যে, অর্থাৎ বিষ ঢাকা কার্য্যে, নিযুক্ত হয়; সেই গতিকে বিবর্জ্জন এবং বৈপরীত্য উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হয়।

আর একটি কথা এই যে, এমন কতকগুলি সামগ্রী আছে, যাহার গায়ে বি... ইহা একটু আঁচ লাগিলেই তাহার মূল্য তদ্দণ্ডে ধূলিসাৎ হইয়া যায়;—যেমন সরলতা। সরলতা খাঁটি হইলেই তবে তাহা সরলতা নামের যোগ্য—মাঝামাঝি সরলতা সরলতাই না। এই জন্য "অকপট" বলিলেই কপটের ঠিক উ[ল্টা] বুঝায়—সরলতা বুঝায়। অতএব দুই দ্বার দিয়া বর্জ্জন ভাবের গণ্ডির ভিতরে বৈ[পরী]ত্যের ভাব প্রবেশ করে;—একটি হচ্চে লৌকিক ভদ্রতা রক্ষা, আর একটি হচ্চে খাঁটি বস্তুর বিশেষ মর্য্যাদা রক্ষা। শেষোক্ত দ্বার দিয়া বৈপরীত্য কেবল নয়—বৈপরীত্যের লাঙ্গুল ধরিয়া অনেক সময় হেয়তা অর্থও বিবর্জ্জনের গণ্ডির মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে। ইষ্ট বস্তুর গাত্রে বিবর্জ্জনের একটু লাগিলেই তাহা জাতিচ্যুত হইয়া হেয় পদবীতে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম অতীব ইষ্ট এইজন্য বিধর্ম্ম (অর্থাৎ আশপাশের ধর্ম্ম) লোকের চক্ষে অনেক সময়ে সাক্ষাৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সুপথ অতীব ইষ্ট বস্তু, এইজন্য বিপথ (অর্থাৎ আশপাশের প কুপথেরই সামিল। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতে

য বি-উপসর্গের পার্শ্বপ্রবণতা, বিবর্জ্জন, বৈপরীত্য, হেয়তা এই চারিপ্রকার অর্থ পরস্পরের অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত রহিয়াছে।

অপ-উপসর্গের ব্যাপারটা এক কথায় চুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে; সে , বিবর্জন এবং হেয়তা বি-উপসর্গের গৌণ অর্থ, কিন্তু অপ-উপসর্গের তাহাই র্থ। তাহার সাক্ষী—

হেয়তা অর্থ ... ... { অপধর্ম্ম, বিধর্ম্ম
অপকর্ম্ম, বিকর্ম্ম
অপদেবতা

বিবর্জ্জন অর্থ ... ... { অপবর্জ্জন, বিবর্জ্জন
অপগত, বিগত
অপেত, বীত

ইংরাজীতে অপ = ab; তাহার সাক্ষী

abnormal = অপ-normal

abdicate = অপবর্জ্জন

বিবর্জ্জন এবং হেয়তা এই দুই অর্থে বি-উপসর্গের এবং অপ-উপসর্গ উভয়েই নির্বিশেষে ়হৃত হইতে পারে বলিয়া অপ-উপসর্গ কখন কখন ইংরাজিতে de (অর্থাৎ বি) মূর্ত্তি ণ করে; তেমনি আবার, ab (অর্থাৎ অপ) উপসর্গ কখন কখন দেশীয় ভাষায় র্ত্তি ধারণ করে; তাহার সাক্ষী—

অপযশ = defamation;

to abstain = বিরত হওয়া।

অপ-উপসর্গ সম্বন্ধে এই যাহা ইঙ্গিত করিলাম, ইহাই যথেষ্ট; কেননা, উহার অর্থ স্পষ্ট যে, তদুপলক্ষে অধিক বাক্য ব্যয় করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। একস্থলে কেবল উপসর্গের একটু প্যাঁচাও অর্থ দৃষ্ট হয়; কিন্তু বিবর্জ্জনের সহিত পার্শ্ব-প্রবণতার সম্বন্ধ যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে এখন আর সে অর্থ কাহার নিকটে পবিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অপাঙ্গ শব্দের অপ-উপসর্গে পার্শ্বপ্রবণতা, হেয়তা এবং বর্জ্জন তিনই এক সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। অপাঙ্গ শব্দের অর্থ নয়নের কোণ। যাহা ার বস্তু তাহাকে আমরা নয়নের সম্মুখে আনয়ন করি, কিন্তু যাহাকে আমরা ত না পারি, তাহাকে আমরা নয়নের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলি, আর সে পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলে তাহার প্রতি আমরা নয়নের কোণ দিয়া আড়-ভাবে দৃষ্টি —"এখনো আছে কি গিয়াছে গেলে আপদ যায়" এই ভাবে দৃষ্টি করি। অপাঙ্গের প্রবণতার সহিত পরিবর্জ্জনের এইরূপ ব্যঙ্গব্যঞ্জক সম্বন্ধ (Correspondence) তে পাওয়া যায়। তবে, স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় ব্যাপারে অপাঙ্গের ওরূপ বিষাক্ত অর্থ

একেবারেই উল্টাইয়া গিয়া অপাঙ্গ দৃষ্টি অমৃত-বৃষ্টিরই নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়; কেন যে, এরূপ হয়, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে;—প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে নয়নের সম্মুখে আনয়ন করিবার ভরপুর ইচ্ছা থাকিলেও প্রণয়িনী লজ্জাবশতঃ সে ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়; কাজেই সেরূপ স্থলে অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রকৃত অপাঙ্গ দৃষ্টি নহে—তাহা অপাঙ্গ দৃষ্টির ভাণ মাত্র। অপাঙ্গ দৃষ্টি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—

(১) চক্ষেরই অপাঙ্গদৃষ্টি কিন্তু মনের সম্মুখ দৃষ্টি—যেমন দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার অপাঙ্গ দৃষ্টি।

(২) চক্ষেরই সম্মুখ দৃষ্টি, কিন্তু মনের ভীষণ অপাঙ্গ দৃষ্টি—যেমন ওথেলোর প্রতি ইয়াগো'র অপাঙ্গ দৃষ্টি।

(৩) মন এবং চক্ষু দুয়েরই অপাঙ্গ দৃষ্টি—যেমন ক্যালিবানের প্রতি মিরাণ্ডার অপাঙ্গ দৃষ্টি।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, তাহা ডাহা গদ্য; এই জন্য বর্ত্তমান স্থলে অপাঙ্গ বলিতে তৃতীয় শ্রেণীর সাদাসিধা অপাঙ্গ ভিন্ন প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেঁদো অপাঙ্গ বুঝাইতে পারে না।

অতঃপর বি-উপসর্গের মধ্যে বিশেষত্ব কোনখান দিয়া প্রবেশ করে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যা'ক্।

বিশেষ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে তৎপূর্ব্বে শেষ শব্দের অর্থ কি তাহা জানা আবশ্যক। অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হোক,—

শেষ = পরিণাম = পর্য্যবসান = পরিসমাপ্তি।
শিষ্ট = পরিণত = পর্য্যবসিত = পরিসমাপ্ত।

শিষ্ট শব্দের প্রচলিত অর্থ—ইংরাজিতে যাহাকে বলে finished gentleman। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, শিষ্টাচার = শিষ্টোচিত আচার ব্যবহার = যাঁহাদের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইয়াছে—যাঁহারা finished হইয়াছেন—তাঁহাদের অনুযায়ী আচার ব্যবহার। শিষ্ট শব্দের অর্থ এই যে, যাহাকে finish করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণকার বিদ্যালয়ের যেরূপ বিপর্য্যয় শিক্ষা-প্রণালী তাহাতে বালকদিগকে finish করিয়া তুলিতে গিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবেই finish করা হইয়া থাকে অর্থাৎ একেবারেই সারিয়া ফেলা হইয়া থাকে। শিক্ষা-শব্দের অর্থ finish করিবার ইচ্ছা। শেষের অর্থ যখন জানিতে পারা গেল, তখন বিশেষের অর্থ জানিতে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব হইবে না। শেষের অর্থ যখন পরিসমাপ্তি, তখন বি-শেষের অর্থ বি-পরিসমাপ্তি অর্থাৎ আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তি, ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। নিম্নে প্রণিধান করা হোক,—

de = বি;
termination = শেষীকরণ;

determination = বিশেষীকরণ।

বিশেষিত হওয়া = নানাদিকের একটা কোন দিকে determination হওয়া

= নানা শাখার একটা কোন শাখায় পরিসমাপ্ত হওয়া।

বস্ত্রের ভাব একটি সামান্য ভাব; এই সামান্য ভাবটির গাত্রে আমি যদি শ্বেত-বর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা একতর শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—শ্বেতবস্ত্রে পরি-সমাপ্ত হয়; উহার গাত্রে আমি যদি শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে পীতবর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা আর এক শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—পীত বস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়; উহার গাত্রে যদি নীলবর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা তৃতীয় আর এক শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—নীল বস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়। এইরূপ আশপাশের শাখায় পরি-সমাপ্তির নামই বিশেষ প্রাপ্তি। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, "Jack of all trades is master of none" যে ব্যক্তির সব কাজই কিছু কিছু আসে, সে ব্যক্তি কোন কাজেই সুপরিপক্ক নহে। এক এক ব্যক্তি এক একটি কার্য্যে লাগিয়া থাকিয়া তাহাতেই সে পরিপক্কতা লাভ করে—পরিপক্কতা লাভ করিয়া অপরাপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে বিশেষিত বা বিপরিসমাপ্ত হয়; আর, সেই সঙ্গে সাধারণ লোক-মণ্ডলীর আশপাশ দিয়া নানাপ্রকার শাখা-মণ্ডলী বিনির্গত হইয়া পরস্পর হইতে উত্তরোত্তর পৃথক্‌রূপে বিশেষিত হইতে থাকে—সাধারণ লোক-মণ্ডলী নানাপ্রকার বাধ্যবাধকতার বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলী, কৃষকমণ্ডলী, বণিক্‌মণ্ডলী, কারিকরমণ্ডলী, সেনামণ্ডলী, এইরূপ বিভিন্ন শাখা-মণ্ডলীতে পরিসমাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তি = বিপরি-সমাপ্তি = বিশেষ প্রাপ্তি। পার্শ্ব-প্রবণতার সহিত বিশেষত্বের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখি-য়াই আমরা বলিতেছি যে, বি-উপসর্গের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অর্থের দ্বার দিয়া শেষোক্ত অর্থ প্রবেশ করিয়াছে—পার্শ্ব-প্রবণতার দ্বার দিয়া বিশেষত্ব প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কেবল এই একটি কথা বলিবার আছে যে, তুমি বলিতেছ বটে যে, পার্শ্বপ্রবণতার দ্বার দিয়া বিশেষত্ব প্রবেশ করিয়াছে; 'হাই যে ঠিক্ তাহা কে বলিল? তাহার পরি-বর্ত্তে আমি যদি বলি যে, বিশে[illegible] দিয়া পার্শ্ব-প্রবণতা প্রবেশ করিয়াছে, তবে তাহাতে কি দোষ হয়? ইহার উত্তর এই যে, তাহাতে এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয়; তাহার সাক্ষী—

প্র উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখ-প্রবণতা;

নি উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ অন্তর্নিষ্ঠতা;

সং উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা;

সমস্তই দিক্ দেশের সম্বন্ধ-সূচক। বি উপসর্গ তখন উহাদেরই দল-ভুক্ত তখন এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে, তাহারও মুখ্য পরিচয় লক্ষণ, উহাদেরই অনুরূপ দিক্‌দেশের সম্বন্ধসূচক।

অতঃপর পরিবর্ত্তন এবং অসামঞ্জস্য এই দুই ভাব বি উপসর্গের মধ্যে কোথা হইতে কি সূত্রে প্রবেশ করে, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক।

সুবিখ্যাত ডারুইন এক জোড়া কপোত লইয়া তাহাদের বংশানুক্রমে বিশিষ্টতম লম্বপুচ্ছদিগের জোড়া মিলাইয়া অল্পকালের মধ্যে তদুৎপন্ন সন্তান-সন্ততির আকার এরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, পরিশেষে সেই কপোত বংশে কপোত এবং ময়ূরের মাঝামাঝি একটা জাতি-বিশেষ ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে Variety হইতে Species-এর উদ্ভাবন, ব্যাকৃতি হইতে বৈজাত্যের উদ্ভাবন, অর্থাৎ আকৃতি পরিবর্ত্তন হইতে বিশেষ জাতির উৎপত্তি। পরিবর্ত্তন এবং বিশেষত্ব দুয়ের মধ্যে যখন এইরূপ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, বি উপসর্গের পরিবর্ত্তন-সূচকতা, পার্শ্ব-প্রবণতা, বিহীনতা এবং বিশেষত্ব এই চারি দ্বারের প্রত্যেকের মধ্য দিয়াই অসামঞ্জস্যের ভাব অতি সহজে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমতঃ বৈষম্য ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তন ঘটিতেই পারে না; তাহার সাক্ষী পৃথিবীতে শীতোষ্ণের বৈষম্যই বায়ুর দিক্ পরিবর্ত্তন এবং চাল পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ বৈষম্যের যথোপযুক্ত মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইলেই পরিবর্ত্তনের স্রোতঃ ব্যাহত বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার অসামঞ্জস্যে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার পার্শ্ব দিয়া প্রদর্শনীয় গোরুর পঞ্চম চরণের ন্যায় ফ্যাঁকড়া বাহির হইলে তাহা অসামঞ্জস্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া দর্শকের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয়। চতুর্থতঃ কোন একটি বস্তু অঙ্গহীন হইলে তাহা হইতে অসামঞ্জস্য বিজৃম্ভিত হয়। পঞ্চমতঃ কোন একটি বস্তুর বিশেষত্ব অতিমাত্র পরিস্ফুট হইলে, চতুর্দ্দিকস্থ আর আর বস্তুর সহিত তাহার মিশ খায় না—তাহারই নাম অসামঞ্জস্য। বিকার শব্দের মুখ্য অর্থ পরিবর্ত্তন ঘটনা; কিন্তু জ্বর বিকারের বিকার একপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন ঘটনা। বিসদৃশ শব্দের মুখ্য অর্থ সাদৃশ্য হইতে পার্শ্বে বিচ্যুত, কিন্তু তাহার প্রচলিত অর্থ খাপছাড়া বা বেমানান্। বিকল শব্দের মুখ্য অর্থ কলাহীন বা অঙ্গহীন কিন্তু বিকল অবস্থা বলিলে বুঝায় যে তদবস্থাপন্ন ব্যক্তির মর্ম্ম গ্রন্থি সকল অব্যবস্থিত ভাবে ছিন্ন ভিন্ন। বিকট শব্দের মুখ্য অর্থ বিশেষরূপে পরিস্ফুট, কিন্তু "বিকট শব্দ" বলিলে বুঝায় অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর শব্দ।

নানাদিক্ দিয়া আমরা এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি যে, পার্শ্বপ্রবণতা, বিহীনতা, বৈপরীত্য, হেয়তা, বিশেষত্ব, পরিবর্ত্তন, অসামঞ্জস্য, সমস্তেরই মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ ভাবের মিল রহিয়াছে। অতএব প্রথমে যেমন আমাদের মনে হইয়াছিল—বি উপসর্গ কেমন করিয়া না জানি অতগুলা ভাবের বোঝা একাকী বহন করে—এক্ষণে তাহার ধন্দ অনেকটা মিটিয়া গেল; আর, সেই সঙ্গে এটাও বুঝিতে পারা গেল যে, বি উপসর্গের মুখ্য অর্থ পার্শ্বপ্রবণতা।

প্র, বি, এবং সং এই তিন উপসর্গের উদাহরণ-মালা ইতিপূর্ব্বে যাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি—সাহিত্যের উদ্যান হইতে ফুল তুলিয়াই আমরা সে মালা গাঁথিয়াছি। এবারে, দর্শনারণ্য হইতে রুদ্রাক্ষ ফল সংগ্রহ করিয়া আর এক রকমের মালা গাঁথিবার উপক্রম করিতেছি;—তাহা দার্শনিকদিগের কাজে লাগিতে পারে।

উদাহরণ-মালা।

প্রচার = সম্মুখে ব্যাপ্তি
বিচার = বিশেষে ব্যাপ্তি
সংচার = সাকল্যে ব্যাপ্তি
[যেমন ইস্পঞ্জের অভ্যন্তরে জলের সঞ্চার]

প্রকার (process) = সম্মুখস্থিত লক্ষ্যের সাধনোপযোগী কার্য্য
বিকার = আশপাশে ছটকিয়া পড়া লক্ষ্যহীন কার্য্য
সংস্কার = অন্তঃকরণে কেন্দ্রীভূত বীজরূপী কার্য্য

প্রজ্ঞা = সম্মুখবর্ত্তী অপরোক্ষ তত্ত্ব জ্ঞান
বিজ্ঞান = পার্শ্ব-ঘেঁসা আপেক্ষিক (অর্থাৎ relative) তত্ত্ব জ্ঞান
সংজ্ঞা = কেন্দ্র স্থানীয় বীজ জ্ঞান

উপরি-প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত গুলির মধ্যে, বিচার, সংস্কার, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান এবং সংজ্ঞা, এই পাঁচটি শব্দের মুখ্য অর্থ অবধারণ করা, দর্শনতত্ত্বান্বেষীদিগের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক।

বিচার বলে কাহাকে? চার = চালনা। ফোড়ায় অস্ত্র চালনা করা হইতেছে, আর, ফোড়ায় অস্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে, দুয়ের অর্থ একই; তা ছাড়া দাঁড় চালনা করা আর দাঁড় ply করা একই। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, চার = চালনা = প্রয়োগ = to apply। বিচার = বিশেষে চারণ = বিশেষে প্রয়োগ। মনে কর এক ব্যক্তির হস্তে আর ব্যক্তির নামাঙ্কিত ঘড়ি ধরা পড়া'তে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির প্রতি চৌর্য্য অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাকে বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। বিচারপতি এ অবস্থায় কি করেন? প্রথমে সাক্ষিগণের মুখে ঘড়ি স্থানান্তরিত হইবার বিশেষ বিবরণ অবগত হ'ন। তাহার পরে, সেই বিশেষ বিবরণের অঙ্গীভূত ধৃত ব্যক্তির আচরিত বিশেষ কার্য্যটিকে চৌর্য্য বলা যাইতে পারে কি না, তাহা মনে মনে বিচার করেন; যাহা তিনি করেন তাহা আর কিছু না—চৌর্য্যের স্বরূপ নির্ব্বাচন (definition) যাহা বিধান-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই তিনি উপস্থিত ঘটনাতে চারণ করেন বা প্রয়োগ করেন;—ইহার নাম বিশেষে সামান্যের চারণ—ইহারই নাম বিচার।

সংস্কার শব্দের অর্থ কি? সাধনীয় কার্য্যের নানা ডালপালা অন্তঃকরণ-মধ্যে বীজ ভাবে কেন্দ্রীভূত থাকিলে তাহাকেই আমরা বলি সংস্কার; সুতরাং সংস্কার শব্দ সং উপ-

সর্গের কেন্দ্রাভিমুখিতার বিশেষ একটি প্রমাণ স্থল। যখন দেখিতেছি যে, হংস-শাবক অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ করে, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, সন্তরণ করিতে হইলে যতপ্রকার পদ-চালনা কার্য্য আবশ্যক, সমস্তই হংসের অন্তঃকরণে বীজ-ভাবে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে; সেই কেন্দ্রীভূত কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ করিয়াই আমরা বলি যে জলে সন্তরণ করা হংসের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার।

প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ শাস্ত্রানুসারে প্রজ্ঞাতব্য বিবেক। সম্মুখবর্ত্তী জ্ঞাতব্য বিষয়কে আশপাশের সমস্ত ডালপালা হইতে বিবিক্ত করিয়া জানা = খোসা ছাড়াইয়া শাঁস গ্রহণ করা = প্রজ্ঞা। গণিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান—সমগ্র জ্ঞানবৃক্ষের বিশেষ বিশেষ শাখা প্রশাখা; এইজন্য সমগ্র জ্ঞানের তুলনায় বলা যাইতে পারে

বিজ্ঞান = বিশেষ বিশেষ শাখায় পরিসমাপ্ত বিশিষ্ট রূপ জ্ঞান
= Science

প্রজ্ঞা করে কি? না নানা বিজ্ঞানপ্রবাহিণীর সাগরসঙ্গম হইতে সার মন্থন করিয়া মনুষ্যের পরমপুরুষার্থ এবং জগতের চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে যথা-সম্ভব তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করে; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে

প্রজ্ঞা = ফলজ্ঞান = Wisdom

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে প্রজ্ঞা অগ্রে কি বিজ্ঞান অগ্রে? ফল জ্ঞান অগ্রে কি শাখা জ্ঞান অগ্রে? ইহার উত্তর এই যে এক হিসাবে ফল অগ্রে, আর এক হিসাবে শাখা অগ্রে। ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা বাহির হয় সুতরাং ফল অগ্রে। আবার শাখা হইতে বৃন্ত, বৃন্ত হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল বাহির হয়, সুতরাং শাখা অগ্রে। অতএব ভাবিয়া দেখিলে প্রজ্ঞা বিজ্ঞানের মূলও বটে—ফলও বটে; তাহার সাক্ষী—বেকন্ এবং দে-কর্ত্তার প্রজ্ঞা-বাণীগুলি আরিস্ততেলিক এবং আরবিক বিজ্ঞানের ফল, কিন্তু নিউটনিক বিজ্ঞানের মূল। তেমনি বেদোপনিষদের প্রজ্ঞা-বাণী গুলি প্রাচীনতর বিজ্ঞানালোচনার ফল এবং ভারতবর্ষের মধ্যমাব্দীয় বিজ্ঞানের মূল। লোকসমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে; তাহার পরে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করে; তাহার পরে শিক্ষিত বিজ্ঞানকে সংসার-ক্ষেত্রে খাটাইয়া বহুদর্শিতা-সূত্রে প্রাজ্ঞ হইয়া উঠে। যাঁহারা বিদ্বান্ মাত্র, তাঁহারা নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক এবং শাস্ত্রের উদাহরণদ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রেত মত সমর্থন করেন; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্র এবং যুক্তির কাথ বাহির করিয়া লইয়া এবং তাহার সিটি পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বপুরুষেরা প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত; আর অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে তাহা বুঝাইবার জন্য অনন্ত নামক একটা বৃহৎ সর্পের কল্পনা করিয়াছিলেন। "পৃথিবী

অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত” এ কথাটি শুনিতে খুব সহজ ; কিন্তু প্রথমে ঐ কথাটি যাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, তিনি তাঁহার তৎকালোচিত বহুদর্শিতায় নিউটন অপেক্ষা যে, কোন অংশে ন্যূন ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। নিউটন বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিলেন যে পৃথিবী ভারাকর্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁহার এই আবিষ্কৃত তত্ত্বটির তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের প্রজ্ঞাবাণীর তুলনায় তাহা শিশুর অর্দ্ধস্ফুট বচনের ন্যায় অসম্পূর্ণ—যদিচ বিজ্ঞান অংশে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা “পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত” বলিলে তাহার পরেই আইসে যে সূর্য্য কিসের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত” ; যদি বল যে সূর্য্য সূর্য্যান্তরের আকর্ষণের “উপর প্রতিষ্ঠিত” তবে তাহার পরেই আইসে যে “সূর্য্যান্তর কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত” যদি বল যে, “সূর্য্যান্তর অবশিষ্ট জগতের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত” তবে তাহার পরেই আইসে যে “অবশিষ্ট জগৎ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত” ; যদি বল যে, “অবশিষ্ট জগৎ স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ আপনার উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত”—তাহা বলিতে পার না ; কেননা যদি জড়জগতের বড়ই হউক আর ছোটই হউক্ কোন একটি অংশ স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তবে পৃথিবী কি দোষ করিল? পৃথিবী স্বপ্রতিষ্ঠিত না হয় কেন? তা শুধু নয়—পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুই স্বপ্রতিষ্ঠ না হয় কেন? “প্রত্যেক জড় বস্তু এবং জড়-বস্তু-সজ্ঘ অন্যের আকর্ষণে বিধৃত” এই না তোমার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত? তবে আর তুমি কিরূপে বলিবে যে, জগতের অমুক অংশ স্বপ্রতিষ্ঠ! প্রজ্ঞা কিন্তু আশপাশে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একেবারেই নির্ঘাত বলিয়া দিলেন যে, পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত—ইহার উপরে আর কাহার কোন কথা চলিতে পারে না। কেহ যেন ভুল না বোঝেন—এরূপ না মনে করেন যে, যাহা ধরিতে ছুঁতে পাওয়া যায় না, এইরূপ ঐকান্তিক তত্ত্ব লইয়া—অর্থাৎ একটা ঋজু রেখার দুই অন্ত নাই কেবল এক অন্ত আছে এইরূপ ঐকদেশিক (Abstract) তত্ত্ব লইয়া—প্রজ্ঞার যত কিছু বাণিজ্য ব্যবসায়। প্রজ্ঞার নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল তোমার আমার চক্ষে ঐকান্তিক বা ঐকদেশিক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না—ইহা সত্য ; কিন্তু এটাও তেমনি সত্য যে, যাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞান-দূরবীক্ষণের একান্ত এবং অপরান্ত উভয় অন্ত সমসূত্রে মিলাইয়া তাহার মধ্য দিয়া অনন্তের প্রতি পরিষ্কার সম্মুখ-দৃষ্টি প্রসারণ করেন ; আর তাঁহাদের সেই নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁহারা যাহা অবলোকন করেন, তাহা সমীচীন সত্য বই আর কিছুই হইতে পারে না। অনন্তের প্রতি তুমি আড় দৃষ্টি প্রয়োগ করিতেছ—কাজেই তোমার অনন্ত একটা ঐকান্তিক অর্থাৎ (Abstract) আবছায়া মাত্র ; কিন্তু আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্য-মণ্ডলী যাঁহারা নিখিল জগৎ সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া অনন্তের প্রতি সম্মুখ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনন্তও কি তোমার আমার অনন্তের ন্যায় অপদার্থ এবং শূন্য একান্ত মাত্র, Abstraction মাত্র, তাহা হইতেই পারে না। তাঁহাদের দুই একটি কথার আভাসে

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের অনন্ত অখণ্ড এবং পরিপূর্ণ সত্য, আর তাহা তাঁহাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ বিরাজমান। অতএব এটা স্থির যে, প্রজ্ঞা শব্দের আদিতে প্র, আর বিজ্ঞান-শব্দের আদিতে বি, দুই শব্দের আদিতে যে দুই উপসর্গ বসিয়াছে—ঠিক্‌ই বসিয়াছে। প্রজ্ঞা=জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ অপরোক্ষ তত্ত্বের উপলব্ধি, তাই তাহার আদিতে প্র; বিজ্ঞান=সমগ্র সত্যের আশ পাশ দিয়া পরিস্ফুটিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি নানা প্রকার শাখা প্রশাখা-সম্বন্ধীয় বৈশেষিক জ্ঞান, তাই তাহার আদিতে বি। এখন সংজ্ঞা কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক্।

প্রজ্ঞা = ফলজ্ঞান (Wisdom);

বিজ্ঞান = শাখাজ্ঞান (Science);

সংজ্ঞা = বীজজ্ঞান (Consciousness)।

বীজজ্ঞানে ফলজ্ঞান এবং শাখাজ্ঞান দুইই অপরিস্ফুট আকারে সমাহিত রহিয়াছে বা কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, আর, সেই সমাহিত ভাবটি ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিবার জন্য সংজ্ঞা শব্দের আদিতে সং উপসর্গ নিযুক্ত রহিয়াছে। সং কি? না একত্র সমাহিত অর্থাৎ এক স্থানে জড়। সংজ্ঞা কি? না একস্থানে কেন্দ্রীভূত বীজজ্ঞান। কোন্ স্থানে? না জ্ঞাতার অন্তঃকরণে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা, শাখা হইতে ফল; তেমনি সংজ্ঞা হইতে (Consciousness হইতে) লৌকিক জ্ঞান বা বিষয় বুদ্ধি বা Common sense, বিষয় বুদ্ধি হইতে বিজ্ঞান বা Science, বিজ্ঞান হইতে প্রজ্ঞা বা Wisdom। Consciousness হ'চ্চে বীজ, বিষয় বুদ্ধি হ'চ্চে অঙ্কুর, বিজ্ঞান হ'চ্চে ডালপালা, প্রজ্ঞা হচ্চে ফল। ধান্য যখন মাটির ভিতরে থাকে তখন তাহা বীজ; যখন তাহা শীষের আগায় বিরাজ করে, তখন তাহা শস্য। এক গাছের শস্য যেমন আর এক গাছের বীজ হইতে পারে, তেমনি এককালের প্রজ্ঞা আর এককালের সংজ্ঞা হইতে পারে; তাহার সাক্ষী—বেদোপনিষদ্ মহাভারত রামায়ণ বাইবেল এবং সেক্সপিয়রের প্রজ্ঞাবাণী এক্ষণে জন সাধারণের সংজ্ঞার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ এইরূপ হইয়াছে যেন সে-সকল মহাবাক্য জন্মাবধি সকলেরই অন্তঃকরণে বদ্ধমূল। সং এবং আধান এই দুয়ের যোগে সমাধান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সমাধি কি? না একত্র সমাধান—একত্র সমাবেশ—সমস্ত মনোবৃত্তি একস্থানে জড় করা। "বাণ সন্ধান কথা হইতেছে" বলিলে বুঝায়—সমস্ত মনোবৃত্তি বাণের সহিত একযোগে লক্ষ্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। সং উপসর্গ সংজ্ঞা শব্দের আদিতে বসিয়া ইঙ্গিতচ্ছলে বিজ্ঞান করিতেছে যে, জ্ঞানের সমস্ত ভাবী শাখা প্রশাখা এবং ফলফুল শিশুর সংজ্ঞার ভিতরে জড়িপুঁটুলি হইয়া রহিয়াছে সংজ্ঞারূপী মুকুলের অভ্যন্তরে তাহার আশপাশের পাপড়ি—বিজ্ঞান, এবং সম্মুখের বীজ-কোষ প্রজ্ঞা, দুইই কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম তাহার আদ্যোপান্ত স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে

প্র-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখ-প্রবণতা
বি-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ পার্শ্ব-প্রবণতা
সং-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা।

অতঃপর পরি-উপসর্গের কিরূপ অর্থ তাহা দেখা যা'ক্। বি-উপসর্গের লক্ষ আশ-পাশে; পরি-উপসর্গের লক্ষ্য চতুর্দ্দিকে; তাহার সাক্ষী—

পরিধি = circumference

পর্য্যায় = পরি + আয় = ঘুরে ফিরে আসা।

পর্য্যায়-ক্রমে = পালা-ক্রমে = periodically।

প্রকৃত প্রবন্ধ এ যাত্রা এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। এখনও ন্যূনাধিক দ্বাদশ উপসর্গ অবশিষ্ট আছে, আর তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার কিছু না কিছু বলিবার আছে। বারান্তরে সমস্তই নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিব। অতঃপর যাহা আসিতেছে, তাহা আমি দুইজন শ্রদ্ধেয় প্রবীন ব্যক্তির সৎপরামর্শ হেলন করিতে না পারিয়া পরিশিষ্ট বেশে অত্র সহ চালাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। দুইজনই জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায়—একজন হ'চ্চেন ধর্ম্মবুদ্ধি, আর একজন হ'চ্চেন বিষয়বুদ্ধি। ধর্ম্মবুদ্ধি আমার দক্ষিণকর্ণে মন্ত্র দিতেছেন যে, অভ্যাগত অতিথিকে ফিরাইতে নাই; বিষয় বুদ্ধি আমার বামকর্ণে মন্ত্র দিতেছেন যে, বিশেষতঃ যখন তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার ভাবী উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ধর্ম্মবুদ্ধির বচন শিরোধার্য্য করিয়া আমার মন বলিতেছে যে, পরিশিষ্টাংশ যখন প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ-পূর্ব্বক প্রবন্ধের অভ্যন্তরে আশ্রয় দেওয়া হউক; বিষয়-বুদ্ধির পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া আমার মন বলিতেছে যে, পরিশিষ্ট অংশ যখন সাহিত্য-সেবকদিগের কাজে লাগিতে পারে, তখন বিশেষ যত্ন-সমাদরের সহিত তাহার অবয়ব-পুষ্টির ব্যবস্থা করা হউক্—বিধিমতে অতিথি-সৎকার করা হউক্। আমার দুই পার্শ্বের দুই গুরু-তুল্য মন্ত্রণা-দাতা উভয়ে একবাক্যে আমাকে যাহা করিতে বলিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি—আমার তাহাতে কোন অপরাধ নাই।

পর্য্যায় এবং পালার মধ্যে মর্ম্মান্তিক (অর্থাৎ অস্থি মজ্জাগত) অভিন্নতা-সম্বন্ধে কাহারও মনোমধ্যে যদি কোন প্রকার "কিন্তু" বা দ্বৈধ থাকে, তবে তিনি নিম্নে প্রণিধান করুন্:—

ঘোরা = to turn } ইহা হইতে আসিতেছে যে {
∵ পর্য্যায় = পরে পরে ঘুরে আসা
∴ পর্য্যায়-ক্রমে = by turns.........ক
∵ your turn = তোমার পালা
∴ by turn = পালা ক্রমে...............খ
}

ক বলিতেছে যে, পর্য্যায়ক্রমে = by turns
খ বলিতেছে যে, by turns = পালাক্রমে
} অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে,

পর্য্যায়-ক্রমে = পালা-ক্রমে।

এ যেন হইল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে; সেটী এই যে, পর্য্যায়ের পালা স্বতন্ত্র, আর ডালপালা'র পালা স্বতন্ত্র। এরূপ দ্বৈধস্থলে কর্ত্তব্য যাহা তাহা এই :—

ক ১ ॥ যখন নবাবি চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, চলন হইতে চাল আসিয়াছে।

ক ২ ॥ যখন আতপ চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, তণ্ডুল হইতে তাঁড়ূল আসিয়াছে, তাঁড়ূল হইতে তাউল আসিয়াছে, তাউল হইতে চাউল আসিয়াছে।

খ ১ ॥ যখন গাছের ডালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দারু হইতে ডাল আসিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে, দারুকে ডাল বলিলে দারু-শব্দের নিতান্তই ব্যাপ্তি-সংকোচ করা হয়, যেহেতু দারু-শব্দের অর্থ কাষ্ঠ। ইহারই জুড়ি আর একটি কথা এই যে, পানীয় শব্দ হইতে খোট্টার ব্যবহার্য্য পানী (জল) আসিতে পারে না; যেহেতু পানীয়কে জল মাত্র বলিলে দুগ্ধাদিকে পানীয়ের কোটা হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া পানীয় শব্দের ব্যাপ্তি-সংকোচ করা হয়। আপত্তিকারীর জানা উচিত যে, কার্য্য-গতিকে অনেক সময় মূল-শব্দের ব্যাপ্তি-সংকোচ অনিবার্য্য। কাঠুরে কুড়ালের ঘায়ে প্রথমেই গাছের এক পার্শ্ব কাটিয়া ফেলে। সেই কর্ত্তিত খণ্ডের শাখাংশই জ্বালানি কাঠ, অবশিষ্ট অংশ পল্লব। এইরূপে পাইতেছি যে,

শাখাপল্লব = শাখা + পল্লব = জ্বালানি কাঠ + পল্লব = দারু + পল্লব = দারুপল্লব = ডালপালা।

খ ২ ॥ যখন মুগের ডালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে,

যেমন, মেজে = মার্জ্জ্য = মার্জ্জিতব্য অর্থাৎ মার্জ্জনী দ্বারা কিনা ঝাঁটা দ্বারা মার্জ্জিতব্য; তেমনি, ডাল = দাল্য = দলিতব্য অর্থাৎ জাঁতায় দলিতব্য। দলিয়া (অর্থাৎ ডলিয়া) বাহির করা হয়, তাই দাল্য বা ডাইল।

অতএব যেমন কল্য হইতে কাল্ আসিয়াছে, তেমনি, দাল্য হইতে ডাল আসিয়াছে।

গ ১ ॥ যখন গাছপালার কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, পল্লব হইতে পালা আসিয়াছে।

গ ২ ॥ যখন তস্কর-ভীত যাত্রি-গণের মধ্যে পালা-ক্রমে রাত জাগিয়া চৌকি দিবার কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে,

পর্য্যায় হইতে পর্য্যা আসিয়াছে, পর্য্যা হইতে পালা আসিয়াছে।

কি আশ্চর্য্য! পর্য্যায়ের র্য্য ল-বেশ ধারণ করিয়া পালা-শব্দের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া বসিয়া আছে! এইরূপেই—লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া গাঙ্গুর্য্যের র্য্য গাঙ্গুলির মধ্যে এত কাল ধরিয়া অজ্ঞাত বাস করিয়া আসিতেছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও কেহ এরূপ প্রশ্ন করিল না যে, চট্টোপাধ্যায় চাটুয্যে, বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁড়ুয্যে, মুখোপাধ্যায় মুখুয্যে—একা কেবল গঙ্গোপাধ্যায় গাঙ্গুলি হইল কি অপরাধে!

আমি কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, গাঙ্গুলির উলি, মুখুয্যে-চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যের উর্য্যে ভিন্ন আর কিছুই নহে। পালার মূল বৃত্তান্ত আর গাঙ্গুলির মূল বৃত্তান্ত অবিকল একই রূপ; তাহার সাক্ষী—

পর্য্যায় = পর্য্যা = পালা }
গাঙ্গুর্য্যে = গাঙ্গুলি }

লোকে বলে যে, গঙ্গোপাধ্যায় হইতে গাঙ্গুলি হইয়াছে, চট্টোপাধ্যায় হইতে চাটুয্যে হইয়াছে, মুখোপাধ্যায় হইতে মুখুয্যে হইয়াছে—ইত্যাদি। কোন কোন শব্দাচার্য্য উপাধ্যায় শব্দের উপরে আসুরিক অস্ত্র চিকিৎসা চালাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন না। প্রথম উদ্যমেই তাঁহারা উপাধ্যায়ের পা কাটিয়া ফেলিয়া তাহাকে উধ্যায় করেন; তাহার পরে সুদীর্ঘ উপবাসের শোষণে উধ্যায়ের কণ্ঠের হাড় বাহির করিয়া তাহাকে উধ্যা করেন; তাহার পরে ক্রমান্বয়ে উধ্যাকে পিটিয়া উজ্যা এবং উজ্যাকে ঈষৎ বাঁকাইয়া উয্যে করিয়া ছাড়িয়া দেন। উপাধ্যায় যখন উয্যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন আমি এক আঁচড়েই বুঝিতে পারিলাম যে, সে উয্যে কোন কার্য্যেরই নহে—যেহেতু তাহার মাথায় রেফ নাই। উপাধ্যায়ের উধ্যাকে যতই কেন মুচড়াও না,—কিছুতেই সে বাগ মানিবে না; কেননা উধ্যা হইতে রেফ-যুক্ত উর্য্যা বাহির করা দেবতারও অসাধ্য। তুমি হয় তো বলিবে যে, "রেফে আমার প্রয়োজন নাই—আমি ইংরাজিতে নাম স্বাক্ষর করিবার সময় Mookerjy না লিখিয়া Mookejjey লিখিব; কিন্তু তাহা বলিলে চলে কই! রেফে তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে—কিন্তু আমার নিকট তাহা বহুমূল্য সামগ্রী; যেহেতু আমি অনেক চিন্তা ব্যয় করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বটির সন্ধান পাইয়াছি যে, গাঙ্গুর্য্যের রেফের মধ্য দিয়া গাঙ্গুলির লি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। রেফ উর্য্যের শিখা মাত্র নহে যে, তাহা ছাঁটিয়া ফেলিলেই হইল—রেফ ফণীর মণি; রেফ গেলে উর্য্যের সবই যায়। ব্যাকরণের সন্ধি হইতে পাইতেছি যে,

রি + অ = র্য্য

তা'ছাড়া, অন্তঃস্থ য'য়ে য-ফলা দিয়া তাহাতে রেফ দিলে তাহার প্রকৃত উচ্চারণ র্জ্জ নহে—তাহার প্রকৃত উচ্চারণ রিঅ। রিঅ যে অ ফেলিয়া দিয়া রি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহা তো হইতেই পারে; তার সাক্ষী

চাতুর্য্য = চাতুরি অ = চাতুরি ;
মাধুর্য্য = মাধুরি অ = মাধুরি।

এইরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, র্য্য হইতে রি অতি সহজে আসিতে পারে; যখন রি আসিতে পারে তখন লি' ও আসিতে পারে। এমন কি "ডলয়োরলয়োরভেদঃ" এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে রি'এর আর এক নামই লি; তাহার সাক্ষী—অভিধান খুলিয়া দেখ, দেখিবে যে, অঙ্গুরি এবং অঙ্গুলি উভয়েরই অর্থ আঙ্গুল। এই জন্যই আমি বলি যে, গাঙ্গুর্য্যের রেফের মধ্য দিয়াই গাঙ্গুলির ল বাহির হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে গাঙ্গুলি যেন গাঙ্গুর্য্যে হইতে আসিল—গাঙ্গুর্য্যে স্বয়ং কোথা হইতে আসিল? গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্য হইতে তো নহেই!—আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলিব "গাঙ্গুর্য্যে" আসিয়াছে "গঙ্গার্য্য" হইতে। যদি বল যে, আর্য্য হইতে উর্য্যে আসিবে কেমন করিয়া? তবে তাহার উত্তর এই যে, কদর্য্য হইতে কদুর্জ্জি আইল কেমন করিয়া? প্রথমতঃ গঙ্গার্য্য হইতে গাঙর্য্য অতি সহজেই আসিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ কদর্য্য হইতে যেমন করিয়া কদুর্য্যি আসিয়াছে, গাঙর্য্য হইতে তেমনি করিয়া গাঙুর্য্যি আসিয়াছে; তৃতীয়তঃ পর্য্যা হইতে যেমন করিয়া পালা আসিয়াছে, গাঙুর্য্যি হইতে তেমনি করিয়া গাঙুলি আসিয়াছে। অতঃপর বক্তব্য এই যে, র্য্য হইতে র্য্যি র্য্যা এবং র্য্যে তিনই অতি সহজে বাহির হইতে পারে। র্য্য হইতে র্য্যি তো বাহির হইতে পারেই, তার সাক্ষী আচার্য্য = আচার্য্যি; তা ছাড়া য্য হইতে য্যা বাহির হইবার পক্ষেও লেশমাত্র বাধা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু অকারের মূল উচ্চারণ আকারের সহিত অবিকল সমান—কেবল আকার অপেক্ষা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রস্ব। পণ্ডিত মহাশয়েরা এক্ষণে যেরূপ বালকদিগকে "কর খল" পড়া'ন, সেরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কুত্রাপি ছিল না—এমন কি বিদ্যাপতির আমলে উহা বঙ্গের কোন স্থানে ছিল কি না সন্দেহ। ব্যাকরণ-শাস্ত্র মানিতে হইলে বলি এবং বলী'র মধ্যে যেরূপ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ—পদ্ম এবং পদ্মা'র মধ্যেও অবিকল সেইরূপ। আর একটি কথা এই যে শব্দের শেষ স্থানীয় স্বর হ্রস্ব হইলেও তাহাকে একটু দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা আবশ্যক—কেন না তাহা না করিলে তাহা রীতিমত পরিস্ফুট হইতে সময় পায় না। এই জন্য মাধুরি যদিচ মাধুরিঅ হইতে আসিয়াছে, তথাপি আমরা মাধুরি লিখিবার সময় ইকারটাকে দীর্ঘ করিয়া দিই। অতএব উপবীতের ত হইতে যেমন পইতার তা আসিয়াছে, তেমনি য্য হইতে য্যা অতি সহজেই আসিতে পারে। আর য্যা তো য্যে হইয়াই রহিয়াছে; তাহার সাক্ষী—"সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতে কা'র ভার্য্যে।" আর একটি কথা এই যে আমাদের এই বঙ্গ-ভারতী ভাগীরথী-মাতা'র পার্শ্বচরী হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে পদপ্রসারণ করিয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা মৈথিলি ভাষার ন্যায় আধ-খোট্টাই ভাষা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই;

তার সাক্ষী বিদ্যাপতির বাঙ্গালা ভাষা। এইজন্য খুব সম্ভব যে পূর্ব্বে আমাদের দেশে মুখুয্যে শব্দ আধ খোট্টাই ছাঁদে উচ্চারিত হইত—'মুখুয্যা' এইরূপে উচ্চারিত হইত। এইরূপ নানাবিধ যুক্তির একত্র সমাধান দ্বারা আমরা পাইতেছি যে মুখুয্যে দুইরূপে আসিতে পারে:—অকারের দীর্ঘ আকার এই সূত্রে একদিক্ দিয়া আমরা পাইতেছি যে,

মুখার্য্য = মুখয্যা = মুখুয্যে

আর ইকারের গুণ একার এই সূত্রে আর একদিক্ দিয়া পাইতেছি যে

মুখার্য্য = মুখর্য্য = মুখুর্য্যি = মুখুয্যে

এখনও জিজ্ঞাসা মিটিতেছে না। কেহ বলিতে পারেন—লোকে যে বলে "ফুলের মুখুটি"—মুখুটি কোথা হইতে আইল? ইহার উত্তর স্পষ্ট পড়িয়া আছে;—

মাধুর্য্য = মাধুরি অ }
মুখুয্যে = মুখুরি অ }

অঙ্গুরীয় = অঙ্গুটি }
মুখুরিঅ = মুখুটি }

র মূর্দ্ধণ্য বর্ণ কিন্তু তাহার রব অস্পষ্ট; ট মূর্দ্ধণ্য বর্ণ কিন্তু তাহার টঙ্কার সুস্পষ্ট; অতএব র যে কখন কখন ইতর-ভাষা-পল্লীতে ট-বেশে দেখা দিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। চাটুটি মুখুটিরই সহোদর; কিন্তু চাটুটির দুই ট'য়ে টক্‌রা টক্‌রি বাধিয়া গোলোযোগ উপস্থিত হওয়াতে দ্বিতীয় ট প্রথম ট'য়ের নিকটে নরম হইয়া ত হইল—চাটুটি নরমিয়া চাটুতি হইল। চাটুয্যে মহাশয় ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন—তিনি বলিতে পারেন যে "বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিখিয়াছি কোন্ গাঁই?—চাটুতি গাঁই'—তুমি আমাকে আজ নূতন শিখাইতে আসিয়াছ যে চাটুতি চাটুর্য্যে'র অপভ্রংশ? তোমার তো স্পর্দ্ধা কম নহে!" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে চাটুতি গাঁই বলিয়া যে একটা গাঁই আছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত—মুক্তকণ্ঠে—স্বীকার করিতেছি; কিন্তু চাটুতি গাঁই চট্টগ্রাম হইতে আইল কেমন করিয়া সেটাও তো একবার ভাবিয়া দেখা উচিত! আমি জানি যে যশোহর প্রদেশে নরেন্দ্রপুর বলিয়া একটা গ্রাম আছে; ঐ নামটির উৎপত্তি-বিবরণ আর কিছু না—অনতিপূর্ব্বে ঐ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী কোন একটী গ্রামে নরেন্দ্র নামক একজন মাথালো ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ঐ গ্রামটি নূতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার নাম দিলেন নরেন্দ্রপুর। এইরূপ ব্যক্তি-বিশেষের নামে গ্রামের নামকরণ আমাদের দেশে এত প্রচলিত যে তাহার নিদর্শন পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে; তার সাক্ষী—মুরসিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুরসিদ আলি খাঁ; আহ্মদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা গুজরাটের শাসনকর্ত্তা আহ্মদ; রামগিরিতে রামচন্দ্র

এক সময়ে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম রাম-গিরি। এরূপ প্রথা কেবল আমাদের দেশেই আবদ্ধ নহে. আমেরিকা-খণ্ডে উহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তার সাক্ষী—চিরস্মরণীয় মহাত্মা ওয়াসিংটনের নামানুসংজ্ঞিত ওয়াসিংটন নগর; পেনের প্রতিষ্ঠিত পেন্সিল্‌বানিয়া উপরাজ্য; ইত্যাদি। উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সহিত আমেরিকার প্রথা-সাদৃশ্যের বিশেষ একটি কারণও আছে; তাহা আর কিছু না—বঙ্গদেশে যেমন এক সময়ে ব্রাহ্মণ-কুলের নূতন পত্তন হইয়াছিল, আমেরিকা প্রদেশে সেইরূপ ইউরোপীয় জন-মণ্ডলীর নূতন পত্তন হইয়াছিল। তা ছাড়া, প্রধান আর একটি কথা এই যে পূর্ব্বতনকালে ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত গ্রামের অধিবাসীরা অধিষ্ঠাতৃ-ব্রাহ্মণকুলের কুল-মাহাত্ম্যে আপনাদিগকে বিশিষ্টরূপে গৌরবান্বিত মনে করিত। তখনকার আমলের অধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ এবং অধিষ্ঠিত গ্রাম দুয়ের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা দেখিলে মনে হয়—অধিষ্ঠাতৃ-ব্রাহ্মণকুল যেন অধিষ্ঠিত গ্রামের আত্মা, আর অধিষ্ঠিত গ্রাম যেন অধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণের শরীর। অধিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠান-ভূমির মধ্যে এমন-তর যেখানে ঘনিষ্ঠতা, সেখানে উভয়ের মধ্য দিয়া উভয়ের পরিচয়-জ্ঞাপনের প্রথা প্রচলিত হইবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরূপ স্থলে পরিচয়-জ্ঞাপনের প্রশ্নোত্তরপদ্ধতি কিরূপ হওয়া সম্ভবপর তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; তাহার একটি নমুনা এই :—

প্রশ্ন। কোথাকার আর্য্য।

উত্তর। চট্টগ্রামের আর্য্য = চট্টার্য্য = চাটুয্যে।

প্রশ্ন। কোন্ গ্রাম।

উত্তর। চট্টার্য্যের গ্রাম = চট্টার্য্যগ্রাম = চাটুতি গাঁই।

চট্টগ্রাম হইতে কেমন করিয়া চাটুতি গাঁই আসিতে পারে—এ জিজ্ঞাসার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল। একটা জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হইল বটে, কিন্তু তাহার উত্তপ্ত চিতা ভস্ম হইতে আর একটা জিজ্ঞাসা গাত্রোত্থান করিল; তাহা এই যে, গ্রামের ব্যালাই বা চাটুতি-গ্রাম হইল কেন, আর, ব্রাহ্মণের ব্যালাই বা চাটুয্যে-মহাশয় হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণকে "তত্র ভবান্" বলিয়াও আশ মেটে না কেন, আর, ব্রাহ্মণের আসন-বসনকে "তৎ" বলিয়াই "যথেষ্ট বলা হইয়াছে" মনে করা হয় কেন? যাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বলিবেন যে, ঘটিবাটির পক্ষে একটা যৎসামান্য তকারান্ত বা টকারান্ত নামই যথেষ্ট—তৎ বা Thatই যথেষ্ট; কিন্তু ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নাম উহারই মধ্যে শুনিতে একটু লম্বা চওড়া হওয়া বিধেয়; আর, যাহা বিধেয় তাহা কার্য্য-গতিকে স্বভাবতই ঘটিয়া উঠে—যেমন চাষা'র মুখ দিয়া সত্য কথা স্বভাবতই বাহির হইয়া পড়ে। মুখুটি-শব্দ অপেক্ষা যে মুখুয্যে-শব্দ মুখার্য্য-শব্দের নিকট-সম্পর্কীয়—শ্রোতা'র কর্ণ-ই তাহার সমুচিত কষ্টিপাথর; সুতরাং কাহারও কর্ণ থাকিতে তিনি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, একদিকে মুখুটি এবং আর একদিকে মুখুয্যে—

দুয়ের মধ্যে মুখুয্যে—অপেক্ষাকৃত সাধুভাষা; আর, তাহা অপেক্ষাকৃত সাধুভাষা বলিয়াই ব্রাহ্মণের ব্যালা আমরা তাঁহাকে মুখুয্যে মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করি; আর তাঁহার বাস গ্রামের ব্যালা "মুখুটি গ্রাম" বলিয়া সংক্ষেপে সারি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—সেটি ভুলিলে চলিবে না;—আমেরিকায় ওয়াসিঙ্‌টন, পেন্সিল্‌বানিয়া, এবং আর গোটা দুত্তিন স্থান তত্তৎ প্রতিষ্ঠাতার নামে অনুসংজ্ঞিত হইয়াছে দেখিয়া—নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে কেহ আর এরূপ কথা বলে না যে, নিউইয়র্ক, চিকাগো প্রভৃতি আমেরিকা'র সমস্ত প্রদেশই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাতা'র নামে অনুসংজ্ঞিত। অতএব, মুখুটি এবং চাটুতি এই দুই গ্রামের নাম মুখার্য্য এবং চট্টার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বন্দিঘাটিও যে বন্দার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিতে হইবে—এমন কোন বাধা-বাধকতা নাই; বরং পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত গ্রামের নাম পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা এবং ঘটনা সূত্রে পৃথক্ পৃথক্ প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছিল মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই পর্য্যন্তই আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আর বলিয়াছিও তাই—যে, বন্দার্য্য হইতে শুধু কেবল বাঁড়ুয্যে আসিয়াছে, কিন্তু মুখার্য্য হইতে মুখুয্যে এবং মুখুটি দুইই আসিয়াছে; চট্টার্য্য হইতে চাটুয্যে এবং চাটুতি দুইই আসিয়াছে। আর্য্য হইতে কিরূপে উর্য্যে এবং উলি আসিতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া চুকিয়াছি; অধিকন্তু একটু পূর্ব্বে এটাও দেখাইলাম যে, অঙ্গুরীয় হইতে অঙ্গুটি আসিয়াছে যদি সত্য হয়, তবে মুখুরিঅ হইতে মুখুটি আসিবে—চাটুরিঅ হইতে চাটুটি'র ভাই চাটুতি আসিবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর যেখানে রাশ নাম আর ডাক নামের ন্যায় একই গ্রামের একটি নাম চট্ট এবং আর একটি নাম চাটুতি, সেখানে চট্টার্য্য গ্রাম (চাটুতি গাঁই) যে চট্টগ্রামেরই নামান্তর হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? মুখুটি এবং চাটুতি যেখান হইতেই আসুক্ না কেন—আমার যেটা মুখ্য প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত (Hypothesis) সেটা এই যে, আর্য্য হইতে উর্য্যে এবং উলি এই দুইটি যমক সহোদর বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমার এই প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তটিকে আমি চাটুয্যে, মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যে, গাঙ্গুলি এই চারি স্থানে খাটাইয়া দেখিলাম যে, উহাদের চতুঃসীমার মধ্যে কোন স্থানেই তাহা তিলমাত্রও ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি আর এক প্রকার সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা বলেন যে, উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে, ওঝা হইতে উঝ্যা আসিয়াছে। উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে, ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করি; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলি—কথাটা'র প্রতি একটু ধীর ভাবে প্রণিধান করা হউক—যে, ওঝা'র মাথায় যেহেতু শিখা নাই (অর্থাৎ রেফ নাই) এই জন্য ওঝা হইতে কোন প্রকারেই গাঙ্গুলির উলি আসিতেপারে না; তা ছাড়া, আর একটি কথা এই যে, উপাধ্যায় যখন একবার উপবীত পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ য-ফলা পরিত্যাগ করিয়া) ওঝা হইয়াছে, তখন আবার

সে যে যে কাঁচিয়া উপবীত (অর্থাৎ য-ফলা) ধারণ করিয়া উয্যো হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। উপাধ্যায় হইতে যে ওঝা আসিয়াছে, তাহা তুমিও বলিতেছ—আমিও বলিতেছি; কিন্তু "উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে" এই মাত্র বৃত্তান্তের বলে কিছু এটা প্রমাণ হয় না যে, ওঝা হইতে উর্য্যো বা উলি আসিয়াছে; বরং উপরে আমি যাহা বলিলাম তাহাতে যথোচিত প্রমাণ হইতেছে যে, ওঝা হইতে উলিও আসিতে পারে না—উযোও আসিতে পারে না; উলি আসিতে পারে না কেন? না যেহেতু ওঝা'র মস্তকে শিখা নাই; উয্যো আসিতে পারে না কেন? না যেহেতু ওঝা'র গলায় উপবীত নাই। পক্ষান্তরে আমি যথেষ্ট প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছি যে, উয্যো এবং উলি দুইই আর্য্য হইতে অতি সহজে আসিতে পারে; যেহেতু আর্য্যের মস্তকে শিখা উড্ডীয়মান—জম্‌কালো রেফ; আর, তাহার গল-দেশে উপবীত লম্বমান—দিব্য সর্পাকৃতি য-ফলা। অতএব আর্য্যের কাজ আর্য্য করুন্, ওঝা'র কাজ ওঝা করুন্, তাহা হইলেই দেখিতে ভাল হয়, নচেৎ পরস্পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষের কাহারও তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই—তৃতীয় পক্ষ জন-সমাজেরও তথৈবচ—অতএব তাহাতে ক্ষান্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

শব্দ ভাঙিয়া গড়িয়া মুচড়িয়া এই যে, আমি একটা নূতন সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইলাম যে, মুখার্য্য হইতে মুখুয্যে হইয়াছে—গঙ্গার্য্য হইতে গাঙ্গুলি হইয়াছে—বন্দার্য্য হইতে বাঁড়ুয্যে হইয়াছে—সাধারণ লোকমণ্ডলীর স্থূল দৃষ্টিতে ইহা এক প্রকার ভেল্‌কি বাজী মনে হইতে পারে; তাঁহারা তো জানেন না যে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত Max Muller ভট্টাচার্য্য শরমা হইতে Helena বাহির করিয়াছেন; দহনা হইতে Daphne বাহির করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের বিচিত্র-গতি বিষয়ে তাঁহাদের চক্ষু একেবারেই বদ্ধ-কপাট। শব্দের মার প্যাঁচ ছাড়িয়া দিয়া, এবার, একটা চক্ষে দেখা এবং কাণে-শোনা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি—দেখি যদি তাহাতে তাঁহাদের কাহারো চক্ষু ফুটাইতে পারি। কিন্তু এ সভায় যাঁহারা অদ্য উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় তো আমি মুখ খুলিতে না খুলিতেই আমার সমস্ত মন্তব্য কথা বুঝিয়া বসিয়া আছেন—আর তাঁহাদের মধ্যে এমনও বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ পণ্ডিতের অভাব নাই যাঁহারা অনেক বিষয়ে আমার অর্দ্ধস্ফুট চক্ষু পূর্ণ মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন;—এ সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যদি আমার বক্তব্য বিষয়টি ভাল ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য অপক্ষপাতে বিচার করেন, তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে পত্নীরা স্ব স্ব স্বামীকে আর্য্য-পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অধুনাতন কালের অন্তঃপুর প্রদেশে স্বামীকে না হউক—স্বামীর ভ্রাতাকে প্রকারান্তরে আর্য্য-পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করা হইয়া থাকে; যেহেতু, আর্য্যপুত্রও যা, আর ঠাকুর-পোও তা একই। শ্বশুর হ'চ্চেন ঠাকুর বা আর্য্য

আর শ্বশুরের পুত্র হ'চ্চেন ঠাকুর-পো বা আর্য্য-পুত্র। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ঠাকুর শব্দ আর্য্য-শব্দের একপ্রকার অবিকল অনুবাদ। ইহা হইতে আসিতেছে যে চট্ট-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ চট্টার্য্য, বন্দ-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ বন্দার্য্য, গঙ্গ-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ গঙ্গার্য্য। অতএব অধুনাতন কালে ব্রাহ্মণেরা যে-ভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষিত হ'ন—পূর্ব্বে এক সময়ে যে তাঁহারা ঠিক্ সেইভাবে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষিত হইতেন—এরূপ অনুমান কেবল অনুমান-মাত্র নহে; কেননা একটি চক্ষে দেখা কথা এবং আর একটি কাণে শোনা কথা এই দুইটি প্রত্যক্ষ বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্য ঐ অনুমানটির অটল ভিত্তিমূল। আর্য্যপুত্র শব্দটি সকলেই পুস্তকে দেখিয়াছেন আর ঠাকুর-পো শব্দটি সকলেই কাণে শুনিয়াছেন; এখন দুইটিকে নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া দেখুন্—দেখিবেন যে দু'য়ের মধ্যে একচুলও ভাবের ইতর বিশেষ নাই। তুলা-দণ্ডের দুইদিকের দুই ভার-পাত্রের একটিতে রাখিলাম ঠাকুর-পো এবং আর একটিতে রাখিলাম আর্য্য-পুত্র; তুলা-দণ্ড দুইদিকের কোন দিকেই হেলিল না—দুই ভার-পাত্র সমসূত্রে স্থির রহিল। একদিকের ভার-পাত্র হইতে পো এবং আর একদিকের ভার-পাত্র হইতে পুত্র এই দুই সমান অংশ উঠাইয়া লইলাম। এ পাত্রে অবশিষ্ট রহিল ঠাকুর আর ও পাত্রে অবশিষ্ট রহিল আর্য্য। ইহাতেও দুইদিকের দুই ভার-পাত্র পূর্ব্ববৎ সমসূত্রে স্থির রহিল। তবেই হইতেছে যে, আর্য্য = ঠাকুর।

অনতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে অধুনাতন-কালে ব্রাহ্মণেরা যে-ভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষিত হ'ন—পূর্ব্বে এক সময়ে তাঁহারা ঠিক্ সেই ভাবে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষিত হইতেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে অধুনাতন-কালে ব্রাহ্মণেরা কি-ভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষিত হ'ন? এ প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজে হইতে পারে। পথের কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া অতিথি করিবার ইচ্ছা হইলে গৃহী ব্যক্তি দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে "ঠাকুর এই দিকে আসুন।" এমন কি রাঁধুনে বামুনকেও আমরা বামুন ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, কোন ব্রাহ্মণের কোন বিশেষ গুণ দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ঠাকুর বলি না—সাধারণতঃ সকল ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলি। অতএব মিষ্টর্ যেমন ইংরাজের সাধারণ উপাধি—আর্য্য তেমনি পূর্ব্বে এক সময়ে ঠাকুরের ন্যায় ব্রাহ্মণবর্গের সাধারণ উপাধি ছিল, তাহাতে আর ভুল নাই। তাহা যদি হইল—আর্য্য যদি ব্রাহ্মণবর্গের সাধারণ উপাধি হইল—তবে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য বিশিষ্ট উপাধি আছে;—সে উপাধি কি? আপাততঃ তিনটি বিশিষ্ট উপাধি প্রধানতঃ আমার চক্ষে পড়িতেছে—(১) ভট্টাচার্য্য (২) আচার্য্য এবং (৩) উপাধ্যায়। তা ছাড়া আরো অনেকগুলি বিশিষ্ট উপাধি আছে—যেমন বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার ন্যায়রত্ন ইত্যাদি; কিন্তু শেষোক্ত উপাধি-গুলি বিশিষ্ট হইতেও বিশিষ্ট—ও গুলি বিশিষ্টতর। বিশিষ্টতর উপাধিগুলির সহিত আপাততঃ আমাদের

বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। কিছুপূর্ব্বে এই যে তিনটি বিশিষ্ট উপাধির কথা আমি উল্লেখ করিলাম—যে, ভট্টাচার্য্য আচার্য্য এবং উপাধ্যায়, এগুলি হ'চ্চে বিশেষ বিশেষ অধ্যাপক-মণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ উপাধি। আমাদের দেশে যাঁহারা স্মৃতি স্তায় কাব্য অলঙ্কার ব্যাকরণ এই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপক তাঁহারা ভট্টাচার্য্য। যাঁহারা জ্যোতিষাদির অধ্যাপক তাঁহারা শুধু আচার্য্য অর্থাৎ সামান্ত আচার্য্য—আচাজ্জি ঠাকুর। এ দেশের সভ্যসমাজে স্মৃতি দর্শন এবং সাহিত্যের স্তায় জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের তেমন কোন বিশেষ মর্য্যাদা ছিল না; এইজন্ত শুধু আচার্য্য যাঁহাদের উপাধি তাঁহারা পুরোহিতদিগের স্তায় নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হ'ন। ভট্টাচার্য্য এবং আচার্য্য উভয়েই Professor। ভট্টাচার্য্য স্মৃতিদর্শন এবং সাহিত্যের Professor বলিয়া বিশেষ সম্মানার্হ; আচার্য্য সামান্ত জ্যোতিষাদির Professor বলিয়া অবজ্ঞাস্পদ। আর এক শ্রেণীর অধ্যাপক হ'চ্চেন উপাধ্যায়। উপাধ্যায় শব্দের অর্থ অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে যে, অধ্যাপক; উপদেশক; বেদের এক দেশ যিনি অধ্যয়ন করা'ন্। খুব সম্ভব যে সর্ব্ব প্রথমে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকেই বেদের কোন না কোন দেশ অধ্যয়ন করাইতেন; কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের বংশজাত ব্রাহ্মণেরা বেদের কোন দেশই অধ্যয়ন করা'ন না।

বহুদর্শী সুবিদ্বান্ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেদিন সভা-সমীপে প্রসঙ্গ ক্রমে একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যাহা উপস্থিত করিয়াছিলেন—ইতিপূর্ব্বে তাহা আমার জানা ছিল না। তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করাইয়া বৃত্তিগ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল—আর সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ উপাধি ছিল 'উপাধ্যায়।' তাঁহার এ কথা বেস্ আমার মনে লাগিতেছে, কেননা পুরাতন গ্রীক্ দেশেও শেষাবস্থায় ঐরূপ বিদ্যাদানের বিনিময়ে বৃত্তি-গ্রহণের প্রথা সুরু হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদর্শিত ঐতিহাসিক দূরবীনের মধ্য দিয়া আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, বৃত্তি যোগাইবার দায় হইতে নিস্কৃতি পাইবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্র-মণ্ডলীর অভিভাবক-দিগের মনে জোয়ারের জলের স্তায় ক্রমশই প্রবর্দ্ধিত হইতেছে, আর, তাহার প্রবল তোড়ে উপাধ্যায় মণ্ডলীর অধ্যাপনা-শালায় ভাঙ্গন ধরিয়া ভট্টাচার্য্যগণের চতুষ্পাঠীর দিন দিন অবয়ব পুষ্টি হইতেছে। তাহার কিয়ৎপরে দেখিতেছি, যে ছাত্র-হীন উপাধ্যায়েরা আপন আপন পাততাড়ি গুটাইতেছেন। তাহার পরেই সবেগে যবনিকা-পতন! সেই যবনিকা-পতন অবধি এ কাল পর্য্যন্ত উপাধ্যায়-শ্রেণী নিতান্তই বেকার অবস্থায় পড়িয়াছেন—এখন তাঁহারা বেদও পড়া'ন না, বেদাঙ্গও পড়া'ন না। এক্ষণে একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভট্টাচার্য্য-পদবী কেবল বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে, আর একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ মাত্রই লোক-সমাজে ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত। উপাধ্যায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা ভট্টাচার্য্যের দলে মিশিয়া ভট্টাচার্য্য

হ'ন, তাঁহারাই কেবল অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হ'ন; আর সেই উপলক্ষে তাঁহারা তাঁহাদের পৈতৃক উপাধি (উপাধ্যায়) বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যোচিত উপাধি পরিগ্রহ করেন; কিন্তু এরূপ যাঁহারা করেন তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প;—অধিকাংশ উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা কার্য্যের কোন ধারই ধারেন না অথচ অধ্যাপনা-কার্য্য পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শেষোক্ত ব্রাহ্মণদিগের মান বজায় রাখিবার জন্য উপচারচ্ছলে (অর্থাৎ out of courtesy) তাঁহাদের নামের শেষ-ভাগে উপাধ্যায় পদবী অদ্যাবধি সংযোজিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাজে উপাধ্যায় ছিলেন—ইঁহারা কেবল নামে উপাধ্যায়। এই গতিকে—বেদাধ্যাপক-বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের নামের পরিশিষ্ট ভাগে দুই কারণে দুইরূপ উপাধি সংযোজিত হইল; (১) তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম বজায় রাখিবার জন্য উপাধ্যায় উপাধি; এবং (২) তাঁহাদের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার দৃষ্টে সাধারণ-ব্রাহ্মণ-জাতি-সুলভ আর্য্য উপাধি। সাঁটে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, উপাধ্যায়, বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের পোষাগি উপাধি, আর, আর্য্য তাঁহাদের আটপৌরে উপাধি। আমাদের দেশের ভাষাও দুইরূপ—পোষাগি ভাষা এবং আটপৌরে ভাষা। সাধু ভাষা পোষাগি ভাষা, ইতর ভাষা আটপৌরে ভাষা। এখন বক্তব্য এই যে, আটপৌরে ভাষার পর্ণকুটীরে আর্য্য শব্দ উর্য্যে এবং উলি বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাত বাস করিতেছে; আর সেই সঙ্গে পোষাগি ভাষার প্রশস্ত অট্টালিকায় উপাধ্যায় শব্দ যেমন তেমনি অবিকৃত ভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। গঙ্গঠাকুর পোষাগি ভাষাতেই পোষাগি উপাধি ধারণ করিয়া গঙ্গোপাধ্যায় হ'ন; কিন্তু আটপৌরে ভাষাতে তিনি আটপৌরে উপাধি ধারণ করিয়া সামান্য গঙ্গার্য্য বা গাঙ্গুলি হইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, উপাধ্যায় উপাধি কেবল বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কুলেরই উপাধি ছিল—সকল ব্রাহ্মণের নহে। খুব সম্ভব যে, ঘোষাল উপাধি ঘোষার্য্য হইতে আসিয়াছে—সান্যাল উপাধি সান্যার্য্য হইতে আসিয়াছে। এরূপ হইলেও হইতে পারে যে, যেমন চট্টগ্রামের বা চাটুতি গ্রামের চট্টার্য্য, তেমনি, ঘোষপাড়ার ঘোষার্য্য। পর্য্যায়ের র্য্য যখন পালা'র ল হইয়াছে, তখন ঘোষার্য্যের র্য্য ঘোষালের ল হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে, ঘোষালের যেহেতু পোষাগি উপাধি নাই এইজন্য সন্দেহ হয় যে, তিনি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সোপাধ্যায় ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; অথচ আবার ঘোষাল কুলীনের মন্ত্রপূত গণ্ডির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন;—ইহার ভিতরে কি যে নিগূঢ় রহস্য লুক্কায়িত আছে, ইতিহাস-বেত্তারা তাহা বলিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা যাহা আমার মনে হইতেছে তাহা এই;—মান্দ্রাজ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদিগের উপাধি আইয়র। আইয়র যে, আর্য্য হইতে আসিয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই। পূর্ব্বে মান্দ্রাজ নিতান্তই অনার্য্য প্রদেশ ছিল; সুতরাং মান্দ্রাজ

অঞ্চলে আর্য্যই যে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বোচ্চ উপাধি হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পরি-উপসর্গের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া এ আবার কি একটা নূতন উপসর্গে আসিয়া পড়িলাম! গতিক যখন এইরূপ, তখন আমার পক্ষে আজ—মহামান্য সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণের অনুমতি লইয়া—এই খানেই বিশ্রাম করা শ্রেয়। তা বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না যে, আমি আমার হাতের কার্য্য অর্দ্ধ-সমাপন করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইতেছি। প্রত্যেক উপসর্গের সম্বন্ধেই আমি সাধ্যানুসারে ভাবিয়া চিন্তিয়া এক একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি; যদি আপনারা তাহা শুনিতে ভার বোধ না করেন, তবে বারান্তরে আমি তাহা নিঃশেষে বলিয়া ফেলিয়া আমার মনের ভার লাঘব করিতে কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করিব না—কেননা আপনাদের মত অভিজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলী অন্যত্র দুর্লভ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম-মঙ্গল।

বাল্যকালে কীর্ত্তন শুনিতাম। কীর্ত্তনের অনেক গানই বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সুরদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস, মুকুন্দরাম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের রচিত বলিয়া জানিতাম। সঙ্গীতের বৈঠকে, মাঠে ঘাটে ঠাকুরুণ-বিষয়ক গান শুনিতে পাইতাম, তাহাতে রামপ্রসাদ, নীলাম্বর, নরচন্দ্র, কমলাকান্ত, নারায়ণ প্রভৃতি শক্তি-সাধকদিগের ভনিতি থাকা প্রযুক্ত বুঝিতাম, তাঁহারাই সেই সকল গীতের রচয়িতা। তদ্ব্যতীত গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত পড়া হইত। কবিকঙ্কণের চণ্ডী বয়স্থ ব্যক্তিগণ পাঠ করিতেন, গায়কেরা গান করিত। এজন্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণকেও চিনিতাম। স্কুল পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করিয়া বয়স কালে যখন অধ্যাপনা করি, তখন পূজ্যপাদ ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ" এবং বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কবিচরিত" নামক প্রায় একজাতীয় দুইখানি পুস্তক একই কালে হস্তগত হয়, তাহাতে বাল্যকালের পরিচিত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস ও রামপ্রসাদ ব্যতীত রামেশ্বর, কেতকাদাস, ভারতচন্দ্র ব্যতীত মুসলমান আমলের আর কোন গ্রন্থকারকে দেখি নাই।

আজি দশবৎসর পূর্ব্বে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, তাহাতেও আর কোন প্রাচীন কবির নাম পাওয়া যায় নাই। এমন কি, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলের কথাও তাহাতে ছিল না, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে দুই একজন প্রাচীন কবির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কোন কথা পাওয়া যাইত। মোটের উপর বুঝিতাম, বাঙ্গলা ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থ আর বড় বেশী নাই। তবে যে বটতলায় কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল সে গুলি অপ্রসিদ্ধ লোকের লিখিত বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইতে পায় নাই বলিয়া বিবেচনা হয়। যাহা হউক দেখিতে দেখিতে এই দশবৎসর মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন কবির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে ছিলেন এতদিন তাহাও অনেকে জানিতেন না, সৌভাগ্যক্রমে যখন তাঁহাদিগকে লেখায় পড়ায় পাওয়া গিয়াছে তখন একদিন, না—একদিন সাধারণে তাঁহাদিগের রচিত অপূর্ব্ব কাব্যের অমৃতময় স্বাদে তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবেন সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

আজি আমি তদ্রূপ একটী কবির এবং তাঁহার রচিত একখানি অপূর্ব্বকাব্যের পরিচয় দিব। পুস্তকখানি মুদ্রিত করিলে ৮ পেজী ফর্ম্মার তিনশত পৃষ্ঠারও অধিক হইবে। গ্রন্থের অনেক স্থলেই কবি ইহাকে অনিলপুরাণ অর্থাৎ বায়ুপুরাণ বলিয়া গিয়াছেন,—

"উলটিয়া আভ্যারে কহেন ভগবান। অনিল পুরাণ দ্বিজ সহদেব গান॥"

কিন্তু বায়ুপুরাণ দেখিয়া ইহা যে উক্ত পুরাণের অনুবাদ এরূপ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। স্থানে স্থানে ইহার "ধর্ম্মমঙ্গল" নামও দেওয়া হইয়াছে,—

"শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ সহদেব গায়। ধনে বংশে নায়কে বাড়াবে কালুরায়॥"

কোথাও বা আদি পুরাণানুসারে ইহা লিখিত এরূপ পরিচয়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

"ব্রহ্মার বচন শুনি, পাণ্ডবের চূড়ামণি,
চলিল বিষ্ণুর সন্নিধান।
আদি পুরাণের মত, অনাদি চরিত যত,
দ্বিজ সহদেব রস গান॥"

কোন স্থলে বা ইহাকেও শ্রীধর্ম্মপুরাণ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে,—

"শ্রীধর্ম্মপুরাণ দ্বিজ সহদেব গায়।
ভক্ত নায়কেরে দয়া কর কালুরায়॥"

আবার কোথাও বা ইহা যে এক নূতন কাব্য কবি তাহাও বলিতে ত্রুটী করেন নাই,—

"রাণীরে দেখিয়া হিমালয় চমকিত। দ্বিজ সহদেব গান নূতন সঙ্গীত॥"

ফলতঃ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় পুরাণের অনুকরণে লিখিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণের উৎপত্তি প্রভৃতি ইহাতে যথাবিধি বর্ণিত হইয়াছে, উহার মধ্যে কবির কল্পনার ক্রীড়াও আছে— ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে মৎস্যধারণ, শিবের কৃষিবৃত্তি অবলম্বন ইত্যাদি। কথা-প্রসঙ্গে অনেক স্থানেই পৌরাণিক আখ্যানের অবতারণা আছে। ইহাতে পরব্রহ্মকে "ধর্ম্ম নিরঞ্জন" এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনি আপন পূজাপদ্ধতি মর্ত্ত্যলোকে প্রচার জন্য সময়ে সময়ে অবতার হইয়াছেন। অবতার হইয়া, যে যেরূপে আপন মহিমা প্রচার করিয়াছেন, তাহাই এ গ্রন্থের অস্থিমজ্জা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব পুরাণের অনুবাদ হইলে ইহাকে ধর্ম্মপুরাণ বলিলে ক্ষতি ছিল না, বায়ুপুরাণ বা আদিপুরাণও ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ ঐ সকল পুরাণের সহিত ইহার বিশেষ সংস্রব দৃষ্ট হয় না। অংশতঃ কোন পুরাণের সহিত ঐক্য থাকিলে একটী পুরাণের পুরানামের অধিকার ইহার নাই। এইরূপে পুরাণ ও কল্পনার মিশ্রিত মতাবলম্বনে লিখিত বলিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য আপন চণ্ডীকাব্যের পরিচয়দানস্থলে নানা পুরাণ বিচার করিয়া এক নূতন গ্রন্থ রচনা করিবার কথা যে বলিয়াছেন, উপস্থিত গ্রন্থে সেইরূপ বলিলেই ঠিক হইত। কবি আপন কল্পনা বলে ধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি প্রচার উপলক্ষে উপন্যাসাংশের গুরুত্ব-প্রতিপাদন জন্য অনেক স্থলে পুরাণের কথা উপস্থিত করিয়াছেন। সে কালের অধিকাংশ কবিই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ে, ধর্ম্মজীবন বঙ্গীয় পাঠকের চিত্তাকর্ষণ জন্য নায়ক নায়িকাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া বর্ণন করিতেন এবং তাঁহাদিগের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখাপনোদন জন্য মধ্যে মধ্যে

দেব বা দেবী বিশেষের মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাব দেখাইতেন। মুসলমান আমলের কবি-দিগের মধ্যে কেহই আপন কাব্যে দেবদেবীর সংস্রব শূন্য করিতে পারেন নাই। বঙ্গভাষায় প্রাচীন কাব্য আলোচনা করিলে বোধ হয় যেন দেব দেবী ছাড়িয়া সে কালে কোন কাব্যই হইতে পারিত না, বোধ হয়, হইলেও সাধারণের নিকট সমাদৃত হইত না।

ঐ সকল কাব্যে প্রধানতঃ যে যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন থাকিত, সেই সেই দেবদেবীর নামের সহিত 'মঙ্গল' শব্দ যোজনা দ্বারা প্রায়শঃ গ্রন্থের নামকরণ হইত, তজ্জন্যই কৃষ্ণমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল ইত্যাদি নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্য কবি যে স্থানে স্থানে তাঁহার গ্রন্থ খানিকে "ধর্ম্ম-মঙ্গল" নাম দিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত বলিয়া ইহাকে "ধর্ম্মমঙ্গলই" বলা হউক। এ পর্য্যন্ত আটখানি ধর্ম্মমঙ্গলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা গিয়াছে। ময়ূরভট্ট, খেলা-রাম, ঘনরাম, রূপরাম, রামচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র, রমাই পণ্ডিত এবং সহদেব চক্রবর্ত্তী, এই আটজনের লিখিত আটখানি। এই আটখানি ধর্ম্মমঙ্গলই ধর্ম্মযাজন বা কাহার মানত উপলক্ষে মন্দিরা বা খোল ও মন্দিরা উভয় সহযোগেই গায়কদিগের দ্বারা গান করা হইয়া থাকে। আজি কালি প্রাচীন কবিদিগের কাব্য গান করিবার প্রথা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে বলিলেও চলে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শারদীয় মহা মহোৎসব উপ-লক্ষে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, যেখানে মহামায়ার মূর্ত্তি সেইখানেই চণ্ডী ও রামায়ণ-গান শুনিতে পাওয়া যাইত। এখন আর দেশে পূর্ব্বের ন্যায় চাউল ধান শস্তা নাই, লোকের সেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতারও অভাব, মতি গতিও অন্যদিকে ফিরিয়াছে। সুতরাং দুর্গা পূজায় সেরূপ উৎসব নাই, আড়ম্বরও নাই। এই সর্ব্ববাদিসম্মত মহোৎ-সবেরই যখন এই অবস্থা, তখন ধর্ম্মগাজনের আর কথায় কাজ কি, ধর্ম্মগাজনের ধূমও গিয়াছে, ধর্ম্মের গানের পসার কমিয়াছে। তাহা না হইলে উপরোক্ত আটখানি ধর্ম্মমঙ্গলই গায়কেরা খোল ও মন্দিরা সহযোগে গান করিত। ধর্ম্মমঙ্গল এত দিন মুদ্রিত হয় নাই। বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ১২৯৫ সালে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-প্রণীত ধর্ম্ম-মঙ্গল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। অপর তিনখানি এখনও অমুদ্রিত। ঘনরাম, রূপরাম ও রামচন্দ্র প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক নায়িকা একই ঘটনা ও বর্ণনীয় বিষয়ের কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলের বিষয় বিশেষ অবগত নাই। কিন্তু সহদেব চক্রবর্ত্তী-প্রণীত ধর্ম্মমঙ্গল পৃথক্‌বিধ। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, ভাবসমাবেশও সুন্দর। গ্রন্থের আকার, রচনা-পারিপাট্য, ও কবিত্বে সহদেবের ধর্ম্ম-পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার একখানি মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। গ্রন্থকার কাব্যের নানা স্থানে আপনার নাম ধাম বংশ পিতামহাদির পরিচব ও আত্ম জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই সে কালের কবির চরিতাখ্যান সম্বন্ধে যথেষ্ট।

বাসস্থানের পরিচয় দানোপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন,—

"দ্বিজ সহদেব গান অনাদি ভাবনা। রাধানগর বাড়ী যার বালিগড় পরগণা ॥"

এতদ্দেশে—অর্থাৎ অধুনাতন হুগলী জেলার অন্তর্গত দুইটী রাধানগর দেখিতে পাওয়া যায়। একটী পাড়ায় সাহাবাজারের নিকট—হাবেলী পরগণার অন্তর্গত; অপরটী দ্বারহাটার নিকটবর্ত্তী ও বালিগড় পরগণার অন্তর্গত। ইহাতে বুঝিতে হইতেছে যে শেষোক্ত রাধানগরেই কবির বাসস্থান ছিল। তিনি জাতিতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ,—

"অহর্নিশ ভাবি হরগৌরীর চরণ। গান দ্বিজ সহদেব বৈদিক ব্রাহ্মণ ॥"

সহদেব বংশ-পরম্পরায় চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রাজারাম চক্রবর্ত্তী এবং অগ্রজ মহাদেব চক্রবর্ত্তী।

"চক্রবর্ত্তী রাজারাম, অশেষ পুণ্যের ধাম,
বিশ্বনাথ তাহার নন্দন।
মহাদেব তস্য সুত, যাহার অনুজ ভ্রাত,
সহদেব সুকবি রচন ॥"

গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবি আপনাকে দেবানুগৃহীত ও তৎসূত্রেই কবিত্বসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এই দেবানুগ্রহলাভ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন রকম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—

"অনিল পুরাণ দ্বিজ সহদেব ভণে। কালাচাঁদ যারে কৃপা করিলা স্বপনে ॥"

অন্যত্র,—"দ্বিজ সহদেব গান শ্রীধর্ম্মের মায়া। বিল্বমূলে বসিয়া যাহারে কৈলে দয়া ॥"

অন্যত্র,— "খদির পলাশবন, এড়াইয়া দুইজন,
মধুবনে হৈল উপনীত।
দ্বিজ সহদেব গায়, দয়া কৈলে কালুরায়,
স্বপনে শিখালে যারে গীত ॥"

কবি উক্ত ধর্ম্মকালুরায়ের বন্দনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

"সোণার নূপুর পায়, উর বাপা কালুরায়,
যারে কৃপা করিলে স্বপনে।
বসিয়া শ্রীফল মূলে, সত্য করি কুতূহলে,
নিজ মন্ত্র শুনাইলে কাণে ॥
আপনি করিছে দয়া, মোরে দিলে পদছায়া,
পূর্ব্বজন্মে আছিল তপস্যা।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে, মনে ছিল তুয়া অংশে,
তেঁই ধর্ম্ম দেখা দিলে আস্যা ॥

তেবাস্তর মোর বিলে,　　তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে,
সঙ্গীত　হইল　নিরমান।
অনাদি চরণ-রেণু,　　তথি লোটাইয়া তনু,
দ্বিজ　সহদেব　রস-গান॥"

কবির অনুগ্রাহক কালুরায়, এখনও রাধানগরে আছেন, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণবংশ লুপ্ত হওয়ায় উক্ত দেবতা এখন ভাট-উপাধিধারী সদ্গোপদিগের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাহার পর কবি তারকেশ্বর-বন্দনায় বলিয়াছেন,—

"মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় এক চল্লিশ সালে।　বশ্যা ছিলে বৃষধ্বজ শ্রীফলের মূলে॥
বাঘছাল আসন বিভূতি ভূষা গায়।　কিবা সে লাবণ্যছটা কহা নাহি যায়॥
পঞ্চম অক্ষর মন্ত্র শম্ভু দিলে কাণে।　বদনে নাচয়ে বাণী তথির কারণে॥
গান দ্বিজ সহদেব শঙ্কর ভাবনা।　গায়কের পূর্ণ কর মনের বাসনা॥"

ইহাতে এই বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের বাল্যাবধি বাঙ্গলা কবিতায় একটু ঝোঁক ছিল, বয়সকালে লেখাপড়া শিখিয়া দৈবানুগ্রহে কালিদাসের কবিত্ব, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভা-শালী কবিকঙ্কণভট্টাচার্য্যের স্বপ্নলব্ধকবিত্বশক্তির কথা সর্ব্বদাই মনে তোলা পাড়া করিতে করিতে, বিশেষতঃ "কবিত্বং দুর্লভং লোকে" এই কথায় কবিত্ব দৈবশক্তির অধীন নিশ্চয় বোধে নানা দেবতার ধ্যানানুরক্তিপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে একদিন নিদ্রাযোগে—বিভূতিভূষিত, সম্ভবতঃ বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন বিল্বমূলে, কোন দেব-মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাঁহার নিকট স্বপ্নে পঞ্চাক্ষরমন্ত্রলাভ ঘটিয়াছিল। বোধ হয়, তন্ত্রাদিপাঠে তাঁহার এই মন্ত্রের উৎকর্ষ জ্ঞান পূর্ব্ব হইতেই ছিল, ইহার পর দৈবানুগ্রহের সাহসে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। গ্রামে বা পাড়ায় কালাচাঁদ বা কালুরায় নামে কোন ধর্ম্মের তাৎকালিক অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। কবিত্বের জন্য ব্রাহ্মণকে সেই কালুরায় ধর্ম্মের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ বলিয়াই বোধ হয়। এদিকে তারকেশ্বরের মহিমা রাঢ়ে বঙ্গে, গ্রন্থমধ্যে কাহাকে ছাড়েন, কাহাকে রাখেন কাজ নাই, পাঁচেই এক, একেই পাঁচ, এই ভাবিয়া সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল মধ্যে যখন যে দেবতার কথা আসিয়াছে, তখন তাঁহারই উদ্দেশে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়াছেন।

"দ্বিজ সহদেব গান রসের কাহিনী। রাঙ্গা পায়ে স্থান দিবে শঙ্কর ভবানী॥" ইত্যাদি।

ফলতঃ ব্রাহ্মণ বহুদেবতার সাধনায় সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার কাব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের সহিত তুলনায় উৎকৃষ্ট না হইলেও কোন মতে নিকৃষ্ট নহে, স্থানে স্থানে ভাষার লালিত্য ও কল্পনার আবেগ তাঁহার কাব্যে অধিক-তর সৌন্দর্য্য-যোজনা ও উদ্দীপনার আবির্ভাব করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল রচনারম্ভের কাল ৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র পৌর্ণমাসী। এই দিন

তিনি দেবানুগ্রহ লাভ করেন, এবং সম্ভবতঃ এই পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথিতেই তিনি ধর্ম্মমঙ্গলের দুই চারি পৃষ্ঠাও—অন্ততঃ রচনা করিয়া থাকিবেন।

"দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব্ব তপ ফলে। যাহারে করিলে দয়া এক চল্লিশ সালে॥

* * * *

আগমের কথা ইহা কে বলিতে পারে। কালাচাঁদ স্বপনে সদয় হৈলা যারে॥
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি। হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি॥

* * * *

দ্বিজ সহদেব গান ললাটের লেখা। মধুমাসে মায়াধর যারে দিলা দেখা॥"

এখন কথা হইতেছে ৪১ সাল কোন্ শতাব্দীর? সে সম্বন্ধে বা গ্রন্থসমাপ্তি কাল সম্বন্ধে কবি কিছুই বলিয়া যান নাই। অনুমান ও প্রমাণ-প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। আমি সহদেবের যে হস্তলিখিত ধর্ম্মমঙ্গল খানি পাইয়াছি, উহার লিপিকাল ১১৯৩ সাল। আমার নিজ গ্রামস্থ বাঁকুড়ারায় ধর্ম্মের সেবক ডোম-জাতীয় পণ্ডিতদিগের পূর্ব্বপুরুষ আনন্দীরাম পণ্ডিত উহার লিপিকর। ভাঙ্গামোড়ার ডোমপণ্ডিতেরা দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আজি কালি তাহাদিগের মধ্যে কাহারও পাণ্ডিত্য প্রসিদ্ধি নাই,—তবে যে তাহারা একেবারে বর্ণজ্ঞানশূন্য তাহাও নহে, তাহাদের গৃহে আজিও যে সকল অপ্রকাশিত মহামূল্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে—এ দেশের অনেক কৃতবিদ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়-দিগের নিকট তাহাদের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রণীত "রাধা-রসমঞ্জরী" নামক অপূর্ব্ব সংস্কৃত খণ্ডকাব্য খানি আমি ঐ ডোম পণ্ডিতদিগেরই নিকট পাইয়াছি।

আনন্দীরাম ধর্ম্মমঙ্গলের শেষে "ইতি ১৮ই মাঘ" ইহা ভিন্ন আর কিছু লেখে নাই, কিন্তু তাহারই হস্তলিখিত কৃষ্ণদাসপ্রণীত পাষণ্ডদলনের লিপি শেষে ১১৯৩ সাল লিখিত থাকায় বুঝা যাইতেছে, আনন্দীরাম ১১১ বৎসর পূর্ব্বে বা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিল। আনন্দীরামের পিতামহ বৃন্দাবন পণ্ডিত যে সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলরচনার সমকালিক তাহার প্রমাণ ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যেই আছে,—

"বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়া স্থিতি। অনুপম গুণধাম অনন্ত মূরতি॥
সদ্বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন। যাহার সেবায় বশ দেব নিরঞ্জন॥"

আনন্দীরাম যদি ১১৯৩ সালের লোক হইল, তবে তাহার পিতামহ কখন হাজার এক চল্লিশ সালের লোক হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না, যেহেতু পৌত্র ও পিতামহে ১০৪১—১১৯৩, ১৫২ বৎসর কালের দূরবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। সর্ব্বদেবদেবী-বন্দনা উপলক্ষে কবি সুয়াদার কালাচাঁদ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"সুয়াদার কালাচাঁদ বন্দো হাতে তালে। পাইল গোপের সুত তপস্যার ফলে॥"

ময়নাদা ভাঙ্গামোড়ার পার্শ্ববর্ত্তী শোমাপুকের একটী পল্লী, তত্রত্য গোয়ালা পণ্ডিতগণও অতিপ্রাচীনবংশসম্ভূত। পণ্ডিতগোষ্ঠীর বর্ত্তমান পুরুষ হইতে ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ বলাই পণ্ডিতের অপুত্রক ভ্রাতা কানাই পণ্ডিত কালাচাঁদ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। এতদ্দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলের রচনা ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র (১৭৪০ খৃঃ অঃ মার্চ্চ ২০।২২শে) আরম্ভ হয়। ১০৪১ সাল বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শতাব্দীর ৪১ সালে নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে কবি সহদেব ঘনরাম ও শিবায়নপ্রণেতা রামেশ্বরের সমসাময়িক এবং তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল উক্ত দুই গ্রন্থকারের গ্রন্থরচনার পরে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলাদি ও রামপ্রসাদের কালী-কীর্ত্তনাদির পূর্ব্বে রচিত।

সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল পৃথক্ ধাতুর ও পৃথক্ ছাঁচে ঢালা একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাতে রঞ্জাবতী নাই, লাউসেন নাই, কর্পূর নাই, কানড়া রাজকন্যাও নাই। সহদেবের গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবেই পুরাণের রীতি অনুসারে রচিত। তিনি তৎকাল-প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে বিঘ্নবিনাশন গণপতি, তাহার পর এইরূপে শ্রীধর্ম্মের বন্দনা করিয়াছেন,—

"করিয়া যুগলকর, প্রণমহ মায়া-ধর,
শূন্য মূরতি নৈরাকার।
দ্বিভুজ ধবলকায়, প্রণমে তোমার পায়,
তোমা বই দেবতা নাহি আর॥
বসিয়া পরম শূন্যে, শান্তি নাহিক মনে,
ডাকিছে উলূক মুনি-জন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, গণনা করিয়া বল,
কেবা মোরে করয়ে সন্তরণ॥
শুনি গোঁসাঞের বাণী, আনন্দে উলূক মুনি,
একে একে করয়ে গণন।
জম্বুদ্বীপের মাঝে, ভক্তগণ তোমা পূজে,
লইয়া সকল বন্ধুগণ॥
ভক্তের স্মরণ জানি, বলে ধর্ম্ম চূড়ামণি,
সেইখানে শূন্য তেয়াগিয়া।
ত্রিভুবনে অনুপম, শূলপাণি যার নাম,
তার ধামে উত্তরিল গিয়া॥
উপরে পুষ্পের ঝারা, মধ্যে গণেশের বারা,
জগতী উপরে সিংহাসন।
ধূপদীপে অন্ধকার, পূজা দেছে উপচার,
দেখি ধর্ম্ম উরিছে আসন॥

দড়া ধরি আসে ছেল্যা, কাঁদি কাঁদি চাপা কলা,
বোঝা ভারে গুবাক্ নারিকেল।
যাত্রী আসে লেখা নাঞি, আনন্দিত গোঁসাঞি,
কলসে কলসে গঙ্গাজল॥
উর উর ধর্ম্মরাজ, সিদ্ধ কর মোর কাজ,
দানপতি আছে মুখ চেয়্যা।
মনে বড় বাসি ভয়, না জানি কেমন হয়,
পার কর আপনি আসিয়া॥
বিষম ধর্ম্মের ঘর, দেখ্যা বড় লাগে ডর,
এক মন হল্যা হয় পার।
দুই মন করে যদি, তারে বাম হয় বিধি,
আচম্বিতে পড়ে মহামার॥
হরিচন্দ্র মহারাজা, আনন্দে করিল পূজা,
নিজ পুত্র দিয়া বলিদান।
মদনা তাহার রাণী, চোখে না পড়িল পানি,
আগু পূজা দিল সাবধান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর, পূজা করে নিরন্তর,
জাজপুরে আদ্যের দেহারা।
এতিন ভুবন মাঝে, শ্রীধর্ম্মের পূজা আছে,
রামাই করিল ঘর ভরা॥
সোণার নূপুর পায়, উর বাপা কালুরায়,
যারে কৃপা করিলা স্বপনে।
বসিয়া শ্রীফলমূলে, সত্য করি কুতূহলে,
নিজ মন্ত্র শুনাইলে কাণে॥
আপনি করিলে দয়া, মোরে দিলে পদছায়া,
পূর্ব্বজন্মে আছিলা তপস্যা।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণবংশে, মনে ছিল তুয়া অংশে,
তেঞি ধর্ম্ম দেখা দিলা আস্যা॥
তেবান্তর ঘোর বিলে, তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে,
সঙ্গীত হইল নিরমান।
অনাদি চরণ-রেণু, তথি লোটাইয়া তনু,
দ্বিজ সহদেব রস গান॥

অতঃপর ভগবতী-বন্দনা, তাহার পর সরস্বতী-বন্দনা, সরস্বতীবন্দনার পর লক্ষ্মী-বন্দনা, অনন্তর চৈতন্য-বন্দনা, তারকেশ্বর-বন্দনা, তাহার পর সর্ব্ব-দেবদেবী-বন্দনা, ইহাতে কবির সমসাময়িক যত গ্রাম্যদেবী, ধর্ম্ম, জীব প্রভৃতি কবি যাঁহাদের কথা আপনি জানিতেন ও লোকমুখে শুনিয়াছিলেন, সকলেরই বন্দনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইতে সকলের কৌতূহল জন্মিবার সম্ভাবনা বোধে, এস্থলে তাঁহারই বন্দনাংশ-টুকু কেবল উদ্ধৃত করিতেছি,—

"গবপুরে বন্দিব স্বরূপ নারায়ণ। আখুটীর ধর্ম্ম বন্দো হয়ে একমন॥
জাড়গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালুরায়। দিবা-নিশি কতেক গায়নে গীত গায়॥
পূর্ব্বদ্বারী কোঠা সম্মুখে দামোদর।* দুদিকে তুলসীমঞ্চ দেখিতে সুন্দর।
বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়া স্থিতি। অনুপম গুণধাম অনন্ত শকতি॥
সৎবংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন। যাহার সেবায় বশ দেব নিরঞ্জন॥
ময়াদার কালাচাঁদ বন্দো হাতে তালে। পাইল গোপের সুত তপস্যার বলে॥
বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়। দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায়॥"

সর্ব্ব দেবদেবী ও পিতামাতা বন্দনার পর কবি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

---

* জাড়গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার চকদীঘির দক্ষিণ, সেলিমাবাদ হইতে কাণা দামোদর দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একটি মুখ জাড়গ্রাম, দশঘরা, পাড়াম্ব, সাহাবাজার, রামনগর, দ্বারহাটা দিয়া হাবড়া জেলায় ভাগিরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং অপর একটী মুখ বাহাদুর, বনপুর, সরমপুর ও বন্দীপুরের নিকট দিয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিয়াছে। পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান দামোদর ঐ দুইটী খাত দিয়াই প্রবাহিত হইত বলিয়া কবি জাড়গ্রামের ও বন্দীপুরের নদী দুইটিকেই দামোদর বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, বর্ত্তমান দামোদর চৈতন্যদেবের সময়েও এই পথে প্রবাহিত হইত; তবে সে সময়ে ইহার অন্য নাম থাকা অসম্ভব নহে।

"ভাঙ্গামোড়া গ্রাম সেই পরম সুন্দর। রজনী পণ্ডিত স্থাপিত করিলা পুনর্ব্বার॥
এই গ্রামে আছে বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তোমারে আসিয়া আজি করিবে মিলন॥
মদনমোহন তুমি করহ স্থাপন। গ্রামবাসী লয়্যা কর সেবার নিয়ম॥
গ্রামের সার্থক হয় সাধু সমাগমে। মদনমোহনপুর ঘুষিবে এক্ষণে॥
তুমি ভাগ্যবান হয়্যা জন্মিলে সংসারে। নদীর প্রভাবে দেখ কাষ্ঠ উঠে তীরে॥
সেই কাষ্ঠে ছিলা এই মদনমোহন। পুনশ্চ বকুল বৃক্ষ করিনু রোপণ॥"

অভিরামলীলামৃত।

চৈতন্যদেবের সহচর অভিরামগোস্বামীর নিদেশানুসারে ভাঙ্গামোড়া গ্রামে মদনমোহনবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। তদনুসারে এই গ্রামের নাম কালেক্টরী তৌজী ও হুগলী জেলার মানচিত্রে মদনমোহনপুরই লিখিত। শেষের কবিতায় যে নদীর উল্লেখ আছে, উহাই বর্ত্তমান দামোদর, ভাঙ্গামোড়া বা মদনমোহনপুরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই নিরঞ্জন বা ধর্ম্ম এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তাহার নিঃশ্বাস হইতে উলুক নামক পক্ষীরূপধারী মুনির সৃষ্টি হয়; তাহার পৃষ্ঠের উপর উপবেশনপূর্ব্বক নিরঞ্জন ধর্ম্ম আদ্যাশক্তির সৃষ্টি করেন, ইনিই গ্রন্থের সর্ব্বত্র আদ্যা নামে অভিহিত হইয়াছেন। আদ্যার গর্ভে ও ধর্ম্মের ঔরসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিদেবগণের উদ্ভব, আদ্যার শতবার দেহান্তরগ্রহণ, মহাদেবকে পতিত্বে বরণ, অবশেষে তুহিনগিরিগৃহে তাঁহার আবির্ভাব, বাল্যলীলা, শিবসহ বিবাহ, গুহগজানন পুত্রের জন্ম, শিবশিবার ঘরকন্না, শিবের ভিক্ষা, দারিদ্র্য দুঃখদাহপ্রযুক্ত কামদা নামক ক্ষেত্রে তাঁহার কৃষিকার্য্য, তদুপলক্ষে কৈলাসে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিপ্রযুক্ত বাগ্দিনীবেশে শিবকে ছলনা, উভয়ের মৎস্যধারণ, কামদক্ষেত্র হইতে ভগবতীর অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান, কৃষিজাত শস্যাদি লইয়া শিবের কৈলাসযাত্রা, তথায় মহাজ্ঞানপিপাসিতা ভগবতীর শিব সমীপে প্রার্থনা উভয়ের পুণ্যতোয়া প্রবাহিনী বল্লকাতীরে প্রস্থান, গৌরীকে মহাজ্ঞান উপদেশকালে শিবমুখবিনিঃসৃত তত্ত্বকথা-আকর্ণনে নদীজলস্থ মৎস্যগর্ভশায়ী মীননাথ যোগীর মহাজ্ঞান-লাভ, মীননাথের গৌরীনিন্দা, তদ্ধেতু ভগবতীর অভিশাপ, শাপপ্রযুক্ত কদলিপাটন নামক স্থানে স্ত্রীজাতির মোহনমন্ত্রে মেষরূপে অবস্থিতি, শিষ্য গোরক্ষনাথকর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার; কালুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গী নামক যোগিপঞ্চকের একত্র মিলন, হরগৌরীস্তুতি, মহানাদে* মীননাথের রাজত্বলাভ; অনন্তর সগরবংশের উপাখ্যান, গঙ্গার উৎপত্তি, ডোমবেশে অমরানগরে শিবের ধর্ম্মপূজা, অমরানগরপতি ভূমিচন্দ্রকর্ত্তৃক উক্ত ধর্ম্মসেবক ডোমের নির্য্যাতন ও ধর্ম্মনিন্দা, সেই অপরাধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠের আবির্ভাব, এবং ধর্ম্মপূজান্তে মুক্তিলাভ, জাজপুরনিবাসী রামাই পণ্ডিত নামক সেবক ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীধরের ধর্ম্মনিন্দা, তজ্জন্য অবদাপাঠন নামক স্থানে তাহার প্রাণনাশ, পিতাকর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবনপ্রাপ্তি, জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মদ্বেষ, তৎপ্রতিকারার্থ তাঁহাদিগের গৃহে ধর্ম্মের জন্মগ্রহণ ও ম্লেচ্ছত্ব অবলম্বনে সকলের জাতি-নাশ, তৎপ্রযুক্ত সকলের ধর্ম্মভীতি ও পরিত্রাণলাভ, ভূমিচন্দ্ররাজার আপন মুণ্ডচ্ছেদে ধর্ম্মপূজা ও স্বর্গারোহণ; হরিশ্চন্দ্ররাজার ধর্ম্মনিন্দা, তৎফলে অপুত্রত্ব, পুত্রলাভার্থ রাণী সঙ্গে বনগমন, নানা দেবদেবীর উপাসনা, তাহাতে নিষ্ফলতা, বনমধ্যে পিপাসায় প্রাণ-ত্যাগ, রাণীর ধর্ম্মস্তুতি, ধর্ম্মের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, লুইচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম, রাজা ও রাণীকে ধর্ম্মের ছলনা, রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, রাণীকর্ত্তৃক পুত্রমাংসরন্ধন, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মের ভোজনকালে লুইচন্দ্রের প্রাণদান এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে সবিস্তার সুন্দর কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। কবি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, শব্দবিন্যাসের ছটা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়,—

---

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মগরা-ষ্টেসনের প্রায় ৬ মাইল পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী। এখানে মীননাথের প্রতিষ্ঠিত এক শিবের মঠ আছে।

বন্দিব জগৎমাতা, বিষ্ণুমায়া গিরিজাতা,
নিজঘটে দেহ পদ ভাব।

*   *   *   *

ত্রিদশতটিনীতটে বান্দা কালীঘাট। বিরাজে কালিকা যথা সদা গীত নাট॥"

এরূপ শব্দ বিন্যাস কাব্যের নানা স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির রূপবর্ণনা উপলক্ষে কবি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, অনেক কাব্যের বহু বিস্তৃত বর্ণনাতেও তাহা পাওয়া যায় না;

"তাহে জনমিলা আদ্যা সৃষ্টির কারিণী। পূর্ণশশধরমূর্ত্তি রাজীবলোচনী॥
চাঁচর চিকুরে শোভে বকুলের মালা॥ আষাঢ়িয়া মেঘে যেন শোভিত চপলা॥
ললাটে সিন্দূর বিন্দু রবির উদয়। চন্দন চন্দ্রিকা তার কাছে কথা কয়॥
রক্তিম অধরে পক্কবিম্বকের দ্যুতি। দশন আকার কুন্দ যিনি মুক্তা পাতি॥
করিকরভের কুম্ভ জিনি পয়োধর। লক্ষের কাঁচলি শোভে তাহার উপর॥"

স্বভাব-বর্ণনায় কবির সিদ্ধহস্ততা দেখাইবার জন্য কয়েকটী পংক্তিমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"অতি অনুপম শোভাশোভিত কৈলাস। ষড় ঋতু বসন্ত সমীর বার মাস।
কুসুম দিগন্তগন্ধা সদা বিকশিত। অলিগণ গায় শিব দুর্গার চরিত॥
কিন্নর করয়ে গান, নাচে বিদ্যাধরী। শৃঙ্গ হাতে আছে নন্দী শিবের দুয়ারী॥
কৃতাঞ্জলি আছয়ে সকল মখভুক্। অবনী লোটায়ে স্তুতি করে বেদমুখ॥
স্থিরছায়া তরুগণ অতিশয় শোভা। নানা পক্ষী কলরব জগমনোলোভা॥
মুনিগণ আনন্দে করিছে বেদধ্বনি। চারিদিকে বেষ্টিত স্বর্গের মন্দাকিনী॥
মূষক ভুজগ ভেক থাকে এক ঠাঞি। পশুগণ মানে হরগৌরীর দোহাই॥
হেমময় আসনে বসিলা ভগবতী। গুহ গজানন লয়্যা লক্ষ্মী সরস্বতী॥
বিজয়া করিছে অঙ্গে চামর ব্যজন। পদ্মাবতী মাখাইছে অগুরু চন্দন॥
অব্যয় চরণ সেবা করে জয়াবতী। কর্পূর তাম্বূল কেহ দেয় শীঘ্রগতি॥"

প্রসাদ গুণের পরিচয় দিবার বহুল কবিতা স্বত্বেও কয়েক পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত হইল:—

"ভাদ্রের অসিত পক্ষ অষ্টমীর তিথি। রোহিণী তারকাযুক্ত অন্ধকার রাতি॥
শুভযোগে পার্ব্বতী পড়িলা ক্ষিতিতলে। পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অবনীমণ্ডলে॥
শোধিতকাঞ্চন জিনি দেহের বরণ। রূপে করিল আলো হেমন্ত ভবন॥
শুভক্ষণে অবতীর্ণ হইলা ভবানী। হুলাহুলি দেয় যত অমররমণী॥
বিদ্যাধরী নাচিছে কিন্নরে গায় গীত। মন্দ মন্দ সুগন্ধ পবন-সঞ্চারিত॥
গভীর আরবে মেঘ করয়ে গর্জ্জন। রাজহংস কাকলী কুহরে অনুক্ষণ॥"

গৌরীর ধূলা খেলা বর্ণনা বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছে। ছন্দটিও সর্ব্বতোভাবে নূতন; প্রাচীন কাব্যে এরূপ ছন্দঃ প্রায় দেখা যায় না। কবি ইহাকে একাবলী ছন্দঃ বলিয়াছেন, এরূপ অষ্টাক্ষরে গ্রথিত একাবলী ছন্দঃ প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।

"নগেন্দ্রনন্দিনী উমা। রূপের নাহিক সীমা॥
পঞ্চম বরিষ কালে। কর্ণবেধ কুতূহলে॥
নানা আভরণ অঙ্গে। সমবয়সীর সঙ্গে॥
যশোদা রোহিণী রমা। চিত্রলেখা তিলোত্তমা॥
হীরা জীরা সরস্বতী। হরিপ্রিয়া হৈমবতী॥
কৌশল্যা বিজয়া জয়া। পদ্মাবতী সতী ছায়া॥
হরিশ হইয়া মনে। সবাকার মধ্য মানে॥
ধূলায় মন্দির করি। বকুলের তলে গৌরী।
ধুচনী কূলাচি পাতি। সঙ্গে জয়া হৈমবতী॥
রাঙ্গা ভাঁড় রাঙ্গা টাটি। রন্ধনের পরিপাটি॥
ধূলার অদন করি। সবাকারে দিলা গৌরী॥
মিছা সে ভোজন সুখে। হাত না পরশে মুখে॥
আচমন মিছা জলে। তাম্বূল দাও না বলে।
সকলে বালিকা বুদ্ধি। পাতখোলা মুখশুদ্ধি॥
শয্যা কদম্বের পাতা। বিছান জগৎমাতা॥
দুটি দুটি এক ঠাঞি। সুখের অবধি নাঞি॥
দণ্ডে দণ্ডে দিবানিশি। আনন্দ সাগরে ভাসি॥
কেহ দেয় ছড়া ঝাঁটি। যেন গৃহস্থের বাটি॥" ইত্যাদি।

বিপন্নের দেবীস্তুতি বড়ই আবেগময়ী হইয়াছে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যেন উথলিয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত অসাধারণ ঐকান্তিকতা—আবার শিশুর ন্যায় আবদার,—

"শরণ লইনু জগৎ জননী, ও রাঙ্গা চরণে তোর।
ভবজলধিতে অনুকূল হৈতে, কে আর আছয়ে মোর॥
দুগ্ধকণ্ঠশিশু দোষ করে, রোষ না করয়ে মায়।
যদি বা রুষিবে পড়িয়া কান্দিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥
হরিহর ব্রহ্মা যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি।
বিপদসাগরে তনয় ফুকারে বুঝিয়া যা কর তুমি॥"

কবি পৌত্তলিকতার অন্ধতমসের ভিতর হইতে হিন্দুধর্ম্মের সারভূত অদ্বৈতবাদ কেমন স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া জড়শক্তি বা প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব দুই চারিটি কথায় কত সংক্ষেপে বুঝাইয়া গিয়াছেন,—

নম নম নারায়ণী, সদানন্দ-স্বরূপিণী,
পদ্মযোনিসহায়নী শিবা।
তুমি হেতু সবাকার, বিরাটের মূলাধার,
নিমেষয়ে তুমি রাত্রি দিবা॥
বিস্তারিয়া গুণত্রয়, কর সৃষ্টি স্থিতিলয়,
আরোপিয়া অনাদি পুরুষে।
সংসার কৌতুকাগারে, শিশু যেন ক্রীড়া করে,
স্মরে তোমা দেবতা মানুষে॥
তুমি শালগ্রাম শিলা, ভারতে করিলে লীলা,
প্রকৃতি পুরুষ নানা ছলে।
মোহনে মোহিনী হৈয়া, গোকুলে পুরুষ পায়্যা,
মুরলী বাজালে তরুমূলে॥
আপনি গোপিনীবেশে, বশ হয়্যা কৃষ্ণরসে,
সেবা কৈলে ব্রহ্মা রাত্রি দিনে।
বিস্তারিয়া গুণলেশ, পাল্যা মহা পরিতোষ,
আত্মারাম আপনার মনে॥
কেহ বলে রাধাশ্যাম, কেহ বলে সীতারাম,
কেহ বলে শঙ্কর ও বাণী।
ভুবনে ভকত ধন্য, যাহার ভজন জন্য,
একমূর্ত্তি অনন্তরূপিণী॥
আগম-শাস্ত্রের উক্তি, হ'লে পুরুষের শক্তি,
প্রধানতা পূর্ণ করিবারে।
শক্তিসনে হৈলে জড়, পুরুষে প্রবর্ত্ত যড়,
শক্তিহীন নড়িতে না পারে॥
শক্তিরূপ জগন্ময়, জানে যেই মহাশয়,
হরিভক্তি লভে অনায়াসে।
শীঘ্র যোগ সিদ্ধ করি, সংসার-সাগর তরি,
মুক্ত হৈয়া যায় কর্ম্মপাশে॥
তুমি না ভাঙ্গিলে ধন্ধা, কর্ম্মপাশে থাকে বান্ধা,
লোচন থাকিতে হয় আন্ধা।
অনেক পুণ্যের ফলে, তোমাতে ভকতি হল্যা,
ভদ্র দেখে ভেঙ্গে দেয় ধান্ধা॥

যে কিছু সকলি তুমি, সকলের জন্মভূমি,
পুরুষ প্রকাশ তুয়া গুণে।
অজ্ঞানে বুঝিতে নারে, তব অনাদর করে,
অধঃপাতে যাবার কারণে॥"

যৎকালে সিদ্ধযোগী মীননাথ কামিনী রাজ্য "কদলী-পাটনে" উপস্থিত, তৎকালে তত্রত্য অধীশ্বরী মীননাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বশীকরণ জন্য যে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া ছিল, তাহাতে কবিত্বের বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি আছে,—

"যেখানে সন্ন্যাসী বসি কদম্বের তলা। সখীগণ সঙ্গে তথা আইলা প্রমীলা॥
প্রণাম করিয়া রামা কহে কৃতাঞ্জলি। বঙ্কিম নয়নে চাহে কনক পুতলী॥
সকালে বৈকাল কেন দেখি মহাশয়। নবীন বয়সে হেন উপযুক্ত নয়॥
কদলী নগরে থাক হৈয়া মহারাজা। ষোলশত কামিনী তোমার হবো প্রজা॥
তুমি রাজা হবে আমি হবো পাটরাণী। সদাই সুখেতে রব দিবস যামিনী॥
অবিরত যোগাব অনেক উপহার। কানন ভ্রমিয়া কষ্ট কেন পাবে আর॥
কুম্‌কুম্ কস্তুরী মাখাব সোণা গায়। কাঞ্চন মাদুলী করি পরিব গলায়॥
নবীন লাবণ্য সদা হেরিব নয়নে। করিয়া চাঁপার মালা পরিব লোটনে*॥
আমি হবো শতদল তুমি সে ভ্রমর। তুমি চাঁদ হবে আমি হইব চকোর॥
প্রমীলার বচন শুনিয়া যোগীবর। ঈষৎ হাসিয়া তবে দিলেন উত্তর॥"

যোগীর প্রত্যুত্তরে সংসারে নিতান্ত অনাসক্তি জানাইলেন,—

"প্রমীলে আমার বোলে কর অবধান।
সংসার আমার ধন, না লয় আমার মন,
নিস্তার কারণ ভগবান॥
মিছা মায়া মধুরসে, বন্দী হয়্যা মায়াপাশে,
হরিপদে না রহে ভকতি।
তসরের পোকা যেন, লূতায় বসিয়া কেন,
নিজ সূতে মজে লঘুগতি॥
যোগীর পরম ধন, গোবিন্দের পদে মন,
শুনেছি সনক সনাতন।
না শুনি ব্রহ্মার কথা, সবে হলো ঊর্দ্ধরেতা,
সাক্ষাৎ পাইল নারায়ণ॥

* চুলের খোঁপায়।

মস্তকেতে জটা ধরি, গাছের বাকল পরি,
বিভূতি ভূষণ ধরি গায়।
কি করিব রাজ্যধন, পরম সুন্দরীগণ,
উহা কি আমারে শোভা পায় ॥
কাননে করিয়া বাস, সুখে থাকি বার মাস,
গোবিন্দ তপনে নিরন্তর।
তোমায় কহিনু দড়, মোর অভিলাষ ছাড়,
যাহ ধনী আপনার ঘর ॥
মধুর বচন তোর, লোভ মোহ কাম মোর,
নাহি, কেন বাড়াও জঞ্জাল।
কেন চাহ মোর পানে, বঙ্কিম নয়ন কোণে,
হায় হায় আমার কপাল ॥
হৈয়া জটাবন্ধধারী, যে জন পরশে নারী,
নাহি পাপী তাহার সমান।
ও রসে বঞ্চিত আমি, আর কত বল তুমি,
মোরে না শোভয়ে হেন কাম ॥
প্রমীলা যতেক ভণে, মীননাথ নাহি শোনে,
ভাবে রামা কি করি উপায়।
দ্বিজ সহদেব ভণে, বিল্বমূলে যেই জনে,
দয়াবান্ হৈলে কালুরায় ॥"

ভগবতীর অভিশাপ আছে, মীননাথ যতই কেন করুন না, পরিশেষে তাঁহাকে প্রমীলার মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইতে হইল। কদলী-পাটনে তাঁহাকে প্রমীলাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই ভুলিতে হইল। তিনি যোগের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হারাইলেন, কবি বলিয়াছেন, তাঁহার মেষত্ব-প্রাপ্তি ঘটিল,—

"দূরে গেল মহাজ্ঞান পাইয়া যুবতী। আনন্দিত রঙ্গ রসে কেবল দিবারাতি ॥
মাকড়ের জালে যেন বান্ধা গেল হাতী। বজ্র যেন ভাঙ্গে ঠেকে মণ্ডুকের অস্থি ॥"

কিছু কাল পরে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ সন্ধান পাইয়া যখন উদ্ধারার্থ উপস্থিত হয়েন, কবি তখন তাঁহার মুখ দিয়া যে কয়েকটি কথা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে গ্রাম্যতা-দোষ থাকিলেও বড়ই সুমিষ্ট ও সময়োচিত হইয়াছে,—

"গুরুদেব নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পুতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল, পর্ব্বত ভাসিয়া যায় ॥
গুরু হে বুঝহ আপন গুণে।

শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মঞ্জরিল,
পাষাণ বিন্ধিল ঘুণে॥
হের দেখ বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে, চর্ম্মমণ্ডিত কায়া,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥
শিল নোড়াতে কন্দল বাঁধিল, সরিষা ধরাধরি করে,
চালের কুম্‌ড়া গড়ায়ে পড়িল পুইশাক হাসিয়া মরে॥
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল, ছেলে চায় পায়রার দুধ।
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু, কাকড়া ধরিল কাচি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল, ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥
আগে নৌকা উড়িল, পশ্চাৎ পুড়িল, মাঝে বায় উড়িল ধূলা।
সরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাঞি, ডুবিল দেউল চূড়া॥
বাঘে বলদে হাল জুড়িনু মর্কট হৈল কৃষাণ।
জলের কুম্ভীর ছড়া ঝাড়ি গেল মূষিকে বুনিল ধান॥
তালের গাছে শোলের পোনা ময়তান ধরিয়া খায়।
সাগর মাঝে কই মৎস্য মুড়লি পঙ্গুপলুই লয়্যা ধায়॥
মধ্য সমুদ্রে দুয়াড়ি পাতিনু সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল হরিণী পলায় লাপে লাখ॥
তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু আধার হৈল পুরী।
সহদেব গায় ভাবিয়া কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী॥"

রাজার রাজ্যত্যাগ ও বনগমনে রাজভক্তপ্রজাদুঃখ বর্ণনাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। ভারতের প্রজা চিরদিনই এইরূপ রাজার দুঃখে দুঃখী ও রাজার সুখে সুখী,—

"মহারাজা বনে যাবে পড়িল ঘোষণা। অমরার ঘরে ঘরে পড়িল ক্রন্দনা॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া কাঁদে, হাতীশালে হাতী। পঞ্চপাত্র কাঁদে শোকে লোটাইয়া ক্ষিতি॥
সভাসদ্ দ্বিজ কাঁদে নাহি বাঁধে বুক। যোড়হস্তে কান্দে দুঃখে যতেক ভিক্ষুক॥
গাভী কান্দে তৃণমুখে পক্ষী কান্দে ডালে। বৎস কান্দে স্তনমুখে, মীন কান্দে জলে॥
ধূলায় লোটায়ে কান্দে যত প্রজাগণ। কেন বা ধর্ম্মের ঘর ভাঙ্গিলে রাজন॥
ধর্ম্মনিন্দা করিলে কখন নহে ভাল। ধর্ম্মহিংসি দুর্য্যোধন রসাতলে গেল॥
ধর্ম্মনিন্দা রাজার করিল এতখানি। রাজারে বেড়িয়া রহে একশত রাণী॥
বলিতে বলিতে অস্ত গেল দিবাকর। বিদায় লইয়া পঞ্চপাত্র গেল ঘর॥
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ সহদেব গায়। যার যে অদৃষ্টলিপি তাই হতে চায়॥"

সে কালের কবি বীর বালকের মৃত্যুকালীন উক্তিতে কেমন উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছেন তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"পুরাণের কথা কিছু জননীরে কয়। জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়॥
কোথা গেল কুম্ভকর্ণ, কোথা ইন্দ্রজিৎ। কোথা গেল দশস্কন্ধ, কোথা পরীক্ষিৎ॥
অভিমন্যু মৈল দেখ ভারতের রণে। কৃষ্ণের ভগিনী প্রাণ ধরিল কেমনে॥
কোথা গেল বাণ দেখ, কোথায় মান্ধাতা। জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু লিখিল বিধাতা॥"

সহদেব বঙ্গদেশের কবি, তাই তিনি এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ এদেশের ডোম, ধীবর, গোপাদি ধর্ম্মসেবক পণ্ডিতগৃহে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে; বঙ্গবাসী মাতৃভাষার আদর করিতে শিখিতেছেন; উহার অঙ্গসৌষ্ঠব রূপলাবণ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; প্রাচীন কবির পুরাতন কাব্যের উদ্ধার সাধন হইতেছে; এরূপ অবস্থায় আশা করা যায়, সহদেবের ধর্ম্ম-মঙ্গল অচিরেই বঙ্গবাসীর ধর্ম্ম-গৃহে বিরাজ করিবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

কাঁটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক।

শ্রীবাটী-নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু রামরামচন্দ্র কাঁটোয়া হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী বরগ্রামে মাটি খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে পিত্তলনির্ম্মিত এই ফলকখানি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৫ সালের জুন মাসে তিনি ইহা আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। এখানি জৈনদিগের নৌপজ্জী অর্থাৎ নবপদপূজাপ্রতিমা। শ্বেতাম্বর জৈনেরা মনে করেন যে ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত যত জিনদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা করিলে যে ফল হয়, আশ্বিনমাসে নবপদজীর পূজা করিলেও সেই ফল হয়। নবপদজী চব্বিশজন জিনের সংক্ষিপ্তসার মাত্র।

নবপদের প্রথমপদ অরিহন্ত অর্থাৎ অর্হৎ। এই প্রতিমার ঠিক মধ্যস্থলে পাঁচটি অর্হতের মূর্ত্তি আছে। ইহারা শ্বেতাম্বরীদিগের ঠাকুর, এই জন্য ইহাদের পরিধানে কৌপীন আছে। ইহাদের সর্ব্ব মধ্যস্থলের ঠাকুরটীর মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার। ইনি বীরাসনে উপবিষ্ট, পাণিদ্বয় উত্তানভাবে ক্রোড়দেশে স্থাপিত, ইনি সম্পূর্ণরূপে ধ্যানমগ্ন। ইহার বামে ও দক্ষিণে দুইটি থাম, থামের উপর সেকালের মুসলমানী ধরণের খিলান, খিলানের উপর দুই পার্শ্বে দুইটি হস্তী। হাতী দুইটি আপন আপন শুঁড় উঁচা করিয়া আছে, শুঁড় দুইটি প্রায় পরস্পর ঠেকিয়াছে, শুঁড় দুইটির নীচে খিলানের উপরিভাগে

ঠিক মধ্যস্থলে উঁচা খুরা দেওয়া বাটির মত কি একটি পদার্থ আছে। খিলানের নীচে অরিহতের মস্তকের উপর এবং তাহার দুইপার্শ্বে লতার মত তিনটি পদার্থ আছে। অরিহতের বামপার্শ্বে একটি ছোট খিলান, তাহাতে দুইটি মূর্ত্তি, একটি অরিহতের ঠিক প্রতিরূপ, আর একটি দণ্ডায়মান অরিহতের মূর্ত্তি। অরিহতের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দিগম্বর জৈনদিগের দণ্ডায়মান-মূর্ত্তি উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরদিগের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি বিরল হইলেও যথায় আছে, তথায় কৌপীনধারী, আমাদের এ মূর্ত্তি কৌপীনধারী, ধ্যানস্থ, বাহুদ্বয় দেহ পার্শ্বে লম্বমান, মস্তক মুকুটহীন, পাদুটি জোড়া।

মূল অরিহতের দক্ষিণপার্শ্বেও দুই মূর্ত্তি, একটি উপবিষ্ট অপরটি দণ্ডায়মান। অরিহতের এই পাঁচ মূর্ত্তি প্রতিমার ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত। জৈনগণ একস্থানে পঞ্চমূর্ত্তি রাখিতে পারিলে তাহাকে পঞ্চতীর্থ কহেন্ এবং বিশেষ আদর করেন্। কলিকাতায় কোথাও পঞ্চতীর্থ নাই, এক জায়গায় তিনটি জৈনমন্দির আছে, আর দুইটি হইলেই পঞ্চ-তীর্থ হয়। কিন্তু আমাদের নবপদজীর মধ্যস্থলে একটি পঞ্চতীর্থ আছে, উহা জৈনদিগের বড়ই আদরের। এই পঞ্চতীর্থের দুইপার্শ্বে দুইটি থাম এবং উপরে একটি প্রকাণ্ড খিলান, নীচে একটি রেখা। অবশিষ্ট আটটি পদ ইহার চতুর্দ্দিকে স্থাপিত।

দ্বিতীয়পদ—নাম সিদ্ধ। অরিহতের মস্তকোপরি স্থাপিত, ইহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে কুণ্ডল, উত্তান বাহুদ্বয় অঙ্কোপরি স্থাপিত, ইনি বীরাসনে উপবিষ্ট।

তৃতীয়পদ—নাম আচার্য্য। ইহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে কুণ্ডল, ইনি যোগাসনে উপবিষ্ট, ইহার এক হস্তে পুস্তক অপর হস্তে কিছুই নাই।

চতুর্থপদ—নাম উপাধ্যায়। অরিহতের নিম্নদেশে অবস্থিত, মুণ্ডিত মস্তক, যোগাসনে উপবিষ্ট, হস্তদ্বয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পঞ্চমপদ—নাম সর্ব্বসিদ্ধ, মুণ্ডিত মস্তক, কর্ণে কুণ্ডল, যোগাসনে উপবিষ্ট, এক হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অপর হাত ক্রোড়দেশে স্থাপিত।

ষষ্ঠপদ—নাম সম্যক্ত্ব। সিদ্ধ ও আচার্য্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত, ইহার আকৃতি নাই। ইহার ঘরে লেখা আছে "নমো শংম্যণশ" অর্থাৎ নমঃ সম্যক্ত্বায়।

সপ্তমপদ—নাম জ্ঞানপদ। আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের মধ্যস্থলে খালি ঘরে লেখা আছে "নমো নাণশ" অর্থাৎ নমো জ্ঞানায়।

অষ্টমপদ—নাম চারিত্র্য, উপাধ্যায় ও সর্ব্বসিদ্ধের মধ্যস্থলে খালি ঘরে লেখা আছে "নমো চালিতয়" অর্থাৎ—নমশ্চারিত্র্যায়।

নবমপদ—নাম তপঃ। সিদ্ধ ও মহাসিদ্ধের মধ্যস্থলে খালি ঘরে লেখা আছে—"নমো তবশ" অর্থাৎ নমস্তপসে।

নয়পদের নাম (১) অরিহত (২) সিদ্ধ (৩) আচার্য্য (৪) উপাধ্যায় (৫) সর্ব্বসিদ্ধ (৬) সম্যক্ত্ব (৭) জ্ঞান (৮) চারিত্র্য (৯) তপঃ।

প্রতিমার নীচে দুই কোণে দুই গণধরের মূর্ত্তি। গণধর অর্থাৎ গুরু। অনেক শিষ্যের গুরু হইলে তাঁহাকে গণধর বলিত। গণধরেরা মুণ্ডিতমস্তক, কুণ্ডলধারী, ইঁহারা জোড়হাতে বসিয়া আছেন, পরিধানে কৌপীন, একটি হাঁটু ভূমির উপর, পদদেশ পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপিত, অপর পদের পদতল ভূমির উপর, হাঁটুটী উচ্চভাবে অবস্থিত।

প্রতিমার নিম্নভাগে অতি অস্পষ্টভাবে কয়েকটি অক্ষর লেখা আছে। যথা—

সংবৎ ১৯২৩............শ্রী...............পঞ্জী——

প্রতিমার পৃষ্ঠদেশে—প্রথম সূক্ষ্মাক্ষরে কিছু লেখা আছে তাহার পর স্থূলাক্ষরেও কিছু লেখা আছে। সূক্ষ্মাক্ষরে যথা—

৯০০০ সংবৎ ১৯২৩ মাঘ সুদি ১৩ মক্ররাশিসংস্থিতে ঘস্রাধিপতৌ শুক্রবারে—

ইদং চক্রমণ্ডলং পূজা শান্তি...শ্রীঃ ইন্দ্রেশ্বরে জৈনক্ষেত্রে...স্বর্গস্থানে—

স্থূলাক্ষরে যথা—

৯০০০ নবসহস্র বিশ্বজ—নিহিত সর্ব্বসূরিণঃ সংবৎ ১৯২৩ মাঘ শুভদি ১১ বুধে দেশসসিন প্রতাপসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র ভৃগু মঘ তপন সিংহদাহাল জৈনেন সহ সঙ্গত সহিতেন ভট্টতীর্থিনি—

ওঁং নবপদঃ

সকল লিপিরই সম্বৎ মিলিল, ১৯২৩ হইল, কিন্তু ইহা বিক্রম সম্বৎ নহে। যেরূপ প্রাচীন স্থান হইতে এ প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রায় তিনশত বৎসর হইল, নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে, সুতরাং ইহা জিন-সম্বৎ হইবার সম্ভাবনা। জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্র ত্রিলোকসারে লিখিত আছে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে (৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী নির্ব্বাণলাভ করেন। বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণদিবস হইতে অব্দ গণনা করিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ জৈনেরাও মহাবীরের নির্ব্বাণ দিবস হইতে একটি অব্দ গণনা করিয়া আসিতেছেন।

এখন জৈনাব্দ ২৪২৩ হইবে। যদি জৈনাব্দের ১৯২৩এ এই প্রতিমা স্থাপিত হইয়া থাকে, তবে ইহা ২৪২৩—১৯২৩=৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার স্থাপনার স্থান ইন্দ্রেশ্বর। প্রতিমাস্থ লিপিতে ইন্দ্রেশ্বরকে জিনক্ষেত্র ও স্বর্গস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখন এই ইন্দ্রেশ্বর কোথায়? রামরাম বাবু বলিয়াছেন, যে বরগ্রামে এই প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ইন্দ্রেশ্বর। তিনি যে সকল প্রমাণপ্রয়োগ দিয়াছেন, তাহা ও আমরা এ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণপ্রয়োগ পাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমরা রামরাম বাবুর সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়াছি।

রামরাম বাবু বলেন, অনেক পরগণারই পরগণার নামে একটি প্রধান নগর থাকে যেমন পলাশী পরগণার প্রধান নগর পলাশী, হালিসহর পরগণার প্রধান নগর হালিসহর,

কলিকাতা পরগণার প্রধান নগর ডিহি কলিকাতা, সেইরূপ ইন্দ্রাণী পরগণার ইন্দ্রাণী নামে একটি প্রধান নগর ছিল। ইহার প্রমাণও অনেক পাওয়া যায়—

যথা—চৈতন্যভাগবতে—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাঁটোয়া নামে গ্রাম। তথা আছেন কেশবভারতী শুদ্ধ ধাম॥"

মুকুন্দরামের চণ্ডীতে আছে—

মণ্ডলঘাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি, দেব আইসে যাহার সদন॥"

কাশীরাম দাস বলিতেছেন—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

সুতরাং ইন্দ্রাণী নামে পরগণা ছিল এবং উহাতে ইন্দ্রাণী নামে একটি প্রধান নগরও ছিল জানা গেল। ইন্দ্রাণী তুলনায় কাঁটোয়ার একটি সামান্য নগর তাহাও জানা গেল। তথায় ইন্দ্রেশ্বর নামে হিন্দুর দেবতা ছিলেন, ইহা আমরা বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গল হইতে জানিতে পারিয়াছি। যথা—"উজবনি ক্রম বাই, শিবা নদী শাখাই, ওধানপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর।"

এই ইন্দ্রাণী নগর ও ইন্দ্রেশ্বর কোথায় ছিল? রামরাম বাবু তাহার ঠিকানা দিয়াছেন। বিপ্রদাসও দিয়াছেন। রামরাম বাবু কবিকঙ্কণ হইতে দেখাইতেছেন—

"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বরের পূজা কৈল দিয়া পুষ্পপানি।
ভাউসিংহের ঘাটখান ডাহিনে এড়াইয়া। মেটেরী সহরখান বামদিকে থুইয়া॥"

মেটেরী সহর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, বামদিকে মেটেরী ডানদিকে কিছু উজাইয়া ভাউসিংহের ঘাট, আরও কিছু উজাইয়া ইন্দ্রেশ্বর, আরও কিছু উজাইয়া মণ্ডলঘাট। তাহা হইলে মণ্ডলহাট ও ভাউসিংহের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও ইন্দ্রেশ্বর। এখন এই দুই জায়গার ঠিক মধ্যস্থলে বরগ্রাম, এই বরগ্রামই ইন্দ্রাণী অথবা ইহার অতি সন্নিকটেই ইন্দ্রাণী অবস্থিত ছিল। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্ত্তনে উহা এখন গঙ্গা হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছে। বিপ্রদাস বলেন, কাঁটোয়া ছাড়িয়া ইন্দ্রেশ্বর, ইন্দ্রেশ্বর ছাড়াইয়া শিবানদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। বরগ্রামের কিছু দক্ষিণে এখনও শিবানদী আছে, কিন্তু গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে ও তিনি এক্ষণে শিয়ালনালা হইয়াছেন। ইন্দ্রাণী পরগণার—

"বার ঘাট, তের হাট, তিন চণ্ডী, তিন শ্বর, এ যে জানে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।"

যে পরগণায় তের হাট থাকে সে একটা বড় বাণিজ্যের স্থান, এখন সে গঞ্জ কাঁটোয়ায় হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহা ইন্দ্রাণীতে ছিল, ব্যবসায়ের জায়গা হইলেই জৈনেদের বড়ই প্রতিপত্তি হয়, ইন্দ্রাণীতেও ছিল। তাই একজন জৈন এই প্রতিমা ইন্দ্রাণীতে স্থাপন করেন এবং তাঁহার ই নামানুসারে ভাণ্ডসিংহের ঘাট, ভৃগুসিংহের ঘাট, ভাউসিংহের ঘাট বা ভাউ ঘাট হইয়াছে। ফলকে লিখিত ভৃগুসিংহই এই ঘাটের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(১)

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং।" আমাদের বাঙ্গালা পুস্তক সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ইংরাজাধিকারে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যে সকল পুস্তক বাহির হইয়াছে, সে সকলের কথা বলিতেছি না। বাঙ্গালা-মুদ্রাযন্ত্র হইবার পূর্ব্বে যে সহস্র সহস্র বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি।

অনেকেরই বিশ্বাস, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় শতাধিক পুস্তক ছিল কি না সন্দেহ! এত যে সাহিত্য-চর্চ্চা, এত যে অভিনব বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রচার, তাহা ইংরাজ-প্রভাবের ফল। বাল্যকালে আমাদেরও এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু বহুদিবস হইতে সে ভ্রম দূর হইয়াছে।

এখন যেরূপ অনুসন্ধান চলিতেছে, যেরূপ সন্ধান পাইতেছি, প্রতিদিন যেরূপ পুথি সংগৃহীত হইতেছে, এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে মোটামুটী বলিতে পারা যায়, বাঙ্গালার নানাস্থানে বিভিন্ন লোকের যত্নে রচিত এখনও দশসহস্রাধিক বাঙ্গালা পুথি রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। বাঙ্গালা দেশে এমন বিশিষ্ট পল্লী নাই, যেখান হইতে না দুই চারি জন পল্লী-কবি আবির্ভূত হইয়াছেন।* এমন দিন গিয়াছে, প্রত্যেক গ্রামবাসী স্ব স্ব পল্লী-কবির মহিমায় আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন। সেই সকল পল্লী-কবির প্রভাবে শান্ত শিষ্ট গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন মত-প্রচলন, বিভিন্ন ধর্ম্মের উত্থান-পতন, জাতীয় শক্তি-সংগঠন, মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন এ সমস্তই পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের অশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন। বিভিন্ন সময়ের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস কিরূপ ছিল, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন কিরূপে গঠিত হইয়াছে, প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিলে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার, রীতিপদ্ধতি, ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল ও কিরূপে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বাঙ্গালা পুথিসমূহ হইতে সেই অতি প্রয়োজনীয় কথা উদ্ধার করিয়া আমাদের প্রস্তাবিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ হইতেছে। কেবল ইহাই নহে। যাঁহারা ভাষা-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা বঙ্গভাষার উৎপত্তির ধারাবাহিক ইতিহাস জানিতে চাহেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির অনুসন্ধান ও প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি-পরিদর্শন তাহাদের

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।

একান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালা পুথি-সংগ্রহে সাধারণের যত্ন বৃদ্ধি হইবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের মাতৃভাষার প্রভূত উপকার সাধিত হইবে, ভাবিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

আপাততঃ আমরা আমাদের আয়ত্তাধীন বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ের পুথির কথাই বলিব। অতঃপর অপরাপর মহাত্মাগণের সংগৃহীত পুথির তালিকাও প্রকাশ করিব।

এ পর্য্যন্ত বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে পাঁচ শতের অধিক বিভিন্ন বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। এখন যেরূপ অনুসন্ধান চলিতেছে, যদি এইরূপ ভাবে পুথি সংগ্রহ হইতে থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, এক বর্ষের মধ্যে প্রায় ২।৩ হাজার বিভিন্ন নামধেয় পুথি আমাদের হস্তগত হইতে পারিবে।

আপাততঃ ২০৪ খানি পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অকারাদি বর্ণানুক্রমে প্রকাশ করিলাম *। ইচ্ছা ছিল, এই সমস্ত পুথি সমালোচনপূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও ভাষার পরিচয় প্রকাশ করিব; তিনি সময়াভাববশতঃ এবার তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বারান্তরে অবশিষ্ট পুথিরও এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

অবশেষে সাধারণের প্রতি নিবেদন,—যাঁহার নিকট প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি আছে, তিনি সেই সেই পুথির প্রারম্ভ ও শেষ কবিতাগুলি, গ্রন্থকারের পরিচায়ক শ্লোকসমূহ, পুথিলেখকের নামধাম, পুথি নকলের তারিখ, শ্লোকসংখ্যা বা পত্রসংখ্যা, এবং পুথির অধিকারীর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। তাঁহার প্রেরিত প্রাচীন অথবা সাধারণের অজ্ঞাত বাঙ্গালা পুথিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় সাদরে প্রকাশিত হইবে।

---

* প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি মাত্রই বর্ণাশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। ইচ্ছা ছিল, যে পুথিতে যেরূপ লেখা আছে, অবিকল তাহাই উদ্ধৃত করিব; কিন্তু সেই উদ্ধৃত কবিতাগুলি অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে কি না তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তজ্জন্য কেবল বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করা হইল। কিন্তু ব্যাকরণগত যেরূপ প্রাচীন পদাদি ও বিভক্তি আছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিলাম না।

১ । অক্রূর আগমন । কবিচন্দ্র ও শঙ্কর ।

আরম্ভ—

নারদ আসিল তথা কংসরাজে কয় ।
দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥

মধ্য—

হইলা বামন কায় বলিরে ছলিলে ।
পরশুরামের রূপে ক্ষত্রীকুল সংহারিলে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় ব্যাসের আদেশে ।
স্বপ্নে কৃপা কৈল যারে ব্রাহ্মণের বেশে ॥

শেষ—

দরশন দিয়া কুব্জির কুব্জ মোচন কৈল ।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ শঙ্কর রচিল ॥
ইতি অক্রূর আগমন সমাপ্ত ।

(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০। ইহার আর একখানি পুথি আছে, তাহা ১০৯০ সনে লিখিত ।)

২ । অঙ্গদের রায়বার । ঘোষাল শর্ম্মা ।

আরম্ভ—

সমুদ্র পার হোকে রাম থাপা হোকে বৈঠা ।
আঁখো পর ধুঞ্জি নিক্‌লে মাঙ্গায় রঙ্গিন চোট্টা ॥

শেষ—

ভণয়ে ঘোষাল শর্ম্মা আপ্‌কে জমুদার ।
অধমকো প্রভু কদম হুকুম হোয়ে দরিয়া উতর পার ॥
ইতি খোট্টা অঙ্গদের রায়বার সমাপ্ত ।

পাত্রসায়ের গোপীনাথপুর সন ১০৮৮ সাল তারিখ ২৮শে কার্ত্তিক রোজ সোমবার তিথি শুক্লা সপ্তমী বেলা তৃতীয় প্রহরে লেখা হইল । (শ্লোক সংখ্যা ১০০ ।)

৩ । অজামিলের উপাখ্যান । কবিচন্দ্র ।

আরম্ভ । (প্রথম পাত নাই, ২য় পাত হইতে)

মধ্য—

এই সব শোক করি,　　অন্তরে ভজয়ে হরি,
দ্বিজ যোগে তনু তেয়াগিল ।

শেষ—

এত দূরে অজামিল উপাখ্যান সায় ।
অষ্টম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায় ॥
লিখিতং শ্রীনিমাঞি চন্দ । সন ১০৮৭ সাল ।

৪ । অধ্যাত্ম-রামায়ণ । শ্রীলক্ষ্মণ দাস ।

(আদিকাণ্ড ।)

আরম্ভ ।—(প্রথম পাত নাই ২য় পাত হইতে)

মধ্য—

দ্বিতীয় কাণ্ডে অযোধ্যা রাম বনবাসী ।
অরণ্যেতে বনে বনে সম্ভাষেণ ঋষি ॥

শেষ—

আধ্যাত্মিক রামায়ণ আদিকাণ্ড সায় ।
রামপদরজ ভাবি শ্রীলক্ষ্মণ গায় ॥
(শ্লোক সংখ্যা ৮০০ ।)

৫ । অধ্যাত্ম-রামায়ণ । শ্রীলক্ষ্মণ দাস ।

(অযোধ্যা কাণ্ড ।)

(১ম পাত নাই । ২য় পাত হইতে)

এইরূপে দিন যায় আনন্দ সতত ।
শাসন করেন পৃথ্বী রাজা দশরথ ॥

ভণিতা—

শ্রীরাম চরণ পদ্মে নিবেসিয়া মন ।
ব্যাস বাল্মীকির মত বলে শ্রীলক্ষ্মণ ॥

শেষ—

রামের পাদুকা তায় করিল স্থাপন ॥
ভরত ধরেন ছত্র পাদুকা উপর ।
শত্রুঘন মহাবীর ঢুলায় চামর ॥
রাজ্যচর্চ্চা পাদুকায় নিবেদন করি ।
বিচারেন ভরত শ্রীরাম পদ স্মরি ॥
এত দূরে অযোধ্যা কাণ্ডের কথা সায় ।
অভিপ্রায় ব্যাসের মত শ্রীলক্ষ্মণ গায় ॥
(শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০ ।)

৬ । অভিরাম-বন্দনা । রাইচরণ দাস ।

আরম্ভ—

বন্দিব শ্রীগুরু　　বাঞ্ছা-কল্পতরু
সর্ব্বসিদ্ধি যার পদে ।
যাহার কৃপাতে　　শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে
মিলে ঘুচে অপরাধে ॥

*　　*　　*　　*

বন্দিব আনন্দ মনে বৃন্দাবনচন্দ্র।
বীরসিংহা গ্রামী যার প্রকট আনন্দ॥
গ্রাম পূর্ব্বদিকে হয় যার শ্রীমন্দির।
দরশনে সুসৌষ্টব অতি মনোহর॥

ভণিতা--

এ রাইচরণ দাস সদা করে অভিলাষ
কবে দাস হইব তোমার॥

মন্তব্য।—(এই গ্রন্থে অভিরাম গোস্বামী ও জাহ্নবা ঠাকুরাণীর জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে ও পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিজ রামপ্রসাদ কবির পদও উদ্ধৃত আছে। শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪২০।)

ইহার আর একখানি পুথি আছে, তাহা ১০৯৫ সনে লিখিত।

৭। অমৃতরসাবলী।—

আরম্ভ—

শ্রীগুরুচরণারবিন্দ, সাবধান হঞা বন্দ,
যাহা হৈতে তিমির বিনাশে।
করুণা কর নিজ গুণে, মহিমা দেহ সর্ব্বজনে,
এই নিবেদন করু দাসে॥

মধ্য।—সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল।
সহজ না জানিলে অসমর্থক হৈল॥
বস্তু প্রকাশিব আমি সেই সেই হয়।
শ্রীমুকুন্দ লেখাঞাছেন হইয়া সদয়॥
কবিরাজ গোসাঞীকে যবে প্রভু আজ্ঞা কৈল।
গ্রন্থ বর্ণন কর তাঁহারে কহিল॥
গোসাঞি কহেন মুঞি করি নিবেদন।
আমার শক্তিত গ্রন্থ না যায় বর্ণন॥
নিতাই কহেন তুমি ভরসা কর মনে।
চৈতন্য লেখাব তোরে আনিয়া আপনে॥
তাঁহার আজ্ঞায় কৈল গ্রন্থের চিন্তন।
যে লিখাইল তাহা করিল লিখন॥১
তার মধ্যে আর এক বস্তু কৈল সার।
প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা হইল আমার॥২

তাহা লাগি সেই তত্ত্ব করিল প্রচার।৩
নিষেধ করিল নিতাই না লিখিল আর॥
ভক্তিকল্পলতিকাতে দেখ বিচার করিয়া।
সহজ ভাঙ্গিতে প্রভু কলম লৈল কাড়িয়া॥৪
চৈতন্যচরিতামৃতে সহজ সংক্ষেপে লেখিল।
জীব তরে গোসাঞি জীউ লেখিয়া ঢাকিল॥৫
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জীবের লাগিয়া।
দেশে দেশে ফেরেন প্রভু প্রেম প্রচারিয়া॥৬
জীবের মনে সহজ বস্তু সামান্য হইবে।
সামান্য জ্ঞান হৈলে জীব অধোগতি যাবে॥৭
প্রেমরত্নাবলী গ্রন্থে সহজ ভাঙ্গিতে।
অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে॥
দিবারাত্রি বঞা গেল কিছুই না জানে।
আপনে নিতাই আসি কহিল স্বপনে॥
দেখিয়া তাহার দশা আজ্ঞা কৈল তারে।
সহজ বস্তু প্রকাশ কর করিয়া প্রচারে॥৮
তবে শ্রীরূপ ঠাঞি আজ্ঞা মানি নিলা।
সেই বাঞ্ছা হয় তবে তাহারে আজ্ঞা দিলা॥৯
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব স্বরূপ গোসাঞি জানে।
রঘুনাথ শিখাইলা করিয়া যতনে॥
সেই রঘুনাথ দাস তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
কৃপা আজ্ঞায় গোসাঞি মুকুন্দে কহিলা॥
মুকুন্দদেব তবে গোসাঞির আজ্ঞা পেঞা।
সহজ বস্তু লিখিলেন সংস্কার করিয়া॥১০
সেই পুথি দয়া করি দিলেন আমারে।
সংস্কার বুঝিতে নের্‌য়া ফির্‌য়া দিলা তাঁরে॥

---

(১) লিখাইল নিতাই তাহা করিল লিখন।
(২) তার মধ্যে এক বস্তু অতি সে বিস্তার।
(৩) তাহা নাকি শতেক ভক্ত করিল প্রচার।
(৪) সহজ লিখিতে প্রভু কলম লিল কেড়্যা।
(৫) জীবের ভয়েতে গোসাঞি লিখিয়া ঢাকিল।
(৬) দেশে দেশে বেড়াইল প্রেম প্রচারিয়া।
(৭) জীবের মনে সহজ সামান্য জ্ঞান হয়।
সামান্য বলিলে জীব অধোগতি যায়॥
(৮) সহজ বস্তু পৃথক্ করি করহ বিচার।
(৯) সেই বাঞ্ছা হয় লেখ আজ্ঞা তারে দিল।
(১০) সহজ তত্ত্ব লিখিলেন সংস্কার করিয়া।

তবে মুকুন্দদেব বুঝি আমার মন।
বিচার করিয়া তাহা করিলা লিখন ॥
মোর হাতে কলম দিয়া লিখাইল আপনে।
বাহ্যে করণ নহে মনের করণে ॥
গোসাঞি মুকুন্দ বলে সহজ বস্তু বলি।
শ্লোকার্থ ভাঙ্গিয়া দিয়া লেখহ সকলি ॥[১১]

শেষ—

অমৃত-রসাবলী এই গ্রন্থ মহাশুর।
রসিক ভক্তের নিকট অন্যের বহু দূর ॥

*　　*　　*　　*

শ্রীমুকুন্দদেবের আজ্ঞায় লিখিলাম আমি।
কত বা দিবার বেলা যে মানা কৈলেন তিনি ॥
অতএব প্রাণ তোকে কৈলাম সমর্পণে।
প্রাণ নিকটে ইহা রাখিবি গোপনে ॥

ইতি অমৃতরসাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ভাদ্র মাসে সতর তারিখে লিখেছি। লিখিতং পিয়ারী দাস নাড়া। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩২০।)

৮। অম্বরীষ উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

শুক কহে শুন পরীক্ষিত নরপতি।
বৈষ্ণব যাহারে কোপে তার নাহি গতি ॥
মন দিয়া শুন তুমি নবমের কথা।
ব্যাসের বর্ণন বৈষ্ণবের গুণ গাথা ॥
অম্বরীষ নামে রাজা ছিল পুণ্যবান্।
দান ধর্ম্ম পূজা করে কৃষ্ণগুণ গান ॥

শেষ—

বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তি কবিচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

সন ১০৮০ সাল তাং ১৮ই ফাল্গুন বৈকালে সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীনিমাইদাস চন্দ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৬৫।)

৯। অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা কহ তপোধন।
তার পর কি করিলা পিতামহগণ ॥

শেষ—

অর্জ্জুনে বিদায় দিলা প্রভু যদুরায়।
ব্যাসের আদেশে দীন কবিচন্দ্র গায় ॥
ইতি অর্জ্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ সমাপ্ত।

স্বাক্ষরমিদং শ্রীনফরচন্দ্র মণ্ডল সাং রাউতখণ্ড। সন ১২৫৪, তারিখ ২৪শে জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা ২০০)

১০। অর্জ্জুনের বাঁধবাঁধা পালা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

রাজা বলে মুনিবর জিজ্ঞাসি তোমারে
তার পর কি করিলা পঞ্চ সহোদরে ॥

শেষ—

হনু আগে অর্জ্জুন তবে হইল বিদায়।
এত দূরে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্রে গায় ॥
অর্জ্জুনের বাঁধবাঁধা পালা সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীগোবিন্দরাম সরকার, সাং পাত্রসায়ের। এই পুস্তক শ্রীপঞ্চানন হেঁশ তন্তুবায়ের। ইতি সন ১১০১ সাল ২৫শে মাঘ রোজ শুক্রবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৩০।)

১১। আট রস। গোবিন্দদাস।

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
শ্রীনিত্যানন্দ পদ মোর স্ফুরুক অন্তরে ॥
দুই প্রভুর ভক্ত পাএ করএ প্রণতি।
সবে মোরে কর দয়া তবে যে পীরিতি ॥

মধ্য—

গোবিন্দদাস কহে এতহি বিচার।
টুটল বাণ কিয়ে লোচন ভার ॥

শেষ—

খণ্ডিত (১২ পাতের পর আর নাই।)

---

(১১) শ্লোকার্থ ভাঙ্গিয়া লেখাব সকলি ॥
এই সকল পাঠান্তর আর একখানি ২০২ বৎসরের প্রাচীন পুথি হইতে দেওয়া গেল।

১২। আত্মজিজ্ঞাসা *। শ্রীকৃষ্ণদাস।

আরম্ভ।—অথ আত্মজিজ্ঞাসা লিখ্যতে। তুমি কে? আমি জীব। কোন্ জীব? তটস্থ জীব। থাক কোথা? ভাণ্ডে।

শেষ—

সহচরী সহ আস্বাদিতে মোর চরণ আশ।
জিজ্ঞাসাতত্ত্বসারাৎসার কহেন শ্রীকৃষ্ণদাস॥

ইতি আত্মজিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ।

লিখিতং শ্রীরূপদাস নাড়া, সাং রসোড়া। ইতি সন ১২৪২ সাল আখিরি তারিখ ৩রা বৈশাখ।

* নরোত্তম রচিত দেহকড়চের সহিত ভণিতা ছাড়া আর সকল অংশে মিল আছে। (পরিষৎ-পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) এই গ্রন্থ কৃষ্ণদাস বা নরোত্তম কাহার রচিত, তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, এখানি প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থ হইলেও অপর কোন ব্যক্তি কৃষ্ণদাস বা নরোত্তমের নামে মেকী চালাইয়াছেন। কেহ বলেন, দেহকড়চ স্বরূপকল্পতরু নামক গ্রন্থের এক সামান্য ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু আমরা ছয়খানি নরোত্তমের ভণিতাযুক্ত দেহকড়চ ও তিনখানি কৃষ্ণদাসের ভণিতাযুক্ত আত্ম-জিজ্ঞাসা পুথির সন্ধান করিয়াছি, তদ্দারা এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যে ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থ কোন বৃহৎ গ্রন্থের অংশ মাত্র। স্বরূপ-কল্পতরু একখানি আধুনিক সংগ্রহগ্রন্থ। সুতরাং সেদিনকার পুথির উপর নির্ভর করিয়া আমরা দেহকড়চ বা আত্ম-জিজ্ঞাসাকে কোন গ্রন্থের অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা দুই শত বর্ষের লেখা দেহ-কড়চ পাইয়াছি। ইহার পূর্ব্বের লেখা স্বরূপকল্পতরুবৎ পুথি না পাইলে এই গ্রন্থ কোন বৃহৎ পুথির অংশ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অনেকের বিশ্বাস আলোচ্য গ্রন্থখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের লেখা। গৌরাঙ্গদেব যাঁহার পদাবলী শুনিয়া বিমুগ্ধ হইতেন, সেই চণ্ডীদাসও একজন সহজ সাধক। অনধিকারীর সহজ মত বুঝিবার সাধ্য নাই। সহজ মত এখন নেড়ানেড়ীর হাতে পড়িয়া ভ্রষ্ট হইয়াছে।

১৩। আত্মনিরূপণ। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য চেতন হৃদয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ গুরুমহাশয়॥

মধ্য—

জগত জীবন প্রভু ভকত হৃদয়।
কেমনে আছয় তাহা শুনহ নির্ণয়॥

শেষ—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
আত্মানিরূপণ কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি আত্ম-নিরূপণ সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীকেশবলাল সরকার। নিবাস বিষ্ণুপুর সন ১২১৮ সাল তারিখ ১৬ই শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১১২।)

১৪। আনন্দ-ভৈরব। প্রেমদাস।

আরম্ভ—

প্রেমাঙ্কুরৈঃ ক্ষোভগান্ধারিকাঃ স্পর্শ-ইচ্ছা রমামনাধিকাঃ॥

যথা রাগ।

পদ্মাবতী কহে মুঞি করি নিবেদন।
এই শ্লোকের অর্থ কর শুনিতে হয় মন॥
কান্তা শ্লোকার্থ করিয়ে স্মরণ।
বাহ্যে নাহি কহা যায় অমনের করণ॥
*　　*　　*
অনাদি ব্রহ্মার ঘামে শক্তির জনম।
তার রূপে তার মন কৈল আকর্ষণ॥
এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা হৈল সঙ্গম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হৈল জনম॥
মুখে ব্রহ্মা বুকে বিষ্ণু শিব ভগদ্বারে।
ক্রমে ক্রমে প্রবল হৈলা তিন সহোদরে॥

শেষ—

শ্রীগুরুপদারবিন্দ হৃদে করি আশ।
আনন্দভৈরব কহে প্রেমদাস॥

ইতি আনন্দভৈরব সমাপ্ত।

বৈরাগী বৈষ্ণবের এ পথ নহে রসিকের কারণ।
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রেম-প্রয়োজন॥

শ্রীপিয়ারিদাস নাড়া। সাং পাত্রসায়ের।
(শ্লোকসংখ্যা ৩৫০।)

১৫। আনন্দলতিকা।—লোচন দাস।

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই ভাই।
অবনীমণ্ডলে দোঁহে সুখে গুণ গাই॥

শেষ—

যত দোষ না লইবা সাধুমহাজন।
বিনতি করিয়া কহে এ দীন লোচন॥

ইতি আনন্দলতিকা সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণকান্ত হেশ সাং বানজুই। শ্রীতিলকরাম নন্দী সাং জামকুণ্ডী লিখিয়া সমাপ্ত করিনু। সন ১০৮০ সাল তাং ৫ই শ্রাবণ। রোজ মঙ্গলবার বেলা ছয় দণ্ডের সময়। শ্রীরঘুনাথ কুণ্ডুর পাঠশালে দক্ষিণমুখে বসিয়া লিখিয়া সমাপ্ত হইল। পুস্তক শ্রীচৈতন্যচরণ হেশ নিবাস দক্ষিণপাড়া। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০। ইহার আর দুইখানি প্রাচীন পুথি আছে।)

১৬। আশ্রয়নির্ণয়।—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

অথ আশ্রয়নির্ণয়। আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চপ্রকার। নামাশ্রয় ১, মন্ত্রাশ্রয় ২, ভাবাশ্রয় ৩, প্রেমাশ্রয় ৪, রসাশ্রয় ৫, এই পঞ্চপ্রকার।

শেষ—

অষ্টপদ্ম চরণে ২, মুখে ১, নেত্রে ২, নাভি ১, কর ২, শ্রীমতীর হারমালা, মুক্তামালা, কাঞ্চনমালা এবং শ্রীমতীর বনমালা এক। বৈজয়ন্তিমালা, মুক্তামালা।

ইতি আশ্রয়নির্ণয় সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীমথুরদাস বৈরাগী। সন ১২১৯, ২৭শে পৌষ শনিবার রাত্রে সমাপ্ত। (১০৯৮ সনে লিখিত আর একখানি পুথি আছে।)

১৭। উজ্জ্বলনীলমণি।—

শ্রীরূপগোস্বামী কৃত মূলের অনুবাদ।

আরম্ভ—

জয় গদাধর গৌর পরম সুন্দর।
এক আত্মা প্রকট দুই কলেবর॥

শেষ—

ভাষাচ্ছন্দে কিঞ্চিৎ কহিল স্বল্পাক্ষরে।
বৈষ্ণব ঠাকুরদাস ক্ষেমিবে আমারে॥

ইতি উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ সম্পূর্ণ।

ইতি সন ১২৬৯ সাল ২৭শে বৈশাখ। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৬৫।)

১৮। উঞ্ছবৃত্তির পালা।—কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

মন দিয়া শুন সবে ভারত পুরাণ।
শ্রবণে কলুষ নাশ অন্তে মুক্তি স্থান॥

শেষ—

হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হৈল সায়।
ভারত শ্রবণে নর চতুর্ব্বর্গ পায়॥

ইতি উঞ্ছবৃত্তির পালা সমাপ্ত।

পাত্রসাএর গ্রামের শ্রীগোকুলদাস বৈষ্ণবের লিখিত। ইতি সন ১০৬১ সাল। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৩০।)

১৯। উদ্ধবদূত।—মাধব গুণাকর।

আরম্ভ—

গোপীকার প্রাণবন্ধু কৃপা অম্বুধি।
প্রণয় পটুতা তিঁহ সর্ব্ব গুণনিধি॥
প্রেমসিন্ধু আদেশেতে আইলা গোকুল।
গোপগোপী দুঃখ দেখি হইলা আকুল॥

শেষ—

তাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম।
কবিশিখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম॥
তার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর।
পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব্বগুণধর॥
গজসিংহ নামে রাজে ছিল বর্দ্ধমানে।
তার সভাসদ্ ছিল দ্বিজ সর্ব্বগুণে॥
উদ্ধবদূত গ্রন্থ করিল রচন।
তাহা শুনি মুগ্ধ হয় যত সভাজন॥

(শ্লোক সংখ্যা ৭৮০।)

২০। উদ্ধবসংবাদ।—কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৃন্দাবন পাশরিতে নারেন মাধবে।
নবীন কুঞ্জ বৃন্দাবন ভাবে॥

তাহাতে বসিলেন কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে লাগিলা কিছু গোপীর হিত ॥

শেষ—

এতেক বচন যদি উদ্ধব কহিলা।
শুনিয়া সভার প্রেম ভাবিতে লাগিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে।
দশম স্কন্ধের কথা উদ্ধব গমনে ॥
ইতি শ্রীউদ্ধবসংবাদ সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীজগন্নাথ সরকার, সন ১১০২ সাল। তাং ২৫শে চৈত্র রোজ বুধবার, তিথি চতুর্দ্দশী, বেলা ৬ দণ্ডে সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ৪০০।)

২১। উদ্ধবসংবাদ।—দ্বিজ নরসিংহ।

আরম্ভ—

এক দিন বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত।
ভাবিতে লাগিল কৃষ্ণ গোপীর চরিত ॥
গোকুলে গোপীর সঙ্গে যত কৈল লীলা।
সে সব সোঙরি কৃষ্ণ বিবশ হইলা ॥

শেষ—

এতেক কহিল সখা ব্রজের কথন।
তোমা না দেখিয়া সবার বিকল পরাণ ॥
দ্বিজ নরসিংহ বলে গোপীপদতলে।
অন্তকালে স্থান দিহ চরণ-কমলে ॥

(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২২। উপাসনা-পটল।—নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে শ্রীরূপং শ্রীসনাতনং।
তব পাদরজো মহ্যং দেহি ভো। কৃপয়াপ্রভো ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু রূপসনাতন।
শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীজীব চরণ ॥

মধ্য—

অপ্রকৃত প্রেম কেমনে স্ফুরে জীবে।
এ কারণে শিক্ষাগুরু মহান্ত স্বরূপে ॥

শেষ—

তোমা সভার পদরজ চিত্তে অভিলাষ।
উপাসনা-পটল কহে নরোত্তম দাস ॥
ইতি উপাসনা পটল সমাপ্ত।

লিপিরিয়ং শ্রীপ্যায়ারীচরণ দাস নাড়া, সাং পাত্রসাএর গোপীনাথপুর। তাং ২৯শে আষাঢ়, তিথি-কৃষ্ণাষ্টমী। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৮১০।)

২৩। একাদশীব্রত পালা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

শুক বলে পরীক্ষিৎ ধরহ বচন।
একাদশীব্রত রাজা কর আরম্ভণ ॥
রুক্মাঙ্গদপুরে রাজা সঙ্গে সন্ধ্যা রাণী।
পাত্রমিত্র পুরজন সভাকারে আনি ॥

শেষ—

এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা অন্তর্ধ্যান।
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে করিলা পয়ান ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় ব্যাসের রাঙ্গা পায়।
হরি হরি বল সবে পালা হল সায় ॥

ইতি রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশীব্রতের পালা সমাপ্ত। সন ১০৮৭ সাল। তাং ৭ই পৌষ (শ্লোক-সংখ্যা ২৫০।)

২৪। কংস বধ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বাদ্য বাজাইতে মানা করে কংসাসুর।
কৃষ্ণে পুরী হইতে করি দেহ দূর ॥

শেষ—

দুই ভাই প্রেমাবেশে হাত ধরাধরি।
পিতামাতা স্থানে গেল দেখ্যা অন্তঃপুরী ॥
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
শুনিলে কংসের বধ যমের নাহি দায় ॥
কৃষ্ণের পীরিতে হরি বলহ সভায়।
এত দূরে কংসবধ পালা হল সায় ॥

লিখিতং শ্রীগৌরমোহন শর্ম্মা। সাং পাত্রসায়ের মৌজে বৈকুণ্ঠপুর। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০।)

২৫। কণ্বমুনির পালা। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—১ম পাত নাই।

মধ্য—

ধ্যান ভঙ্গ হইল মুনির প্রকাশ নয়ন।
দেখে পাতে অন্ন খায় শ্রীনন্দের নন্দন ॥

শেষ—

কৃষ্ণদাস বিরচিত ভক্তের ভগবান।
নন্দ আদি সকলে হইলা বিস্মরণ ॥
ইতি শ্রীকণ্বমুনির পালা সমাপ্ত
(শ্লোকসংখ্যা ১৬০ ।)

২৬। কণ্বমুনির পারণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

শুক কহে শুনক আদি নিবেদি সভারে।
বিহার করেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ॥

শেষ—

অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
ভক্তজন মুক্তি পায় ব্যাসের নন্দন ॥
রাধার মঙ্গল গীত কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥

ইতি পারণ-পালা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামকান্ত দত্ত। সাং পাত্রসায়ের। এ পুস্তক শ্রীবিশ্বম্ভর বাত্তি তন্তুবায়ের। সাং মাজপার। ইতি সন ১২২০ সাল, তারিখ ৫ কার্ত্তিক, রোজ সোমবার, তিথি শুক্লা প্রতিপদ, নক্ষত্র শতভিষা, বেলা ৫ দণ্ডে সমাপ্ত হইল।

২৭। কপিলামঙ্গল। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ – কপিলামঙ্গল।

শুন সর্ব্বজন মন দিয়া ইতিহাস।
শুনিলে সকল পাপ হইব বিনাশ ॥
কপিলামঙ্গল গীত শুনিতে রসাল।
শুনিলে সকল পাপ হরেত তৎকাল ॥

শেষ—

লীলাবতী কপিলার চরণ ধরিয়া।
কপিলার পূজা কৈল পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥
এই পুথি যতনে যেবা রাখে নিকেতনে।
অষ্টশত পাল তার বাড়ে দিনে দিনে ॥
এই মত রহিল গাই মথুরামণ্ডলে।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে বলে ॥
(শ্লোকসংখ্যা ২০০ ।)

২৮। কপিলামঙ্গল। ক্ষুদিরাম দাস ও কেতকাদাস।

আরম্ভ—

নারদ বলেন বোল করিতে বিড়ম্বনা।
ব্রহ্মমূর্ত্তি হতে মোর নাঞক বাসনা ॥
ব্রহ্মমূর্ত্তি হইয়া যাব কপিল্যা ছলিতে।
গোবাগা বলিয়া মোরে ঘুষিবে জগতে ॥

শেষ—

দিতে নিজ পরিচয় চলে মুনি মহাশয়।
সুকবি কেতুকা দাস কয় ॥

* * *

রামের সনে যাব বনে বলিছেন লক্ষণ।
ক্ষুদিরাম দাসে মাগে চরণে স্মরণ ॥

ইতি কপিলামঙ্গল সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীমধুসূদন কুণ্ডু। সন ১২২৮ সাল, তারিখ ১১ বৈশাখ, রোজ বুধবার, বেলা আড়াই প্রহর হইতে সমাপ্ত হইল।
(শ্লোকসংখ্যা ১৫০ ।)

২৯। কালিকামঙ্গল। ভারতচন্দ্র।

আরম্ভ—অথ কালীমঙ্গল লিখ্যতে।

ভবানন্দ মজুমদারের * * * হরি।
বর চাহ মনমত তাহা দিতে পারি ॥

* * *

সংক্ষেপে কহিতে হইল কহিতে বিস্তর।
অতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর ॥ * * ॥
প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের সমর ॥ * * ॥
ত্রিপদী ছন্দ ॥ * * ॥
যশোর নগর ধাম, প্রতাপআদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।

* * *

শেষ—

ভারত কহেন নিত্য বিহরয় রায়।
এত দূরে কালিমঙ্গল জাগরণ সায় ॥

ইতি কালিকামঙ্গল জাগরণ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল। সাকিম নন্দীপুষ্করণী। পাঠক

শ্রীক্ষেত্রমোহন চন্দ্র, সাং পাঁজদোনা। সন ১২৪৬ সাল, তারিখ ২৮ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

মন্তব্য।—ইহার আর একখানি পুঁথি আছে, তাহার আরম্ভ নাই, কিন্তু শেষে কেবল জাগরণ নহে সমস্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ আছে।

ইতি হইল সায়, ভারত সঙ্গীত গায়,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা।
ভুরস্থট্যা পরগণায়, ব্রাহ্মণ নরেন্দ্র রায়,
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তার, কালিকামঙ্গল সার,
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত হইল। লিখিতং শ্রীরামকুমার মজুমদার, সাং বহলোলপুর, পং খণ্ডঘোষ সন ১২২৮ সাল। তারিখ ৭ কার্ত্তিক।

৩০। কালিকাবিলাস। কালিদাস।

আরম্ভ—

কহিল ভাগুরি মুনি, কহ ত শুনি,
মার্কণ্ডেয় মহামুনি।
অষ্টম মন্বন্তরে, যে হইল ছত্রধরে,
কি পুণ্য কৈল সেইজন॥

ভণিতা—

কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
রচিলা শ্রীকালিদাস কালিকাবিলাস॥

শেষ—৩০ পাতের পর খণ্ডিত। যে অবধি আছে, তাহার শ্লোকসংখ্যা ১৭৪০।

৩১। কালীয় দমন। দ্বিজ পরশুরাম।

আরম্ভ—

ধেনুক অসুর মারি প্রভু মহাবল।
নিউয়ে সকল লোক খায় বার ফল॥

* * *

শেষ—

এইরূপে রহিলা সভে সেই বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে দ্বিজপরশুরাম ভণে॥

ইতি কালীয়দমন সমাপ্ত, সন তাং ২৬ মাঘ শকাব্দা ১৭৬১।

৩২। কুঞ্জ-বর্ণন। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

* * *

বন্দিব শ্রীগুরুদেব আনন্দ করিয়া।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করো ভূমিতে পড়িয়া॥
যাহার প্রসাদে সর্ব্বসিদ্ধি অব্যাহতি।
তাহার চরণ বিনু অন্য নাহি গতি॥

* * *

পত্রের লহরী কিবা ভাল সুশোভিত।
চাতকাদি পক্ষি শব্দ করে সুললিত॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখ কোটীচন্দ্র-শোভা।
চকোর চকোরী তাহে অতি মনোলোভা॥

শেষ—

শ্রীলোকনাথ গোসাঞি পাদপদ্ম করি আস।
কুঞ্জবর্ণন গায় নরোত্তম দাস॥
ইতি কুঞ্জবর্ণ সমাপ্ত। (শ্লোক প্রায় ১৫০।)

৩৩। কুন্তির শিবপূজা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন মুনি আদিপর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারতের কথা শুনে জন্মেজয়॥

শেষ—

বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে।
এতদূরে পালা সায় কবিচন্দ্রে ভণে॥

ইতি শ্রীকুন্তির শিবপূজা সমাপ্ত। ইতি সন ১০৭৯ সাল, তাং ১৮ই ভাদ্র বেলা ১ প্রহরে সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীনিমাইচরণ দাস, সাং বনবিষ্ণুপুর—সম্প্রতি পাত্রসায়ের (শ্লোকসংখ্যা ১০০।)

৩৪। কৃষ্ণকর্ণামৃত। যদুনন্দন দাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যেত্যাদি।

* * *

বন্দ গুরু পাদপদ্ম নখাগ্র অঞ্চলে।
যাতে হইতে বিঘ্ননাশ সর্ব্বাভীষ্ট মিলে॥

* * *

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুর্রুর্মে,
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপুচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু,
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ।
এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা।
সারঙ্গরঙ্গদা নাম টীকা যে হইলা॥
তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু চৈতন্য গোসাঞি।
যার গুণে কলির জীব তরিল সভাই॥

শেষ—
কৈল আমি যে বন্ধনে সব প্রভুর শ্রীচরণে।
এ যদুনন্দন গেল ভুলে॥

*　　*　　*

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে সংস্কৃতবর্ণনে শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যানং প্রাকৃতভাষান্বিতং শ্রীযদুনন্দনদাসেন কৃতং অষ্টমপ্রকাশসম্পূর্ণং।

বাটী হইতে কার্য্য অন্তে দিনাজপুর গমন।
আমানি গঞ্জে করিলাম পাণিগ্রহণ॥
আমার শ্বশুর বন্ধ আছেন কোম্পানি ফাটকে।
তেকারণে স্থিতি মোর হৈল বার মাস।
তেহে আদেশ কৈলা পুস্তক লিখিতে আমাকে।
খালাস হইয়া তেহো গেলেন কলিকাতা।
এ সনে আমার গ্রন্থ লেখা হইল সমাপ্ত॥

স্বাক্ষরমিদং শ্রীশচীনন্দন মিত্র। সাকিম বর্দ্ধমানের কটাযোড়া। ইতি সন ১১৯০ তারিখ ১২ই ভাদ্র রোজ শনিবার দশ দণ্ড বেলা।

৩৫। কৃষ্ণমঙ্গল। দ্বিজ জীবন।

আরম্ভ—
শুন শুন শ্রোতাগণ হয়ে এক চিত।
শুকদেব কহে কথা শুনে পরীক্ষিৎ॥
দরিদ্র সুদামানাম এক দ্বিজবর।
অবন্তীনগরে মুনি বহুকাল ঘর॥

ভণিতা—
শুন বন্ধু ভবসিন্ধু যদি হবে পার।
রচিল শ্রীকৃষ্ণদাস কৃষ্ণকথা সার॥
দ্বিজ দামোদর বলে শুন চন্দ্রমুখী।
নয়ান বয়ান কেন মলিন দেখি॥
হয়পৃষ্ঠে আরোহণ হইল ব্রাহ্মণ।
রচিল জীবন দ্বিজ ভারত কীর্ত্তন॥

শেষ—
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত রচিল জীবন।
শ্রবণে কলুষ নাশ স্বরগে গমন॥
এইখানে রহিল ভাই কৃষ্ণকথা বাণী।
পূর্ণ বদনে ভাই কর হরিধ্বনি॥

(শ্লোকসংখ্যা ৩২০।)

৩৬। কৃষ্ণমঙ্গল। দ্বিজ মাধবদাস।

আরম্ভ—
পাঁচালিচ্ছন্দঃ সঙ্গীতং এতন্মাধবশর্ম্মণা।
আদৌ গণপতিং বন্দে বৈষ্ণবং বিঘ্ননাশনং।
লম্বোদরং কুঞ্জরাস্যং সুন্দরং গৌরীনন্দনং।
কুঞ্জর সুন্দর মুখ এতিন লোচন।
মদজলগণ্ডযুক্ত চলহ শমন॥

*　　*　　*

ভাগবত সংকেত না বুঝে সর্ব্বজন।
লোক ভাষারূপ কহি সেই পরায়ণ॥
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নাম মধুর সংগীত।
লাচাড়ি * * * প্রবন্দে হৈব বিদিত॥
বিশেষ পাইল আমি চৈতন্য আদেশ।
সেই ভরসায় যার না জানি বিশেষ॥

শেষ—১ হইতে ৩১৪ পাত পর্য্যন্ত আছে, তৎপরে খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা ৯০০০।

৩৭। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—প্রথম পাত নাই।
তার পর আল্যা তথা ব্রহ্মাদি দেবতা।
কৃষ্ণেরে কহয়ে ক্রমে সন্তহে শ্রবণ॥

শেষ—
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

লিখিতং শ্রীনিমাইদাস চন্দ্র। সাং পাত্রসায়ের

ইতি সন ১০৮৫ সাল তারিখ ১৮ই বৈশাখ তিথি শুক্লপক্ষ চতুর্দ্দশী। শ্লোকসংখ্যা প্রাপ্ত অংশের ১২৫।

৩৮। কৃষ্ণবিজয়। গুণরাজ খান।

আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ নাথ নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুহ্মি সে কারণ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দন সৃষ্টি কর তার।
গণপতি প্রণমহ আনন্দ অপার॥

শেষ—নাই।

পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ১৮০। তৎপরে খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা ৭০০০। মুদ্রিত কৃষ্ণবিজয় অপেক্ষা অনেক বড়।

৩৯। কোকিল-সংবাদ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—নারায়ণং নমস্কৃত্যাদি।

অথ কোকিল-সংবাদঃ লিখ্যতে।
নন্দের নন্দন নটরূপ বেশ ধরি।
নিভৃতকানন মাঝে প্রবেশিলা হরি॥
উদয় শারদ বিধু দেখিয়া নয়ানে।
রাধিকার বয়ান পড়িয়া গেল মনে॥

শেষ—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গান যে যার মিলন।
রাসকুঞ্জ পালা সায় যে যার মিলন॥

ইতি কোকিল-সংবাদ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবলাই চাঁদ পাল। পাঠক শ্রীবৃন্দাবন পাল ও কুঞ্জবিহারী পাল। ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ২২শে জ্যৈষ্ঠ। শনিবার চতুর্থী। (শ্লোকসংখ্যা ১৪৫।)

৪০। গঙ্গাবন্দনা। দ্বিজ নিধিরাম।

আরম্ভ—

বন্দমাতা সুরধুনি, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রবময়ী অভিধান,
সুরাসুর নরের জননী॥

ভণিতা—

ভণে দ্বিজ নিধিরাম পুরাহ আমার কাম
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যেন মরণ সময়ে আসি তোমার সলিলে বসি
শ্রীরাম বলিতে প্রাণ যায়॥*

শেষ—

গঙ্গার বন্দনা হইল॥৬॥
সবাই মিলে হরি হরি বল ভাই॥
গঙ্গাস্নানে যেবা যায় নরে।
সবাকার পাপতাপ সব যায় দূরে॥
এই গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য শুন ভাই।
ফিরে ফিরে সবাই হরি বল ভাই॥
লিখিতং শ্রীরাধামাধব মুখয্যা।

(শ্লোকসংখ্যা ১২০।)

৪১। গঙ্গার বন্দনা। কবিকঙ্কণ।

আরম্ভ—

বন্দ মাতা সুরধনী পুরাণে মহিমা শুনি
পতিতপাবনী পুরাতনী॥

শেষ—

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দঃ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত। পাটনাতে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষের জন্য লিখিলাম সন ১২৩৭ সাল। তারিখ ৩রা শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা ২৪।)

৪২। গীতগোবিন্দ। রসময় দাস।

আরম্ভ—

জয় জয় শচী সুত ব্রজেন্দ্র কুমার।
কৃপা করি দেহ নিজ সেবা অধিকার॥
* * * *
মেঘৈর্মেদুরমম্বরমিত্যাদি * *
এই শ্লোকে নিত্যলীলা প্রথম কহিলা।
বস্তু নির্দ্দেশ করি গ্রন্থ বিস্তারিলা॥
* * * *
মেঘ আচ্ছাদিলা সব গগনমণ্ডলে।
মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইয়াছে সেইকালে॥

বনভূমি তমালের বর্ণ সর্ব্বস্থানে।
শ্যাম হইয়াছে কেহো নাহি জানে॥
যদি বল মনুষ্যের গমনাগমনে।
যেমনে চলিবে তার শুন বিবরণে॥
অন্ধকার অভিসারের বেশভূষা করি।
চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি॥
আনন্দ নিদেশ পাইয়া চলে দুই জন।
প্রতিকুঞ্জে কুঞ্জলীলা করে দুই জন॥
অধ্বকুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করে।
চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহারে॥
প্রিয়া মিলনের ইচ্ছা জানি সেইকালে।
মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগনমণ্ডলে॥
মেঘাবৃত চন্দ্র পুন রহে সেইখানে।
টীকার এই মত অর্থ করএ ব্যাখ্যানে॥

শেষ—
অতি দীন অতি হীন রসময় দাস।
শ্রীগীতগোবিন্দ ভাব করিলা প্রকাশ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ৭ই আষাঢ়। লিখিতং শ্রীপার্ব্বতী দাসী।

৪৩। গীতগোবিন্দ। (পদ্যানুবাদ।)

আরম্ভ—সংসারার্ণবতারণৈকতরীং ইত্যাদি।

মেঘৈর্ম্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তংভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ।

দেখ মেঘ আচ্ছাদিল সকল আকাশ।
তাথে হৈতে সূর্য্যের না হয় পরকাশ॥
বৃক্ষ সব তমালে করিল অন্ধকার।
দেখিতে না পায় অন্য অন্যের আকার॥
অতএব মিলন করহ দুইজন।
কৃষ্ণের বিরহ তাপ করহ খণ্ডন॥
হেন আনন্দিত স্থান হইতে রসাবেশে।
অতি হরষিতে দোহে বন পরবেশে॥
কিবা সে বনের শোভা কহনে না যায়।
কুসুমিত বন সব ভ্রমে ভৃঙ্গ তায়॥
মন্দমন্দ সুগন্ধি শীতল বায়ু বহে।
অতি সুখী সুমুখীগণ কেহো কেহো কহে॥
অত্যন্ত নির্জন বন যমুনার কুলে।
জলচর বনচর ডাকে কুতুহলে॥
অতিপুলকিতচিত্ত হইয়া রাধা কানু।
পথে কুঞ্জ দ্রুম দেখি সভে হৃষ্টতনু॥
রহঃস্থলে কুতুহলে রাধিকার সনে।
নির্ভরে করে ক্রীড়া সেই কুঞ্জবনে॥
রাধিকা কৃষ্ণের শোভা না যায় বর্ণন।
জড়িতে জড়িত যেন নব ঘনে ঘন॥
রাধামাধবের রতিকেলি নানামত।
অতিশয় উৎকণ্ঠাতনু অবিরত॥

শেষ—শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামদেব্যাত্মজশ্রীজয়দেবস্য পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু।

হেন জয় দেব কাব্যরচনা সংস্কৃতে।
ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংকৃত প্রাকৃতে॥
এই দোষ ক্ষেমিবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা হেতু আমার রচন॥
সমাপ্ত করিল গজ ইষুরসসোমে। (১৬৫৮)
কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে॥
পটের তৃতীয়ে কর মধ্যেতে আকার।
সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বাধার॥
ইন্দ্রের বাহনপরে দময়ন্তীপতি।
বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি॥

৪৪। গুরুদক্ষিণা। স্বরূপরাম।

আরম্ভ—
শুন শুন কৃষ্ণ কথা ভাই দুই বন্ধুজনা।
আরাধনে শুন সভে গুরুর দক্ষিণা॥

শেষ—
কবি স্বরূপরামে বলে শুন ছাত্রগণ।
গুরুর চরণ সেবা কর সর্ব্বক্ষণ॥

ইতি গুরু দক্ষিণা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মা সাং কুণ্ডপুর সন ১২০২ তাং ২১ অগ্রহায়ণ। বেলা এক প্রহরে সমাপ্ত।

৪৫। গুরুশিষ্য সংবাদ—

আরম্ভ—বন্দেঽহং শ্রীগুরুমিত্যাদি। অজ্ঞানমিত্যাদি।

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সদারহে স্থিতি।
বৃন্দাবন পরিতেজ্য নাহিহ শকতি॥
শিষ্য বলে কেবা তবে মথুরাকে গেলা।
কুবজার মালাপরি কংসধ্বংস কৈলা॥

শেষ—

সেবা হাতে লও যবে সখি সঙ্গে যাবে।
নিত্যস্থানে রাধাকৃষ্ণ দরশন পাবে॥

ইতি গুরু শিষ্যের কথা সমাপ্ত। ইতি সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২৬ ভাদ্র রোজ লক্ষ্মীবার তিথি পঞ্চমী লিখিতং শ্রীপীতাম্বর দাস সাং পাত্রসায়ের। (শ্লোক-সংখ্যা ২৫৩২)। ইহার আর একখানি ১০৯০ সনের অতি জীর্ণ পুথি আছে।)

৪৬। গেড়ুচুরী। কবিচন্দ্র কৃত।

আরম্ভ—

রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্বকথন।
কহ কহ কৃষ্ণকথা করিব শ্রবণ॥
শুকদেব বচনে রাজা পরিক্ষীৎ বলে।
কি কর্ম্ম করিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥

শেষ—

যশোদা বিদায় জটিলার পাশে হৈল।
এমন কৃষ্ণের লীলা জটিলা ভুলিল॥
ভবিষ্য পুরাণ কথা কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

গেঁড়ুচুরী পুস্তক সমাপ্ত হৈল বেলা আন্দাজ এক প্রহর সময় সন ১২৮০ সাল ৪ ফাল্গুন পাঠনার্থে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কর সাং বীরসিংহা আকবাড়ী পীঁড়াতে রোজ সোমবার। (শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

৪৭। গোপীভক্তি রস বা কৃষ্ণলীলা। অচ্যুত দাস।

আরম্ভ—প্রথম তিনপাত নাই। তৎপর ৪র্থ পাত হইতে

* * *

———চক্ষুর গোচরে।
এখনে দেখিবি যদি আয় মোরপুরে॥
পশ্চাৎ কহিবি মোরে মিথ্যা কহিস তোরা।
দেখিঞা দমন কর শান্ত হউ মোরা॥

ভণিতা—

মজিয়া অচ্যুতদাস সেই রাঙ্গাপায়।
গোপীভক্তিরস-গীত আনন্দেতে গায়॥

শেষ—১৫২ পাতের পর খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা ২১০০। পুথির আকার দেখিলে প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

৪৮। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা। বাসুদেব ঘোষ প্রণীত।

আরম্ভ—

রাগ করুণাশ্রী।

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥

ভণিতা—

"বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।"
"বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুটি কর।"

ইত্যাদি।

মন্তব্য—পুঁথিখানির লেখা পরিষ্কার। কবিত্ব অতি সুন্দর। এই গ্রন্থে গৌরাঙ্গের বাল্যজীবনী পদাবলী আকারে লিখিত। প্রত্যেক কবিতা পদা-বলী-সুলভ রাগ-রাগিণী সংযুক্ত। যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৬৬টি পদ সম্পূর্ণ আছে।

৪৯। গোলক বস্তু বর্ণন। শ্রীগোপালভট্ট।

আরম্ভ—

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়তে শ্রুতিং।
যৎকৃপা তামহংবন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥
পঙ্গু গিরি লংঘে ইহ বড় কথানয়।
মূক শ্রুতি হয় নিত্যানন্দের কৃপায়॥

শেষ—

অতএব নীলাচল বসে গৌরহরি।
আস্বাদিল নিজবাঞ্ছা মনের মাধুরী॥

ইতি শ্রীগোপাল ভট্ট বিরচিতং শ্রীগোলোকবর্ণনং চৈতন্যনিত্যানন্দজাহ্নবীতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ। (শ্লোকসংখ্যা ১০০।)

৫০। গোবিন্দ রতিমঞ্জরী। ঘনশ্যাম দাস।

আরম্ভ—স শ্রেয়ানিহ দিব্য সগুণযুজামদ্বৈত নাম প্রভুঃ নিত্যানন্দরসপ্রবর্ষকঘনশ্যামান্তরুল্লাসকঃ।

* * *

কামোদরাগ।

কো কহু অপরূপ প্রেম সুধানিধি

কো কহত রস মেহ।

কোই কহত ইহ মোই কল্পতরু

মঝু মনে হোত সন্দেহ॥

শেষ—

হাম পুন কি করি কাহাঁ আছয়ে

অনুভবি ওর না পাই।

কহ ঘনশ্যাম দাস জগ মানুষ

মোহন মোহিনি রাই॥

গোবিন্দ শরণং।

গোবিন্দঃ শরণং মমাস্তু সুপদৈর্গোবিন্দমীড়ে মুদা

গোবিন্দেন বিধাস্যতে হিতমতস্তস্মৈ দদেঽহং মনঃ।

গোবিন্দাৎ পরমোনবন্ধুরভিতস্তস্যৈব হেতো রতী

গোবিন্দে২খিলকারকত্বমিতি চেৎ গোবিন্দকামংক্রিয়া॥

ইতি গোবিন্দরতিমঞ্জর্য্যাং শ্রীঘনশ্যামদাসকৃতে গোবিন্দরত্যাযোদনাম পঞ্চমঃ স্তবকঃ॥ সমাপ্তাচেয়ং গোবিন্দরতিমঞ্জরী॥

৫১। গোবিন্দলীলামৃত। যদুনন্দন দাস।

আরম্ভ—

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহানন্দমন্দিরম্।

বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনেন্দিতম্॥

* * *

এই সব শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপ করিয়া।

লেখিমাত্র আপনার মন বুঝাইয়া॥

* * *

না জানি শ্লোকার্থগণ, যৈছে তৈছে সংঘটন,

কবি গুরু বৈষ্ণব বন্দিয়া।

গোবিন্দ-লীলামৃতসার, ভক্তে বুঝে অর্থ তার,

না বুঝে পণ্ডিত হৈঞা॥

ভণিতা—

(১) গায় যদু নন্দন হরিষে॥

(২) নিজ দোষ নিবেদল যদুনাথ দাস॥

(৩) গোবিন্দ-চরিতামৃত যদুনন্দন দাসে॥

শেষ—

শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরে, হৈলা গ্রন্থ সুবিস্তারে,

গোবিন্দ লীলামৃত কাব্যসার।

ত্রয়োবিংশতিসর্গে, সম্পূর্ণ হইল পর্ব্বে,

বিস্তারিতে অনন্ত অপার॥

শ্রীচৈতন্যদাসের দাস, ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস,

আচার্য্য আনিল হৈম লতা।

তাঁর পাদপদ্মে আশ, এ যদুনন্দন দাস,

অষ্ট প্রাকৃতে কহে কথা॥

* * *

রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে।

এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ বিলাসে॥

শ্রীগোবিন্দার্পিতমস্তু চরিতামৃত।

মদীশ্বররূপেণ কৃষ্ণদাস কবিনৃপ-

ত্বমেব মম সংনাথ ত্বমেব মম সঙ্গতিং॥

হে কৃষ্ণ কবিরাজাখ্যরাধাকৃষ্ণনিরূপিণে

নিবেদয় দুঃখী জীবে লয়মামচরণান্তিকম্॥

ইতি ত্রয়োবিংশতিসর্গ গ্রন্থ সমাপ্ত। তাং পৌষে ২৩ সন ১০২২ সাল।

মন্তব্য—পুথি খানি খণ্ডিত, মধ্যে কয়েক পাত নাই। (শ্লোকসংখ্যা ৩৫০০।)

৫২। গোবিন্দ-বিজয়। অভিরাম দাস।

আরম্ভ—

প্রণমহ গণ রায় হরের নন্দন।

একদন্ত গজবক্ত্র মূষিক বাহন॥

* * *

বন্দিব গৌরাঙ্গ গুরু রূপে জিনি বিদ্যাধরী।

বিধুমুখি খঞ্জন নয়ানি।

ভণিতা—

গোবিন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ পানে।
অকিঞ্চিন অভিরাম পুরাণ বাখানে॥
শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ মকরন্দ পানে।
অবোধ ভ্রমর অভিরাম দাস গানে॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ গানে।
গোবিন্দ বিজয় অভিরাম দাস ভণে॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ অভিরাম গায়।
গোবিন্দ বিজয় গীত এতদূরে সায়॥

শকাব্দা ১৬৭৩। সন ১১৫৮ সাল। এই গ্রন্থের ২ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে।

৫৩। গৌরগণাখ্যান। দেবনাথ।

আরম্ভ—জয়তি জয়তি দেব শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি।

বন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় রসময় ধন্য,
সর্ব্বঅবতার শিরোমণি॥
দীন জনে কর দয়া ও পাদপদ্ম দিয়া
মোরে নেহ দাস করি কিনি॥

শেষ—

শ্রীমুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
ইহা সভার পাদপদ্ম মোর নিজধন॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম করি নিতি ধ্যান।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ গৌরগণাখ্যান॥
শ্রীনরহরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
দেবনাথ দাস কহে গৌরগণাখ্যান॥

ইতি শ্রীগৌরগণাখ্যানে সপ্তমোদ্দেশ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ। স্বাক্ষর শ্রীচৈতন্যচরিতাভিধেয়স্য পাত্রসায়ের। শ্লোকসংখ্যা ৩২৫।

৫৪। চাটু পুষ্পাঞ্জলি। রূপগোস্বামী।

আরম্ভ—

নবগোরোচনাগৌরীপ্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণিস্তবকবেদ্যোতি বেণীব্যালকুলাফণা॥

* * *

জিনি উপমার গণ তুলনা নাহিক সম
জিনি শোভা শ্রীমুখমণ্ডল

শেষ—যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ঐকান্তিকদৃঢ়ামতিঃ।
বৃষভানুসুতা তাসাং কৃপাং কুর্ব্বীত নিশ্চয়ং।

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিস্তোত্রং সম্পূর্ণং। ইতি।

৫৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

শুকদেবে তারপর মহারাজা কয়।
মোর মনে সন্দেহ হইল মহাশয়॥

ভণিতা—

(১) ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান॥
(২) অষ্টম স্কন্ধের কথা চৌদ্দ অধ্যায়।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

শেষ—

চিত্রকেতু উপাখ্যান কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

এই পুস্তক শ্রীনিমাঞিচন্দের। সাকিম পাত্রসায়ের। (শ্লোকসংখ্যা ২৫০।)

৫৬। চৈতন্যপ্রেম বিলাস। লোচনদাস।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই, ২য় পাত হইতে আছে)

চরণমাধুরী দুই অগ্রবন কহি।
যাহাতে গমন করে নেত্রপদ্ম দুই॥

শেষ—

নরহরি পাদপদ্ম হৃদে করি আশা।
জন্মেই ইহা বিনু নাহিক ভরসা॥
চৈতন্যপ্রেমবিবর্ত্তবিলাস এই হও।
ইহা বিনু অন্য কিছু মমে সব নও॥
শ্রীচৈতন্যপ্রেমবিলাস শুনে যেই জন।
অনায়াসে পাও সে চৈতন্য চরণ॥
ভক্তপাদপদ্ম হৃদয়ে করি আশ।
চৈতন্যপ্রেমবিলাস কহে এ লোচন দাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-প্রেমবিলাস সমাপ্ত। সন ১২১৯ সাল ৩রা ফাল্গুন। লিখিতং শ্রীমথুরদাস বৈরাগী। সাঃ মুণ্ড কাটা। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০।)

৫৭। চৈতন্যমঙ্গল। জয়ানন্দ।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই) ২য় পাত হইতে
গদাধর প্রাণনাথ॥

শ্রীপণ্ডিত গোসাঞি বন্দো বন্দ নিরন্তর।
যার প্রেমে পূর্ণ হৈল জঙ্গম স্থাবর॥

শেষ—

চিন্তিঞা চৈতন্ত গদাধরপদদ্বন্দ্ব।
আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ॥
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল নবখণ্ড সমাপ্ত।

যথাদৃষ্টমিত্যাদি। শ্রীধর্ম্মদাস আচার্য্যকস্য লিখনমিতি। শকাব্দা ১৬০১। মাহ চৈত্র বৃহস্পতিবারে কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠী দিবসে তৃতীয় প্রহরে শ্রীযাদবদাসের পুস্তক সাঙ্গ হৈল॥*॥ ইতি ২স৯ম তেরিখ ১৯ চৈত্র॥

(এই পুথিখানির বিবরণ পরিষৎপত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পর কবি জয়ানন্দের রচিত আরও কএকখানি প্রাচীন পুথি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দিতেছি):—

৫৮। চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশখণ্ড। জয়ানন্দ।

আরম্ভ—

আনন্দে প্রকাশখণ্ড শুন সাবধানে।
ক্ষেত্রের মাহিত্র গোসাঞি কহেন যথাক্রমে॥
একদিন নীলাচলে চৈতন্য গোসাঞি।
দেখিবারে গেলা তারে শীঘ্র কানাঞি॥

শেষ—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধরপদদ্বন্দ্ব।
আনন্দে প্রকাশখণ্ড গায় জয়ানন্দ॥
এই অবধি সে প্রকাশখণ্ড সাঙ্গ।
তীর্থযাত্রা করিলেন ঠাকুর গৌরাঙ্গ॥
ইতি প্রকাশখণ্ড সমাপ্ত।

লিখিতং শ্রীগৌরচরণ শর্ম্মা, সাং পাত্রসাএর। সন ১১০৯ সাল। ২৫ মাঘ। রোজ শনিবার।

৫৯। চৈতন্যমঙ্গল বৈরাগ্যখণ্ড। জয়ানন্দ।

আরম্ভ—

একদিন গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে নাচে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সভাকারে যাচে॥

শেষ—

আগম নিগম বেদ পুরাণের সার।
বৈরাগ্যখণ্ড শুনিলে জীবের নিস্তার॥
জয়ানন্দে আশীর্ব্বাদ করহ হরিষে।
চৈতন্যমঙ্গল যেন গায় দেশে দেশে॥
ইতি বৈরাগ্যখণ্ড সমাপ্ত॥

লিখিতং শ্রীরামচরণ কলু। সাং বীরসিংহা। সন ১১৬৫ সাল। ৩ অগ্রহায়ণ। বেলা তিনদণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল॥

(ইহার একখণ্ড কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে আছে।)

এ ছাড়া জয়ানন্দরচিত ধ্রুবচরিত্র ও প্রহ্লাদচরিত্রের পুথি পাওয়া গিয়াছে। (৮৫ ও ১০০ সংখ্যক পুথির বিবরণ দেখ।)

৬০। চৈতন্যমঙ্গল (মধ্যখণ্ড)। লোচনদাস।

আরম্ভ—

আর একদিনে সেই কেশব ভারতী।
আইলা সন্ন্যাসীবর অতি শুদ্ধ মতি॥

শেষ—

চৈতন্যচরিত্র কথা চৈতন্যপ্রকাশ।
মধ্যখণ্ড সার কহে এ লোচনদাস॥
ইতি শ্রীমধ্যখণ্ড সমাপ্ত।

বকলম শ্রীকাশিরাম শর্ম্মা পুস্তকমিদং শ্রীবৈকুণ্ঠরাম দেবশর্ম্মা সন ১০৪৭ সাল তারিখ ৪ বৈশাখ রোজ শনিবার॥

(আরও তিন সেট চৈতন্যমঙ্গলের পুথি আছে, কিন্তু সে কয়খানি অধিক প্রাচীন নহে। উক্ত পুথিখানি অতি প্রাচীন বলিয়াই উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছি। ১১০৬ সনের পুথির শেষে লোচনদাসের এইরূপ পরিচয় আছে—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামনিবাস॥
মাতা সতী সুরপতি অরুন্ধতী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥
কমলাকর দাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে গাই গোরা গুণগাথা॥

সংসারে জন্ম দিল এই মাতা পিতা।
মাতামহকুলের মোর শুন কিছু কথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥
মাতামহ হয় মোর পরমানন্দগুপ্ত।
নানা তীর্থপূত তিঁহো তপস্যাতে রত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক পুত্র।
সহোদর নাহি নাহি মাতামহের পুত্র॥
যথা যাই তথা যাই দুলালা করে মোরে।
দুলাল লাগিয়া কেহো পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তমগুপ্ত চরিত্র তাহার॥
তাহার চরণে মুই করো নমস্কার।
চৈতন্য-চরিত্র লেখা কৃপায় তাহার॥
বড় কৃপা করিলেন শুন তার কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
তাহার কৃপাতে যেবা করিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস॥

৬১। জগন্নাথমঙ্গল। দ্বিজ মুকুন্দ।

আরম্ভ—

নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে ইত্যাদি।
* * *
অতসীকুসুমনিন্দি শরীরের আভা।
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের শোভা॥

শেষ—

বৈষ্ণবের পদরেণু বন্দিয়া মাথায়।
জগন্নাথ-মঙ্গল মুকুন্দ দ্বিজ গায়॥

উৎকলখণ্ডে শ্রীপুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে শ্রীজগন্নাথ-লীলা সমাপ্ত। তারিখ ৬ ফাল্গুন রোজ বুধবার:শকাব্দা ১৭৩৫। শ্রীরামধনমিত্র বাবাজীউ। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০।)

৬২। জৈমিনি ভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব)
দ্বিজ অভিরাম।

আরম্ভ—

করপুটে বন্দ গুরুদেবের চরণ।
অজ্ঞান তিমিরান্ধে দিল জ্ঞানাঞ্জন॥
* * *
চৌদিকে বেড়িয়া ভক্ত করে হরিধ্বনি।
নাচে গোরাচান্দ অবতার-শিরোমণি॥
ক্ষণেক মুদিত আঁখি ক্ষণেক প্রকাশ।
ক্ষণেক রোদন ক্ষণে ক্ষণে মন্দ হাস॥
ভাবের আবেশ গোরা আপন না জানে।
অবনী পবিত্র কইল নিজ নাম গুণে॥
* * *
কুরুগণ নিধন করিয়া যদুরায়।
পঞ্চ পাণ্ডব সঙ্গে আসি হস্তিনায়॥
অভিষেক কৈল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরে।
* * *
সবিশেষ উপদেশ শুন মহাভাগ।
তুরিত হইয়া কর অশ্বমেধ যাগ॥

শেষ—

জৈমিনি-ভারত-পোথা পীযুষের সার।
কৃপাতে যে ফল সফি চিত্তে যে যাহার॥
সর্ব্বতীর্থ করি ভ্রমে অবনীমণ্ডল।
গোকাঞ্চন কোটি কন্যাদানে যেই ফল॥
ততোধিক ফল পায় শুনিলে এ কথা।
রোগ শোক দুখ তাপ হরয়ে সর্ব্বথা॥
যেবা গায় গাওয়ায় এই কৃষ্ণ রস।
পায় সে অচলা ভক্তি ধন ধর্ম্ম যশ॥
দ্বিজ অভিরাম কহে করি পরিহার।
এ ভব সংসারে পার কর এই বার॥
একান্তে চিন্তিয়া সভে কৃষ্ণের চরণ।
মুখ ভরি বল হরি যত বন্ধুজন॥

ইতি জৈমিনিভারত সংপূর্ণ। সন ১২৪৮ সাল তারিখ ১৭ ভাদ্র বুধবার॥ (শ্লোকসংখ্যা ৫০০০।)

৬৩। জৈমিনি-ভারত। মিশ্র অনন্ত।

আরম্ভ—

নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি * * *
প্রণমহ নারায়ণ চরণ-যুগল।
ত্রিজগত নাথ প্রভু সৃষ্টি অনুবল॥
* * *
পুণ্য শ্লোক উপাখ্যান ভক্তিভাবে মানি।
পুনর্জন্ম নহে যদি শুদ্ধ হেন জানী॥

আশ্চর্য্য শ্রবণসুখমোক্ষনিদান।
সর্ব্বলোক শুনে যেন পায় পরিত্রাণ ॥
তে কারণে শ্লোক অর্থ পাথার রচন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শুনিলে কথন ॥
বাপ কৃষ্ণানন্দ বসু * মাতা সংজ্ঞাজননী।
কৃষ্ণপরায়ণ চিত্তে রচিয়া বাখানি ॥
দুইলোক শুদ্ধ হয় শুনিলে কথন।
মিশ্র অনন্তে কহে কৃষ্ণের বচন ॥

শেষ—
দুই লোক শুদ্ধ হয় শুনিলে কথন।
মিশ্র অনন্ত কহে ভারত রচন ॥

ইতি জৈমিনিভারত পুস্তক সমাপ্ত। শকাব্দা ১৬২১। ২১ ভাদ্র বুধবার লিখিতং শ্রীরাঘবেন্দ্র দেব মোকাম বিষ্ণুপুরা পরগণে গঙ্গারামপুর। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৮০০)।

৬৪। তরণীবধ পালা। কৃত্তিবাস।

আরম্ভ—
রাম রাম প্রভু রাম কমল-নয়ন।
সীতার প্রাণনাথ রাম রাজীব-লোচন ॥

শেষ—
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস বচন।
যে জন প্রচার কৈল গীত রামায়ণ ॥

ইতি তরণীবধ পালা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণচরণ বিস্যা সাং ঘোড়নালকী। পঠনার্থ শ্রীমহাদেব চঙ্গ সাং চক রঘু। সন ১০৮৩ সাল। তাং ২৮ অগ্রহায়ণ রোজ শুক্রবার। (শ্লোক সংখ্যা ৭৫০।)

৬৫। তত্ত্বকথা। যদুনাথ দাস।

আরম্ভ—
কর জোড়ে বন্দো বৈষ্ণব চরণ।
শ্রীগুরুচরণ বন্দ এক করি মন ॥
শ্রীচৈতন্য বন্দ আনন্দিত মন।
যাহার প্রসাদে আপনে পাইল চেতন ॥
শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
আনন্দে ভজ হরি কৃষ্ণের চরণ ॥

ভণিতা—
যদুনাথ দাস কহে হরি বল মুখে।
তরিবে শমন-দায় বৈকুণ্ঠ যাবে সুখে ॥

শেষ—(৮ পাতের পর খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০৫।)

৬৬। তরণীবধ। দ্বিজ দয়ারাম।

আরম্ভ—
লঙ্কাপুরে রাজপাট বস্যাছে রাবণ।
বীরবাহুর মরণ শুনিল ততক্ষণ ॥

শেষ—
দ্বিজ দয়ারাম কন লোভে অতি পাপ।
পূর্ণপাপ হৈলে জীবের মনস্তাপ ॥
শ্রীদেবীচরণ বলে দ্বিজ পদে লিপ্ত।
তরণির বধপালা হৈল সমাপ্ত ॥

ইতি তরণীবধ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীমথুরামোহন হাজরা সাং গোপালপুর। সন ১২৪৬ সাল তারিখ ১৫ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার। (শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

৬৭। তুলসীচরিত্র। দ্বিজ ভগীরথ।

আরম্ভ—
প্রণমহ নারায়ণ অনাদ্য নিধন।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয় যাহার কারণ ॥

ভণিতা—
কংসারি পণ্ডিতের পুত্র দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে শুনিলেন তুলসীর মাহাত্ম্য ॥

শেষ—
তুলসীর মহিমা কত কে কহিতে জানে।
দ্বিজ ভগীরথে কহে কৃষ্ণের চরণে ॥

ইতি তুলসীর মাহাত্ম্য সমাপ্ত। সন ১২৫৩ সাল। ২৭ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোক সংখ্যা ১৮০।)

৬৮। ত্রিগুণাত্মিকা।

আরম্ভ—চর্ম্ম মাংস রেতঃ অস্থি মজ্জা মণি এই ছয় ধাউত। ইহার কোন ধাউতে কোন্ বস্তু হয়? চর্ম্ম মাংস রেতঃ এই তিন ধাউতে মাতার বস্তু হয়।

শেষ—আপনি সাধক সাধ্য সখী সাধন। সেব্য

* ১২৯ সংখ্যক নাম দেখ।

প্রবর্ত্ত দেহ ভজন দেহ প্রবর্ত্ত দেহ গুরুর আশ্রয় সেব্য সেবক সম্বন্ধ ভজ ব্রহ্ম সম্বন্ধ সখী সম্বন্ধ এই ত্রিগুণাত্মিকা সমাপ্ত। সন ১১১২।

৬৯। দণ্ডাত্মিকা। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—দণ্ডাত্মিকা লিখ্যতে ॥

প্রাতঃকালে উঠিয়া রাধা ঠাকুরাণী।
দন্তধাবনক্রিয়া সারিলা আপনি ॥
তবে রাই প্রাতঃস্নান কৈলা আচমন।
পুরি মিঠাই কিঞ্চিৎ করিলা ভক্ষণ ॥

শেষ—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৌষট্টি দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীমথুরাদাস বৈরাগী সাং মুড়াকাটা পাঠক শ্রীকেনারাম সেন সাং নিউগ্রাম।

৭০। দণ্ডীপর্ব্ব। কবি মহীন্দ্র।

আরম্ভ—

একাদশ স্কন্ধে পুরাণে শ্রীভাগবতে।
শুকদেব কহে শুনে রাজা পরীক্ষিতে ॥
দণ্ডী নৃপতির কথা সংক্ষেপে শুনিল।
বিস্তারিয়া কহ রণ কিরূপে হইল ॥

শেষ—

পরীক্ষিৎ শুনে কথা শুক মুনি বৈল।
দণ্ডীরাজার কথা এত দূরে সাঙ্গ হৈল ॥
একাদশ-স্কন্ধে শ্রীভাগবত-তত্ব।
শ্লোকপ্রবন্ধে করিল ব্যাসের কবিত্ব ॥
সেই শ্লোক এই রচিয়া পয়ার।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে লোক বুঝিবার ॥
ভাগবত-পুণ্য-কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুক মুনি কহে কথা পরীক্ষিৎ শুনে।
কহেন মহীন্দ্র কবি এই সমাধানে ॥

ইতি সন ১২৫৯ সাল তা ২৫ কার্ত্তিক। লিখিতং শ্রীনন্দপাল। (শ্লোক সংখ্যা ১৫০০।)

৭১। দর্পণচন্দ্রিকা। নরসিংহদাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

* * *

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শেষ—

শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সদা যার আশ।
দর্পণচন্দ্রিকা কহে নরসিংহ দাস ॥

ইতি শ্রীমদ্দর্পণচন্দ্রিকা সমাপ্ত। সন ১২৬৭ সাল তারিখ ১১ পৌষ বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৫০। এই গ্রন্থের আরও দুই খানি পুথি আছে।)

৭২। দশমপুরাণ। কবিচন্দ্র।

(প্রথম তিন পাতা নাই চতুর্থ পাত হইতে)

আরম্ভ—

বসুদেব দৈবকী করিব সম্প্রদানে ॥
ইহার কারণে মুর আসি আছি হেথা।
দাঁড়াইয়া কহ পুন আপনার কথা ॥

শেষ—

সর্ব্বলোক শুন সভে কর অবধান।
কৃষ্ণের রহস্য শুন দশম পুরাণ ॥

ইহার বাকী পুস্তক আছে। লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত। সাং পাত্রসাএর, পুস্তক শ্রীমোহনপোদ্দারের, সাং নিজ গ্রাম, সন ১২১৪, তারিখ ২৮ আশ্বিন, রোজ মঙ্গলবার মোকাম নাটমন্দির। (প্রাপ্তাংশের শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ৫৫০।)

৭৩। দাতাকর্ণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—অথ দাতাকর্ণের পালা লিখ্যতে ॥

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারত রাজা শুনে জন্মেজয় ॥
একদিন বাসুদেব ভাবিত অন্তরে।
কর্ণ সে কেমন দাতা বুঝিব তাহারে ॥

ভণিতা—

সেই মুণ্ড লয়ে পুনঃ রাজহ অম্বল।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দ-মঙ্গল ॥

শেষ—

কর্ণ পদ্মাবতী দোঁহে হইল বিদায়।

এতদূরে দাতাকর্ণের পালা হৈল সায়॥ * ॥

ইতি দাতাকর্ণের পালা সমাপ্ত। পুস্তকমিদং শ্রীপাঁচু হেঁস। সন ১০৭৪ সাল' বিতারিখ ৫ পৌষ রোজ শনিবার। লিখিতং শ্রীগোবিন্দ রাম সরকার সাং চাকদহ। (২০০ শ্লোক। ১০৬২ সনের লিখিত আর একখানি দাতাকর্ণ আছে।)

৭৪। দাসগোস্বামীর সূচক। রাধাবল্লভ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য আদি পদ,
মল প্রায় সকল তেজিল॥

শেষ—

সেই রঘুনাথ দাস, পূরাও মনের আশ,
সেই মোর আছে বড় সাধ।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস, মনে কৃষ্ণ অভিলাষ,
সভে মেলি করহ প্রসাদ॥

ইতি দাসগোস্বামীব সূচক সংপুর্ণ। তারিখ ১৬ ভাদ্র ১২৫৬ সাল। (শ্লোক ২০।)

৭৫। দিবারাশ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

এক দিন শ্রীঘরে নিশায় যদুপতি।
পালঙ্গে সুতিয়া কৃষ্ণ রুক্মিণী সংহতি॥
আবেশে অবস রস হৈল কলেবর।
করিলা রভসলীলা কৌতুক বিস্তর॥

শেষ—

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পুরাণে প্রকাশ।
এতদুরে সমাপ্ত হইল দিবারাশ॥

ইতি শ্রীশ্রীদিবারাস নামক গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবিপ্রপ্রসাদ রায় সাকিম ডোঙ্গালন পাঠক শ্রীনফর গয়াঞী সাং বীরসিংহ সন ১২৪৯ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৮০।)

৭৬। দীপকোজ্জ্বল। বংশীদাস।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই।)

ভণিতা—

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সদা যার আশ।
পঞ্চম অধ্যায় কথা কহে বংশীদাস॥

শেষ—(১৬ পাতের শেষে)

নরদেহ বিনু নহে রস আস্বাদন।
ঈশ্বর দেহেতে নহে রসের করণ॥ (খণ্ডিত)

৭৭। দুই দশার আখ্যান।

আরম্ভ—আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ

* * *

আদ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥

শেষ—

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে করিল দুই দশার আখ্যান॥

ইতি সন ১২৬৭ সাল পৌষ।

৭৮। দুর্ল্লভসার। লোচনদাস।

আরম্ভ—

এক নিবেদন করি শুন সর্ব্বজন।
বাচাল করয়ে গোরা শুনে মূর্খ জন॥
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উঠয়ে ভাই বলি না উঠয়ে ডর॥

শেষ—

আমার বচন তুমি করিহ বিশ্বাস।
আনন্দহৃদয় কহয় এ লোচনদাস॥

* * *

ইতি লোচনানন্দ বিরচিত শ্রীশ্রীদুর্ল্লভসারসংগ্রহং সম্পূর্ণং। ইতি সন ১০৮২ সাল তাং ২৩ ফাল্গুন। (শ্লোক সংখ্যা ৯৫০। এই গ্রন্থের আরও তিনখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।)

৭৯। দেহভেদতত্ত্ব নিরূপণ।

আরম্ভ—

পঁচিশ প্রকৃতি ২৫ পঞ্চ আত্মা ৫ ভার বিবরণ। এই পাঁচ পাঁচে পঁচিশ প্রকৃতি। পঞ্চ মন ছয় রিপু দশ ইন্দ্রিয় ১০।

পাঁচ মনের নিরূপণ কহি বিবরিয়া।
পাঁচ পাঁচে পঁচিশ সভার শুন মন দিয়া॥

শেষ—

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই নেত্র হয়।
সজল নয়ান যারে ভাবে প্রেমে আস্বাদয়॥

ইতি দেহভেদতত্ত্বনিরূপণং সম্পূর্ণং।

৮০। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কয়।
শ্রীমহাভারত শুনে রাজা জন্মেজয়॥
রাজসূয়যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়।
মহারাজা যুধিষ্ঠির বসিলা সভায়॥

শেষ—

পরক্ষতি পরনিন্দা করে যেই জন।
মরিলে না মুক্ত হয় নরকে গমন॥
এত শুন্যা জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ-মঙ্গল॥

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত সাং পাত্রসায়ের রঘুনাথপুর। পুস্তক শ্রীবংশীবদন দত্ত সাং নিজগ্রাম সন ১১০৯ সাল তাঃ ১৫ আশ্বিন রোজ শুক্রবার বেলা ৬ দণ্ডের সময় সমাপ্ত করিলাম। মো নাটমন্দির।

৮১। দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বৈশম্পায়ন বলে শুনে জন্মেজয়।
তবে কতকদিন বই ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়॥

ভণিতা—

আদি পর্ব্বে ভারত কথা, ব্যাসের বর্ণনা গাথা,
কবিচন্দ্র করিল প্রকাশ॥

শেষ—

বিপ্র যত অর্জ্জুনেরে বেড়্যা লয়্যা যায়।
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর এতদূরে সায়॥
(শ্লোক সংখ্যা ১৬০।)

৮২। দ্বাদশপাট-নির্ণয়। নীলাচলদাস।

আরম্ভ—

দয়ালুঃ শ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বদীনবন্ধু নঃ...।
ত্রাহি মাং করুণাদৃষ্টঃ অতিদীন দয়ানিধেঃ॥
খানাকুল কৃষ্ণনগর ঠাকুর অভিরামের পাট।
এমন পাট কোথাও নাই জগতে বিখ্যাত॥

শেষ—

শ্রীরূপসনাতন পাদপদ্ম করি আশ।
কিছু না জানি বর্ণন করে নীলাচলদাস॥

॥॥* দ্বাদশপাটের নির্ণয়॥ আদৌ ঠাকুর অভিরামের পাট খানাকুল কৃষ্ণনগর।১। অম্বিকা গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।২। আকনা মাহেশ পণ্ডিত ঠাকুর।৩। ঠাকুর সুন্দরানন্দ হলদা মহেশপুর।৪। উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রাম।৫। কাল্যা কৃষ্ণদাস আকাই হাটের।৬। এই ছয় পাট॥ নবদ্বীপ পুরুষোত্তম পণ্ডিত ঠাকুর।১। কমলাকর পিপ্‌লাই।২। ধনঞ্জয় পণ্ডিত।৩। পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর।৪। মুকুন্দদাস ঠাকুর।৫। কাশীশ্বরদাস ঠাকুর।৬। জোজানে মালীদাস ঠাকুর।৬। নবদ্বীপে ছয় পাট॥৬॥ উপমহান্ত গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পাট অগ্রদ্বীপ॥১॥ তমলুকে বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর।২॥ মাধবঘোষ ঠাকুর গৌরাঙ্গপুর।৩॥
(শ্লোক সংখ্যা ১১০।)

৮৩। দ্বারকা-বিলাস। দ্বিজ জয়নারায়ণ।

আরম্ভ—অথ দ্বারকাবিলাস লিখ্যতে॥ শ্রীশ্রীগণেশায়।

শম্ভুসুত লম্বোদর গজেন্দ্রবদন।
ত্বংহি পূর্ণব্রহ্ম কর বিঘ্ন বিনাশন॥
* * *
বৈশম্পায়ন প্রতি বলে জন্মেজয়।
শুনাঞে ভারতামৃত জুড়াকে হৃদয়॥

ভণিতা—

(১) পয়ার প্রবন্ধে জয়নারায়ণে কয়॥
(২) দ্বিজবর প্রকাশিলা দ্বারকাবিলাস॥
(৩) রাধাকৃষ্ণদাস ভাসে দ্বারকাবিলাস॥
(৪) দ্বারকাবিলাস রচে জয়নারায়ণ॥

শেষ—

শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গযাত্রা করিয়া শ্রবণ।
স্বর্গ যান যুধিষ্ঠির তেজি সিংহাসন॥
(খণ্ডিত) * * *
হরি হরি বল সভে পালা হল সায়॥

ইতি লিখিতং শ্রীরাজীবলোচন গো * * * সাকীম নবজীবনপুর সন ১২৫২ সাল তারিখ ২৩ বৈশাখ। (শ্লোক সংখ্যা ২০০০।)

৮৪। ধর্ম্ম-মঙ্গল। দ্বিজ রূপরাম।

(বাঘ জন্ম ও আখড়ার পালা।)

বাঘবধ পালার আরম্ভ—নাই। (খণ্ডিত কেবল ৪ পাত পাওয়া গিয়াছে।

মধ্য—

কায়স্থ সজ্জন ধীর মহাজন আর।
অকালে ভাঙ্গিল গোরাচাঁদের বাজার॥
* * *
কুসমেট্যা তেঁতুল্যা বাগদী মাজি ছুল্যা।
সভারে খাইল বাঘ চাঁপাকলা বল্যা॥

ভণিতা—

(২) অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়॥
(২) ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়॥

শেষ—

ফুরাল বাঘের কথা বলিল কর্পূর।
বলিতে লাগিল কিছু ময়নায় ঠাকুর॥
এখানে রহিল গীত সভে বল হরি।
রথ ভরে ধর্ম্মঠাকুর গেল স্বর্গপুরি॥
দ্বিজ রূপরাম গান অনাদ্যের পায়।
আসর সহিত ধর্ম্ম হবে বরদায়॥

ইতি বাঘ জন্ম সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীকালীচরণ শর্ম্মা সাং বোঙক্রি॥

আখড়ার পালার আরম্ভ—

আখড়ায় পালা লিখ্যতে।
লাউসেন কর্পূর হইল এগার বৎসর।
গুরুর মন্দিরে পাঠ পড়ে নিরন্তর॥

শেষ—

হরগৌরী দুজনে বসিলা একাসনে।
ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম ভণে॥

ইতি পালা সমাপ্ত।

মন্তব্য—কেবল এই পালাটীর শ্লোকসংখ্যা ২০০।

৮৫। ধ্রুবচরিত্র। জয়ানন্দ।

আরম্ভ—(প্রথম পাত নাই।)

শেষ—

সকল কামনা ধ্রুব ভক্তি স্রোতে ভাসে।
জয়ানন্দ বলে ধ্রুব পরমানন্দে ভাসে॥
গৌরাঙ্গ মোর আরে প্রাণরে॥

ইতি ধ্রুবচরিত্র সম্পূর্ণ। সন ১২০৩ সাল তাং ১২ পৌষ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫১১।)

৮৬। ধ্রুবচরিত্র। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—ধ্রুবচরিত্র লিখ্যতে॥

শুক কহে পরীক্ষিৎ কহি তোরে পুন।
স্বয়ম্ভু মনুর বংশ মন দিয়া শুন॥

শেষ—

ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এত দূরে ধ্রুবের চরিত্র হইল সায়॥

ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ২৫ আশ্বিন। লেখক শ্রীধনঞ্জয় চৌধুরী॥ (শ্লোকসংখ্যা ২১১।)

৮৭। নন্দবিদায়। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—নন্দবিদায়ের পালা লিখ্যতে॥

চিকণকালা চিকণকালা।
কালার গলে দুলিছে বনমালা॥
কৃষ্ণ কংসাসুরের করিল সৎকার।
কুলোচিত কার্য্য ক্রিয়া করাইল সভার॥

শেষ—

দশমস্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে নন্দের বিদায় হইল সায়॥

স্বাক্ষর শ্রীজন্মেজয় দাস আইচ সাং রামচন্দ্রপুর পরগণে সমরসাহী চাকলে বর্দ্ধমান সন ১২১৬ সাল তারিখ ২৬শে মাঘ রোজ মঙ্গলবার॥ এই পুস্তক

আদর্শ শ্রীযুক্ত মুক্তারাম সরকার সাং কেশবপুর। (শ্লোকসংখ্যা ১৪১) আর একখানি প্রাচীন পুথির শেষে—

এই মত সকলে রহিল ব্রজপুরে।
বসুদেব নানা কাব্য নানা রস করে॥
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

সন ১১৬৫ সাল। পাঠার্থে শ্রীবৃন্দাবন হৈস সাং বীরসিংহপুর। তারিখ ১৯ জ্যৈষ্ঠ।

৮৮। নবদ্বীপপরিক্রমা।

আরম্ভ—

শ্রীগৌরগোবিন্দদেববিলাসস্থলমুত্তমং।
নবদ্বীপব্রজং নিত্যং বন্দে তন্ত্রমণাদিকং॥
জয় জয় গৌরগোবিন্দ।
ব্রহ্মাদি আরাধে তুয়া চরণারবিন্দ॥

শেষ—(৮ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত। ৮ পাতের শেষ)

করুণা করহ গৌর হরি।
অতি দীন হৈয়া যেন পরিক্রমা করি॥

(পুথির আকার দৃষ্টে দেড়শত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।)

৮৯। নামামৃতসমুদ্র। নরহরিদাস।

আরম্ভ—

সংসারাসারবোধপ্রদমুদসদনশ্রী গুরোঃপ্রেমকন্দ-
শ্রীরাধানাথকৃষ্ণপ্রবরসময়শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রঃ।
* * *
শ্রীগুরুশ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্য নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈত গোসাঞি॥

শেষ—

আর কি বলিব গৌরপ্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর॥

ইতি শ্রীনামামৃতসমুদ্র গ্রন্থ সংপূর্ণ। (প্রার্থনাঙ্ক ২৯০।)

৯০। নারদপুরাণ। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

নমঃ নমঃ প্রভু নমঃ আদি সনাতন।
ক্ষীরোদ সায়রে বটপত্রেতে শয়ন॥
নমঃ নমঃ সত্যযুগে মৎস্য অবতার।
যেরূপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার॥

শেষ—

দোষাদোষ মোর না লইবে কৃপা করি।
রচিলাম যেমন ঘটে বুদ্ধি দিলা হরি॥
রচিলাম শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায়।
নারদপুরাণ হইল এত দূরে সায়॥
শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥ * * ॥
অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার।
সুবর্ণবণিক কুলে উৎপত্তি আমার॥
পৈত্রিক বসত পূর্ব্বে অম্বিকানগর।
হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর॥
পিতামহ নাম ছিল মদনমোহন।
পিতা তারাচান্দ নাম ধর্ম্মপরায়ণ॥
এ সকল পুণ্যবান আছে পূর্ব্ব কীর্ত্তি।
এ অধমের সংসারে রহিল অপকীর্ত্তি॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নাম ছিল নাম নারায়ণ।
ভেক আশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥
রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান্।
স্বর্গবাসে গেলা তিঁহ চাপিয়া বিমান॥
আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম।
সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥
সন দশ শও নিরেনব্বুই সালে।
মাহ জ্যৈষ্ঠ মধ্যে এই পুস্তক রচিলে॥

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগুরুচরণ দত্ত। সাং পাত্রসায়ের মৌজে রঘুনাথপুর সন ১১০৮ সাল। তাং ৯ কার্ত্তিক রোজ রবিবার।

৯১। নারদসংবাদ। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—অথ নারদ সংবাদ লিখ্যতে॥ * ॥

নমহ নমহ প্রভু আদি সনাতন।
ক্ষীরোদসাগরে বটপত্রেতে শয়ন॥
নমোনমঃ সত্যযুগে মৎস্য অবতার।
যেরূপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার॥

ভণিতা—

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

শেষ—ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত॥ সন ১২৩৮ সাল ১৭ ফাল্গুন (অস্পষ্ট)। (প্রায় ৩০০০ শ্লোক॥)

মন্তব্য—পাঠান্তর স্বীকার করিলে কৃষ্ণদাসের নারদপুরাণ ও নারদসংবাদ একই পুস্তক বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থের চারিখানি পুথি আছে।

৯২। নিগম গ্রন্থ। গোবিন্দদাস।

আরম্ভ—

শিক্ষাগুরুকে না ভজিয়ে অন্যজনে ভজে।
সে জন পশুর প্রায় রোরবেতে মজে॥
প্রভুর পুলক পূর্ণ। প্রেম লীলা অবতীর্ণ॥
প্রকটিত নিজ নাম। সব লীলা অভিরাম॥
সঘনে কীর্ত্তন রঙ্গে। কীর্ত্তন আনন্দ রঙ্গে॥

শেষ—

কহয়ে গোবিন্দদাস ভক্ত আর নাঞি।
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাঞি॥

কেবল নিগম গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২রা ফাল্গুন। লেখক শ্রীগোপীনাথ দাস। পাঠক শ্রীবলরাম ফলু। (শ্লোকসংখ্যা ১৪০।)

মন্তব্য—ইহার আর একখানি পুঁথি আছে, সেখানিও ১২৫৫ সালে ২৩ ফাল্গুনে লিখিত। সেখানির লেখক "শ্রীগোপাল গরাই।"

৯৩। নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীজীবগোস্বামী।

আরম্ভ—

জিহ্বার হইতে আসক সহিতে
পুর্ব্বখ্যাতি রস তায়।
শ্রীজীব যাহায় জিহ্বা স্থিতিময়
অধরে অধর চায়॥

শেষ—

শ্রীজীবগোস্বামী একান্ত ভাবেন
রাই অঙ্গে সব থুল।
শ্রীমতী দেহেতে প্রাপ্তি অভিলাষে
শ্রীমতী জিহ্বাতে রইল॥

ইতি শ্রীনিত্যবর্ত্তমান সম্পূর্ণ।

৯৪। নৌকাখণ্ড। জীবন চক্রবর্ত্তী।

আরম্ভ—অথ নৌকাখণ্ডলিখ্যতে॥

গোপীরে করিতে পার, চলে কৃষ্ণ কর্ণধার,
তরি লয়া চলিল আপনি।
জানিলা প্রভুর ছল, যমুনা অগাধ জল,
অতি বেগে বহে তরঙ্গিণী॥

ভণিতা—

চক্রবর্ত্তী নারায়ণ তস্য পুত্র জীবন
বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

শেষ—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচিল জীবন।
শ্রবণে কলুষনাশ পাপবিমোচন॥

পাঠক শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী সাং মাজুকুরি লিখিতং শ্রীক্ষেত্রনাথ ঘোষাল সাং জাতকুরে রাজপটী গব্বি-পুষ্করণী। তিথি তৃতীয়া বার বুধবার শুক্রপক্ষ। (শ্লোকসংখ্যা ১৭৫।) ইহার আরও ২ খানি পুথি আছে, তন্মধ্যে একখানির লিখন-কাল সন ১১০৩ সাল ৭ আশ্বিন বুধবার।

৯৫। নৌকাখণ্ড। হরিবোলদাস।

আরম্ভ—

উদ্ধব বলে শুন নারদ তপোধন।
তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন॥

শেষ—

আলিঙ্গন কৈল কৃষ্ণ গোপিকার সঙ্গে।
হরিবোল দাসে কহে নৌকাখণ্ড রঙ্গে॥

ইতি সন ১২৬৩ সাল তারিখ ৯ শ্রাবণ। (শ্লোক-সংখ্যা ১২০০।)

৯৬। পদ্মপুরাণ। ষষ্ঠীবরদাস।

আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহার কারণ॥

হেন প্রভু নারায়ণ বন্দিয়া সানন্দে।
পদ্মপুরাণ ছায়া রচি রামানন্দে॥

ভণিতা—

কহে কবি ষষ্ঠীবর সরস পয়ার।
* * * * নাচাড়ি চরণে মনসার॥
(১২ পাত পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।)

৯৭। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—ব্রহ্মশাপ লিখ্যতে।

সূত কহে শৌনকাদি শুন সবিশেষে।
জপ যজ্ঞ তোমরা কহ সার দেশে॥

শেষ—

এক নামের মহিমা কহনে না যায়।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় পালা হৈল সায়॥

এই পুস্তক শ্রীনিমাঞি চন্দের সাকিম পাত্রসাএর।
(শ্লোকসংখ্যা ১২৫।)

৯৮। পারিজাতহরণ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

মন দিয়া শুন সভে ভারত-কথন।
এক মনে শুন সবে পারিজাতহরণ॥
একদিন নারায়ণ মৈনাকপর্ব্বতে।
বেহার করেন কৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিতে॥

শেষ—

শুনরে ভকতগণ হইয়া এক মন।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় পারিজাতহরণ॥

ইতি পারিজাতহরণ সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ১২ ভাদ্র রোজ রবিবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৩২)

৯৯। প্রকাশ্যনির্ণয়।

আরম্ভ—১ম পাত নাই।

শেষ—

বৃন্দাবনে কর্ত্তা হইলে অনঙ্গমুঞ্জরী।
কুঞ্জপদনিভিত শ্রীনিধুবন পুরী॥
বৃন্দাবনের প্রকাশ্য গেলেন নবদ্বীপে।
আনন্দ চিন্ময় রস ভজে সর্ব্বলোকে॥
ব্রজপুরে প্রকাশ করিলা সনাতন।
যত্ন করি লৈল তাহা দাস বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন দাস হইতে শ্রীরূপ পাইল।
রঘুনাথ দাস প্রতি রূপ গোসাঞি দিল॥
পাইল গোপালভট্ট রঘুনাথ স্থানে।
রাধাকুণ্ডে বাস করি রহিলা নির্জ্জনে॥

ইতি প্রকাশ্যনির্ণয়ঃ সর্ব্বতত্ত্বসম্মিলিতঃ সিদ্ধি-পটলং সম্পূর্ণং।

ইতি শ্রীসনাতন গোস্বামী * * * স্বাক্ষর মিদং শ্রীবৃন্দাবন দাস ইতি সন ১০৮২ সাল তাং ২২ ফাল্গুন।
(গদ্য ও পদ্যে লিখিত।)

১০০। প্রহ্লাদচরিত্র। জয়ানন্দ।

(কেবল দুই পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে, আদ্যন্ত নাই। পুথির আকার দৃষ্টে শতাধিক বর্ষের পুরাতন বলিয়া বোধ হয়।)

১০১। প্রহ্লাদচরিত্র। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

প্রহ্লাদচরিত্র শুন শুন সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে গন্ধর্ব্ব জিনিল পূর্ব্বে॥

শেষ—

কবিচন্দ্র দ্বিজ ভনে ভাবি রমাপতি।
মেজ্যর দক্ষিণে ঘর পাণ্ড্যায় বসতি॥

ইতি প্রহ্লাদচরিত্র সায় হইল। লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪০০।) আরও চারিখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি পুথির শেষে—

প্রহ্লাদচরিত্র যেবা একচিত্তে শুনে।
কৃষ্ণভক্তি সর্ব্ব সিদ্ধ হয় দিনে দিনে॥
সপ্তম স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে প্রসাদ চরিত্র হইল সায়॥

ইতি সন ১০৭১ সাল তারিখ ৩ চৈত্র শুক্রবার।

১০২। প্রহ্লাদচরিত্র। ভরতপণ্ডিত।

আরম্ভ—(প্রথম ৬২ পাতা নাই। তৎপরে)

নারায়ণ দেহ হৈল সেই দ্বিজবর।
পীতবাসঃ চতুর্ভুজ শ্যামল সুন্দর॥

ভণিতা—

ভরত পণ্ডিত বলে শুন সর্ব্বজন।
যে মতে জিয়াইল শিষ্য মৃতক ব্রাহ্মণ॥

শেষ—

প্রহ্লাদে ঠাকুরে হইল কথোপকথন।
ত্যজিল নৃসিংহরূপ দেব নারায়ণ॥
সাম্য হইয়া প্রভু আছেন যেই স্থানে।

৭৯ পাতের পর খণ্ডিত। পুথির আকার দেখিলে ২০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

১০৩। প্রেমতরঙ্গিণী। ভাগবতাচার্য্য।

(শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ।)

আরম্ভ—

তং বেদ শাস্ত্র পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রং
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গজটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাং॥
গান্ধাররাগ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ গোকুল বন্দন।
বৃন্দাবন চন্দ্র ব্রজরমণীজীবন॥

ভণিতা—

ভাগবতাচার্য্যের মধুরসবাণী।
পরীক্ষিত দেহত্যাগ প্রেমতরঙ্গিণী॥

শেষ—দ্বাদশ স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত। ৩৮৭ পাতের পর খণ্ডিত। (প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৭০০০।)

১০৪। মনসামঙ্গল ক্ষেমানন্দ ও কেতকদাস।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই)

ভণিতা -

নগরী নিকট আইলা ঘাটজ পাতলা।
রচিল কেতকাদাস সেবিয়া কমলা॥

শেষ—

চম্পানগর মাঝে, বিশাল বাজনা বাজে,
চাঁদবেণ্যা পূজে বিষহরি॥
অষ্টমঙ্গলা কৈয়া, বেহুলা লখাই লইয়া,
মনসা চলিলা স্বর্গ পুরী॥
ক্ষেমানন্দ রস গাএ, অষ্টমঙ্গলাসাএ,
সাঙ্গ হৈল দেবীর মঙ্গল।
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০০।)

১০৫। প্রেমদাবানল। নরসিংহদাস।

আরম্ভ—

প্রথমে বন্দিব মুই দেব নারায়ণ।
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ যত দেবগণ॥

শেষ—

রাধা কহে হংস শুন বিরহ সকল।
দাস নরসিংহ কহে প্রেমদাবানল॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০।)

১০৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা। নরোত্তমদাস।

আরম্ভ -

শ্রীচৈতন্যপদদ্বন্দ্বব্রহ্মশঙ্করসেবিতম্॥
জয়তি সাধবঃ সর্ব্বে ন ভজন্তি দুরাশয়াঃ॥
শ্রীচৈতন্যে মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স পদান্তিকম্॥
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দ মুঞি সাবধান মনে।
যাহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিআ যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে॥

শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে যে বোলান বাণী।
কি বলিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে শ্রীনরোত্তমদাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত। তাঃ ২৩ আশ্বিন সন ১১৬৫ সাল।

১০৭। প্রেমবিলাস। নিত্যানন্দদাস।

আরম্ভ—নারাধিতং কলিযুগে ইত্যাদি।

* * *

জয় জয় শ্রোতাগণ কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণলীলা যার হইবেক প্রাণ॥

আচার্য্য ঠাকুরের জন্ম হইল যেমতে।
ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিতে॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে দিলা পাঠাইয়া।
তেঁহ গৌড় ভাসাইলা প্রেমভক্তি দিয়া॥
গৌড়দেশ হইতে যেই বৈষ্ণব আইসে।
জিজ্ঞাসেন মহাপ্রভু অশেষ বিশেষে॥

শেষ—(১০১ পাতার পর আর পাতা নাই ১০১ পাতের শেষ এই—

কৃপাকরি কহে শুন নিত্যানন্দ দাস।
এই এই স্থানে কৃষ্ণের সদাই বিলাস॥
পঙ্কজের প্রায় বৃন্দাবনের ঘটন।
মাত্র বাক্য আছে মহাপ্রভুর স্থাপন॥
মুদ্রিত প্রকাশ হয় দুইত প্রকার।
নিবাসে মুদ্রিত হয় লীলায় বিস্তার॥

এইরূপ হন সব গমনাগমন। (প্রাপ্তাংশের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৩০০০।)

১০৮। ভক্তিচিন্তামণি। বৃন্দাবনদাস।

আরম্ভ—আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতা ইত্যাদি।

শুন শুন আরে লোক শুন সাবধানে।
গৌরচন্দ্র অবতার অপূর্ব্ব শুবনে॥

শেষ—

দেখিঞা শুনিঞা যার মনে নাহি ধরে।
সে জন তরিতে কিছু নাহি পর কারে॥

পঞ্চদশাধ্যায়। ইতি শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিত ভক্তি-চিন্তামণি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীগোপীমোহন দাস সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২১ পৌষ রোজ বুধবার। (শ্লোকসংখ্যা ৯০০।)

১০৯। ভক্তিরসাত্মিকা। দীনকৃষ্ণ দাস।

আরম্ভ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

* * *

নিত্যানন্দ বলে প্রভু করি নিবেদন।
জীবের নিস্তার প্রভু কেমন সন্ধান॥

শেষ—

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসাত্মিকা কহে দীনকৃষ্ণ দাস॥
ইতি ভক্তি রসাত্মিকা সম্পূর্ণ।
যতনে রাখিব যেন না হয় প্রচুর্ণ॥

ইতি ১০৮৮ সাল। (শ্লোকসংখ্যা ১০৮। ১০৮৩ সনের আর একখানি পুঁথি আছে।)

১১০। ভক্তিলতিকা। নরোত্তমদাস।

আরম্ভ—আজানুলম্বিতভুজৌ (ইত্যাদি)।

* * *

প্রণমহুঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
প্রণমহুঁ নিত্যানন্দ ভক্তি কৃপালয়॥

শেষ—

এই ভক্তিলতিকা গ্রন্থের রহিল নাম।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ করিঞা স্মরণ॥
বর্ণন করিল মনে করি অভিলাষ।
ভক্তিলতিকা কহে নরোত্তমদাস॥

ইতি ভক্তিলতিকা গ্রন্থ সংপুর্ণ॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৮০।)

১১১। ভগবত্তত্ত্বলীলা (আগম)। যুগলদাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরিত্যাদি॥

জয় জয় শ্রীগুরু পতিতের বন্ধু।
জয় জয় চৈতন্যচন্দ্র প্রেমের সিন্ধু॥

* * *

শিবরহস্যাগমে একে যে কথা শুনিল।
পার্ব্বতীরে সদাশিব সে কথা কহিল॥

* * *

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আদি কহিবে আমারে।
যদি দাসী হেন কৃপা থাকে মোর তরে॥

শেষ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ হৃদে করি আশ।
এই তত্ত্ব বিরচিল যুগলের দাস॥

ইতি শ্রীহরপার্ব্বতী সম্বাদ পয়ার প্রবন্ধে ভগবত্তত্ত্ব-লীলা সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ২৫০। ইহার আরও

তিনখানি পুথি আছে। তন্মধ্যে ১০৮৩ সনে লিখিত একখানি।)

১১২। ভরত উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ভাগবতামৃত।
পঞ্চম স্কন্ধের কথা শুনিতে অমৃত॥
দিনে দিনে মৃগ শিশু হয় বলবান্।

শেষ—

এতদূরে ভরতের উপাখ্যান সায়।
পঞ্চম ব্যাসের উক্তি কবিচন্দ্রে গায়॥

লিখিতং শ্রীনিমাঞিচন্দ। (শ্লোকসংখ্যা ৩০০।)

১১৩। ভাগবতামৃত। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

একদিন নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি।
তপ জপ সাঙ্গ করি সবে আছে বসি॥

ভণিতা—

(১) দেবাসুরে কলহ হইল তার পর।
কবিচন্দ্রের কথা গাইল শঙ্কর॥

(২) চক্রবর্ত্তী মুনিরাম, অশেষ গুণের ধাম,
তস্য সুত কবিচন্দ্রে গায়॥

শেষ—

এত বলি দেব ঋষি হল্যা অন্তর্ধান।
এতদূরে পালা সাঙ্গ কবিচন্দ্র গান॥

সন ১০৮০ সাল তারিখ ১৯ ভাদ্র হল সায়। লিখিতং শ্রীনিমাইদাস চন্দ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০)

১১৪। ভাগবতের অর্থবিসম্বাদ।

আরম্ভ—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
বাদ কৈল অম্বরীষ একোন উচিত।
যার ভয় ত্রিভুবন হয় কম্পান্বিত॥

শেষ—

ভজ ভজ আরে ভাই বৈষ্ণব গোসাই।
এ ভব সংসারে যেন সুখে তুরি যাই॥
শ্রীভাগবতে অম্বরীষ সম্বাদ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

১১৫। ভাষাপরিচ্ছেদ। (সংস্কৃত ভাষা-পরিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া রচিত।)

আরম্ভ—গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমারদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়? তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্তপ্রকার। দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।

মধ্যে—মীমাংসা মতে কর্ত্তাত্মক শব্দ নিজে ধ্বন্যাত্মক শব্দ জন্য বর্ণাত্মক শব্দকে ঈশ্বর কহেন মীমাংসকেরা পরমাত্মা মানেন না। অতঃপর কর্ম্মের পরিচয় কহিতেছি। * * * ব্যাপারবৎ কারণের নাম করণ। কারণ জন্য হইয়া কার্য্যজনক যে হয় তাহার নাম ব্যাপার। * * অনুমিতির অপর কারণ পক্ষতা আছে। ইহাতে প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহেন পর্ব্বতে বহ্নি সন্দেহের নাম পক্ষতা। একথা ভালো নহে কারণ যে হয় সে অবশ্য কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেতে থাকে। প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয় পরে ব্যাপ্তির স্মৃতি পরে পরামর্শ। তবে পরামর্শ কালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণ পরামর্শ ক্ষণ সে ক্ষণে সংশয় থাকিল না। জ্ঞান ইচ্ছাদ্বেষকৃত সুখ দুঃখ। ইহারা দ্বিক্ষণ স্থায়ী পদার্থ, ত্রিক্ষণে নষ্ট হয় জানিবে।

শেষ—(নাই। খণ্ডিত। ১৫ পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তারিখ আছে শুভমস্তু সন ১১৮১।)

১১৬। ভ্রমরগীতা। রূপনাথ দাস।

আরম্ভ—বন্দেঽহং করুণাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্যদয়ানিধিং

* * *

শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন।
ভ্রমর দেখিয়া যে কহিল গোপীগণ॥

শেষ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম করি আস।
মাথুর বর্ণন কহে রূপনাথ দাস॥

ইতি ভ্রমরগীতায়াং গোপী উক্তি মাথুরবর্ণনা নাম পঞ্চম অধ্যায়। সন ১২২৪ সাল স্বাক্ষর শ্রীরামনারায়ণ দাস তস্যঃ তারিখ ১৪ মাঘ রোজ সোমবার আটদণ্ড গতে সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ১৫০।)

১১৭। মঙ্গলচণ্ডী। রঘুনাথ দাস।

আরম্ভ—

প্রণমহ গণপতি বিঘ্নবিনাশন।
প্রণতিপূর্ব্বক বন্দ শিবাণীচরণ॥

শেষ—

শিবদুর্গাপাদপদ্ম নিত্য মোর আশ।
দ্বিজ রঘুনাথে কহে রাখ নিজ দাস॥

ইতি নিয়ত মঙ্গলচণ্ডিকা পাঁচালি সমাপ্ত শুভমস্ত শকাব্দা ১৬৬১। সন ১১৪৮ তাং ২৭ আষাঢ় মোশংপুর নগর মৌজে দেবগ্রাম। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫০॥)

১১৮। মনঃশিক্ষা। (দাসগোস্বামী কৃত মূল ও প্রেমদাস কৃত তাহার অনুবাদ।)

আরম্ভ—গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়েষু সুজনে (ইত্যাদি)
অস্যার্থ। গুরু শব্দে গুরু গোসাঞি উপদেষ্টা প্রভু।
দম্ভ ছাড় তাহে রতি না ছাড়িহ কভু॥

শেষ—

শ্রীদাসগোসাঞির পদ হৃদে আশ কৈল।
দ্বাদশ শ্লোকের অর্থ মন বুঝাইল॥
বৈষ্ণব গোসাঞি পাদপদ্ম হৃদি আশ।
মনঃশিক্ষা সংক্ষেপার্থ কহে প্রেমদাস॥

ইতি মনঃশিক্ষা সমাপ্ত॥ সন ১১৫৫ সাল ১৩ বৈশাখ রোজ সোমবার॥ (শ্লোকসংখ্যা ৩৬।)

১১৯। মনঃশিক্ষা। (অনুবাদ) গিরিবর দাস।

আরম্ভ—

শ্রীগুরুচরণে ব্রজে ব্রজবাসীগণে।
বৈষ্ণবচরণে আর ব্রাহ্মণের গণে॥

শেষ—

যেই জনে গায় উচ্চ মধুর করিয়া।
সেই জন স্বগণ শ্রীরূপানুগ হৈয়া॥
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ সেবারস লভে।
গিরিধর দাস ইহা গাইল এই লোভে॥

অপর একখানি পুথির আরম্ভ—

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়েষু সুজনে (ইত্যাদি)
চরণে ধরিয়া বহু ব্যগ্রতা করিয়া।
এই ভিক্ষা মাগু অহে শুন মন ভাইয়া॥

(শ্লোকসংখ্যা মূল ও অনুবাদ সমেত ৪৮।)

১২০। মনসামঙ্গল (পদ্মপুরাণ)। জগন্নাথ।

আরম্ভ—(১ম পাতা নাই, ২য় পাত হইতে)
সর্ব্বলোকে তুয়া সেবি, প্রত্যক্ষ দেবতা কলিযুগে॥
ঋষিগণ সুরাসুরে, সর্ব্বদাএ স্তুতি করে,
না জানন্তি মহিমা তোহ্মার।

ভণিতা—

বৈদ্যশ্রীজগন্নাথে রচিল পুরাণ।
সুরচিত কহি শুন নাচাড়ীর ছান্দ॥

শেষ—(৪০ পাতের শেষে)
কেমতে যাইব কালিকা জনকবাড়ী।
কোন ছলে মুণ্ডিব আপনা ছোর দাড়ী॥

(তৎপরে খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৬০০।)

১২১। মনসামঙ্গল। জগমোহন মিত্র।

আরম্ভ—

অগ্রজন্মা-অঙ্ঘ্রি-অব্জ উত্তমাঙ্গে ধরি।
গ্রন্থ গ্রন্থনের গুহ্য আস্তচ্যুত করি।

শেষ—

চতুর্দ্দশ পালা সাঙ্গ হইল পুস্তকে।
সপ্তদিন সপ্তরাত্র গাইবে গায়কে॥
আমি মূর্খ মূঢ়মতি অতি অপ্রবীণ।
ভরসা মনসাপদ সম্পদবিহীন॥
নিজ বংশাবলী বলি বিস্তার করিয়ে।
কল্যাণে রাখিবে মাতা পদছায়া দিয়ে॥
বড়িসা সমাজ মাঝে মহামতিমান।
গৌড়েশ্বর মিত্র নাম তেরজ প্রধান॥
সেই বংশে জন্ম মিত্র হরিনারায়ণ।
বালাণ্ডায় গোপালপুরেতে নিকেতন॥

আত্ম পক্ষে দুই পুত্র গুণে গুণধাম ।
অগ্রজ ধরণীধর অনুজ শ্রীরাম ॥
শেষ পক্ষে পক্ষসুত ধর্ম্মপরায়ণ ।
প্রথমে শ্রীধর পরে কমল-নয়ন ॥
নানাজাতি যশভাতি রাখি চারিজন ।
লীলা সম্বরিয়া স্বর্গে করিলা গমন ॥
ধরণীধরের দুই পুত্র বিচক্ষণ ।
গঙ্গানারায়ণ আর রামনারায়ণ ॥
শ্রীধরের বংশধর সর্ব্বগুণধর ।
রামচন্দ্র পীতাম্বর পরে বিশ্বম্ভর ॥
কমলনয়ন সুত হরচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ।
আত্মপক্ষে আবির্ভাব ভৈরব কনিষ্ঠ ॥
এই ভিক্ষা মাগি মাগো চরণ-কমলে ।
সর্ব্বজনে সর্ব্বক্ষণে রাখিবে কুশলে ॥
শ্রীরামের চারি পুত্র জ্যেষ্ঠ আমি দীন ।
স্বকর্ম্মে প্রবৃত্তিহীন অকর্ম্মে প্রবীণ ॥
নাম রাখিয়াছে সবে শ্রীজগমোহন ।
অন্ধের যেমন নাম কমললোচন ॥
অনিত্য সম্পদে নিত্য চিত্ত নিমগন ।
আশা করি তব পদে সদা থাকে মন ॥
অষ্টমভ্রাতার নাম মদনমোহন ।
ঐহিকে সম্পদ দিবা চরমে চরণ ॥
তৃতীয় সোদর শোকে বিকল অন্তর ।
মথুরামোহন নাম অল্পে লোকান্তর ॥
তস্য সুকুমার সূর্য্যকুমার শৈশব ।
পিতৃহীনে দিবে মাতা অতুল বৈভব ॥
কনিষ্ঠ সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ শ্রীরামমোহন ।
নিজ দাস বলি যেন সদা থাকে মন ॥
অধমের তিনপুত্র তব প্রসাদাৎ ।
জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্ন দ্বিতীয় কালীনাথ ॥
নাম তারা-বিলাস কনিষ্ঠ বংশধর ।
সকলের প্রতি দয়া থাকে নিরন্তর ॥
মধ্যম ভ্রাতার তিন সুধীর সন্তান ।
যথাক্রমে সকলের লিখি অভিধান ॥
প্রথমে সারদা ভগবতী সতী নাম ।
পরম্পর শ্রীচরণ মোহন বিশ্রাম ॥
অনুজ অগ্রজ দুই তস্য পরিচয় ।
পরার্থে কুমারনাথ শিরে চন্দ্রদ্বয় ॥
নবাঙ্কাষ্ট বয় ভাগে নব অনুরাগ ।
গোষ্ঠীপতি জামাতা প্রসন্নচন্দ্র নাগ ॥
প্রত্যক্ষে লিখিলে নাম বাহুল্য জানায় ।
বান্ধব বর্গেতে মাতা রাখিবে ও পায় ॥
অতঃপর গ্রন্থ সাঙ্গ কাল নিরূপণ ।
ষড় রস সিন্ধুশশী ক্রমেতে গণন ॥
শন শশী বাণপক্ষ তস্য তদন্তরে ।
অঙ্ক অস্য বামাগতি ব্যক্ত চরাচরে ॥
মূর্খের হইবে দুঃখ সুক্ষ্ম ভাবনায় ।
প্রকাশ করিয়া তাই লিখি পুনরায় ॥
শকাব্দ শতরোশত ছেষট্টী জানিবে ।
সন ধল্যে বারশত একান্ত গণিবে ॥
আছয়ে কবির নাম ভাষায় বিদিত ।
ভজন শুনয়ে বলি সঙ্কেতে কিঞ্চিৎ ॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬৭০০ ।)

১২২ । মনসার পাঁচালী (পদ্মপুরাণ) ।

নারায়ণদেব ।

আরম্ভ—

সরস্বতী পদযুগ করি নমস্কার ।
সেবকেরে দয়া করি রাখহ সংসার ॥

ভণিতা—

নারায়ণদেবে কহে সরস পাঁচালী ।
বেউলার কথা শুন এক যে নাচাড়ি ॥

শেষ—(৪২ পাতের শেষ)

পদ্মা বোলে শুন হনুমান্ ।
একে একে তুলি দেহ ডিঙ্গা চৌদ্দখান ॥
পদ্মার বচনে বীর নৌকা কইল স্থির ।
নৌকা তুলিবারে লাগে কানি দয় জল ॥

(তৎপরে খণ্ডিত । প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৪৮০ ।)

১২৩। মনসাপাঁচালী। জানকীনাথ।

আরম্ভ—নারায়ণং নমস্কৃত্যেত্যাদি।

প্রণমহ নারায়ণ জগৎজীবন।
সৃজন-পালক যেই করএ পালন॥

শেষ—

শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার করিয়া পদবন্ধে।
পণ্ডিত জানকীনাথে রচিল সানন্দে॥
* * *
বিপ্র জানকীনাথ মনসার দাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে পোথা করিল প্রকাশ॥

* * * * বাঙ্গলামাহে ১৫ই চৈত্র তিহি শুক্লপক্ষের বিজয়া অষ্টমী রোজ বুধবার অক্ষর পুস্তক শ্রীগণেশরাম ধরদাস মোকাম বালিয়াচোং সরকার শ্রীহট্ট। (শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ৬০০০।)

১২৪। মহাভারত। বিজয়পণ্ডিত।

☞ তৃতীয় বর্ষের সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা দ্রষ্টব্য। এই পুথি মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই পরিষৎকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে।

১২৫। মহাভারত। কাশীরামদাস।

১০৬১ সনের পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। মুদ্রিত পুথি হইতে তিনগুণ বড়।

১২৬। মহাভারত। (বিরাটপর্ব্ব) সঞ্জয়।

আরম্ভ—

বনপর্ব্ব কথা যদি হৈল সমাধান।
বিরাটপর্ব্বের কথা কর অবধান॥
তবে জন্মেজয় রাজা কান্দি জিজ্ঞাসন্ত।
তারপরে কিবা হৈল কহ মতিমন্ত॥

শেষ—১৮ পাতের পর খণ্ডিত।

১২৭। মহাভারত। (পরাগলী) কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

আরম্ভ—(১ম ২০ পাত নাই। ২১ পাত হইতে)

লোমে লোমে ঘর্ম্ম খসে তেজি অহঙ্কার।
লজ্জায় বসিল সব রাজার কুমার॥
কেহো শক্ত নহিল ধনুতে দিতে গুণ।
ব্রাহ্মণ সমাজ হৈতে উঠিলা অর্জ্জুন॥

ভণিতা—

ভারতের কথা সার, যেহেন অমৃতধার,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস॥
যদি শুনে একমনে, বৈকুণ্ঠে হয় গমনে,
পড়িলে সকল পাপক্ষয়।
অমৃত ভারতকথা, কবীন্দ্রে রচিল পোথা,
নাম তার পাণ্ডব বিজয়॥

(কর্ণপর্ব্বের শেষ)

শেষ—(২৯২ পাতের শেষে)

মালিনী আমার কন্যা অতি রূপবতী।
তাহাকে করিব দান শুন মহামতি॥
রাজার বচন শুনি নারদ চলিল।
সুনন্দাপুরী গিয়া যমেক কহিল॥

মন্তব্য—(আদি পর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের শেষ ভাগ হইতে অশ্বমেধপর্ব্বের বীরবর্ম্মার যজ্ঞ কথা পর্য্যন্ত আছে। ২৯২ পাতের পর খণ্ডিত। পুথিখানি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পাত্রসায়ের গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০০।)

১২৮। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)। নিত্যানন্দ ঘোষ।

আরম্ভ—যং ব্রহ্ম বেদান্তবেদে বদন্তি পরং ইত্যাদি।
* * *
প্রথমেত গুরুপাদ পদ্ম (ধরি) শিরে।
যার অনুগ্রহ মতি হৈল বিশ্বেশ্বরে॥
* * *
ব্যাসদেব বর্ণিলেন ভারত কথন।
সে কথা বুঝিতে নাঞি পারে সর্ব্বজন॥
ভারত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
পরাকৃত করিআ কহি বুঝ মহাসুখে॥

ভণিতা—

বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুন শুন ওরে ভাই হইয়া এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারতকথন॥

মন্তব্য—(৫১ পাতের পর খণ্ডিত। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্য্যন্ত। এই ৫১ পাতের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ৩২৫০।)

১২৯। মহাভারত (স্ত্রীপর্ব্ব)। নিত্যানন্দ-ঘোষ।

আরম্ভ—নারায়ণং নমস্কৃত্যাদি।

বৈশম্পায়ন মুখে, রাজা শুনেন কৌতুকে,
জিজ্ঞাসা করিলা জন্মেজয়।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হৈল, যত ক্ষত্রিগণ মৈল,
পাণ্ডবের ঘুচিল সংশয়॥

শেষ—

বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
ব্রাহ্মণের পদরজ করিয়া ভাবন।
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারত কথন॥
রচিলাউ বুঝ ভাই না করিহ হেলা।
এতদুরে স্ত্রীপর্ব্ব সমাধা হইলা॥

ইতি শ্রীমহাভারতের স্ত্রীপর্ব্ব সমাপ্ত॥ স্বাক্ষর শ্রীসদানন্দ সরকার। সাং ডাণ্ডআপাড়া। সন ১০৮২ সাল তাং ৫ শ্রাবণ॥ (বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে এই স্ত্রীপর্ব্বের ১০৮৩ সালের একখানি এবং তৎপরবর্ত্তী বিভিন্ন সনের দুই খানি পুথি আছে। শ্লোকসংখ্যা ১৫০০।)

১৩০ মহাভারত (বৃহৎ শান্তিপর্ব্ব)। নিত্যানন্দ ঘোষ।

আরম্ভ—বৃহৎ শান্তি লিখ্যতে।

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
রাজা হৈল যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়॥

শেষ—

নিত্যানন্দ দাস কহে পাঁচালীর মত।
শান্তিপর্ব্ব এত দুরে হৈল সমাপ্ত॥

বীরসিংহ সন ১২৩৭ সাল তাঃ ২৯শে ভাদ্র। (শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ৪৫০০। ১২৬৭ সালের আরও একখানি পুথি আছে।)

১৩১। মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব্ব)। নিত্যানন্দ ঘোষ।

আরম্ভ—(প্রথম তিনপাত নাই ৪র্থ পাত হইতে)

ক্ষত্রিয়ের হৈল ক্ষয়, শক্রুর হইল জয়,
তব পুত্র কালে কৈল বশ॥

ভণিতা—

শুন শুন আরে ভাই হঞা এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত কথন॥

(যে কয় পাতা আছে, তাহার মোট শ্লোকসংখ্যা ১৮০০)

১৩২। মহাভারত (বিরাটপর্ব্ব) গঙ্গা-দাস সেন।

আরম্ভ—বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

সভাসদ্ পুন সব কর অবধান।
চিত্ত দিয়া শুন কহি পরীক্ষিত যে পুরাণ॥

শেষ—(৫৬ পাতার পর খণ্ডিত। প্রাপ্তাংশের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৪০০।)

১৩৩। মহাভারত (আদিপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

ভীষ্মেরে চাপায়া রথী ভূপ আন ঘরে।
শুভযোগে শান্তনু রাজত্ব দিল তারে॥
শান্তনু নৃপতি স্নান করিবারে যায়।
যমুনার তীরে কন্যা দেখিবারে পায়॥

শেষ—

এই কথা দুর্য্যোধন শুনে ঘরে ঘরে।
ভাবনা হইল বড় রাজার অন্তরে॥
বিমনা হইয়া মনে ভাবেন রাজন।
কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে শুন ভক্তগণ॥

সন ১০৮৩ সাল তারিখ ২১ জ্যৈষ্ঠ। শ্রীনিমাইচন্দ্র।

১৩৪। মহাভারত (কিরাতার্জ্জুনীয়)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বঞ্চা আছে পাঁচ ভাই দ্রৌপদী সহিতে।
হেনকালে অর্জ্জুন কহেন জোড় হাথে॥

পূর্ব্বে নারদমুখে শুন্যাছি বিবরণ।
পাশুপাত বাণে শল্য রাজার মরণ॥
শেষ—(খণ্ডিত) ৩ পাত মাত্র, পরে নাই।

১৩৫। মহাভারত (বনপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—
বৈশম্পায়ন বলে রাজা শুন জন্মেজয়।
কাম্যবনে যুধিষ্ঠির বৃকোদরে কয়॥

শেষ—
এত বলি বৃহদশ্ব আশ্বাসিয়া যায়।
বনপর্ব্বে চিত্র-কথা কবিচন্দ্রে গায়॥ * ॥

ইতি সন ১০৮৫ সাল লিখিতং শ্রীনিমাঞিদাস চন্দ্র সাকিম পাত্রসায়ের। (শ্লোকসংখ্যা ২৯০।)

আর একখানি পুথির শেষে—
পাণ্ডবেরে বিদায় দিয়া করিল গমন।
কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে ভাই পঞ্চজন॥
কোথা গেলে অহে প্রভু দেব যদুরায়।
হাহাকার ক'র্য্যা সর্ব্বে কান্দে উভরায়॥
বনপর্ব্বের কথা এত দূরে সায়।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়॥

১৩৬। মহাভারত (উদ্যোগপর্ব্ব) কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—উদ্যোগপর্ব্ব লিখ্যতে।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
কৃষ্ণরে সম্ভাবি যুধিষ্ঠির কয়॥

শেষ—
ঢাল খাঁড়া ধনু তীর গায়ক দিবেক।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা সেই গাওয়াবেক॥
ভারত শ্রবণে দেহ হয় পুলকাঙ্গ।
এতদূরে উদ্যোগপর্ব্বের কথা সাঙ্গ॥
কবিচন্দ্র বলে দ্বিজ ব্যাসের কিঙ্কর।
ভীষ্মপর্ব্ব মন দিয়া শুন তারপর॥
(শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

১৩৭। মহাভারত (ভীষ্মপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়।
ভারতশ্রবণে হয় পুণ্যের উদয়॥
কৌরব পাণ্ডব রণে সাজে দুই দল।
পৃথিবীর রাজা যত আইল সকল॥
শেষ—(খণ্ডিত।)

১৩৮। মহাভারত (দ্রোণপর্ব্ব) কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—
প্রভাতে সঞ্জয় যায়্যা ধৃতরাষ্ট্রে কয়।
কালিকার যুদ্ধের কথা শুন মহাশয়॥
অভিমান করি দুর্য্যোধন কহে দ্রোণে।
পাণ্ডবের জয় দেখি কি কাজ জীবনে॥

ভণিতা—
দ্রোণপর্ব্বের কথা কবিচন্দ্র কয়।
যে জন গায়ায় তার সর্ব্বত্র হয় জয়॥
শ্রীযুত গোপালসিংহ নৃপতির আদেশে।
সংক্ষেপে ভারতকথা কবিচন্দ্র ভাষে॥
শেষ—(খণ্ডিত। মোট শ্লোক ১৫০।)

১৩৯। মহাভারত (১ কর্ণপর্ব্ব) কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—
বৈশম্পায়ন বলে রাজা কহি যে তোমায়।
দ্রোণের মরণে কুরু নিদ্রা নাহি যায়॥
প্রভাতে কর্ণেরে রাজা করি সেনাপতি।
পাণ্ডবে জিনিতে যায় কৌরবের পতি॥

শেষ—
কর্ণপর্ব্বে যে জন গায়ায় গায় শুনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায় সেই জনে॥
এই পর্ব্ব যেবা জন গায়ায় সাদরে।
বাস ভূষা দক্ষিণা দিবেক গায়কেরে॥
ইহার উত্তর গাব শল্যপর্ব্বের কথা।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ব্যাসের গুণ গাথা॥
হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হল সায়।
অভিমত বর পায় যে জন গায়ায়॥

ইতি সন ১০৮৩ সাল তারিক ২৮ কার্ত্তিক বেলা চারি দণ্ডে সমাপ্ত হইল॥ লিখিতং শ্রীনিমাঞিদাস চন্দ্র সাকিম পাত্রসাএর।

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
কর্ণ মল্যে কহ কি করিল দুর্য্যোধন॥

বৈশম্পায়ন বলে রাজা করহ শ্রবণ।
হা কর্ণ হা কর্ণ বলি কান্দে দুর্য্যোধন ॥ * ॥
(শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

(২ কর্ণপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—
বৈশম্পায়ন মুনি কহে শুনহ রাজন।
বিস্তারিয়া কর্ণপর্ব্ব করি যে বর্ণন ॥

শেষ—
কর্ণ যুদ্ধ এত দূরে হইল সমাপন।
ইহা পর শল্যপর্ব্ব করিবে শ্রবণ ॥
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে কর্ণপর্ব্ব পালা হৈল সায় ॥

ইতি সন ১০৮৮ সাল। তারিখ ১৮ পৌষ তিথি কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশী মঙ্গলবার বেলা ছয় দণ্ডে সমাপ্ত হইল। শ্রীনিমাঞি চন্দ্র সাকিম পাত্রসায়ের। (শ্লোক সংখ্যা ১৭৫।)

১৪০। মহাভারত (শল্যপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—
হা কর্ণ হা কর্ণ ব'ল্যা দুর্য্যোধন ডাকে।
সাগরের মাঝে ফেল্যা গেলে ভাই মোকে ॥

শেষ—
শল্যপর্ব্বের কথা এত দূরে সায়।
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

সন ১০৮৩ সাল তারিখ ১৫ বৈশাখ। লিখিতং শ্রীনিমাইদাস সাকিম পাত্রসাএর। (শ্লোকসংখ্যা ১৭০।)

১৪১। মহাভারত (গদাপর্ব্ব)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—
ধৃতরাষ্ট্র বলে সঞ্জয় জিজ্ঞাসি তোমারে।
কৃপ আদি কি কার্য্য করিল তারপরে ॥
গদা কান্ধে কর্য়া ভীম ভ্রম্যা একা।
ব্যাধ সঙ্গে দৈবযোগে পথে হৈল দেখা ॥

ভণিতা—
দারুণ পুত্রের শোকে, বুঝায়্যা হারিল লোকে,
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জানে ॥

শেষ—
সেবিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র গায়।
গদাপর্ব্বের কথা এতদূরে সায় ॥

ইতি সন ১০৮২ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ লিখিতং শ্রীনিমাঞিচন্দ্র সাকিম পাত্রসাএর বেলা তৃতীয় প্রহরে সমাপ্ত হইল। (শ্লোকসংখ্যা ১৭০।)

১৪২। মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব)।
কৃষ্ণানন্দ বসু।

আরম্ভ—(১ম চারি পাত নাই, তৎপরে)
কি কারণে তাহা নাই করিলে সাধনে ॥
সুলভ গোবিন্দভক্তি কঠিন না হয়।
কি কারণে তাহাত মানিলে বিপর্য্যয় ॥
পরহিংসা পরদ্রব্য কৈলে অপকার।
ছার ইচ্ছা করিয়া পুষিল সুতদার ॥

শেষ—
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
এক মনে একচিত্তে শুনে যেইজন।
সর্ব্ব দুঃখ হরে সেই ব্যাসের বচন ॥
সম্ভ্রমে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়পদদ্বন্দ্ব।
পয়ার প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ ॥

ইতি শান্তিপর্ব্ব। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০।)

১৪৩। মুক্তাচরিত্র। নারায়ণ দাস।

আরম্ভ—
লীলাম্বুজনিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ।
উদিতং যে শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণবিধুং ভজে ॥
জয় জয় মহাপ্রভু চৈতন্য ঈশ্বর।
অবতীর্ণ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ শশধর ॥

শেষ—
প্রভুশ্রীজয় গোপানন্দ পাদপদ্ম আশ।
মুক্তার চরিত্র কহে নারায়ণ দাস ॥
ঋতু বেদ অম্বুচন্দ্র (১৫৪৬) গণনা সঙ্কেতে।
মুক্তাচরিত্র ভাষা হৈল বিদিতে ॥

ইতি শ্রীমুক্তাচরিত্রে ব্রজবাসী ভাবনিরূপণং ষষ্ঠঃ স্তবকঃ। সন ১১০৪ সাল তারিখ ১৭ ভাদ্র পাঠক শ্রীচৈতন্য পান সুবর্ণ বর্ণিক। সাং বীরসিংহা লিখিতং শ্রীপরমানন্দ বিশ্বাস। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০।)

১৪৪। মৃগব্যাধসংবাদ। দ্বিজ রতিদেব।

আরম্ভ—(গোড়ায় দুই পাত নাই, ৩ পাতায়)

"রুক্মিনী কাহিনী।

হস্তিনাপুরেতে ঘর, মুচুকুন্দ নৃপবর,

রুক্মিণী যে তাহার রমণী॥

তাতে যত বৈসে লোক, নাহি তাতে দুঃখ শোক,

ধর্ম্ম * * * বনে।

দ্বিজ আদি যত জাতি, করে যার যেই নীতি,

ধর্ম্ম বিনে না ভাব আন॥

ভণিতা—

(১) হরগৌরী-পাদপদ্ম বন্দিয়া আনন্দে।

দ্বিজ রতিদেবে গাহে নাচাড়ির ছন্দে॥

(২) যে যত মেলানি মারে, এড়ি যাইতে প্রাণ পোড়ে,

গোপীনাথসুত বিরচন॥

১৪৫। যম উপাখ্যান। শঙ্কর দাস।

আরম্ভ—

প্রণত করিয়া বলি শুন সর্ব্বজন।

রামকৃষ্ণ জগন্নাথ বল নিরন্তন॥

শেষ—

শ্রীকৃষ্ণচরণ খানি শিরেতে ধরিয়া।

কহেন শঙ্করদাস কৃষ্ণ প্রণমিঞা॥

যম উপাখ্যান কথা শুনে যেই নরে।

ধনধান্য পূর্ণ পইত্র সুখে দেই তারে॥

ইতি যম উপাখ্যান গ্রন্থ সমাপ্ত। ১২৫৩ সাল ১লা আষাঢ় সোমবার সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫।)

১৪৬। যোগাগম। যুগল দাস।

আরম্ভ—

জয় জয় শ্রীগুরু পতিতের বন্ধু।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রসসিন্ধু॥

শেষ—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদে করি আশ।

এই তত্ত্ব বিরচিল যুগলের দাস॥

ইতি যোগাগম গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতং গৌরচরণ দাস। লেখাইলেন শ্রীসাকল্যরাম দে। (শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২২৫।)

১৪৭। যোগাদ্যাবন্দনা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—যোগাদ্যাবন্দনা লিখ্যতে।

জয় মা যোগাদ্যা বন্দ ক্ষীরগ্রামবাসী।

অবনীতে সিদ্ধপীঠ গুপ্তবারাণসী॥

বাম হস্তে খর্পর দক্ষিণ হস্তে খণ্ডা।

রাবণের ঘরে মাতা ছিলা উগ্রচণ্ডা॥

শেষ—

মায়ের কারণে আমি পুণ্যবান হল।

সবাই মিলে ভাই সব হরি হরি বল॥

ইতি সমাপ্ত॥ *॥ (শ্লোক ১২০।)

১৪৮। রতিবিলাস। রসিক দাস।

আরম্ভ—

নতোঽস্ম্যহং গৌরশচীগর্ভইন্দুং

সিদ্ধান্তসদ্ভক্তিপ্রকাশসিন্ধুং।

* * *

বন্দ শচী গর্ভ ইন্দু গৌর ভগবান্।

সদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সিন্ধুপ্রবাহ বিশ্রাম॥

সহজ প্রেমামৃত গূঢ়রূপে আস্বাদিল।

স্বয়ং আস্বাদিত বাহে প্রকাশ না কৈল॥

শেষ—

সে সম্পদ পুষ্টিকর মোর মনোবুদ্ধি।

যাহা হইতে পাইনু রতিবিলাসের শুদ্ধি॥

রসশূন্য মূর্খ রসিকদাস মূঢ়মতি।

শ্রীরূপানুগ্রহে কহে রতিবিলাসপদ্ধতি॥

* * * *

লিখ্যতে গ্রন্থঃ নাম বৈষ্ণবদাসক এষ গ্রন্থোলভ্যঃ শ্রীশ্রীস্বরোপাধিকারিঠক্কুরপ্রসাদাৎ। সন ১১৮৮ তারিখ ২২ আষাঢ়। (শ্লোকসংখ্যা ২৯০)

১৪৯। রসকল্পসার। নিত্যানন্দ দাস।

আরম্ভ—(প্রথম ১ পাতা নাই, ২ পাতায়)

এইরূপে নিত্য লীলা গোবিন্দের সনে।

সর্ব্বরস পুষ্ট করে কেহো নাহি জানে॥

শেষ—

নিত্যানন্দদাস মুঞি নিত্যানন্দ দাস।

জনমে জনমে হইব তাঁহার দাসের দাস॥

অতি দীন হীন মুঞি নিত্যানন্দ দাস।
রসকল্পসার এই করিল প্রকাশ॥

জয় রাধা সমাখ্যাতা তত্র দাসগদাধরঃ পূর্ব্বেঽনঙ্গমঞ্জরীচৈব ইদানীং জাহ্নবা স্থিতা। ইতি রসকল্পসার গ্রন্থ সমাপ্ত। শক ১৭০১। (শ্লোকসংখ্যা ৮০।)

১৫০। রসকল্পসার। বৃন্দাবন দাস।

আরম্ভ—

আদৌ ব্রহ্মা ততঃ কৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ ততঃপরম্।
সখী দেহানুদেহঞ্চ পঞ্চধা কথ্যতে গুরুঃ॥
*　　*　　*　　*
বৃন্দাবন কুঞ্জ মধ্যে রসাবেশ হঞা।
পরম আত্মা হইতে নিত্য শক্তি প্রকাশিয়া॥
সেই শক্তি হইতে হয় আনন্দের ধাম।
সেই শক্তি পূর্ণকর গোবিন্দের কাম॥

শেষ—

নিত্যানন্দের দাস মুঞি নিত্যানন্দের দাস।
জন্মে জন্মে হয় যেন তার পায় আশ॥
অতিদীন অতি হীন বৃন্দাবন দাস।
রসকল্পসারতত্ত্ব করিল প্রকাশ॥
(শ্লোকসংখ্যা সংখ্যা ৩০।)

১৫১। রসভক্তিলহরী। শ্রীকৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—(১ম ৩ পাত নাই। ৪র্থ পাত হইতে)

স্বকীয়া ভাবেতে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।
এহি হেতু পরকীয়া করহ আশ্রয়॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনু ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শেষ—

এই অষ্ট অবস্থাতে হয় অষ্ট সখী।
সহায় করেন সবে কভু না উপেখি॥
শ্রীপদ্মমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি আশ।
চরণে স্মরণ মাগে শ্রীকৃষ্ণদাস॥

ইতি রসভক্তিলহরী সমাপ্ত। সাক্ষর শ্রীতপস্যারাম সাকিম পরগণে তিসিনা রাজধানী শ্রীশ্রীযুত রাজধরমাণিক্যদেব মহারাজ। ইতি সন ১২১১ ত্রিপুরাব্দ বাঙ্গলা সন ১২০৮ তারিখ ২৫ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার তিথি প্রতিপদ। (শ্লোক প্রায় ৩৭০।)

১৫২। রসোজ্জ্বল। জগন্নাথ দাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নং জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ইত্যাদি।

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ।
অজ্ঞান তিমির নাশ কৈল যেই জন॥

মধ্য—

উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বরের তত্ত্ব।
অতএব এই তিন জানিবা মহত্ত্ব॥

শেষ—

রসবতী নারী আর রসিক নাগর।
রসপূর্ণ করি ভজ গুণের সাগর॥

ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ২০ ফাল্গুন লিখিতং শ্রীমথুরদাস বৈরাগী পাঠক কেশবরাম সেন সাং মুণ্ডাকাটী। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৬৬০।)

১৫৩। রসোদ্গার। (বাসুঘোষ, জ্ঞানদাস, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, যদুনন্দন প্রভৃতির ৩৬টী পদ।)

আরম্ভ – অথ রসোদ্গার বিভাষ।

আজু গৌরাঙ্গসনে রজনী গোঙাঅলু
সো সুখ কি কহব সই।
লাখ বদন যদি বিধি মোরে দেয়ত
তবে কিছু গোরাগুণ কই॥

শেষ—

ভনএ বিদ্যাপতি ইহ রস গায়।
ইহ অবশেষ যদুনন্দন গায়॥

১৫৪। রাগময়ীকণা।

আরম্ভ—

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
যার কৃপায় লেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
তবে বন্দ সাবধানে বৈষ্ণব গোঁসাই।
কৃষ্ণপ্রেমধন দিতে আর কেহ নাই॥

শেষ—

বৃন্দাবনে ষোল কলা গোকুলেতে বার।
দ্বারকায় নয় কলা মথুরায় হুসার॥

১২১১ ত্রিপুরাব্দে লিখিত আর একখানি পুথিতে এইরূপ আছে—

"ভাব বলিয়া এক অপূর্ব্ব কাহিনী।
নিষ্ঠারূপে ভজে যেই ভাবে ভক্ত গণি॥
হরে বলিয়া কৃষ্ণ হয় মহাশয়।
বিশাখা তাহান নাম জানিহ নিশ্চয়॥
হেলায় বলিএ এক অমৃতের খনি।
শ্রীজীব বলিয়া নাম জগতে বাখানি॥
কহিতে অনেক উঠে আনন্দ তরঙ্গ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু উপাসনা রঙ্গ॥
অনেক প্রকার হএ সাধন লক্ষণ।
নিজ গুরু সঙ্গে করি যাব বৃন্দাবন॥
ততেক কহিল যদি শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীরূপচরণ ভিন্ন আর গতি নাই॥
রাগময়ী গ্রন্থ তার নাম যে কহিল।
ইহাতে সাধকে কিছু বুঝিতে পারিল॥
যেই জনে না দেখিল রাগময়ীকণা।
যেইজনে কিবা জানে রসের উপাসনা॥
শ্রীরূপসনাতন পদে যাব আশ।
রাগময়ীকণা লিখে শ্রীবিরিঞ্চীর দাস॥
হীন তপস্যারাম ভবের তরঙ্গ দেখি ঝরে দুই আঁখি।
হরিপদে বিনে আর উপায় না দেখি॥
সামান্য লোকের গতি করিলা উদ্ভব।
আক্ষি অধমের হৈল এত পরাভব॥
ইতি রাগময়ীকণা সমাপ্ত। ত্রিপুরাব্দ ১২১১।

১৫৫। রাগমার্গলহরী।

আরম্ভ—বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং ইত্যাদি।

মধ্য—

শ্রীরূপগোসাঞির কথা দুর্গম অপার।
আপনে গৌরাঙ্গ কৈল শক্তির সঞ্চার॥

শেষ—

শ্রীরূপপদারবিন্দ আজ্ঞা শিরে ধরি।
কহিলাম রাগমার্গভজনলহরী॥

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধ্য-সাধন-নিরূপণ রাগমার্গলহরী সমাপ্ত॥

১৫৬। রাগমালা। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য (ইত্যাদি)

প্রথমে বন্দিব গুরু বৈষ্ণব চরণ।
তাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পুরণ॥

শেষ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু তাহার আখ্যান॥
প্রভু সম্মতে কৈল রাগমালা প্রকাশ।
এই সব আখ্যান কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি রাগমালা নাম সম্পূর্ণ॥ সন ১১৪৩ সাল তারিখ ২৯ পৌষ মোকাম ভোলতা পরগণে ফতেসিংহ লিখিতং শ্রীনন্দদুলাল দাস আদরস শ্রীআনন্দীরাম সিংহ। (শ্লোকসংখ্যা ১৮০।)

১৫৭। রাগরত্নাবলী। কৃষ্ণদাস।

ভণিতা—

জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ জয় জয়॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

* * *

রাগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ করি দুই বিধ হয়।
বামা দক্ষিণারাগ দুই বিধ কয়॥

শেষ—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
রাগরত্নাবলী গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি রাগরত্নাবলী গ্রন্থ সম্পূর্ণ। পাঠক শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাসস্য॥ (শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

১৫৮। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব। যদুনন্দন দাস (বিদগ্ধ-মাধবের অনুবাদ।)

আরম্ভ—সুধানাং চান্দ্রিণামপি মধুরিমো (ইত্যাদি)

* * *

কৃষ্ণলীলা শিখরিণী চন্দ্রসুধা উন্মাদিনী
তাহাকে দমন করে যেবা।
রাধাদি প্রণয় তাথে ঘন রসা সুভাষিতে
সে মাধুরী অন্ত করে কেবা॥

শেষ—
শ্রীরূপপাদপদ্ম স্মরণ করিঞা।
কৃষ্ণলীলা গান কৈল মন বুঝাইয়া॥
শ্রীযুত শ্রীপ্রভু মোর আচার্য্যঠাকুর।
গৌড়ে রাধাকৃষ্ণলীলা ভাণ্ডার প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণপ্রেম দিল তাহার নন্দিনী।
শ্রীল শ্রীহেমলতা নাম ঠাকুরাণী॥
তেহোঁ পাদধূলি দিল আমার মস্তকে।
সেই সে ভরসা মোর হঞাছে অধিকে॥
ঠাকুর বৈষ্ণবপদে কর পরণাম।
দোষ না লইবে প্রভু মাগো এই দান॥
রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব আখ্যান।
গাএ দীনহীন যদুনন্দনাভিধান॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্বে তীর্থবিলাসো নাম সপ্তমোহঙ্কঃ॥ *॥ লিখিতং শ্রীগোকুল দে॥ সন ১০৯০ সাল তারিখ আশ্বিন মাহ পঞ্চম দিবসে গ্রন্থ সমাপ্ত। বার শনিবার।

১৫৯। রাধারসকারিকা।

আরম্ভ—অথ রাধারসকারিকা লিখ্যতে।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
প্রথমে বন্দিব গুরুদেবের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

শেষ—
রাধা হইতে নিরাকার রসের স্বরূপ।
অতএব দুইরূপ হয় একরূপ॥

১৬০। রাধারাগসূচক (রঘুনাথ দাস গোস্বামীর)

আরম্ভ—অথ সূচক।
শ্রীরূপবৈরাগ্যকালে সনাতন বন্দিশালে
বসিয়া ভাবেন মনে মন।
রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈল গৌরহরি
মউ অধমে লইল সঙরণ॥

মধ্য—
সেই রঘুনাথ দাস পুরিব মনের আশ
এই মোর মনে আছে সাধ।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস মনে করে অভিলাষ
সবে মেলি করহ প্রসাদ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর রাধারাগসূচক সম্পূর্ণ।

শেষ—
পাথারে পড়িনু মুঞি গেল বহু দূর।
কেশে ধরি উদ্ধারিল শ্রীআচার্য্য ঠাকুর॥
শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পদে রহু আশ।
প্রার্থনা করএ সদা নরোত্তম দাস॥

ইতি সন ১২৭৫ সাল তারিথ মাহ মাঘ ১৭ রোজ সমাপ্ত। (শ্লোকসংখ্যা ৫০।)

১৬১। রাধিকামঙ্গল। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—
রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্ব কথন।
কৃষ্ণ কথা কহ মুনি করিএ শ্রবণ॥
শুকদেব বচনে রাজা পরীক্ষিৎ বলে।
কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ যশোদার কোলে॥

শেষ—
রাধিকামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
এত দূরে রাধিকামঙ্গল হৈল সায়॥

ইতি সমাপ্ত। ১২৭৮ তাং ২০ ফাল্গুন। (শ্লোক সংখ্যা ২৩০। ১০৯৭ সনে লিখিত আর একখানি পুথি আছে।)

১৬২। রামস্বর্গারোহণ। ভবানীদাস।

আরম্ভ—প্রণাম জয়কালী ব্রহ্মার চরণ।
কোটি কোটি ব্রহ্মা যার রোম কোণ॥
* * *
নবদ্বীপবন্দম অতি বড় ধন্য।
যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য॥
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম॥

তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম।
কতদিন আছিল সেই বদরিকাশ্রম॥
বামনদেব তথা যশোদা জননী।
সপুত্রে বন্দম যবে সর্ব্বলোক জানি॥
শিশুকাল হতে মোর নাহি চিত্ত।
কর্ণে সরস্বতী বৈসে যাহার নিত্য॥
কৃত্তিবাস কবিরাজ করিআছি আন।
বাল্মীকিপুরাণে যেন করি আলোচন॥

শেষ—

সঙ্গতি করিয়া নেয় জিতে কার্য্য নাহি।
বৈকুণ্ঠে যাইতে মোর মনে সুখ চাহি॥

শ্রীরামলোচনদেবস্য ইতি সন ১১২৫ তারিখ ২৬ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০।)

১৬৩। রামায়ণ। (সুন্দরাকাণ্ড)। কৃত্তিবাস।

আরম্ভ –

হনুমানের মুখে রাম শুন্যা সীতার কথা।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাম হেট কৈলে মাথা॥

শেষ—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হৈল উত্তরাকাণ্ড॥

ইতি সমাপ্ত সন ১১৪২ সাল তারিখ ১৫ চৈত্র রোজ রবিবার। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮০০।)

১৬৪। রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)। কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

আরম্ভ –(বন্দনার অংশ অস্পষ্ট, শিবের বিবাহ হইতে আরম্ভ।) মোট ১৬১ পৃষ্ঠা।

শেষ—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভাবে রামের চরণে।
উত্তরাকাণ্ড হৈল সাজ গীত রামায়ণে॥

যথা দৃষ্টং ত্যাদি। তারিখ ২ সন ১০০৯ সাল লক্ষ্মীবার। সাকিম খণ্ডঘোষ পাত্রসাএর। পদ্ম••ণ্ডিত স্বহস্ত লিখিতং। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০০। মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড হৈতে তিন গুণ বড় এবং ইহার বর্ণনার সহিত বা পাঠের সহিত কোন মুদ্রিত রামায়ণের মিল নাই। পরিষদ্ হইতে যে রামায়ণ প্রকাশিত হইবে, এই পুথি তাহার আদর্শ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।) (সম্প্রতি রামায়ণের আরও কএকখানি প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, বারান্তরে তালিকা মধ্যে উল্লেখ করিব)

১৬৫। রামায়ণ। ভবানীনাথ।

আরম্ভ– (প্রথম দুই পাত নাই তৃতীয়পাতে প্রথম)

দণ্ডচারি মহাযুদ্ধ প্রাচান ভারতী॥
অপার সমুদ্রে যেন দশরথ গেল।
কাতর হইয়া রাজা রণে ভঙ্গ দিল॥

ভণিতা—

ভবানীনাথের বাণী অমৃত সমান জানি
শুন নর তরিতে শমন।

শেষ—৪৮ পাতের শেষ।

যজ্ঞ দেব নেত্র এথা চন্দ্রকলা নাহি।
কেবা হরিনিল কন্যা উদ্দেশ না পাই॥
(প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০০।)

১৬৬। রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—(প্রথম পাত নাই)

আদেশ পায়্যা সেনাপতি ধায়।
মনোহর রথ খান সারথি জোগায়॥

শেষ—(১১ পাতের পর খণ্ডিত)

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় বাল্মীকের মত।
অধ্যাত্ম রামায়ণে লেখা নাহি এত॥
পর্ব্বত আনিয়া বীর শ্রীরামেরে দিল।
কালনেমি বধ আদি সকল কহিল॥

১৬৭। রামায়ণ (অরণ্যকাণ্ড)। ভিকনশুক্ল দাস।

আরম্ভ—

দশরথে আদেশি নৃপতি রঘুপতি।
বনেতে চলিল সীতা লক্ষ্মণ সংহতি॥

শেষ—

প্রচণ্ড ধনুক হাথে, বন পথে বিচরিতে,
সুগ্রীব সহিতে দরশন॥

না জানি ভাল না জানি মন্দ না জানি পদবন্ধ।

ভক্তিহীন শক্তিহীন জ্ঞান বিরহিত।

অশুদ্ধ পাইলে দোষ না লইবে পণ্ডিত ॥

এই পুস্তক লিখিতং শ্রীভিকন শুক্রদাসস্য ওলদে শ্রীকৃপারাম শুক্র দাসস্য। তিথি কৃষ্ণপক্ষ বুধবার। ইতি সন ১২০৬ মাহ ১৮ আশ্বিন। (শ্লোক প্রায় ২১০।)

১৬৮। রাবণবধ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

তবে দেখ দিল রাম ধনুকে টঙ্কার।

লঙ্কা ভুবনে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥

শেষ—

দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে শুন সর্ব্বজন।

রাবণব'ধে সীতা লয়্যা দেশে আগমন ॥

ইতি রাবণবধ সমাপ্ত। পঠনার্থে শ্রীসনাতন পাল সাং কীঃমাড় পঃ চন্দ্রকোণা সন ১২৪৬ সাল ২৯ কার্ত্তিক সংক্রান্তি। (শ্লোকসংখ্যা ৫২।)

১৬৯। রাসলীলা। কবিচন্দ্র।

শেষ—

ত্যজিয়াছি যত ভোগাদিবাসনা।

অনুরাগে নাই করি অঙ্গের মার্জ্জনা ॥

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ব্যাসের কৃপায়।

হরি হরি বল সবে পালা হইল সায় ॥

স্বাক্ষর শ্রীজন্মেজয় আইচ। সন ১২১৬।

(শ্লোকসংখ্যা ৫০।)

১৭০। রিপুচরিত্র। বৃন্দাবন দাস।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন ইত্যাদি।

গুরু কৃপা হইলে নরের ঘুচয় অজ্ঞান।

নাশ হয় তিমির সব পায় পরিত্রাণ ॥

শেষ—

যে জনে পড়িবে এহি মানের দায়।

কুটী নাটী ভজ শ্রীগৌরাঙ্গের পায় ॥

গোবিন্দ ভাবিয়া কহে দাস বৃন্দাবন।

রিপুচরিত্র গ্রন্থ হৈল সমাপন ॥

ইতি সন ১২৬৮ তাঃ ৬ শ্রাবণ। রোজ শনিবারে বেলা দুপ্রহরের সময় পূর্ণ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১২৫)

১৭১। রুক্মিণীহরণ (ভাগবতামৃতে)। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—

বিদর্ভ নগরে বৈসে ভীষ্ম নরপতি।

মহারাজ চক্রবর্ত্তী দেশে দেশে খ্যাতি ॥

শেষ—

রুক্মিণীহরণ যেবা করএ শ্রবণ।

রিপুজয়ী হইয়া পায় গোবিন্দচরণ ॥

ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।

হরি হরি বল সর্ব্বে পালা হৈল সায় ॥

পুস্তকমিদং শ্রীনিমাইদাস চন্দ্র সাং পাত্রসাএর। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০।)

১৭২। লক্ষ্মীচরিত্র। ভরতপণ্ডিত।

আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্তপতি।

তদন্তরে প্রণমহ দেবী সরস্বতী ॥

শেষ—

ভরত পণ্ডিত বলে বন্দি নারায়ণ।

প্রবন্ধ করিয়া বিরচিল লক্ষ্মীপুরাণ ॥

ইতি লক্ষ্মীচরিত্র সমাপ্ত। সন ১২৪৪ সাল জেলা বালেশ্বর সাকিম পটী মতিগঞ্জের বাজারের উত্তরদিগে লিখিতং নফরচন্দ্র বসু। তারিখ ১ পৌষ। (শ্লোকসংখ্যা ৩০০।)

১৭৩। বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান। (নাম অপ্রাপ্ত।)

আরম্ভ—অথ রাজা বিক্রমাদিত্য উপাখ্যান।

রাজা বিক্রমাদিত্য মহাপুণ্যবান।

প্রজার পালন করেন পুত্রের সমান ॥

কি কহিব মহারাজার সভার কথন।

নবরত্ন পরিপূর্ণ অতি সুশোভন ॥

শেষ—খণ্ডিত। ১২ পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

১৭৪। বৃন্দাবনধ্যান। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীবৃন্দাবন যদ্গোলকস্থান মণিমণ্ডল নানারত্ন নির্ম্মিত।

নানাকল্পতরু কতশত নানালতাপুষ্প বিকসিত ॥

* * * *

বায়ুকোণ হইতে যমুনা আইলা বৃন্দাবনে।
শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি মথুরা প্রদক্ষিণে॥

শেষ—

শ্রীরূপসনাতন পদে যার আশ।
শ্রীবৃন্দাবন-ধ্যানলীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনধ্যান সম্পূর্ণ। * * * লিখিতং শ্রীচৌধুরীক্ষেত্র সাং কোংগোটা সন ১০৬৪ সাল তাং ৯ জ্যৈষ্ঠ রোজ শনিবার।

১৭৫। বৈদ্যনাথমঙ্গল। সুন্দর দ্বিজ।

আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিরঞ্জন।
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় যাহার কারণ॥

ভণিতা—

দ্বিজ হরিহর-সুত মূঢ় অল্পমতি।
স্বপ্নে শঙ্কর পদে নাহিক ভকতি॥
মহামায়ার কৃপা কিছু না হৈল আমারে।
দ্বিজ মণিরাম কহে ভবানী-পদারে॥

* * *

বৈদ্যনাথ-মঙ্গল লোক শুন এক মনে।
বোলেন সুন্দর দ্বিজ শঙ্কর চরণে॥

শেষ—

বিষম যমের সভা বড়ই দুরন্ত।
পতিতপাবন নামে রাখিবা মহত্ত্ব।

ইতি বৈদ্যনাথমঙ্গল পুস্তক সমাপ্ত। স্বাক্ষর শ্রীমহেশরাম দাস। সন ১২১০ সাল তাং ২ ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৯০০।)

১৭৬। বৈষ্ণববন্দনা। দৈবকীনন্দন দাস।

আরম্ভ—

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈঃ কম্পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
প্রাণ গোরাচান্দ মোর ধন গোরাচান্দ।
জগত বান্ধিলে গোরা দিয়া প্রেম ফান্দ॥

শেষ—

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোনকালে নাহি পায় কোন সে যন্ত্রণা।
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি সেই লভে।
দৈবকীনন্দন কহে এই সব লোভে॥

ইতি বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত সন ১০৪৪ সাল ২ জ্যৈষ্ঠ মাস। আর একখানি পুথির শেষ—পাঠার্থে শ্রীবৃন্দাবন দাস দে। সাক্ষর মিদং শ্রীহরিচরণ দাস। শকাব্দা ১৬৭৮ সন্নাব্দে ১০৬২ শুক্রবার।

১৭৭। বৈষ্ণবামৃত। দীনভক্তিদাস।

আরম্ভ—

(প্রথম ৪ পাত নাই।)
শুন নাম মাহাত্ম্য সকল।
নাম পরম তপ নাম বড়ই ধর্ম্ম।

শেষ—

দীনভক্তিদাসের ভক্তি ভিক্ষার কারণে।
পাইব অচ্যুতপদ শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ পুস্তক সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরামগোপালদাস সাকিম বায়ড়া গৌরহাটী পুস্তক শ্রীভগীরথ মোদক সাকিম কোতলপুর সন ১০১৮ সাল তারিখ ২২ ভাদ্র রোজ শনিবার ঠিকানা শ্রীযুত রাজারাম তেওয়ারির দহলিজ ৬ দণ্ড বেলাতে সম্পূর্ণ হইল। (শ্লোকসংখ্যা ১৪৫০।)

১৭৮। বৈষ্ণবামৃত। মুকুন্দ দাস।

আরম্ভ—

একচিত্ত হঞা কথা শুন সাবধানে।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে কথা হৈল যেমনে॥

শেষ—

শুন শুন বৈষ্ণবামৃত হইবে আনন্দ।
এক মন করিয়া কহে দাস মুকুন্দ॥

ইতি বৈষ্ণবামৃত সমাপ্ত। ইতি সন ১০৮১ সাল তারিখ ৬ ফাল্গুন রোজ বুধবার। (শ্লোকসংখ্যা ১৪৪।)

১৭৯। শনির পাঁচালী। (মুচুকুন্দপুরাণোক্ত)

আরম্ভ—

সরস্বতীর পদযুগ করিয়া বন্দন।
ভক্তি করি বন্দিলাম যত দেবগণ॥

শেষ—

মুচুকুন্দ পুরাণের কথা করিয়া বাখান।
শনির পাঁচালীকথা হইল সমাধান॥
ওহে শনিরবিসুত ছায়ার নন্দন।
এ অধীনে করিলাম তোমাকে বন্দন॥

শনৈশ্চর-পাঁচালী সমাপ্ত। ইতি সন ১১৮০ সাল বিতারিখ ২০ বৈশাখ।

১৮০। শিবরামের যুদ্ধ। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—শিবরামের যুদ্ধ লিখ্যতে। রামং লক্ষণমিত্যাদি

নানা দুখ পায়্যা তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পম্পানদীর কূলেতে বসিলা দুইজন॥

ভণিতা—

সম্মুখে দেখিতে পাইল শিবের মধুবন।
রামায়ণের রামলীলা কবিচন্দ্রে গান॥

শেষ—নাই। (কেবল প্রথম ৯ পাত পাওয়া গিয়াছে।)

১৮১। শিবসংকীর্ত্তন। দ্বিজ রামেশ্বর।

আরম্ভ—অথ মৎস্য ধরার পালা লিখ্যতে।

পার্ব্বতী পদ্মারে বলে পাঠাইলাম জাত।
কি হেতু না হৈল কার্য্য না আইল নাথ॥

ভণিতা—

অজিতসিংহের সুত, যশোবন্ত নরনাথ,
রাজা রামসিংহের নন্দন।
তস্য পুত্র রামেশ্বর, তদাশ্রয় করি ভর,
বিরচিল শিব-সংকীর্ত্তন॥

শেষ—

দ্বিজ রামেশ্বরে গায় ভবানী সহায়।
এতদূরে মৎস্যধরা পালা হৈল সায়॥
ভ্রাতৃফোটা দেহ লোক মনে প্রীত হয়্যা।
কনিষ্ঠে আশীষ কর ধান্য দূর্ব্বা দিয়া॥

ইতি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীহৃদয়নাথ দে সাকিম শিবরামপুর। সন ১১৭০ সাল ১১ পৌষ।

১৮২। শিবি উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—(১ম পাতা নাই)

শেষ—

শিবিরাজার উপাখ্যান যেইজন শুনে।
বিপদে হয় পার শুনে নারায়ণে॥
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সভে পালা হইল সায়॥

ইতি শিবিরাজার উপাখ্যান সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীনবীনমোহন সিধাই সাং গড়ের ডাঙ্গা। খরিদার শ্রীগোপালচন্দ্র পড়েল সাং গড়ের ডাঙ্গা। সন ১২৪৭ সাল তারিখ ১ আশ্বিন। (শ্লোকসংখ্যা ১৩০।)

১৮৩। শীতলামঙ্গল। নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী।

আরম্ভ—

রঙ্গ রসে করেন স্থিতি রোগপুরপাটনে।
বসন্তকুমারী বস্যা ভাবে মনে মনে॥
ব্রণব্যাধি জানে বেড়াই চৌদ্দভুবন।
সত্যত্রেতাদি নামপূজা শান্তি স্বস্ত্যয়ন॥

পরিচয়—

সৌতি সম সর্ব্বশাস্ত্র, শ্রীযুত ভবানীমিশ্র,
তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব, কি গুণে তুলনা দিব,
যার সখা প্রভু দামোদর॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ, শ্রীরাধাচরণাম্বুজ,
শ্রীচৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাতঃ, নিত্যানন্দ নামযুত,
গাহে ভেবে শীতলাচরণ॥

শেষ—

নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুকর।
আজ্ঞামতে পূর্ণানন্দে হরি বল নর॥

ইতি পুস্তক সমাপ্ত লিখিতং শ্রীরামধন চোঙ্গদা সাং যেণুর সন ১২১৬ সাল তারিখ ২২ জ্যৈষ্ঠ। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০।)

১৮৪। শুকপরীক্ষিৎসংবাদ। হরিচরণ।

বন্দিব অঞ্জনা-সুন, অসীম যাহার গুণ,
বীর অনন্ত বিক্রম নাম হনু।
ফলভ্রমে শিশুকালে, দিবাকর ধরিল বলে,
যেন গরাসিল অর্দ্ধতনু॥

ভণিতা—

দ্বিজ মিশ্রী রমাকান্ত, কামদেব মিশ্রীতাত,
রমাকান্তসুত দাশরথী।

মুনিরাম তার সুত, কৃষ্ণ ভজে অবিরত,
সদাকাল নারায়ণে মতি ॥
তাহার অনুজ ভাই, অবিরত গুণ গাই,
কৃষ্ণের চরণ অভিলাষী।
ভাবিয়া গুরুর পায়, শ্রীহরিচরণ গায়,
ঘরে বাহিরে বনে বসি ॥
(৯ পাত মাত্র পাওয়া গিয়াছে।)

১৮৫। সত্যনারায়ণ। ফকিররাম দাস।

আরম্ভ—

করপুট করিয়া বন্দিব গজাননে।
পাণিপুটে প্রণাম পার্ব্বতী-পঞ্চাননে ॥

মধ্য—

দেখ থাকে পুরাণ কোরাণ থাকে দেখো।
জোই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো ॥

ভণিতা—

ফকীররাম কবিরাজ কয়।
যাকু দেখি বড় মঙ্গলময় ॥

শেষ—

ইতি সন হাজার সতর জ্যৈষ্ঠ মাসে।
সাঙ্গ কৈল পুস্তক ফকিররাম দাসে ॥

ইতি শ্রীসত্যনারায়ণের পুথি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন পাল সাকিম পাত্রসাএর গোপীনাথপুর। ইতি সন হাজার সন ১০৯৫ সাল তারিখ ২৮ শ্রাবণ সোমবার তিথি চতুর্থী সায় পঞ্চমী প্রবেশে এমন বেলে তিন প্রহর সময়ে সমাপ্ত হইল। (শ্লোক ৮৫০।)

১৮৬। সত্যনারায়ণ। নরহরি।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই, ২য় পাত হইতে)

কাঞ্চননগরে সদানন্দ নামে সাধু।
সুতাপুত নাহি নিরানন্দ সহ বধু ॥
পীরপূজা ফল শ্রুতি শুনিয়া শ্রাবণে।
বংশ হেতু আরাধয়ে পীর নারায়ণে ॥

শেষ—

পূজা সাঙ্গ হ'ল্য ভাই কহে নরহরি।
আমীন্ আমীন্ বলি সভে বল হরি ॥
(শ্লোকসংখ্যা ১৩৫।)

১৮৭। সত্যনারায়ণ। দ্বিজ রামকৃষ্ণ।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই, ২য় পাত হইতে)

কলির মোচন যদি কৈল নারায়ণ।
জোড়হস্তে জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন ॥

ভণিতা—

দ্বিজ রামকৃষ্ণ-বাণী, শুন সাধুনন্দিনী,
সত্যদেব কর আরাধন ॥

শেষ—

সোয়ার ঘোড়ার পরে জিন।
সত্যনারায়ণ আসিলেন পূজার দিন ॥
আসিলেন সত্যদেব বসিলেন খাটে।
সত্যনারায়ণের আজ্ঞা হৈল প্রসাদ হাতে হাতে বাটে ॥

ইতি সত্যদেব ঠাকুরের পাঁচালী সমাপ্ত ॥ * ॥ ইতি সন ১১৪১ তাং ২৫ ভাদ্র। শক ১৬৫৪ রোজ শনিবার।

১৮৮। সত্যনারায়ণ। দ্বিজ রামেশ্বর।

আরম্ভ—

সত্য সত্য সত্য পর সর্ব্বসিদ্ধি দাতা।
বাঞ্ছা বড় বাড়িল বর্ণিতে ব্রতকথা ॥

শেষ—

গ্রন্থ সাঙ্গ হইল রচিল দ্বিজরাম।
সবে হরি বল কর মজুরা সেলাম ॥

এই পুস্তক সমাপ্ত হইল সন ১২১০ সাল তাং ৬ই ভাদ্র। (শ্লোকসংখ্যা ২০০।)

১৮৯। সত্যনারায়ণ। (বা গোবিন্দবিজয়) দ্বিজ বিশ্বেশ্বর।

আরম্ভ—

প্রণমহ লক্ষ্মীপতি গরুড়বাহন।
বৃষভারোহণে বন্দো দেব পঞ্চানন ॥
প্রণমহ নারায়ণ সত্য ভগবান্।
দুঃখ দারিদ্র খণ্ডে হয় পরিত্রাণ ॥

শেষ—

সমাপ্ত হইল কথা বল হরি হরি।
সত্যনারায়ণ পূজা অবিলম্ব করি ॥

ইতি সত্যনারায়ণের পাচালি সমাপ্ত। শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৭১ সন ১১৫১ তারিখ ১৭ বৈশাখ শনিবার মোকাম পরগণে হরনগর মৌজে দেবগ্রাম শ্রীরাঘবেন্দ্ররায়স্য সাক্ষরমিদং পুস্তকং। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৬০ ।)

১৯০ । সত্যপীরকথা । শঙ্করাচার্য্য ।

আরম্ভ নাই । (খণ্ডিত)

মধ্য—

এমত প্রকারে আমি করিব সিরণী ।
প্রমাণ মাথার কি তুমি ঠাকুরাণী ॥

শেষ—

আমিন আমিন বলিয়া সভে সার কার্য্য ।
আজ্ঞায় রচিল ইহা শঙ্কর আচার্য্য ॥
শুনিলে সে অবশ্য হয় সিদ্ধি কার্য্য ।
ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ সুখে করে রাজ্য ॥

ইতি সত্যপীরকথা হইল সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীজগন্নাথ বণিক ॥ পাঠক শ্রীযযাতিরাম শর্ম্মা সন্ধ্যাকালে সমাপ্ত হইল। ইতি সন ১০৬২ সাল তারিখ ২০ আষাঢ় ।

১৯১ । সদ্ভাবচন্দ্রিকা । নরোত্তম দাস ।

আরম্ভ—

রাধাকৃষ্ণ প্রণিপাত জীবনে মরণে ।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই পাইব সর্ব্বজনে ॥

ভণিতা—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দাস অনুদাস ।
গাহিল শ্রীনরোত্তম সেবা অভিলাষ ॥

শেষ—১৬ পাতার পর আর পাতা নাই । (প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪৩২)

১৯২ । সনাতনগোস্বামীর সূচক । রাধাবল্লভ দাস ।

আরম্ভ—

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোঁসাঞি,
বাদশার উজীর হৈয়াছিল ।
শ্রীরূপের পত্র পাইয়া, বন্দী হইতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিল ॥

শেষ—

সূক্ষ্মবস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় শয়ন তায়,
কণ্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ ।
কহে রাধাবল্লভ দাস, মনে এই অভিলাষ,
কত দিনে হব তার দাস ॥

ইতি সনাতন গোস্বামীর সূচক সমাপ্ত । সন ১২০৬ সাল তাং ১৮ ভাদ্র ॥ (শ্লোক ৩২)

১৯৩ । সাধন কথা ।

আরম্ভ—শ্রীগুরু শিষ্যকে কৃপা করিয়া দেহের পার্থিবাদি পঞ্চভূতের অচৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া, তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া, পরে নিত্য শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবন সাধক সিদ্ধকরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে শিষ্যের অজ্ঞান দূর হইয়া জ্ঞান জন্মাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণদিগকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন ।

শেষ—পরে সেই জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু শিষ্যকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ কহিলেন তোমার সুজ্ঞান আদি জন্মিয়াছে তুমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম লক্ষণার রসময়ী ভক্তিতে বিরাজ কর । ইতি বেদাদি যোগশাস্ত্রের অনুসারে নিষ্কামধর্ম্মের জ্ঞানাদিসাধন কথা সমাপ্ত। সাক্ষরকৃত বেদাদি শাস্ত্র শ্রীগোলকচন্দ্র কর নরাধম নিজগ্রন্থ হরিদাস ওজোইদাস সাকিম প্রয়াগম জগত মৌজে মৌসায় মুতাশয়ে মুশর মঙ্গর থানায় মুক বাসাতে লেখকের। ইতি সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৮ ফাল্গুন ।

১৯৪ । সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা । নরোত্তম দাস ।

আরম্ভ—অজ্ঞানতিমিরেত্যাদি ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি যুগল-কিশোর ।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥

শেষ—

শ্রীরূপ পাদপদ্ম করি আশ ।
সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা। গ্রন্থ সংপূর্ণ লিখিতং শ্রীপিয়ারী দাস নাড়া সাং পাত্রসায়ের। (শ্লোকসং ১৮২)

১৯৫। সাধ্যবস্তু সাধন।

আরম্ভ—শ্রীজীবগোসাঞিঃর সরণি টীকা অনুসারে শ্রীরূপ সনাতনোবাচ।

অষ্ট বৎসর রূপ আগেলা বৃন্দাবনে।
সনাতন দাস এথা সুখ নাহি মনে॥
রাত্র দিবা ভাবে রূপ গৌরাঙ্গ চরণ।
সনাতন সঙ্গে পুন করিতে মিলন॥

শেষ—সাধ্যবস্তুসাধন বিনা আর নাহি হয়।
সাধ্যসাধন মত এইত নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন এই কহিল তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥

ইতি সাক্ষর মালিক শ্রীকিশোরদাস সাকিম তৈয়াদিগা মৌজে কুহারপাড়া ইতি সন ১২৫২ সাল। (শ্লোক সংখ্যা ৩১২।)

১৯৬। সাধ্যসাধনতত্ত্ব।

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে শ্রীরূপং শ্রীসনাতনং
তব পাদরজো মহ্যং দেহি ভো কৃপয়া প্রভো॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু রূপসনাতন।
কৃপা করি দেহ মোরে ও পাদ সেবন॥

মধ্য—দ্বারিকাপুরীতে কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার।
ঐশী ভক্তি প্রাপ্তি স্থান কহে গ্রন্থকার॥

শেষ—(পাঁচপাতার পর খণ্ডিত।)

১৯৭। সারণবিরাট। সারণ কবি।

আরম্ভ—

পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্তু যঃ পিতা।
তং ব্যাসং বদরীবাসং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে॥
জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পিতামহগণ॥
বিরাটনগর মধ্যে রহেন লুকাইয়া।
এক সম্বৎসর বঞ্চে অজ্ঞাত হইয়া॥

শেষ—পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
ষারদাকে সেবিয়া সারণ কবিগান॥
দিব্য কুলে জন্মে সব পাপের মোচন।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে উৎকল ব্রাহ্মণ॥

ইতি সারণ বিরাট সমাপ্ত। সন ১২৬৬ সাল তাঃ ৭ আশ্বিন রোজ শুক্রবার। (শ্লোকসংখ্যা ৩০৫০।)

১৯৮। সারাৎসারকারিকা। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—একদিন দুর্গাশিব একত্রে বসিয়া।
আনন্দে মগ্নদোঁহে বিহ্বল হইয়া॥

শেষ—নিভৃতে বসিয়া ইহা লেখেন গণেশে।
সেই অনুসারে লেখেন নরোত্তম দাসে॥

ইতি সারাৎসারকারিকা সমাপ্ত। ইতি সন ১২৬৬ মাহ ৮ ফাল্গুন। (শ্লোকসংখ্যা ১৪০।)

১৯৯। সিদ্ধসার। গোপীনাথ দাস।

আরম্ভ—জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

ভণিতা—এই মোর অভিলাষ। কহে গোপীনাথ দাস॥

শেষ—এই মনোনীত গ্রন্থ হৈল সর্ব্ব সার।
আপনা নিস্তারের কিছু না দেখি উপায়॥
আপন ইচ্ছায় জীব নানাবাঞ্ছা করে।
কার্য্য নাহি সিদ্ধ হয় শ্রম করি মরে॥

ইতি সিদ্ধসার মনোনীত গ্রন্থ সংপূর্ণ। সন ১২৫৫ সাল। তাং ২৬ পৌষ রোজ সোমবার। ইতি পঠনার্থে শ্রীগোপাল কলু সাং বীরসিং। (শ্লোকসংখ্যা ১৮০।)

২০০। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা। রামচন্দ্র দাস।

আরম্ভ—বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমন্তঃকলুষখণ্ডনম্।
ভক্তিপ্রকাশকং দেবং নিজপ্রেমপ্রদায়কং॥
জয় জয় কৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু করুণা-হৃদয়॥
* * *
জয় জয় নরোত্তম প্রভু শ্রীনিবাস।
যাহার চরণে সদা কর মুক্তি আশ॥
ব্রজে কৃষ্ণের নিত্য লীলা গোসাঞি সকল।
লিখিয়াছে স্থানে স্থানে বুঝিতে বিরল॥
একত্র করিয়া বুঝিবারে হৈল মন।
অতএব সেই সব করি উদ্গারণ॥ তথা।
পূর্ব্বে চুর্ণ ভামৃতে আছয়ে লিখন।
অতি পুষ্ট লাগি করি এথানে বর্ণন॥

শেষ—সভার চরণ পদ্ম হৃদয়ে অধিকা।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা কহে রামচন্দ্রদাস ॥

ইতি সিদ্ধান্তচন্দ্রিকায়াং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীসুত কথনোনাম পঞ্চাধ্যায়ঃ। সন ১০৮২ সাল তাং ১১ মাঘ। (শ্লোকসংখ্যা ২৬০।)

২০১। সিদ্ধিনাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

আরম্ভ—জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। ইত্যাদি
সভাকার পূর্ব্বনাম কহি শুনি সাবধানে।
সখাসখী পিতামাতা আর ভক্তগণে ॥

শেষ—মদনলালসা সখী কহি তার নাম।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত সেই করিল বিধান ॥
এহি ত হইল সব যূথের নিরূপণ।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মন রহু অনুক্ষণ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত সিদ্ধিনাম সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীপ্রতাপনারায়ণদত্তস্য সাং সোপুরা। শকাব্দা ১৭১৮ সন ১২০৩ সাল তারিখ ১৩ আশ্বিন সোমবার তিথি দশমী। (শ্লোকসংখ্যা ১২৫।)

২০২। সীতাহরণ। দ্বিজ কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—(প্রথম শ্লোক অস্পষ্ট)
সীতার প্রাণ রঘুনাথ জীবের জীবন ॥

শেষ—শ্রীরামমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এতদূরে সীতাহরণ পালা হৈল সায় ॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
কত যত্নে ব্রহ্মা আনি করিল প্রচার ॥

ইতি সীতাহরণ পালা সংপূর্ণ। ইতি সন ১২১৬ সাল তারিখ ১৬ পৌষ। (শ্লোকসংখ্যা ৮০।)

২০৩। সুদামাচরিত্র। বিপ্র পরশুরাম।

আরম্ভ—সুদামাচরিত লিখ্যতে ॥ * ॥
রাজা পরীক্ষিতে যদি ব্রহ্মশাপ হইল।
গঙ্গার তীরেতে গিয়া মঞ্চায় বান্ধিল ॥

ভণিতা—এ ভব সংসারে প্রভু মোরে কর পার।
দ্বিজ পরশুরাম গান কৃষ্ণসখা যার ॥

শেষ—এতদূরে সুদামাচরিত হইল সায়।
হরি হরি বল সবে অমর সভায় ॥ * ॥

অক্ষর মিদং শ্রীবলরাম চৌধুরী পাঠক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সাং মাজুকুরি পরগণা বারহাজারী ভবাসী শ্রীশ্রী৺ পরিবার ॥ ইতি সন ১২৩১ সাল তারিখ ২২ ভাদ্র রবিবার দিবসে সম্পূর্ণ হইল ॥ (শ্লোকসংখ্যা ২০০)

২০৪। স্মরণদর্পণ। রামচন্দ্র দাস।

আরম্ভ —(১ম পাত নাই)

শেষ—কেহ না করিহ রোষ, ক্ষমিহ সকল দোষ,
যেন কহি বালকের বশে।
শুন হে সাধক ভাই, স্মরণ-দর্পণ এই,
যে কহিল রামচন্দ্র দাসে ॥

ইতি স্মরণদর্পণ সমাপ্ত। ইতি সন ১০৮৩ সাল তাং ৪ চৈত্র। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৫০।)

২০৫। স্মরণমঙ্গল। নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—(১ম পাত নাই)

শেষ—শ্রীরূপ চরণপদ্ম করি আরাধন।
সংক্ষেপে কহিমু অষ্টকালের আখ্যান ॥
শ্রীরূপ চরণপদ্ম করি সভে আশ।
স্মরণমঙ্গল কহেন নরোত্তম দাস ॥

ইতি স্মরণমঙ্গল আখ্যান সমাপ্ত। শকাব্দা ১৬৪০ সন ১১৩৬ তারিখ ২৭ মাঘ। সাক্ষর শ্রীআনন্দীরাম দাসকন্যা। নিবাস শ্রীনগর। পরগণে মানপুর। রোজ বৃহস্পতিবার।

২০৬। স্মরণমঙ্গলসূত্র। গিরিধর দাস।

আরম্ভ—জয় জয় গুরুদেব চরণারবিন্দ।
নিরবধি ঝরে যাহে কৃপা মকরন্দ ॥

মধ্য—প্রাতঃকালে উঠি রাধিকা সখী সঙ্গে।
দন্তধাবন স্নান ভূষণ পরি রঙ্গে ॥

শেষ—অতি দীন অতি হীন গিরিধর দাস।
স্মরণ-মঙ্গলসূত্র করিল প্রকাশ ॥

২০৭। স্বরূপবর্ণন। কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীগুরুদেব সিদ্ধি স্বাহা। মননস্থান মহত্তর বৃন্দাবন। তাহার সিদ্ধি নাম। সার প্রতিভা।

নির্ম্মল পদ্ম। বিলাসের নাম আনন্দ তত্ব। পরমার্থের নাম অক্ষয় তত্ব।

শেষ—শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধাকৃষ্ণলীলা।
সুখে গৌড়বাসী লোক তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আঁশ।
স্বরূপ বর্ণন এই কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি স্বরূপ-বর্ণন সম্পূর্ণ। সন ১০৮১ সাল তাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ রোজ রবিবার। পুস্তক শ্রীপ্রসাদ দে দক্ষিণপাড়া।

২০৮। হংসদূত। নরসিংহ দাস।

আরম্ভ—প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ চরণ।
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগণ॥
গোপীর বিরহকথা না যায় কথন।
শ্লোক ছন্দে দাস গোসাঞি করিলা রচন॥
শ্লোক ছন্দে কৈলে পুথি বুঝএ সুজনে।
মুর্খে ইহার কিছু না জানে কহনে॥
শ্লোক ছন্দে শুনি মোর হৈল প্রীতি হাস।
হংসদূত কথা কহে নরসিংহ দাস॥

শেষ—প্রধান গোপীর ভাব সভাতে উজ্বল।
ইহাতে বঞ্চিত নরসিংহ যে কেবল॥

ইতি হংসদূত কথা সমাপ্ত। লিখিত শ্রীমথুরমোহন দাস বৈরাগী পাঠক শ্রীজগন্নাথ দে ইতি সন ১২০১ সাল তারিখ ১৪ই পৌষ রোজ বুধবার।

২০৯। হংসদূত। দাস গোস্বামী।

আরম্ভ—(১ম পাতা নাই।)

শেষ—ইহার সকল হয় ভাবের গমন।
হংসদূত ইতিহাস দাস-বিরচন॥

ইতি হংসদূতেগোপিকাসংবাদঃ সম্পূর্ণঃ। লিখিতং শ্রীসন্তোষদাস মুন্সী সাকিম ভগবানবাটী পরগণে সাহাপুর সরকার মান্দরণ সন ১০৭৫ তারিখ ৬ মাঘ শনিবার পৌষ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া দেড় প্রহরের মধ্যে গ্রন্থ-সমাপন হইল। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১০০০।)

২১০। হরপার্ব্বতী বিবাহ। তিলকচন্দ্র।

আরম্ভ—তারপর নিবেদন করি এ সভাতে।
হরপার্ব্বতীর বিভা হইল যেন মতে॥

শেষ—ভাবি ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদদ্বন্দ্ব।
পুরাণের সূত্র পেয়ে লেখে তিলকচন্দ্র॥

ইতি বিবাহ সমাপ্ত। তারিখ ৩০ আষাঢ় রোজ মঙ্গলবার তিথি একাদশী সন ১১০৭।

২১১। হরিনামকবচ। গোপীকৃষ্ণ দাস।

আরম্ভ—জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চৈতন্য গোঁসাঞি বোলেন শুন শচীমাতা।
অবধূত নিতাইর আমি লৈব যাইয়া বার্ত্তা॥

শেষ—অবৈষ্ণবারে কদাচিৎ না করিও প্রকাশ।
নিবেদন করিল এ গোপীকৃষ্ণদাস॥

ইতি হরিনামকবচ সমাপ্ত ইতি সন ১১৭৫ সাল মাহ শ্রাবণ। (শ্লোকসংখ্যা ১৫৪।)

২১২। হরিশ্চন্দ্রের পালা। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্বকথন।
কহ কহ কৃষ্ণকথা মুনি করিয়া শ্রবণ॥

শেষ—পাইল কৃষ্ণের পদপল্লব উদয়।
হরিশ্চন্দ্র সম দাতা কেবা কোথা হয়॥
রাজারে উদ্ধারিয়া গেল নিজ স্থানে।
ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে॥

ইতি হরিচন্দ্রের পালা সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৩ সাল ১৪ ভাদ্র রোজ বুধবার বেলা আড়াই প্রহরে সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীপীতাম্বর দাস গন্ধবণিক সাং পাত্র-সাএর। (শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০।)

২১৩। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান। কবিচন্দ্র।

আরম্ভ—অতঃপর শুন সবে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
কেবা দাতা আছে হরিশ্চন্দ্রের সমান॥

ভণিতা—সঙ্কটে পড়িয়া কোপে আছে বড় ভয়।
কাতর হইয়া ছন্দে কবিচন্দ্রে কয়॥ (শ্লোক ১৭০।)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ৪ঠা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭।) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল।

অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (সভাপতি), কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বাবু শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে, শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ (সহকারী সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। প্রবন্ধ পাঠ।

(ক) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল—হরিনামের শব্দতত্ত্ব।

(খ) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—খোদিত জৈনলিপি।

(গ) „ রসিকচন্দ্র বসু—মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়।

(ঘ) „ অম্বিকাচরণ গুপ্ত—সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল।

৪। বিবিধ বিষয়।

কার্য্যারম্ভের সময় সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না থাকাতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে) সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত সভ্য মহাশয়গণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং নূতন সভ্যের নাম লিখিত হইল।

	প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত।	শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
২।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	„ পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী।
৩।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ প্রতুলচন্দ্র বসু।	„ কালীনাথ দাস।
৪।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	„ জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৫।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	„ সতীশচন্দ্র রায় এম এ।
৬।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।	„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ।
৭।	„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ কালীময় ঘটক।

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের "হরিনাম-শব্দতত্ত্ব" বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইল। পাঠান্তে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ লেখক হরিশব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ে কল্পনা করিয়াছেন। হরিশব্দ প্রাচীন। কলিসন্তরণ-উপনিষদে "হরের্নাম" ইত্যাদি শ্লোক দেখা যায়। লেখক বস্ত্রহরণের বিষয় যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝেন নাই।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধর্ম্মের আলোচনা করা হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনে ধর্ম্মালোচনা সঙ্গত নহে।

শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, সোমলতা ভারতে কোথাও পাওয়া যায় না। সোম পারসিকদিগের হোম।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন যে, বীরেশ্বর বাবু যাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহার অনুমোদন করেন, এরূপ প্রবন্ধ আলোচিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, হরিনাম-শব্দতত্ত্ব মাত্র আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে আপত্তির কোন কারণ দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, বস্ত্রহরণের কথাটা না বলিলে ভাল হইত। তাঁহার মতে প্রবন্ধে শব্দতত্ত্ব মাত্র আলোচিত হইয়াছে। সম্পাদক বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক আভিধানিক বৈয়াকরণের ভাবে গবেষণা সহকারে হরিনামের শব্দতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। হরি শব্দ, কালে কত অর্থান্তরিত হইয়া ঈশ্বর-বাচক হইয়াছে

তাহারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা ধর্ম্মালোচনা নহে। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় পুনরায় বলিলেন যে, অনেকের বিশ্বাস যে, হরিশব্দ অনাদি, অতএব তাঁহার মতে হরিশব্দের তত্ত্বালোচনা সঙ্গত নহে।

স্থির হইল যে, বস্ত্রহরণের প্রসঙ্গ বাদে প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, সোম এখন পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে সোমের পরিবর্ত্তে পুঁইশাক ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রদেশে অন্য পদার্থেরও ব্যবহার হয়। পার্সীরাও সোমযাগ করে। তাহারা সোমকে হোম বলে। সোমের এমন তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন। Hillebrandt এ বিষয়ে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সোম হয়ত "চা" গুল্ম। "চা"র মত সোমও "দুর্গেষু" উৎপন্ন হইত।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বরদার মহারাজের সংস্কৃত-পাঠশালার অন্যতম অধ্যাপক মহাশয়ের মুখে সোম ও পুতিকা বিষয়ক এই শ্রুতিটী শুনিয়াছেন, "যদি সোমং ন বিন্দেত তর্হি পূতিকামালভেয়ম্"।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে যে সোমরাজের উল্লেখ আছে, তাহাও সোমের মত খাইতে বিস্বাদ।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, সোম "হাড়ভাঙ্গা" জাতীয় উদ্ভিদ্।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধে, যে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "খোদিত জৈনলিপি" বিষয়ক প্রবন্ধের সারাংশ সভায় বিবৃত করিলেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। তজ্জন্য শাস্ত্রী মহাশয় সভায় ধন্যবাদার্হ।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার প্রবন্ধ অতি সারগর্ভ হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের উন্নতি কল্পে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদভাজন।

স্থির হইল যে প্রবন্ধটী পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

অন্যান্য প্রবন্ধের আলোচনা স্থগিত রহিল।

৪। অতঃপর গ্রন্থরক্ষক মহাশয়, পরিষদকে যাঁহারা গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নে গ্রন্থোপহারদাতৃগণের নাম ও প্রাপ্ত গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি এ—১ রৈবতক, ২ কুরুক্ষেত্র, ৩ অবকাশ-রঞ্জিনী ১ম ও ২য় খণ্ড, ৪ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৫ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ রঙ্গমতী, ৭ খৃষ্ট, ৮ পলাশীর যুদ্ধ, ৯ ক্লিওপেট্রা, ১০ অমিতাভ, ১১ প্রভাস।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১ পঞ্চভূত, ২ কাব্যগ্রন্থাবলী।
শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এম এ, বি এল—১ ঊষা।
শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল ঘোষাল—১ প্রবাদ সংগ্রহ।
শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ—১ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ।
অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য সাঙ্গ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ২৯শে কার্ত্তিক।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৯শে কার্ত্তিক (১৪ই নবেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাণ-চন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ দাস, কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত ব্যোম-কেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল (সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।
২। সভ্য নির্ব্বাচন।
৩। প্রবন্ধ পাঠ।
(ক) শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু—"মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়।"
(খ) শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত—"সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল।"
৪। ঐতিহাসিক সমিতি ও কবিকঙ্কণ সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

৫। প্রাচীন শব্দ সংগ্রহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রস্তাব।

৬। বিবিধ বিষয়।

১। সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তি পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

নিম্নে প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম লিখিত হইল।

	প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।	শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়।
২।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু।	„ কুঞ্জলাল রায়।	„ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
৩।	„ নগেন্দ্রনাথ বসু।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল	„ ডাক্তার শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
৪।	„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল।	„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।	„ ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টো।
৫।	„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	„ দুর্গাদাস দে।

৩। অতঃপর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের "কবি মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়" প্রবন্ধ পঠিত হইল।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় "জগন্নাথ-বিজয়ের" প্রাচীনতা বিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা সমীচীন মনে হয় না। কাব্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ নাই বলিয়াই যে কবি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর উড়িষ্যাভাষায় রচিত বিস্তর জগন্নাথ মাহাত্ম্যগ্রন্থেও তাঁহার নামোল্লেখ নাই অথচ উড়িষ্যায় চৈতন্যদেব দেবতা বলিয়া পূজিত।

লেখক কবির জাতি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বক্তার নিকট জগন্নাথমঙ্গল নামে মুকুন্দরচিত দুইখানি পুঁথি আছে। তাহাতে "দ্বিজ" মুকুন্দের ভণিতা দৃষ্ট হয়।

লেখক ভাষার প্রমাণে মুকুন্দ কবিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোক স্থির করিয়াছেন। এরূপ স্থির করিবার কারণ যথেষ্ট মনে হয় না। বক্তার নিকট জগন্নাথ-বিজয়ের এক-খানি ও জগন্নাথ মঙ্গলের যে দুইখানি পুঁথি আছে, ঐ সকল পুঁথির ভাষা রাঢ়দেশীয়, ময়মনসিংহের ভাষা নহে। এরূপ হইবার কারণ এই যে পুঁথি নকল করিবার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের পুঁথি-লেখক তত্তৎ প্রদেশের ভাষা ও শব্দের সমাবেশ করিয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্ত কৃত্তিবাস ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গলের প্রকাশখণ্ডের সহিত মুকুন্দের পুঁথির অনেক স্থানে অবিকল মিল আছে। জয়ানন্দ যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার তাহা ভাবিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার মতে চণ্ডীদাস মুকুন্দের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। চৈতন্যদেবেরও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয় তিনি অন্যত্র প্রমাণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শরীরে লীন হইয়াছিলেন, সেইজন্য বৈষ্ণবেরা জগন্নাথদেবকে মহাপ্রভু বলেন। জগন্নাথবিজয়-গ্রন্থে দেখা যায়, মুকুন্দও জগন্নাথকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবকে বৈষ্ণবেরা ভক্তাবতার বলেন না, ভক্তরূপ বলেন।

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, ভাষা অমার্জ্জিত হইলেই যে কাব্য প্রাচীন হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। চণ্ডীদাসের হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে জানা যায় যে, তাঁহার ভাষা প্রবন্ধ-লেখক যতটা মনে করিয়াছেন, ততটা মার্জ্জিত নহে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, অনেকের মতে জগন্নাথ বৌদ্ধাবতার। মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়ের যে পুঁথি Asiatic Societyতে আছে, তাহাতে এই দুই ছত্র দেখা যায়—

"তবে শ্রীজগন্নাথ বৌদ্ধরূপ ধরে। প্রবেশ করিলা হরি দেউল ভিতরে॥
লুকাইয়া যোগধ্যানে রহিলা শ্রীহরি। দেউল গঠিয়া রাজা গেল ব্রহ্মপুরী॥"

আর এক কথা। আমরা জানি যে, ধর্ম্মঠাকুরের বাহন উলুক। ধর্ম্মকে অনাদি বলে। এই গ্রন্থেও উলুকের উল্লেখ আছে। উলুক রাজাকে কূর্ম্মের নিকট পাঠাইল। ধর্ম্ম প্রাচীন অক্ষরে যেরূপ লেখা হইত, তাহাতে অনায়াসে লেখকের হস্তে রূপান্তরিত হইয়া কূর্ম্ম হইতে পারে। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদসহ প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, কবি মুকুন্দের উপর চুরি অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় বলিলেন যে, চোর ডাকাতির উল্লেখ হইয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ আইন আক্‌বরি Alberuniর গ্রন্থ হইতে অধিকাংশ চুরি। কালিকামঙ্গল হইতে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রাহাজানি করিয়াছেন।

স্থির হইল যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

(খ) অতঃপর সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল প্রবন্ধ পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার মতে প্রবন্ধ মুদ্রিত হওয়া উচিত। ইহাতে অনেক নূতন কথা জানিবার আছে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, পঠিত প্রবন্ধে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক

নূতন কথা আছে। অন্ত ধর্ম্মমঙ্গলে—ধর্ম্মকে আদ্য বলিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্মকে ব্রহ্মার সহিত এক করা হইয়াছে। তাঁহার শক্তিকে আদ্যা বলা হইয়াছে।

ভারতে নাথ বলিয়া জন কয়েক জন্মাইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, মীননাথ, মৎস্যনাথ ইত্যাদি। ইঁহাদিগকে বৌদ্ধেরা বৌদ্ধ বলিয়া পূজা করে। হিন্দুরা শৈব বলিয়া পূজা করে। মানাদে একটা "জাত" হয়। সেখানে একজন যোগীরাজ উপস্থিত হয়েন। গ্রন্থোক্ত মহানাদ এই মানাদ। যোগীরাজ এই মীননাথ। ভারত ইতিহাসের পক্ষে ঐ নাথদিগের ইতিবৃত্ত বড় আবশ্যক। "কালুপা," "হাড়িপা" বোধ হয় তৈব্বতীয় ভাষা জাত। তিব্বতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। স্বয়ম্ভুপুরাণে "পা" অন্ত শব্দ আছে।

স্থির হইল সে প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

৪। চতুর্থ আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল।

৫। সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রাচীন শব্দ-সমিতি নিয়োগ বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নে সমিতির সম্পাদক ও সদস্যগণের নাম যথাক্রমে লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

৬। (ক) গ্রন্থরক্ষক মহাশয় পরিষৎ গ্রন্থালয়ের জন্য গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নে গ্রন্থোপহারদাতা ও উপহারপ্রাপ্তগ্রন্থের নাম লিখিত হইল।

১। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত "হিন্দুশাস্ত্র" ২য় খণ্ড।

২। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—(১) "বিদ্যাসাগর" জীবনচরিত, (২) ইংরাজের জয়।
(৩) শকুন্তলা রহস্য।

৩। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল—(ক) "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" (খ) "ন্যায়দর্শন" ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড।

৪। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—"Dramatic Works I. II.

৫। „ রসময় লাহা—"পুষ্পাঞ্জলি"।

৬। „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত—(১) ফুল, (২) পারিজাতমালা, (৩) হেমহার, (৪) মোহনমালা, (৫) একটী চিত্র।

৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—(১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

৮। „ কিরণচন্দ্র দত্ত—(১) কবি কাননিকা।

৯। „ বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়—(১) পদ্মালয়া।

১০। „ রসিকচন্দ্র বসু—(১) ললিতগাথা।

(খ) সম্পাদক পরিষদের অন্যতম সভ্য কবিরাজ নবীনচন্দ্র সেন গুপ্তের মৃত্যুর উল্লেখ করিলে সভা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

(গ) পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় সভায় গোচর করিলেন যে, অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য স্বয়ং ২০৲ কুড়ি টাকা এবং জয়দেবপুরাধিপতির নিকট হইতে ২০০৲ দুই শত টাকা অর্থ সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

পরিষদ্ তাঁহাকে ও জয়দেবপুরাধিপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ১৪ই অগ্রহায়ণ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ (১৮৯৭। ২৮শে নবেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এ, (সহ-সম্পাদক)।

উক্ত অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক "উপসর্গ-বিচার" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৪। ঐতিহাসিক সমিতি ও কবিকঙ্কণ-সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। পরে প্রস্তাবক ও সমর্থক এবং প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম লিখিত হইল।

	প্রস্তাবক	সমর্থকের নাম	প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম।
১।	শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিচরণ-রায় কবিরত্ন।
২।	„ কিরণচন্দ্র দত্ত	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	„ রামগোপাল সেনগুপ্ত।
৩।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	„ প্রমথনাথ মিত্র	„ বেণীমাধব কাব্যতীর্থ।
৪।	„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	„ বিহারীলাল সরকার	„ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
৫।	„ শরচ্চন্দ্র সরকার	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	„ শিবনাথ বসু।
৬।	„ শরচ্চন্দ্র সরকার	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	„ ত্রৈলোক্যমোহন রায়চৌধুরী।
৭।	„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	„ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	„ হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ।
৮।	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	„ পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ
৯।	„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	„ কুঞ্জবিহারী বসু	„ মহেন্দ্রনাথ হালদার।

৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বরচিত "উপসর্গ-বিচার" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় "উপসর্গ বিচার" উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। চণ্ডীবাবু তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, প্রবন্ধটী পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। শীঘ্র যেন প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, এই তাঁহার অনুরোধ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী অতীব সুন্দর হইয়াছে। প্রবন্ধটী "শব্দতত্ত্ব" বিষয়ক, কিন্তু ভাষা কাব্যোপযোগী। প্রবন্ধটী অশেষ চিন্তার ফল। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় অতি গভীর তত্ত্ব সকল অতি বিশদ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। প্রবন্ধোক্ত তত্ত্ব সকলে বিশেষ ভাবিবার অনেক কথা আছে। ইহা দ্বারা নূতন শব্দ-প্রণয়নে বিশেষ সুবিধা হইবে। দুই এক স্থলে মতভেদ আছে, অনেক স্থলে উপসর্গের প্রয়োগ স্থলে প্রকৃত অর্থের আশ পাশ দিয়া যাওয়া হইয়াছে। কারণ প্রয়োগ স্থলে লোকে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রয়োগ করেন। বাঁড়ুর্য্যে, চাটুর্য্যে প্রভৃতি শব্দোৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ আছে। পালা হয়ত, পাল্ ধাতু হইতে, পর্য্যায় হইতে হয়ত নহে। "র" র আসা যাওয়া বুঝা ভার। যেমন ক্রোশ ও কোশ। বড়ালের "ল" কোথা হইতে আসিল? বটাচার্য্য হইতে অথবা বটব্যাল হইতে? জ্ঞান ও আনন্দ উভয় প্রবন্ধ হইতে লাভ হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

সভাপতি (শাস্ত্রী মহাশয়) বলিলেন যে, প্রবন্ধ লেখক বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে অগ্রণী, পণ্ডিত ও প্রকৃষ্ট বক্তা। প্রবন্ধের সমালোচনায় বলিতে হয়, ধন্য ধন্য ধন্য। উপসর্গ-বিচার এ দেশে কেন ইয়ুরোপেও নূতন। দুর্গাদাসও ঐ ভাবে করেন নাই। এ প্রণালী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। উপসর্গ এককালে স্বতন্ত্র শব্দ ছিল। বেদে ঐরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। উপসর্গের বৈদিক প্রয়োগ দেখিলে উপসর্গ বেশ বুঝা যায়। চাটুর্য্যে প্রভৃতি গ্রামের নাম হইতে উৎপন্ন। পঞ্চ ব্রাহ্মণের ১৫৬ বংশধরের নাম, গ্রামের নাম হইতে উৎপন্ন। ইহাদিগের

মধ্যে ১৯ জন কৌলীন্য পান। ইহাদের ৮ গাঁই, বাঁড়ুরি, মুখুটী, চাটুতি ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে যাহারা কুলীন হইলেন, তাহারা বংশজ হইতে আপনাদিগের ভেদ করিবার জন্য ওঝা শব্দ (উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ) ঐ নামের শেষে যোগ করিতে লাগিলেন। ইহা হইতে বাঁড়ুয্যে প্রভৃতির উৎপত্তি।

৪। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ঐতিহাসিকসমিতি ও কবিকঙ্কণসমিতির কার্য্যবিবরণ মহাশয় পাঠ করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে উক্ত দুই সমিতিতে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় সদস্য নিযুক্ত হউন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৫। গ্রন্থরক্ষক মহাশয় গ্রন্থ উপহার দাতাদিগের ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

নিম্নে গ্রন্থোপহার দাতা ও উপহার প্রাপ্ত গ্রন্থের নাম লিখিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত,—সেক্সপিয়র ২য় ভাগ।

২। শ্রীযুক্ত অনুপকৃষ্ণ মিত্র—"সমর্থকোষ" ৮৬ সংখ্যা হইতে ১০৪।

৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন—(ক) মাতৃপদাঞ্জলি, (খ) পঞ্চামৃতম্, (গ ও ঘ) চাণক্য-শ্লোক ২ খানি, (ঙ—ছ) ভট্টিকাব্যম্ ১ম ২য় ৩য় ভাগ, (জ ও ঝ) রঘুবংশম্ ১ম ও ২য় ভাগ, (ঞ) রঘুবংশ Vol. V, (ট) হিমালয় দর্শন, (ঠ) শিক্ষাসার (ড—ণ) শিক্ষা ১ম ২য় ৩য় ভাগ, (ত) তারামা, (থ) শান্তিস্তব, (দ) প্রবন্ধসার, (ধ) হিতোপদেশ, (ন) হর্ষচরিত ৫ম অধ্যায়, (প) রঘুবংশ অর্থ পুস্তক, (ফ) দশকুমার চরিত অর্থ পুস্তক।

৪। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—তিতুমীর-ইতিহাস।

৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত বঙ্গের শেষ বীর।

ঐতিহাসিক সমিতির প্রথম অধিবেশন।—১৩০৪ সালে ১৩ই ভাদ্র ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৫ পাঁচ ঘটিকা। ৬৫/২ নং বীডন্ ষ্ট্রীটে কেশব একাডেমিতে বর্ত্তমান বর্ষের ঐতিহাসিক সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাত্র মিত্র, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (ঐতিহাসিক সমিতির সম্পাদক)

হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়, শারীরিক অসুস্থতা জন্য ও পরিজনের পীড়ার নিমিত্ত উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমেই সম্পাদক মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস-লেখকগণের লিখিত মুসলমান বাদশাদিগের নামের বর্ণ যোজনার (বানানের) অনৈক্য সম্বন্ধে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের সংশোধিত তালিকাটী, সভাস্থলে উপস্থিত করিলেন। কুমুদকুমার বাবু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের প্রস্তুতীকৃত, তালিকার সর্ব্বাংশের বিশুদ্ধি সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায়, আপাততঃ এই ধার্য্য হইল যে, একটী নূতন

তালিকা পুনরায় প্রস্তুত করা হউক। মূল ভাষায় (পার্সীতে) বাদশাগণের নামমালার অর্থ ও উচ্চারণ বিষয়ে শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়, অনেক কথা বলিলে পর সভ্যগণের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হইল। পরিশেষে স্থির হইল, সম্পাদক মহাশয়, ডাক্তার মিত্র মহাশয়ের কৃত তালিকাটী, কুমুদকুমার বাবুকে একপ্রস্থ প্রস্তুত করিয়া প্রেরণ করুন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়, শাহনামা প্রভৃতি মূল গ্রন্থের সহিত ঐক্য করিয়া যে তালিকা দিবেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য চলিবে। সভাস্থলে ইহাও ধার্য্য হইল—এসিয়াটিক সোসাইটী, প্রেসিডেন্সী কলেজের ও হাইকোর্টের মৌলবী এবং অন্যান্য দুই একজন পারস্ত ভাষাভিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক, অদ্যাবধি কুমুদকুমার বাবুর নিকট হইতে তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী সমিতি।—বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম অধিবেশন। ১৩০৪ সাল ১৩ই ভাদ্র। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ২৮শে আগষ্ট। শনিবার অপরাহ্ণ ৫।৹ সাড়ে পাঁচ ঘটিকা। যেদিন ঐতিহাসিক সমিতির প্রথমাধিবেশন হয়, সেই দিনেই এই সমিতির ও এই বৎসরের প্রথমাধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (কবিকঙ্কণ চণ্ডী সমিতির সম্পাদক)।

সম্পাদক মহাশয়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্তের সংগৃহীত প্রতিলিপির প্রসঙ্গ করিলেন। সভাস্থলে তিনি যে কয়েকখানি পুঁথি ও একখানি মুদ্রিত সুপ্রাচীন পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিষয় বলিলেন। ইহাও সম্পাদক বলিলেন, "বিশ্বকোষ" সঙ্কলন-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ও তদীয় অগ্রজ কবিচন্দ্রের ও অপর কবিচন্দ্রের যে যে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তন্নিবন্ধন তিনি "পরিষদের" বিশেষ ধন্যবাদ-যোগ্য। সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং কবিচন্দ্রের যে যে পুঁথি পাইয়াছেন, তাহাও সভায় উল্লিখিত হইল। তিনি কহিতে লাগিলেন, সেগুলির প্রসঙ্গ, চণ্ডীর ভূমিকায় বা উপক্রমণিকায় অতীব উপাদেয় হইবে, এই জন্য সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। অধিকাংশ সভ্য উপস্থিত না থাকায় নির্দ্ধারিত হইল যে, আপাততঃ আরও কিছুদিন পুস্তকসংগ্রহের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রতিলিপি, পুঁথি ও মুদ্রিত সুপুরাতন পুস্তকগুলি অপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কার্য্য অধিক অগ্রসর হয় নাই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিবার পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সম্পাদক।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সভাপতি।

১৩০৪ সাল ২৬শে পৌষ।